সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

একাদশ বর্ষ।

১৩০৭।

কলিকাতা;
[illegible] নং সীতারাম-ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
[illegible] হুকিয়া ষ্ট্রীট, "মণিকা-যন্ত্রে"
শ্রী[illegible]নাথ [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সম্পাদিত।

একাদশ বর্ষ।

১৩০৭।

কলিকাতা;
[illegible] নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
[illegible]২ হুকিয়া ষ্ট্রীট, "মণিকা-যন্ত্রে"
শ্রী[illegible]নাথ [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দিল। যুবতী সেখের ঝি বলিল, "ইয়া আল্লা, তুমি কি এক লহমা সবুর করতে পার না?"—বৃদ্ধার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে দন্তবিরল মুখবিবর হইতে অসংযত বাক্যের সহিত প্রচুর পরিমাণে নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রথম আক্রমণটা মুখে মুখেই চলিল, অবশেষে ক্রোধের উত্তেজনা অধিক হইলে, হাড়ি, কলসী, ঘটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া, উভয়ে হাত মুখের নানারকম ভঙ্গী করিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া পাড়া কাঁপাইয়া তুলিল। পাড়ার দুই পাঁচটা দুষ্টু ছেলে এই ঝগড়া শুনিয়া হর্ষভরে সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং করতালি দিয়া 'নারদ' 'নারদ' বলিয়া নাচিতে লাগিল! ইহাদের এই সহর্ষ আবাহনে কলহের বাস্ত দেবতা তাঁহার প্রিয়তম বাহন ঢেঁকিটির উপর আরোহণ পূর্ব্বক এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শূন্যে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন কি না, তাহা নরলোকের নেত্রগোচর হয় নাই; কিন্তু মুসলমান বীরাঙ্গনাগণের এই কোলাহল ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল, এবং পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকই উভয় পক্ষে যোগদান করিল। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু রমণীগণ এই কোলাহলে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ পূর্ব্বক এবং "আজ বছরকার দিন, শেখের বেটিরা এত ঝগড়াও কর্ত্তে জানে" এই বিদ্রোচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতেছে। নদীতে এক কোমরের বেশী জল নাই, কিন্তু সেই জল টুকুই এই বৃহৎ গ্রামের সহস্র সহস্র অধিবাসীর জীবনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নদীটি শৈবাল ও জলজ উদ্ভিজ্জে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার। তীরে বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে কালো বালির সঙ্গে ঝির ঝির করিয়া অতি ঠাণ্ডা জল উঠিতেছে। নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; অনেক দূর হইতে তাহার তীরবর্ত্তী বাঁশ ঝাড়, বট গাছ ও বাঁশ-জালের বাঁশের উচ্চ অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।

ঘড়াগুলি বালি দিয়া ভাল করিয়া মাজিয়া রমণীগণ ঘড়া ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে; কাহারও ঘড়ার মুখে একটা ছোট তেলের বাটি, তাহার উপরে একটি কাঁচা আম; কেহ বাগানের ভিতর দিয়া আসিবার সময় দুই পাঁচটা আম গাছতলায় কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। গামছাখানি মস্তকে দিয়া ঘড়াটি কাঁখে লইয়া তাহারা অতি কষ্টে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক বিজন গ্রাম্য পথ দিয়া চলিতেছে; ঘড়ার জল ঢক্ ঢক্ করিয়া বাজিতেছে, জলসিক্ত পদাঙ্করেখা গুলি দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যাইতেছে; পদতলে তাপ লাগিতেছে বলিয়া রমণীগণ দুই একবার মুখ বিকৃত করিতেছে; তাহার

পর ধীরে ধীরে ষষ্ঠীতলায় আসিয়া অশ্বত্থমূলে, তেলমাখা বাটিতে করিয়া, তিনবার অল্প অল্প জল ঢালিয়া দিতেছে, এবং বৃক্ষকাণ্ডে ললাট স্পর্শ পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ধীরে বাড়ী ফিরিতেছে।

বিধবা গৃহিণীগণ আহ্নিক পূজা শেষ করিয়া, গত কল্য কলসী-উৎসর্গের সময় তুলসী গাছে যে ঝারা টাঙ্গান হইয়াছে, তাহাতে জল ঢালিয়া, তুলসীমূলে প্রণাম করিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া গোয়াল-ঘরে 'দুধ উৎলাইতে' গেলেন। আজ এ অঞ্চলে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতেই গোয়াল ঘরে দুধ উৎলাইবার একটা নিয়ম আছে। গোশালায় একটা ছোট খাট উনন খুঁড়িয়া গৃহকর্ত্রী তাহার উপর একটা নূতন মালসাতে কিছু দুধ, এক মুঠো আতপ চাউল, এবং কয়েকখান গুড়ে বাতাসা দিয়া, বাঁশের চোঁচালি বা পাটকাঠি দিয়া জ্বাল দিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুগ্ধে চাউল পরিপক্ক হইয়া তাহা পায়েসে রূপান্তরিত হইল; ইহাকেই 'দুধ উৎলানো' বলে। পায়েস প্রস্তুত হইলে একটা আখ্ড কলাপাতের অগ্রভাগে তাহার কিয়দংশ লইয়া উনানের কাছে পুঁতিয়া, অবশিষ্ট পায়েস লইয়া গৃহিণী গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীর ছেলেরা তাহা ভাগ করিয়া মহানন্দে খাইতে লাগিল।

আজ ভগবতী-যাত্রা বলিয়া গৃহস্থের বাড়ীর রাখালেরা সিন্দুর ও বাঁশের চোঙ্গা করিয়া তেল লইয়া গোরুর সিংএ মাখাইয়া দিয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। গোরুর পাল লইয়া রাখালেরা মাঠে গোরু চরাইতে গিয়াছে, কিন্তু মধ্যাহ্নরৌদ্রে মাঠে থাকিবার যো-নাই। তাহারা গোরুর পাল তাড়াইয়া বাগানের ধারে আনিয়া ছায়াচ্ছন্ন, শীতল ঘন আমবাগানের মধ্যে একটা পরিষ্কার যায়গায় কেহ আঁচল পাতিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে;—পাঁচনখানা পাশে পড়িয়া আছে, আর সে মধ্যাহ্নের রৌদ্র এবং জীবনসংগ্রামের ঘোর কোলাহলের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বরচিত রাগিণীতে মেঠো সুরে বাগান প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতেছে,—

"ওরে রামশশী যদি কাঁঠাল খাবি
বিচি গুলা রাখিস্ যতন করে।"

হঠাৎ তাহার একটা গরু দলভ্রষ্ট হইয়া নীলের ক্ষেতের দিকে ছুটিয়া গেল। এখন ক্ষেতে নীল নাই, তবু কি জানি, সেখানে গরু দেখিলে পাছে 'ডাকাত-গিরি'রা একটা গোলযোগ বাধায় ভাবিয়া, পাঁচন গাছটা লইয়া "ফের, ফের শালার গরু" বলিয়া সে সেই যূথভ্রষ্টা গাভীর অনুসরণ করিল।

বাগানের বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, ধূসর আকাশ হইতে সূর্য্য জ্বালাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন ; উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে পথের ধূলা এবং গাছের শুষ্ক পত্র উড়িয়া যাইতেছে ; রৌদ্রকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নীরব ক্লান্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একটা কোকিল—এই নিদাঘ মধ্যাহ্নেও—আম্রবৃক্ষের ঘন পত্রের ভিতর হইতে "কুহু" কুহু" করিয়া কুহরিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য বালকেরা বিশ্রামসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছুরী ও নুন লইয়া আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে ; কেহ কণ্ঠকময় বঁইচি বনে ঘুরিয়া সুপক্ক কালো বঁইচি ফল অনুসন্ধান করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে তাহাকে ভেঙ্গাইতেছে, কোকিল বুঝি তাহা বুঝিতে পারিয়া কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ করিয়া পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিতেছে, শেষে ক্লান্ত হইয়া আর ডাকিতেছে না। কেহ কোন রাখালের পাঁচনখানা চাহিয়া লইয়া উচ্চ আম্রশাখা হইতে কাঁচা আম পাড়িতেছে, এবং দৈবাৎ পাঁচন গাছটা আম্রশাখায় আটকাইয়া গেলে, চিতে ও লাল-ভেরেন্দার ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা পাড়িবার জন্য ক্রমাগত 'এড়ো' ছুড়িতেছে। বাগানের নিবিড়তর অংশে একটা শৃগাল উবু হইয়া পড়িয়া স্থূল লাঙ্গুলটি প্রসারণ পূর্ব্বক চক্ষু মুদিয়া ধুঁকিতেছে, এবং কোথাও সামান্য একটু শব্দ হইলেই মাথা তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

বাগানের সম্মুখ দিয়া রামনগরের পাকা রাস্তা, সুদীর্ঘ ভুজঙ্গের ন্যায় আঁকা বাঁকা ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ; দুই একজন গলদ্‌ঘর্ম্ম পথিক ছাতা মুড়ি দিয়া অতি কষ্টে পথ চলিতেছে।

গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এই পথের ধারে 'জলছত্র তলা।' গ্রাম্য জমীদার গাঙ্গুলীরা পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় এই দারুণ রৌদ্রে পথিকের তৃষ্ণানিবারণের জন্য চৈত্রসংক্রান্তির দিন হইতে 'জলছত্র' দিয়াছেন, সমস্ত বৈশাখ মাসঠা তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জল দান করা হইবে। পাউণ্ডের কাছে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বট গাছের নীচে প্রতি বৎসর 'জলছত্র' দেওয়া হয় ; তাই এই গাছতলাকে 'জলছত্র তলা' বলে।

এই বিশাল বটগাছ হইতে অসংখ্য 'বয়া' নামিয়া গাছটিকে আরও দৃঢ়মূল করিয়াছে ; দুই তিন বিঘা জমী লইয়া এই গাছটা বিস্তৃত ; এত বড় গাছ আর এ অঞ্চলে নাই ; ইহার কতকগুলি 'বয়া' খুব মোটা, যেন এক একটা স্বতন্ত্র গাছের গুঁড়ি ; কতকগুলি সরু, তাহাদের অগ্রভাগ ঠিক

আছে,—রাখালেরা সেই সকল 'বয়া' দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া এক একবার ঝুল খাইয়া যাইতেছে, ইট বোঝাই করা সারি সারি গরুর গাড়ী 'ক্যাঁ কোঁ' শব্দ করিয়া ধূলি উড়াইতে উড়াইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই গাছতলায় আসিয়া গাড়োয়ানেরা একবার গাড়ী থামাইয়া খোঁয়াড়-রক্ষকের কাছে তাহার কলিকাটি চাহিয়া লইয়া তাহাতে এক একটা দম দিয়া আবার গাড়ীতে গিয়া চড়িতেছে।

খোঁয়াড় বা পাউণ্ডটি চারি দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া উচু করিয়া ঘেরা, যাহাতে তাহার ভিতর হইতে গরু কি ঘোড়া লাফাইয়া পলাইতে না পারে। অনেক কালের পাউণ্ড ;—মধ্যে যাহাতে ছায়া হয়, এ জন্ত চারিদিকে নিম, পেঁউ, শিশুর গাছ লাগান ; গাছগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাউণ্ডের ভিতরটি পরিষ্কার, তৃণাদিবর্জ্জিত, সেখানে গোটাকত অস্থিচর্ম্মসার গরু, গোটা চার পাঁচ ছাগল, এবং একটা 'পুকুরে' ঘোড়া আবদ্ধ আছে। গরুগুলা ছায়ায় শুইয়া 'জাওর' কাটিতেছে,—কি খাইয়া তাহাদের রোমন্থনে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহা তাহারাই জানে। খোঁয়াড়-রক্ষকেরা আবদ্ধ গোরুর মালিকের নিকট হইতে প্রত্যেক গোরুর খোরাকী বাবদ প্রত্যহ চারি পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত খরচা আদায় করে, কিন্তু তাহারা এই সকল গোরুকে কোন দিন যে আধ পায়সারও 'দানাপানি' দিয়াছে, এ কথা কেহ কখন শুনে নাই।

নীলমণি পরামাণিক এবার অনেক টাকায় পাউণ্ড ডাকিয়া লইয়াছে। চাকরবাকরে পয়সা কড়ি চুরি করে বলিয়া নীলমণি দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই পাউণ্ডে থাকে, কেবল খাইবার সময় বাড়ী গিয়া ছুটি খাইয়া আসে। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে এক কলসী জল, একটা ঘটি, হুঁকা কলকে, টিকে তামাক এবং যাবৎ সমগ্রাম একটা চকমকির 'থঞ্চে' রাখিয়া দিয়াছে। ম্যাচ বাক্সে পয়সা খরচ বেশী হয় বলিয়া সে তাহা রাখে না। একদিন পরানে গোয়ালা তাহাকে চকমকি ঠুকিতে দেখিয়া বলিয়াছিল, "কি গো পরামাণিক দাদা, চকমকি ঠুকে এরকম হায়রান হওয়ার চেয়ে কি একটা বাণ্ডিল (ম্যাচবাক্স) রাখা ভাল নয় ? দামই বা কত ! এক পয়সা হ'লেই একমাস চ'লে যায় !" কথাটা শুনিয়া পরামাণিকপুত্র হাসিয়া বলিয়াছিল, "দূর বেটা ভেমো গয়লা, সাধে কি আর লোকে বলে যে, যাট বছর বয়স না হলে তোদের বুদ্ধি হয় না ? আধপয়সার একখান চকমকির পাথর, আর দু পয়সার ইস্পাত দিয়ে একখান 'ঠুকনি' গড়িয়ে রাখলে

কত পয়সা খরচ হয় বল দেখি ? কোম্পানীবাহাদুর দিয়েশালাইয়ের বাক্স আর কেরাসিন তেল এনেই ত আমাদের পয়সাটা লুটে নিলে ; আমাদের বাপ-দাদারা যেমন করে দিন কাটিয়েছে, আমাদেরও তেমনি করে দিন চালানতে কিছু ক্ষতি আছে কি ?"—শুনিয়া গোপপুত্র লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিল।

একাকী বসিয়া বসিয়া সময় কাটান বড় কঠিন বলিয়া নীলমণি তাহার কুটীরে একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনিয়া রাখিয়াছিল ; এখানি তাহার নির্জ্জনের সঙ্গী। গাঙ্গুলীদের চাকর ফটিক ঘোষ, 'জলছত্র তলায়' তাহার নব-নির্ম্মিত 'টোঙ' খানিতে বসিয়া পিপাসার্ত্ত পথিকগণকে বুটভিজে, গুড়ে বাতাসা এবং জল বিতরণ করিতেছে, আর নীলমণি তাহার নিকটে গাছের ছায়ায় এক-খানি মাদুরে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বশরীর দুলাইয়া, সেই বহুপুরাতন, মলিন, ছিন্নপ্রায় পুঁথিখানি পড়িতেছে। রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণে রামের খেদ যে অংশে আছে, তাহাই পড়া হইতেছে। একঘেয়ে স্বরে প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া ছত্রের পর ছত্র পড়িয়া যাইতেছে। রাখাল কৃষাণেরা দূর মাঠ হইতে গৃহপ্রত্যাগমনকালে এখানে এক ছিলিম তামাক খাইতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব পবিত্র গাথা শুনিতে শুনিতে আর উঠিতে পারে নাই, পথিকেরা শততালি-বিশিষ্ট ছিন্ন চটি জোড়াটা সম্মুখে রাখিয়া, কোলের উপর ছাতাটা ফেলিয়া, এক পা ধূলি লইয়া বসিয়া গিয়াছে ও একাগ্রচিত্তে এই অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণ করিতেছে। কতবার তাহারা এই অমর গাথা শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই ইহা তাহাদিগের নিকট পুরাতন হয় নাই। বিশেষতঃ আজ এই নিদাঘের অপ-রাহ্নে, এই বিবিধবিহঙ্গকূজিত বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন কুটীরে, সভ্যতার নামগন্ধবিহীন এই শান্ত পল্লীজীবনের মাঝখানে, নরদেব রামচন্দ্রের এই বেদনাপ্লুত করুণ-কাহিনী,—অতি প্রাচীনযুগের একটি দিন, সেই শান্তি, সেই সুপ্তি, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রচণ্ড বিষাদ ও দুঃসহ বিরহের একটি মর্ম্মভেদী চিত্র, তাহাদের সম্মুখে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিতেছিল ; তাহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, রামভদ্র সীতাদেবীর অদর্শনে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, কবি সেই কথা মধুর সরলভাবে বলিতেছেন ;—

চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরীর তীরে
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
কাঁদিয়া বিকল রাম ফুলিল দুই আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বনের যত পাখী।
সীতা সীতা বলি রাম পড়ে ভূমিতলে,
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে।
দুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি,
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ সীতা চন্দ্রমুখী।"

তখন মধুর ও করুণ সমবেদনায় তাহাদের বক্ষঃপঞ্জর হইতে একটি অকৃত্রিম

উচ্চ দীর্ঘশ্বাস এবং চক্ষুঃপ্রান্ত হইতে এক বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মণের উদার ভ্রাতৃপ্রেম, রাজপুত্রের কঠোর বনবাস, কঠোরতর বিরহবিষাদ ও ব্যাকুলতাকে তাহারা নিতান্ত অভ্যস্তভাবে গ্রহণ করিল, সেই গুরুতর ক্লেশ তাহারা নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। যিনি ভগবানের অবতার, সূর্য্যবংশের গৌরবমণি, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, তাঁহার এত বিপদ, এত কষ্ট মনে করিয়া, তাহারা নিজের দুঃখ দৈন্য ও দরিদ্রজীবনের শত শত অভাবের কথা ভুলিয়া গেল। দুঃখী, তাপী, বিপন্নের ক্ষুব্ধ হৃদয়জ্বালা সংযত করিবার এমন মোহন সঙ্গীত পৃথিবীতে আর কোন্ ভাষায় গীত হইয়াছে ?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত গেল। বট পাকুড়ের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইয়া ক্রমে অরণ্যের প্রান্তে মিলাইয়া গেল। পথের ধূলায় আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত অন্ধকার করিয়া গোরুর পাল লইয়া রাখাল গ্রামাভিমুখে ফিরিয়া চলিল, এবং দূরে নদীতীর হইতে গাজনের সন্ন্যাসীদের ঢক্কাধ্বনি কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। চড়কপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামের শ্রমজীবিবর্গের বাণ ফুড়িয়া নাচিয়া বেড়াইবার সখ প্রশমিত হয় নাই ; তাই আজও আবার তাহারা বাণ ফুড়িয়া, বিচিত্র বর্ণের শাড়ী মালকোচা মারিয়া পরিয়া, বিবিধ অলঙ্কার ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া, পায়ে নূপুর বাঁধিয়া আগুণ জ্বালিয়া ধূপবাণ খেলিতে খেলিতে যাত্রাকারে গ্রাম্য বাজারে, শিবমন্দিরের সম্মুখে, গ্রাম্য জমীদার ও ভদ্রলোকদিগের বাড়ী বাড়ী বকশিস আদায় করিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বেই গ্রাম্যবিগ্রহ গোবিন্দদেবের আঙ্গিনা হইতে খোল করতালের শব্দ উঠিতেছে ; সমস্ত বৈশাখ মাসটা নগরসংকীর্ত্তন হইবে, আজ মাসের প্রথম দিন, অধিকারী পাড়ার কীর্ত্তনের দল ধুমধামে বাহির হইবার জন্য সজ্জিত হইতেছেন ;—গলে পুষ্পমালা, চন্দনচর্চ্চিত দেহ, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ নামাবলীতে আবৃত করিয়া তাঁহারা নাচিতে নাচিতে ও

"শ্রীবাসের অঙ্গিনা মাঝে আমার গৌর নাচে,
আমার গৌর নাচে ভক্তসঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেমতরঙ্গে
মুখে হরি বোল হরি বোল ব'লে রে।"

এই গান গাহিতে গাহিতে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সদলবলে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলে, দোকানদারেরা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া "সকলে একবার কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ ক'রে হরি হরি বলো" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। হরিধ্বনিতে গাজনের ঢাকের আওয়াজ ঢাকিয়া গেল।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই নূতন খাতার গোলযোগে দোকানদারেরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে দোকানদার অন্য দিন তাহার দোকানে সামান্য একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইতেও কষ্ট বোধ করে, আজ সেও লণ্ঠনের মধ্যে গ্লাসে করিয়া নারিকেল তৈলের বাতি জ্বালিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাজারের মধ্যে আজ বাবুদের দোকানের বাহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। চন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষ জমীদার ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দোকানখানি গ্রামের মধ্যে বাবুদের দোকান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজ তাঁহার দোকানে চাঁদোয়ার নীচে লাল নীল ও সাদা বেলোয়ারি 'হাঁড়ির' মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য সতরঞ্চির উপর একটা গালিচা পাতা, তাহার উপর দুই তিনটা গিদ্দা বালিশ, তিন চারিটা বাঁধা হুকা বৈঠকের উপর সারি সারি শোভা পাইতেছে, অদূরে রৌপ্যনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট আতরদান ও গোলাপপাশ। চন্দ্রবাবু যে জমীদারের ছেলে, ব্যবসা করিতে নামিয়াও তিনি যে সে কথা ভুলিতে পারেন নাই, তাহারই প্রমাণস্বরূপ তিনি একটা গিদ্দা বালিশে হেলান দিয়া মশলা-খচিত গোলাপগন্ধী ছাঁচিপানের সঙ্গে ফরসীতে সুগন্ধি গয়ার তামাক টানিতেছিলেন ;—কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়িতেছিল, একজন চাকর একখানা বড় চিত্রবিচিত্র পাখা লইয়া বাবুদের বাতাস দিতেছিল ; আর কোনও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিলেই তিনি মিষ্ট হাসিয়া বলিতেছিলেন, "এসো ভাই, বস"—অভ্যাগত ব্যক্তিগণ ঝনাৎ করিয়া কেহ দুইটি কেহ বা চারিটি টাকা ফেলিয়া বাবুকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন ; দোকানদার বাবু আবার মিষ্ট হাসিয়া টাকাগুলি তুলিয়া সম্মুখস্থিত রৌপ্যময় রেকাবীতে রক্ষা করিতেছিলেন, দোকানের গোমস্তা একটু তফাতে বসিয়া খেরুয়া-বাঁধা নূতন খাতাতে টাকাগুলি জমা করিতেছিল।

এখানে জলযোগের আয়োজন কিছু গুরুতর, তাহাতে একটু বেশী রাত্রি হয় বলিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা দোকানদার বাবুর অনুমতি লইয়া অন্যান্য দোকানে খাতা সাইত করিতে চলিলেন, এবং সেই সকল দোকানে টাকাটা আধুলিটা জমা দিয়া গোটা দুই চারি রসগোল্লা ছানাবড়া এবং খান দুই জিলিপি ও পানতামাক খাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন। দোকানদারের চাকরেরা বিভিন্ন দোকানে টাকা দিয়া খাতা সাইত করিয়া বেড়াইতেছে। অবসর বুঝিয়া গ্রামস্থ ধোপা, নাপিত, পারঘাটার পাটনি, বাজার

দোকানে সন্দেশ আদায় করিয়া ফিরিতেছে, ইহাদিগকে বিদায় করিবার জন্ত প্রত্যেক দোকানী কিছু কিছু 'রাশি' সন্দেশের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই তিনটে করিয়া পাইয়া তাহারা সহর্ষমনে দোকানদারবর্গের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে চন্দ্রবাবুর দোকানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধুমধামে জলযোগ করিতে বসিলেন। বেলের সরবত, মুগের ডাল ভিজে, নোনা, পেপে, ডাব প্রভৃতি ফল ফুলারী হইতে লুচি, কচুরী, ক্ষীর, ছানা কিছুই বাদ গেল না। "হাজার হোক জমীদাদের নজর কি না, বুনিয়াদি চা'ল কোথা যাবে?" বলিয়া অনেকেই প্রশংসাবর্ষণপূর্ব্বক চন্দ্রবাবুর শ্রবণযুগলের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল।

কিন্তু আর দুইটি দোকানের কথা এখনও বলা হয় নাই। সে দুইটির মধ্যে একটি গ্রাম্যডাক্তার হরিহর চাটুর্য্যের ঔষধের দোকান, অন্তটি শিবু সাহার মদের দোকান। উভয়ই কেরোসিনের উজ্জ্বল আলো এবং রঙ্গিন শিশি বোতল, ফুলের তোড়া ও নানারকম চিত্রপটে সুসজ্জিত। কিন্তু মদের দোকানে ন'টা বাজিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আজ সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দ্বার-প্রান্ত দিয়া আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে; নব্য বাবুরা কোঁচান চাদরে মুখ ঢাকিয়া অতি সতর্কভাবে ত্রস্তপদে দোকানের খিড়কীদ্বার দিয়া গোপনে খাতা সাইত করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের জলযোগটা কিরূপভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন! দরজার সামান্ত ফাঁক দিয়া এ পক্ষ তাহা ঠিক দেখিতে পান নাই।

হরি চাটুর্য্যের ডাক্তারখানায় খাতাসাইতের ব্যাপার লইয়া গ্রাম্যডাক্তার মহলে প্রথম প্রথম কিছু আন্দোলন উঠিয়াছিল। তাঁহারা বলিতেন যে, ডাক্তারের পক্ষে এ রকম দোকানদারী বড় নিন্দনীয়, কিন্তু হরিবাবু সাধারণের নিন্দাকে কিছুমাত্র মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন যে, যখন দোকানদারী করিতেই হইল, তখন তাহা আর্য্যমতে করাই ভাল; কিছু টাকাও আসে, জাতীয় ভাবও পরিত্যক্ত হয় না। কিন্তু তিনি মিছরীর সরবতে লেমনসিরাপ ঢালিয়া নিমন্ত্রিত নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে তদ্দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া তাহার পর বন্ধুবান্ধবমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত সোডাওয়াটারের বোতল ও কাচনির্ম্মিত সুধাপাত্র শূন্যগর্ভ করিয়া, নববর্ষের যে অভ্যর্থনাকার্য্যে রত হন, তাহাতে জাতীয়ভাব এবং খাঁটি হিন্দুয়ানী কতটা পরিমাণে রক্ষিত হয়, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই।

রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে; গ্রামের উৎসবকোলাহল নিবৃত্ত হইয়া চারিদিক প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে, কেবল হরি বাবুর ডিস্‌পেন্সারী হইতে ঘন ঘন তবলার আওয়াজ উঠিতেছে, আর পানানন্দে বিভোর একটি বাবু শান্তিপুরে পাতলা কোঁচান চাদরখানি পরিধানপূর্ব্বক, পরিধেয় বস্ত্রখানি মস্তকে বাঁধিয়া, নানাভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে, এবং কম্পিতপদে নাচিতে নাচিতে ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ঢুলু ঢুলু লোহিত নেত্র উর্দ্ধে উৎসারিত করিয়া রাসভবিনিন্দিত স্বরে গাহিতেছে :—

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই মা তারা ব'লে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে।"

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের 'আত্ম-জীবনচরিত'।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন,—তাঁহার 'স্বলিখিত জীবনচরিত' যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'স্বরচিত জীবনচরিতের' আরও একটি আকর্ষণ আছে। ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানজী মহাশয়ের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ;—সুতরাং তাঁহার জীবনকাহিনীর সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্তও স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। 'আত্মজীবনচরিতে'র এ দেশে সম্পূর্ণ অপ্রতুল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথাই নূতন, তথায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত একজন বিষয়ী ব্রাহ্মণ আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও অল্প বিচিত্র নহে। রায় মহাশয় এই আত্মজীবনচরিতে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদারতা ও সূক্ষ্ম দর্শনের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক, এই জীবনচরিতের সঙ্গে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

এই নবদ্বীপের রাজাদের (অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির) বংশের ইতিহাসের সহিত আমার পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস এত জড়ীভূত আছে যে, তাঁহাদের বংশের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ মধ্যে মধ্যে বিবৃত না করিলে আমার বংশের সমস্ত অবস্থা জানা যায় না। এ কারণ তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত স্থানে স্থানে নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

আমার পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত গুরুজনের প্রমুখাৎ এইমাত্র শ্রবণ করিয়াছি

যে, তাঁহারা বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী ও ভূস্বামী ছিলেন। কিন্তু কোন্ পরগণার কোন্ গ্রামে বাস করিতেন, তাহা শুনি নাই, অথবা স্মরণ নাই, এবং বংশের অতি প্রাচীনদিগের অভাবে ইহা আর এক্ষণে জানিবারও উপায় নাই।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই নবদ্বীপের বর্ত্তমান রাজাদের পূর্ব্বপুরুষদের সংসারে থাকিতেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহ উক্তবংশোদ্ভব কাঁকদির জমীদার কাশীনাথ রায়ের কোন অপরাধ শুনিয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে সৈন্য পাঠানতে কাশীনাথ পলায়ন করিয়া এই দেশে আইসেন, এবং আন্দুলিয়া গ্রামের নিকট রাজসৈন্য কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইলে, তদীয় গর্ভবতী পত্নী এই জেলার অন্তর্গত বাগোবানের জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লন, এবং এক পুত্র প্রসব করেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তানবশতঃ ঐ নবকুমারকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, এবং তাঁহার নাম রামচন্দ্র রাখেন। আর পরিশেষে ঐ পুত্রটিকে স্বীয় সম্পত্তির ও পদবীর উত্তরাধিকারী করিয়া যান। সে সময় আমার তৎকালীন পূর্ব্বপুরুষেরাও এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ করেন।

রামচন্দ্রের পুত্র ভবানন্দ, ঘটনাক্রমে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে, এ প্রদেশে কয়েকখানি পরগণায় জমীদারী পাইলে, বাগোয়ান হইতে আসিয়া মাটিয়ারিতে বাস করেন। আমার তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষও তথায় উপনিবেশিত হন। (১) ভবানন্দের পুত্র ও পৌত্রের সময় তাঁহাদের সংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি, এবং যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব অন্য কোন দেওয়ান বংশের কথা শ্রুতিগোচর হয় না, তখন কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভবানন্দের সময় হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের একাদিক্রমে দেওয়ান ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ বোধ হয় না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথমতঃ ভালুকার কৃপারাম সিংহ ও তৎপরে বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান হন। মিত্র দেওয়ানের পরে কৃপারামের পুত্র কালীপ্রসাদ সিংহ দেওয়ানী পদ পান। ভারতচন্দ্ররচিত অন্নদামঙ্গলে সভাবর্ণনা স্থলে রঘুনন্দন মালের দেওয়ান, আমার প্রপিতামহ মদনগোপাল রায় বখশি (সেনাপতি) এবং তদীয় অগ্রজ রামগোপাল চক্রবর্ত্তী সহবতের দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২)

(১) আমার জ্ঞাতির মধ্যে এক জনের বংশ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

এই রাজসংসারে মালের দেওয়ানী, সহবতে দেওয়ানী এবং রায় বখশী এই তিন প্রধান পদ ছিল। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া আমাদের বংশ এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমার প্রপিতামহ রায় বখশী পদাভিষিক্ত হওয়া অবধি তাঁহার অধস্তন পুরুষদের রায় উপাধি হইয়া রহিয়াছে। পিতামহ দেওয়ান হইলে তাঁহার রায়দেওয়ান উপাধি হয়। তদীয় পিতৃব্য রামগোপাল চক্রবর্ত্তীর বংশীয়দের পদবী চক্রবর্ত্তীই আছে।

আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন্ জন কোন্ রাজার সময় দেওয়ান ছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তবে ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র রামরাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও রামরাম চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে, তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পর রাজা শিবচন্দ্রের, ঈশ্বরচন্দ্রের ও গিরীশচন্দ্রের সময় কখন আমার পিতামহ রাধাকান্ত রায় ও তাঁহার অনুজ রত্নেশ্বর রায় কখন কালীপ্রসাদ সিংহের বংশোদ্ভব ব্যক্তি ও কখন অন্য কেহ কেহ দেওয়ান হইয়াছিলেন।

আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই রাজাদের অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সম্ভাষিত হইতেন। যদি কোন সম্পত্তি বিনামী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইত, তবে রাজা ইঁহাদের নামেই রাখিতেন। এইক্ষণে এই রাজাদের যে সকল জমীদারী আছে, তাহার মধ্যে প্রায়ংশই আমার খুল্লপিতামহ রত্নেশ্বরের নামে বহুকাল বিনামী ছিল। তাঁহার প্রতি এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, যখন তরফ মহতপুর, ডিহি কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ডিহি বাগরালি এবং ডিহি পাঁচপোতা পত্তনী দিবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনিই পত্তনী পাট্টায় দস্তখত করিলেন, এবং পত্তনীদারগণও তাঁহার নিকটেই পত্তনী কবুলতি প্রদান করিল। সেই সকল পাট্টা ও কবুলতি অদ্যাপি স্থিরতর রহিয়াছে।

বহুকালাবধি আমাদের এক দিকে যেমন পদসংক্রান্ত মান আছে, অন্য দিকে তেমনই বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করাতে, মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া আমাদের সম্মান রহিয়াছে। রোহেলা পটির মধ্যে মমিনপুর নামে যে এক মত আছে, ঐ সকল কুলীনদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ ছয় জনকে নির্ব্বাচন করিয়া এই মতের সৃষ্টি

হয়; তজ্জন্য ইহারা কুলীন শ্রোত্রিয় ছয়ঘরিয়া মতাবলম্বী বলিয়া খ্যাত হন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর নিষ্কর ভূমি তালুক ইত্যাদি ছিল, তদনুরূপ সৎ-ক্রিয়াশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হইতেন, এবং বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের বংশের বাৎস্য গোত্র, কুতবশাখা, পঞ্চপ্রবর ও সপ্তামণি গাঁই।

আমার পিতামহের তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ তারাকান্ত, মধ্যম শিবাকান্ত, কনিষ্ঠ উমাকান্ত। কন্যা সকলের জ্যেষ্ঠা। ইহার নাম জগদ্ধাত্রী। পিতামহের প্রথমা স্ত্রীর নিঃসন্তানাবস্থায় মৃত্যু হয়। এই সকল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান। পিতামহী কৃষ্ণনগরের চৌধুরীর কন্যা, চৌধুরীদিগের সহিত আমাদের এই প্রথম সম্বন্ধ।

আমি উমাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্র। ১২২৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। আমার পিতার প্রথমে এক পুত্র ও তৎ-পরে ক্রমান্বয়ে তিন কন্যা জন্মে। উপর্য্যুপরি তিন কন্যার পরে পুত্র জন্মিলে দীর্ঘায়ু হয় না, এ দেশস্থ লোকের এই সংস্কার আছে। এই পুত্রের দুরদৃষ্ট দূরীকরণ নিমিত্ত জনক জননী বিবিধ প্রকার দৈবকর্ম্ম করিয়া থাকেন। আমার কল্যাণার্থ প্রসূতি অন্যান্য ক্রিয়ার অতিরিক্ত একটি বাড়তি শিবপূজা প্রত্যহ করিতেন, এবং আমার কোন পীড়া হইলে যার পর নাই চিন্তাকুলা হইতেন।

এ প্রদেশের তদানীন্তন নিয়মানুসারে পঞ্চম বর্ষে আমার হাতেখড়ি হয়। তালপত্রে, কদলীপত্রে ও কাগজে যাহা যাহা লিখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করি। পিতাঠাকুরের নিকটেই এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ অভ্যাস করিয়াছিলাম। কোন পাঠশালায় কখনও যাইতে হয় নাই। কিছু দিনের জন্য এক জন গুরু-মহাশয় আমাদের বাটীতে ছিলেন, এইরূপ স্মরণ হয়। কখন কখন গোমস্তা বা মুহুরিরাও শিক্ষা দিতেন। দিবসে লিখিতাম, রাত্রিতে নামতা পড়িতাম। সন্ধ্যার পর কখন কখন পিতৃদেব আমাদের বংশাবলী, শ্রেণী, গাঁই, গোত্র, দেবশাখা, প্রবর, আমরা কাহার সন্তান, কত দিবসের ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বিষয় সকল শিখাইতেন।

যদিও আপনাদের বংশাবলি গাঁই গোত্র ইত্যাদি শিখিতে কিছুই সময় ব্যয়িত হয় না, তথাপি নিষ্প্রয়োজন বোধে এ সকল বিষয়ের শিক্ষা ইদানীং এককালে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত হইলে যদি কোন বালক স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের নামকীর্ত্তনে অশক্ত হইত, তবে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

ইদানীন্তন বালকের কথা সুদূরপরাহত, যুবকদের মধ্যেও অনেকে আপনাদের প্রপিতামহ বা মাতামহের নাম জ্ঞাত নহেন, এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রকাশে লজ্জিত হন না। অনেকে আপনার জন্মদিনও স্মরণ রাখেন না। ইউরোপের অনেক বংশের ইতিবৃত্ত বলিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর থাকেন।

আমাদের পূর্ব্বতন জনগণ যে কোন বিদ্যা শিখিতেন না কেবল এই সকল বিষয় শিখিয়া রাখিতেন, এইরূপ নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা-জ্যোতিতে জগন্মণ্ডল আলো করিয়া গিয়াছেন, অথচ এ সকল শিক্ষা অনাবশ্যক বোধ করেন নাই, এবং আপন সন্তানদিগকে এরূপ শিক্ষা প্রদানে বিরত হন নাই।

যদি এ মহীমণ্ডলে কাহার বংশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজ বংশের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য হয়। আপনার বংশ-বৃত্তান্ত জানা থাকিলে বিস্তর উপকার আছে। উন্নত বংশোদ্ভবগণ পূর্ব্বপুরুষের চরিতাবলি অবগত থাকিলে উচ্চ থাকিবার যত্ন করিবেন, এবং অবনত-বংশোদ্ভূত জনেরা পূর্ব্বপুরুষের হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইবেন। বিভিন্ন বংশের সহিত যতই কেন বন্ধুতা হউক না, শোণিত-সম্বন্ধবশতঃ নিজ বংশের ব্যক্তির সহিত তদপেক্ষা অধিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যখন বিদেশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা স্বদেশীয় ব্যক্তি আমাদের অধিক প্রিয় হন, তখন আপন বংশোদ্ভূত জনের সহিত অন্যবংশোদ্ভব জন অপেক্ষা অধিক স্নেহ-ভাব জন্মিবে, তাহার সন্দেহ কি? দেখা যায়, বিদেশে হঠাৎ কোন স্বদেশীয় ব্যক্তির সন্দর্শন হইলে হৃদয়ে কতই আনন্দ উদয় হয়। আবার যদি পরস্পরের পরিচয়ে সে ব্যক্তি স্বসম্পর্কীয় জানা যায়, তাহা হইলে সে আনন্দ আরও কত বৃদ্ধি হইয়া উঠে। স্বদেশীয় ব্যক্তি যেমন সহজে জানা যায়, তাহার পরিচয় না জানিলে তিনি স্বসম্পর্কীয় কি না, তাহা তেমন জানা যায় না। কিন্তু আপন আপন বংশাবলি অজ্ঞাত থাকিলে সেই সুখের পরিচয়ের সম্ভাবনা কি? যদি আমি আপন প্রপিতামহের নাম অজ্ঞাত থাকি এবং আমার জ্ঞাতিও তাঁহার প্রপিতামহের নাম অনবগত থাকেন, তবে উভয়ের যে এক প্রপিতামহ, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইবে? দেখ, আমরা উভয়েই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকাতে আমাদের যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না,

এবং পরস্পরের যে আনন্দ লাভ হইত, অথবা কোন প্রয়োজন থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইত, তাহা ঘটিল না।

শ্রেণী গাঁই গোত্র ইত্যাদিও বংশের পরিচয়বিশেষ। একরূপ নাম অনেকের থাকিতে পারে, সুতরাং শুদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের নামোল্লেখ হইলেই উভয়ই একবংশোদ্ভূত কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। যদি নামের সঙ্গে গাঁই গোত্র ইত্যাদি মিলিয়া যায়, তবেই উভয় যে একের সন্তান, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আমি দেখিয়াছি যে, আমার গুরুজনেরা প্রতিবেশী ভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরও পূর্ব্বপুরুষের কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন যুবা অপরিচিত থাকিলে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং ইহার উত্তর পাইবামাত্র তাহার পিতামহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে কতই সুখী করিতেন, এবং তাহার সুখে আপনারাও সুখী হইতেন। এক্ষণে আমরা সভ্যতাভিমানী হইয়া এইরূপ অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

তৎকালে প্রায় সকল ভদ্র গ্রামেই এক জন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় এক পাঠশালা ছিল। কিন্তু আমাদের পাড়ায় ইহা ছিল কি না, তাহা স্মরণ হয় না। কেবল এই মাত্র স্মরণ হয়, যেন কিছু দিনের জন্য একবার এক জন গুরুমহাশয় আমাদের বাটীতে ছিলেন। আমাদের বাটীর সকল বালকই গুরুজনের অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়া করিত। বোধ হয়, আমরা কর্ত্তাদের সহিত কখন কুঠিতে কখন গোলাবাটীতে থাকিতাম বলিয়া অথবা শৈশবাবস্থায়ই পারস্যভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন হইত না।

তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাঁহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্ব্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত। আর "পড়ে পড়ে ল্যাখ তুই বেটা বড় হারামজাদা" এইরূপ কর্কশধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। প্রথমে এই সকল দর্শনে ও শ্রবণে শিশুর কোমল হৃদয় কম্পিত হইতে থাকিত, তাহার পর বিদ্যা আরম্ভ হইলে নীরস ও কঠিন অঙ্ক অভ্যাসে মন দিতে হইত। ইহার উপর

কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্ত গুরুমহাশয় কোমলভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষ্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন, এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। কেহ কাহাকে পীড়া দিলে পীড়িত ব্যক্তি তাহার প্রতীকারের জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট ক্রন্দন করে। আত্মীয়েরা নিজে অক্ষম হইলে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হয়। যদি রাজপদাতিকও কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে থাকে, তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লোক কখন কখন ধাবিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বালককে যখন বলবান ছাত্রগণ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত, তখন কেহই তাহার সহায় হইত না, বরং উৎসাহ প্রদান করিত। গুরুমহাশয় বালককে যতই পীড়ন করুন না কেন, গুরুজন তাঁহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেন না। সুতরাং ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যমস্বরূপ জ্ঞান করিত। কোন বালক পাঠশালা হইতে পলায়নকালে ব্যাঘ্র, সর্প, ভূত, প্রেত কিছুরই ভয় করিত না।

আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েক জন বালক কৃষ্ণনগরে চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। ঐ পাঠশালার গুরুমহাশয় বর্দ্ধমান-অঞ্চল-নিবাসী এবং কায়স্থজাতীয় ছিলেন। তাঁহাকে যে বালক কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতে পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাকিতেন, এবং তাহার অনুপস্থিতি বা শিক্ষায় অমনোযোগ জন্য কোন শাস্তি হইত না। আমার এক সুচতুর বাল্যসখা তাঁহার পাঠশালায় ছাত্র ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার মাতুলালয়ে আসিয়া ২।৪ দিন থাকিতেন। প্রতিগমনকালে আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিল্ববৃক্ষ হইতে দুই একটি বেল পাড়িয়া গুরুমহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিতেন, মহাশয়! আপনার নিমিত্ত দুইটি উত্তম বেল আনিয়াছি। তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়েক দিন কেন আইস নাই। বালক উত্তর করিতেন, মামার বাটী যাইয়া আমার জ্বর হইয়াছিল। ইনি যখনই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে গুরুমহাশয়ের রাগের শান্তি করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হয়েন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক পিশতুত ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা

হারে এক দিবা ও রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র-মধ্যে রজনী যাপন করেন। ঐ গুরুমহাশয় চৌধুরী বাটীর এক বালকের গণ্ড-দেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।

ক্রমশঃ।

৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

বিগত ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩।০ ঘটিকার সময়ে কুমারখালি-নিবাসী কাঙ্গাল সাহিত্যসেবক হরিনাথ মজুমদার ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। "বিজয়-বসন্ত"-প্রণেতা হরিনাথ মজুমদার বাঙ্গলা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হইলেও, তাঁহার জীবনকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত নহে। আমাদের দেশে জীবিত সাহিত্যসেবকদিগের সমাদর নাই, সংবাদপত্রেও তাঁহাদের জীবনী বা প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয় না। সেই জন্য কি জীবনে, কি মরণে, তাঁহারা চিরদিনই অনাদরে পড়িয়া থাকেন।

হরিনাথের জীবনকাহিনী নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দারিদ্র্যের কথায় পরিপূর্ণ। কলিকাতার ন্যায় গুণগ্রাহী বিদ্বৎ-সমাজের বুকের মধ্যে থাকিয়া, ধনকুবের মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির হৃদয়বন্ধু অমর কবি মধুসূদন দত্ত যে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লীসমাজে বাস করিয়া, জরাজীর্ণ পর্ণকুটীরের মধ্যে ছিন্নকন্থাশায়ী হরিনাথ যে অনাদরে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাহাতে আর দুঃখ কি? কেবল দুঃখ এই যে, হরিনাথের ন্যায় পল্লীহিতৈষী দরিদ্রবন্ধু সত্যপরায়ণ সাহসী সাহিত্যসেবক বাঙ্গলা দেশে বড় অধিক দেখা যাইত না; ভবিষ্যতে কেহ তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবেন কি না, তাহাতেও সন্দেহ!

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হরিনাথের জন্ম হয়, কিন্তু বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি মাতৃ-হীন হইয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইয়া তাঁহার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়া-ছিল। অন্ন বস্ত্রের অভাব বড়ই শোচনীয় অভাব; তাহার নির্ম্মম নিপীড়নে

প্রতিভা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। সেই অভাবে হরিনাথের বিদ্যাশিক্ষা হইল না। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটী ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখা পড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।"

গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যাহা কিছু বিদ্যা শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা লইয়াই হরিনাথ জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। সে সংগ্রাম নিজের জন্য নহে, দেশের জন্য, মাতৃভূমির দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য! অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার "চা'ল চুলার" সংস্থান নাই, সে কেমন করিয়া মাতৃভূমির সেবা করিবে? হরিনাথের জীবন তাঁহাদের সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বাল্যকালে যিনি রাজা রামমোহন রায়ের "চূর্ণক" নামক গ্রন্থ নকল করিয়া পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যে এবং মৃত্যু দিনেও তাঁহার সেইরূপ দৈন্যদশা সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি নিজের পরিচয় দিবার জন্য "কাঙ্গাল" ভণিতায় গীত রচনা করিতেন।

জমীদারের উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এই কাঙ্গাল বালকের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি সেই দিন হইতে দরিদ্রপীড়ন নিবারণ করিবার জন্য সেবাব্রত গ্রহণ করেন। কুমারখালীতে গোরা পল্টনের বড়ই উপদ্রব ছিল; তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ফল হইত না। হরিনাথের অসীম সাহস ও অপরিসীম বাহুবল ছিল; তিনি গোরা পল্টনের অত্যাচার-সময়ে দুর্ব্বলের বল বাহুবলের আশ্রয় লইয়া সগর্ব্বে গোরা ঠেঙ্গাইয়া বেড়াইতেন। ইহাতে ইংরাজেরা অনেকরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। গোরার অত্যা-

চার সহজেই নিবারিত হইল, কিন্তু জমীদারের অত্যাচার নিবারিত হইল না; তজ্জন্য হরিনাথ "সংবাদ-প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপদেশে ও সহায়তায় হরিনাথ সুলেখক হইয়া উঠিলেন। তখন সেই লেখনীপ্রসূত "বিজয়-বসন্ত" বাঙ্গলাদেশের ঘরে ঘরে পরম সমাদরে পঠিত হইতে লাগিল। বিজয়বসন্তের দ্বাদশ সংস্করণ হইয়াছে; নিতান্ত শিশু-পাঠ্য বর্ণপরিচয়াদি ভিন্ন অন্য কোনও বাঙ্গলা গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইয়াছে কি না, জানি না;—পল্লীবাসী সাহিত্য-সেবকের কোনও গ্রন্থই এরূপ সমাদর লাভ করে নাই। ইহাতে যে অর্থাগম হইল, তাহাতে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের অবসান হইল না। হরিনাথ পল্লীবাসীদিগের করুণ আর্ত্তনাদ রাজ-দ্বারে বহন করিবার জন্য "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পত্রিকা কলিকাতা গিরীশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইত; বিদ্যারত্ন মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া ইহার সম্পাদনকার্য্যের সহায়তা করিতেন; এবং তাঁহার রচিত পরিচয়-শ্লোক গ্রাম-বার্ত্তার কলেবরের শোভা সম্পাদন করিত। শ্লোকটি এইরূপ,—

"গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা॥"

হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা সত্য সত্যই দেশের মধ্যে "দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা" হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের অনাথ প্রজাপুঞ্জের উপকার হইতে লাগিল, কিন্তু অনেকে হরিনাথের শত্রু হইয়া উঠিলেন। হরিনাথ যেরূপ নির্ভীকভাবে "দোষপ্রদোষ" বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে জেলার মাজিষ্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথকে হস্ত-গত করিবার জন্য অর্থলোভন ও তর্জ্জন গর্জ্জন প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। অবশেষে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তায় লিখিলেন,—

"মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্যপালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায়; এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লী-বাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃ-ভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তান-গুলি অত্যাচারিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভারতরাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া-ছেন। অত্যাচার করিয়া এক দিন, না হয় দু দিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না।

কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর হয়ে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা-প্রহার, এ কথা আর গোপন করিতে পারি।। ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া যে প্রকাশ না করে, আমাদিগের মতে সেই রাজদ্রোহী।"

হরিনাথ স্বদেশসেবার জন্য জীবনদান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না; তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য পঞ্জাবী "গুণ্ডা" পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইল। অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন; কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ঋণভারে গ্রামবার্ত্তা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং ২২ বৎসর পল্লীবার্ত্তা বহন করিয়া গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষা ও বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য সেকালে অল্প লোকেই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। হরিনাথ স্বয়ং বালিকা পাঠশালা ও বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্যে যুগপৎ মনোনিবেশ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উভয় পাঠশালাই জীবিত রহিয়াছে, এবং অনেক অজ্ঞানান্ধ নর-নারীর চক্ষুরুন্মীলনের সহায়তা করিতেছে!

যুবকদল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের অভাবে অন্যত্র বিচরণ করিয়া আত্মাপরাধ-বৃক্ষের বিষময় ফল ভোজন করিতে শিক্ষা করে। হরিনাথ তাহাদের উদ্ধারের জন্য নানাবিধ নির্দ্দোষ সঙ্গীতসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সাহিত্যসেবার সংবাদ লইবার অযোগ্য, সেই সকল নিরক্ষর কৃষক-সন্তানেরাও হলচালনা করিতে করিতে "কাঙ্গল ফিকিরচাঁদ ফকীরের" গীতি-সুধা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে!

যাত্রা, পাঁচালি, গীতাভিনয়, বাউল-সঙ্গীত এবং সংকীর্ত্তনাদিতে হরিনাথ যে কত সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্গীত "ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলীতে" বাঙ্গলা গীতিকবিতার নিদর্শনস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

বিজয়বসন্তের কথা বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু বিজয়বসন্ত ভিন্নও হরিনাথ আরও অনেকগুলি গদ্য পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে সাহিত্যসেবকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, হরিনাথের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল;—সরস্বতীর কৃপার ত্রুটি ছিল না;

লক্ষ্মীর কৃপা ঘটিয়া উঠিল না! কাঙ্গাল হরিনাথ স্বদেশসেবায় আত্ম উৎসর্গ করিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, সাধ. চিত উন্নতলোকে প্রস্থান করিলেন!

হরিনাথের আদর্শে, হরিনাথের উপদেশে, হরিনাথের সহায়তায়, কুমারখালী প্রদেশে অনেকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বাগ্মিপ্রবর পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং সুললিতবর্ণনানিপুণ শ্রীযুক্ত জলধর সেন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

হরিনাথ আবাল্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। যৌবনে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময়ে যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম একটি ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

পাপেতে পৃথিবী থার।
ধর্ম্ম তথা নাই আর॥
অনেকে "মিলের" ছাত্র।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র॥
কপটতা ধর্ম্ম সাজে।
পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম্মসাজে কাজ নাই॥
কপটতা পরিহর।
ভাল হও ভাল কর॥

এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাঁহার লেখনী বিশ্রামলাভ করে নাই। "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাসে মাসে তাঁহার সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিত, এবং ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে "মাতৃমহিমা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপদেশকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্যসেবকের প্রাণের নিবেদন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে! সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইতেছে,—

আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
মরণের দিন দেখ সব ফকিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার॥
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি॥
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কে চিনিতে পারে।
তবে কেন মর জীব ধন-অহঙ্কারে॥
পুঁথি পড়, পাঁজি পড় কোরাণ পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান॥
সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন।
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সকলেই জানে।
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে॥
না মানে কুবুদ্ধি, লোক মনে ভরা মল।
আগুণে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল॥
মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা।
ভার্য্যার সমান নাই শরীরতোষিকা॥
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা।
সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিকা॥

যতদিন "গ্রামবার্ত্তা" জীবিত ছিল, প্রায় ততদিনই কোন-না-কোনরূপে হরিনাথকে জমীদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। ১২৮৫ সালের ২১ চৈত্র তারিখের একখানি স্বহস্তলিখিত পত্রে হরিনাথ তাঁহার কোনও স্নেহভাজন সাহিত্যসেবক প্রিয়শিষ্যকে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি যত দূর সাধ্য অত্যাচার করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে অত্যাচারের হাত খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন। এখন আর তাঁহাদিগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া পাওয়া যায় না। গ্রামবার্ত্তা যথাসাধ্য প্রজার উপকার করিয়াছে। পরে কি ঘটে, বলিতে পারি না।

"জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে, এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচরিত হইলেও গ্রামের লোকে তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ও আমার এত দূরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার!"

যে জমিদারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যাঁহাদিগের কৌতূহল দূর হইবে না, আমরা তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এ দেশের সাহিত্যসংসারে এবং ধর্ম্মজগতে চিরপরিচিত;—তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে! এক দিকে হরিনাথ যেমন জমিদারের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াও অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন, অন্য দিকে আবার অন্যান্য জমিদারেরা সময়ে সময়ে অর্থদান করিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ মাতৃপূজার সহায়তা করিয়াছেন। যে সকল জমিদার কাঙ্গাল সম্পাদকের অশ্রুধারা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দিঘাপতিয়াধিপতি স্বর্গীয় রাজা প্রথমনাথ রায়বাহাদুর এবং কাশিমবাজার-নিবাসিনী দীনপালিনী মহারাণী স্বর্ণময়ী ও তাঁহার সুযোগ্য সচিব স্বর্গীয় রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

গৃৎসমদ শৌনকের প্রার্থনা।

সমগ্র ঋক্‌সংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত। তন্মধ্যে যিনি দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি, তাঁহার নাম 'গৃৎসমদ'।

তৎসম্বন্ধে বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন,—

"অথ গার্ৎসমদং দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ব্যাখ্যায়তে * * মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদ ঋষিঃ। স চ পূর্ব্বং আংগিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্রঃ সন্ যজ্ঞকালে অসুরৈঃ গৃহীতঃ ইন্দ্রেণ মোচিতঃ। পশ্চাৎ তদ্বচনেন এব ভৃগুকুলে শুনকপুত্রো গৃৎসমদনামা অভূৎ। তথাচ অনুক্রমণিকা—য আংগিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদঃ দ্বিতীয়ং মণ্ডলং অপশ্যৎ।"

এই বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। ইহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, গৃৎসমদ ঋষি অঙ্গিরা-বংশীয় শুনহোত্রের ঔরস পুত্র। তিনি 'অসুর' উপাসক * শত্রু-কুলের হস্তে পতিত হইলে, ইন্দ্রোপাসক ভৃগুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে মোচন করেন; এবং এই ঘটনার পর তিনি ভৃগুকুলে 'শুনক' নামক এক ব্যক্তির কৃত্রিম পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েন। †

---

* বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্বে আর্য্যেরা যে সকল অলৌকিক সত্বের পূজা করিতেন, তাহাদের নাম "অসুর"। এই অসুরেরা অতীব বলসম্পন্ন বলিয়া কল্পিত হইত। বলই তাঁহাদের প্রধান গুণ। পরে উপাস্য সত্বগণ "দেব" বা জ্যোতির্ম্ময় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে অসুরেরা, "পূর্ব্ব-দেবাঃ" অর্থাৎ প্রাচীন দেবতা, এই সংজ্ঞা লাভ করে। ঋগ্বেদে উপাস্য সত্বগণ কখনও অসুর, কখনও দেব-সংজ্ঞায় অভিহিত; বাহুল্যে "দেব"-শব্দেই তাঁহাদের নামকরণ হয়। ক্রমে বসিষ্ঠ ঋষির সময়ে অসুরের পরিবর্ত্তে দেবের উপাসনা এতাদৃশ বদ্ধমূল হয় যে, দেবতারা অসুরগণকে পরাজয় করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হয়। তিনি ইন্দ্রের উদ্দেশে এক স্থানে বলিতেছেন;—"পূর্ব্বকালের দেবতা অসুরেরাও যখন আসুরিক বলপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন শক্তিতে তাহারা তোমা অপেক্ষা ন্যূন হইয়াছিল।" ঋগ্বেদ ৭।২১।৭। ইহাতে দেখা যায়, বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে অসুর পূজা ত্যাগ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ করিলে অসুরোপাসকদের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা জন্মে। গৃৎসমদের সময়ে এইরূপ শত্রুতা জন্মিয়াছিল, ইহা তদীয় জীবনবৃত্তান্তে প্রকাশ। অনেক স্থলে অসুর-উপাসকেরা "অসুর" এবং দেব-উপাসকেরা "দেব" নামে অভিহিত হয়েন।

† গৃৎসমদের সূক্তেও শুনহোত্রগণের উল্লেখ আছে। যথা:—"অয়ং হিতে শুনহোত্রেষু সোম ইন্দ্রত্বায়া পরিষিক্তো মদায়" ঋগ্বেদ ২।১৮।৬। তদ্ভিন্ন তদীয় সূক্তে "ব্রহ্মদ্বেষি"-গণের এবং "দেবনিন্দুক"-গণেরও উল্লেখ দেখা যায়, ঋগ্বেদ ২।২৩।৪৮; ইহারাই অসুর-উপাসক ছিল, বোধ হয়। এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,—"ত্যং চিৎ শর্ধংতং তবিষীয়মানং ইন্দ্রো হন্তি বৃষভং শংডিকানাম্" অর্থাৎ "ইন্দ্র সেই বিক্রান্ত সেনাপরিবৃত শণ্ডবংশীয় বৃষভকে বধ করিয়াছেন।" পৌরাণিক উপন্যাসে অসুরপুরোহিত ষণ্ডামার্কনামক দুই ব্যক্তির কথা শুনা যায়। সায়ণ বলেন, গৃৎসমদের ষণ্ডই অসুরপুরোহিত শণ্ড; তদনুসারে গৃৎসমদের বৃষভ সেই শণ্ডেরই

াধারণ প্রতিভাশালী ঋষি ছিলেন। বিষ্ণুপুরা-
মিত্র অপেক্ষা প্রাচীন ঋষি। উভয়েই পুরু-
ংদের বংশাবলীর বিবরণ এইরূপ ;—

রবা (২০১০)।

২ অমাবসু (১৯৮০)

৩ ক্ষত্রবৃদ্ধ — ৩ ভীম (১৯৫০)

৪ সুহোত্র — ৪ কাঞ্চন (১৯২০)

৫ গৃৎসমদ — ৫ সুহোত্র (১৮৯০)

চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তয়িতা — ৬ জহ্নু (১৮৬০)

৭ সুজহ্নু (১৮৩০)

৮ অজক (১৮০০)

৯ বলাকাশ্ব (১৭৭০)

১০ কুশ (১৭৪০)

১১ কুশাশ্ব (১৭১০)

১২ কৌশিক (বা) গাধি (১৬৮০)

১৩ সত্যবতী (কন্যা) ইনি ঋচীক ঋষির পত্নী — ১৩ বিশ্বামিত্র (১৬৫০)

১৪ জমদগ্নি।

'শুনহোত্র' এবং 'সুহোত্র' একই নাম। কেন না, 'শুন' শব্দ ও 'সু' শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে, পুরূরবাকে ধরিয়া পঞ্চম পুরুষে গৃৎসমদের জন্ম ; এবং গৃৎসমদের পিতা শুনহোত্র বা সুহোত্র, এবং মহারাজাধিরাজ যযাতি সমসাময়িক ব্যক্তি। এই সময়ে পুরূরবা-বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পঞ্জাব প্রদেশে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ইহার পর পুরূরবা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে বিশ্বামিত্র ঋষি জন্মগ্রহণ করেন।

মুটি ধরা যাইতে পারে। ঐ সময়ে বিশ্বামিত
১৬৫০ বৎসরে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয় অম্নুঃ
মোটামুটি ৩০ বৎসর ধরিয়া, শকাব্দপূর্ব্ব নৃ
(খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৯২২ বৎসরে) পুরুরবা রাজ
তদনুসারে বিশ্বামিত্রের ন্যূনাধিক ২০০ দুই শ
ঋষি জীবিত ছিলেন, দেখা যায়।

গৃৎমদ শৌনকের সময়েও বৃত্তি অনুসারে ৫
বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সমাজ এই সময়ে
আর্য্যবর্ণ ও (২) দাসবর্ণ *। গৃৎসমদের ২০০ বৎ
সাময়িক অগস্ত্য ঋষির সময়েও এহ প্রাচীন উ
বিলুপ্ত হয় নাই। অগস্ত্যের বিষয় লিখিত হইয়া

"অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমি
উভৌ বর্ণৌ ঋষিরুগ্রঃ পুপোষ সত্যা দেবেষু আ

ইহাতে প্রকাশ অগস্ত্য দাসদাসীর সহিত দক্ষিণ দে৷
কাটিয়া জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঋকে উক্ত হইয়াছে
কার্য্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়া উভয় বর্ণ, অর্থাৎ আর্য্য ও দাস বর্ণকে পোষণ করিয়াছিলেন।

গৃৎসমদ শৌনক দাসবর্ণের উল্লেখ করিয়া বলেন ;—

"যো দাসং বর্ণম্ অধরং গুহাকঃ।"—ঋগ্বেদ ২।১২।৪।

যঃ (ইন্দ্রঃ) দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং অধরং নিকৃষ্টং গুহা গূঢ়স্থানে অকঃ অকার্ষীৎ।—সায়ণ।—

তাহাতে অবগত হওয়া যায়, তৎকালে দাসবর্ণ মনুবংশীয় যোদ্ধাগণের দাস্য বৃত্তি দ্বারা অতি হীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিত। গৃৎসমদ আরও বলেন ;—

"স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরংদরো দাসীঃ ঐরয়ৎ বি।
অজনয়ৎ মনবেক্ষাম্ অপশ্চ সত্রাশংসং যজমানস্য তূতোৎ।" ঋগ্বেদ ২।২০।৭।

ইন্দ্র মনুবংশীয় যোদ্ধাগণের জন্যই ভূমি ও নদী সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং 'কৃষ্ণযোনি দাস' জাতীয় মনুষ্যগণকে চারি দিকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সময়ে মনুবংশীয় অর্থাৎ পুরুরবাবংশীয় যোদ্ধাগণ পঞ্জাব প্রদেশে দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, সেই সময়েই গৃৎসমদ ঋষি বিদ্যমান

* এই দুই বর্ণ গৃৎসমদের সূক্তে "উভয়ে জনাবিশঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋগ্বেদ

" যে, গৃৎসমদের সময়েও আর্য্যগণের মধ্যে
ই পক্ষই ইন্দ্রোপাসক, এরূপ রথিগণের
:গ্বেদ ২।১২।৮। বখ্‌তিয়ার খিলজীর পাঠা-
যেমন আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি হানা-
ররাও এই সময়ে তদ্রূপ আচরণে ব্যাপৃত
ত্রর সময়ে পুরুবংশীয় সুদাস রাজার সহিত
;, পুরুবংশীয় অন্য রাজাদেরও বিস্তর যুদ্ধ
াছে।

ত্রেয়েরা প্রতিষ্ঠানে * অর্থাৎ বর্ত্তমান কাবুল
এবং যযাতির সময়ে ইহাঁরা দলে দলে সপ্ত-
অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বেই
নিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল ; ঔপনিবেশিকেরা
(Settler.) বলিয়া গণ্য হইত। এক দেশ হইতে
হইয়া তথায় যাহারা বসবাস করে, তাহাদেরই নাম "বিশ্‌"
প বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া 'নিবিষ্ট' ব্যক্তিগণের জনপদ সকল
ক্রমশঃ অভ্যুত্থিত হইলে, করগ্রাহী দেশরক্ষক "ক্ষতত্র" বা "ক্ষত্রের" আবির্ভাব হয়। ক্ষত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের প্রধানেরা "প্রজাপতি" বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। ক্ষত্রেরা তদপেক্ষা সমুন্নত হইয়া "বিশ্‌পতি" উপাধি ধারণ করেন। প্রজাপতিগণ ক্রমশঃ বিশ্‌পতিগণের করদ হইয়া উঠিলেন। নহুষ এবং যযাতি এইরূপ করগ্রাহী ক্ষত্র বিশ্‌পতি ছিলেন ; এবং বহুসংখ্যক ভৃতিভুক্‌ অনুচর রক্ষা করিতেন। তাহারাই গজনবী মামুদের অনুচরগণের ন্যায় সপ্তসিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য আর্য্য বর্ণ ও দাস বর্ণের উপর আপনাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই ঘটনার পর গৃৎসমদ ঋষির পুত্র শৌনক চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা দিয়া, বিদ্যা ও যজ্ঞব্যবসায়ী আর্য্যগণকে "ব্রহ্ম" এবং যুদ্ধব্যবসায়ী আর্য্যগণকে "ক্ষত্র" নামক বৈশ্যেতর দুইটি পৃথক জাতিগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন। ইহার পূর্ব্বেও যে "ব্রহ্ম" বা "ক্ষত্র" ছিল না, তাহা নহে ; সে সময় গৃৎসমদের সূক্তেই "পঞ্চকৃষ্টি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ,

* মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ইতিহাসলেখকগণ এই নগরকেই Portospana বা Ortospana বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বিবেচনা হয়। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে "সাহিত্যে"

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত সমাজের কথা শ্রুত
এবং গৃৎসমদ নিজেও একজন ব্যবস
যায়। (ঋগ্বেদ ২।১।১৬ দেখ)। তবে দে
হয় "ব্রহ্ম" বা ক্ষত্র হইত; কিন্তু অতঃপর ব্র
বংশ হইলেই ক্ষত্রিয়, এইরূপ নিয়মের সূত্রপ
এই জন্য যে, এরূপ নিয়ম একদিনে বা এ
নাই। এই নিয়ম তৎকালীন সমাজের অভু
বলিয়াই, স্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রব
সর্ব্বপ্রথমে এই নিয়মের পক্ষপাতী হইয়া
প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হয়েন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণে
হইবে, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যা শি
সম্প্রদায়ের বালকেরা ঐরূপে বেদাধ্যয়ন না ক
সম্প্রদায়ের বালকেরা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা না করে ক্ষতি
কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে বেদাধ্যয়ন ও যুদ্ধকৌশলশিক্ষার ব্য।
তাহা ব্রহ্ম ক্ষত্রের অনুপযুক্ত, এইরূপ ভাবেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সর্ব্ব
হইয়াছিল, বিবেচনা হয়। দেখা গেল, এইরূপ ভাবে বিদ্যা এবং রণনৈপুণ্য উভয়েরই উৎকর্ষ হয়। শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী বৈশ্যেরাও যুদ্ধ বিগ্রহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃষিকার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করা সুবিধা বোধ করিল—তাহাতে শৌনকের পরে ধীরে ধীরে আদিম দুই বর্ণ চারি বর্ণে পরিণত হইতে লাগিল। দুই শত বৎসর পরে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সময়েও ক্ষত্রিয়ের পুত্রের একবারে ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব হয় নাই, কিন্তু তৎকালে ইহা আচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অতএব গৃৎসমদ ঋষিকে আমরা জাতীয় ইতিহাসের একটি যুগপরিবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকিতে দেখিতে পাই। দ্বিবর্ণ যুগের অবসানে এবং চতুর্ব্বর্ণ যুগের প্রারম্ভে গৃৎসমদ শৌনকের বেদসূক্ত সকল রচিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের ইতিহাসলেখকেরা শ্লাঘা করিয়া বলেন যে, আমাদের দেশের ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস। আর আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হই যে, আমাদের এই হতভাগ্য দেশের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস। ইংরাজেরা আপনাদের প্রাচীন অবস্থাকে বর্ব্বরদশা বলিতে কুণ্ঠিত হন না—তেমনি

করিয়া আসিতেছি। ইংরাজদের ইতিহাসে কলিযুগের পর সত্যযুগের আবির্ভাব হইতেছে, আমাদের ইতিহাসে সত্যযুগের পরে কলিযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা যাহাকে সত্যযুগ বলিয়া বিবেচনা করি, গৃৎসমদ শৌনক প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই যুগেরই লোক। মনুবংশ এই সময়ে অভ্যুদয়ের সোপানে দিন দিন উন্নত হইতেছিল; উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছিল। কৃষির উন্নতি, যুদ্ধ-বিদ্যার উন্নতি, পরমার্থজ্ঞানের উন্নতি, এইরূপ সর্ব্বতোমুখী উন্নতির মধ্যে গৃৎসমদ শৌনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন লোকের যেমন বাহুবল—তেমনি মনের বল। তরুণ বয়সের আশা ভরসায় জাতীয় জীবন তখন অনুপ্রাণিত। লোকের মন সাহসে ও উদ্যমে পরিপূর্ণ ও প্রফুল্ল। শরৎকালের জ্যোৎস্নার ন্যায় জীবন সমুজ্জ্বল এবং উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু বলিয়া পরিগণিত। গৃৎসমদের বেদসূক্তে তৎকালীন জাতীয় জীবনের চিত্র যেন ফটোগ্রাফ্ করা রহিয়াছে! সে চিত্রও অতি মনোরম।

তৎকালীন বীরপুরুষেরা আপনাদের উপাস্য ঈশ্বরকেও এক মহা বীর-পুরুষ বলিয়া কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। দেবতারা তাঁহাদের বিবেচনায় জড় প্রকৃতির সহিত মহাহবে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশ্ব-সংসারের মধ্যে আপনাদের সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং রক্ষা করিতেছেন; আর যিনি সেই দেবতাসমাজের রাজা, তিনি বৃত্রহন্তা "ইন্দ্র"। তাঁহারাও সেই ইন্দ্রের অনুকরণ করিয়া পৃথিবীতে মানবসমাজে সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। সেই ইন্দ্র কে, তদ্বিষয়ে গৃৎসমদ শৌনক যে একটি অপূর্ব্ব সূক্ত রচনা করিয়াছেন—(ঋগ্বেদ ২।১২) তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বাঙ্গলাভাষায় প্রতিফলিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধারণ করা অসাধ্য;—তাহা গৃৎসমদের ভাষাতেই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"হে মনুষ্যগণ!"—গৃৎসমদ বলিতেছেন—"তোমরা জিজ্ঞাসা কর,—ইন্দ্র আবার কে? শ্রবণ কর। যাঁহার তেজে এই পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ নিয়মের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ একই প্রকার ক্রিয়া করিতেছে (অভ্যসেতাং) তাঁহার নাম ইন্দ্র। যিনি ব্যথাকুল পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত (আগ্নেয়) গিরিসকলকে প্রশমিত করিয়াছেন, যিনি অন্তরিক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টিজলের উৎপাদন করিয়া সপ্তসিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম ইন্দ্র। যিনি শীতল শিলা হইতেও অগ্নি উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম ইন্দ্র। যিনি এই অস্থায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারই নাম ইন্দ্র। যাঁহার সম্বন্ধে কেহ বলে, তিনি আবার কোথা? কেহ বা বলে, তিনি নাই; কিন্তু যিনি ... হইয়াও ঈশ্বরদ্রোহীর সমুদায় ভোগ্যবস্তু বিনষ্ট করেন, বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।"

সেই ইন্দ্রে গৃৎসমদের অচলা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বম্ অস্মে।
পোষং রয়ীনাং অরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥" ঋগ্বেদ ২।২১।৬।

"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন সকল দান কর।" গৃৎসমদের সময়ে অর্থাৎ আমাদের সত্যযুগে সংসারবৈরাগ্য ছিল না। তখন ধনলাভে বঞ্চিত হইয়া কেহ ধনের নিন্দা করিত না। অকপটে লোকে তখন ঈশ্বরের নিকট ধন যাচ্ঞা করিত; তাহাতে আধ্যাত্মিকতার হানি হইল বলিয়া মনে কোনও সংশয় করিত না। সে যুগে কপটতা ছিল না—তাই তাহার নাম ছিল সত্য-যুগ। আমাদের এই মিথ্যাযুগে যেমন মর্কট বৈরাগীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—তখন তেমন হয় নাই।

"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে কর্ম্ম সামর্থ্যের খ্যাতি প্রদান কর।" তখন লোকে যোগী সাজিয়া জঙ্গলে বা গিরিগুহায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিত না, প্রত্যুত কার্য্যদক্ষ হইতে পারিলেই মনুষ্যত্ব লাভ হইল, বিবেচনা করিত। যে যে পথের পথিক, সে সেই পথেই কার্য্যসমর্থ হইয়া যশস্বী হইতে চেষ্টা করিত। ধনের ন্যায় তখনও কার্য্যের নিন্দা শুনা যাইত না, কার্য্যকুশলতা শ্লাঘার বিষয় ছিল। "হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর ধনের পুষ্টি দান কর, সন্তান সন্ততির অহিংসা দান কর"। সমাজে কিসে শান্তি স্থাপিত হইবে, কিসে সমাজের ধনধান্য পুষ্টি লাভ করিবে, কিসে সমাজে সকলে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে, ইহাই সকলের চিন্তার বিষয় এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল।—অধিকন্তু ঋষি আরো বলিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমা-দিগকে বাক্যের স্বাদুতা দান কর।" যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট বাক্যের স্বাদুতা চাহিতেন, তাহারা যে মধুরভাষী লোক ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আলাপে যে কর্ণে সুধাবৃষ্টি হইত, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ, "হে ইন্দ্র! আমাদিগকে দিনের সুদিনতা দাও।" আমাদের দিন সকল আনন্দময় হউক, জীবন মধুময় হউক। শান্তির মধ্যে সমৃদ্ধির মধ্যে সামাজিক সদালাপ ক্রীড়া কৌতুক আনন্দ উৎসবে আমাদের দিন যাপিত হউক। হায়! আমরা এক্ষণে বিষম দুর্দ্দিনে নিপতিত হইয়াছি। তবে একদা আমাদের দিন সকল সুদিন ছিল, ইহা ভাবিলেও কিছু আশ্বাস জন্মে।

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি গৃৎসমদ শৌনকের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। মহা—

করিলে পাপের দণ্ডবিধাতা বরুণের নিগ্রহেই মনুষ্য ভিক্ষুক হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি করুণ স্বরে বরুণকে বলিতেছেন ;—

"মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্।" ঋগ্বেদ ; ২।১৮।৯।

হে রাজন্ স্বামিন্ বরুণ! অহং অন্যকৃতেন অন্যৈঃ অর্জ্জিতেন ধনেন মাভোজং ভোগং মা লভেয়ং। (সায়ণ)।—

হে রাজা বরুণ! অন্যের পরিশ্রমে যে অন্ন উপার্জ্জিত হয়, তাহা যেন আমাদিগকে ভোজন করিতে না হয়! সত্য যুগের এই সুনীতি আমাদের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ আমাদের মধ্যে পরান্নপুষ্ট অনাতুর ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা কত! ইহারা আবার হরিনাম উচ্চারণ করিতে সাহসী হয়! কি কষ্ট! আমরাও ইহাদিগকে পূজনীয় মনে করি! কষ্টাৎ কষ্টতরম্!

পরান্নভোজনের ন্যায় প্রজ্ঞা পৌরুষের হানিকর আচরণ দ্বিতীয় নাই। পরান্নভোজন ভৌম নরকভোগ বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত।—যে সকল অলস অসার লোক অনাতুর অবস্থায় দ্বারে দ্বারে মধুকরী করিয়া বেড়ায়, গৃৎসমদ শৌনকের চক্ষে তাহারা যেরূপ অধম বলিয়া বিবেচিত হইত, এক্ষণেও কি তাহারা তদ্রূপ অধম বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে?—পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন ; তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সে সত্য যুগ— আর এ কলি যুগ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মীরজাফর।

উপক্রমণিকা।

মুরশিদাবাদে "মোবারক মঞ্জিল" নামক মুসলমান রাজপ্রাসাদের উন্মুক্ত চত্বরে একখানি পুরাতন রাজসিংহাসন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা এখন অযত্নে অনাদরে দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে!

এক দিন বাদশাহ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা এই সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া বাঙ্গলা দেশে মোগল-রাজশক্তি জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে এই রাজসিংহাসন প্রথমে রাজমহল, তাহার পরে ঢাকা, এবং তাহার পরে মুরশিদাবাদের মুসলমান রাজধানীর সবিশেষ গৌরব বর্দ্ধন

সিংহাসনখানি অনতিবৃহৎ; গঠনগৌরববিবর্জ্জিত, ঈষদুন্নত স্তম্ভচতুষ্টয়ে প্রতিষ্ঠিত, সুমার্জ্জিত প্রস্তরফলকমাত্র। কিন্তু তাহার সহিত এ দেশের অনেক পুরাতন কাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সিংহাসনের পার্শ্বদেশে লিখিত আছে যে,—"এই পরমমঙ্গলাস্পদ রাজসিংহাসন সুবা বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের নগরে ১০৫২ সালের ২৭শে সাবান তারিখে দাসানুদাস শ্রীখ্বাজা নজর বোখারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।" *

ইহাতে বহুমূল্যরত্নখচিত "মসনদ" সুবিস্তৃত করিয়া, তদুপরি বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমগণ সগৌরবে উপবেশন করিতেন;—পার্শ্বস্থ কনকদণ্ডে চারু চন্দ্রাতপ ঝল মল করিয়া চারি দিকে মোগলের বিভবচ্ছটা উদ্ভাসিত করিত!

নবাব মন্‌সুরোল্‌-মোল্‌ক-সিরাজদ্দৌলা-শাহকুলী খাঁ মিরজা মহম্মদ হায়-বৎজঙ্গ বাহাদুর ইহাকে পরম সমাদরে হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ মাস ইহার উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই শেষ! তাহার পরে কেহ আর "তখ্‌ত মোবারকের" গৌরবরক্ষার জন্য লালায়িত হয় নাই!

এখন অনাবৃত দেহে প্রখর রৌদ্রতাপে পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া, সময়ে সময়ে গলিত গৈরিকধারা নিঃসৃত হইয়া সিংহাসন-গাত্রে কতকগুলি রেখাচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। আগরা দুর্গের মোগল-রাজপ্রাসাদে যে বৃহদায়তন রাজ-সিংহাসন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও এইরূপ রেখাচিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে। মুরশিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, মুসলমানের অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া "তখ্‌ত মোবারক" এখনও নীরবে রোদন করিয়া থাকেন;—গৈরিক রেখাগুলি সেই নিভৃত-রোদনের অশ্রুলেখামাত্র! †

এই বহুমানাস্পদ মোগল-রাজসিংহাসনের সঙ্গে মীরজাফরের কলঙ্ককাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে! মীরজাফর স্বদেশদ্রোহী। তাঁহার আত্মাপরাধ-

* "তৈয়ার সোদ তখ্‌ত মোবারক বতারিখ বিস্তওহফ্‌তম সহর সাবানুলমা আজ্জাম ১০৫২ বএতমাম কমতারিণে বান্দাহা খাজা নজরে বোখারী কি মোকামে মুঙ্গের মিন সুবা বেহার",—এই কয়েকটি কথা লিখিত আছে। পরমস্নেহাস্পদ শ্রীমান মহম্মদ চয়েন উদ্দীন এম্‌. এ. ইহার যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত হইল।

† The stone has reddish stains, due to the presence of iron; and it sometimes sweats so much, that the water trickles over the edge. Then the stone is weeping, according to the natives, for the passing away of the

বৃক্ষে তাহার বিষময় ফল শীঘ্রই সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। গলিত কুষ্ঠরোগে জীর্ণ হইয়া, নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় ছটফট করিতে করিতে মীরজাফর ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা যে, যাঁহারা তাঁহার পাপপথের প্রধান সহচর, যাঁহারা তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র ফলভাক্, তাঁহারাও তাঁহাকে মহাপাপী বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

মীরজাফরের উত্থান পতনের ইতিহাস কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস;—সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই! কিন্তু কিরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া মীরজাফর আপনার হাতে আপনার সমাধিগহ্বর খনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবে, "কে সাধু কে চোর" তাহা নির্ণয় করা কথঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! ইতিহাস-লেখকেরা সবিশেষ রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা না করিয়া, মীরজাফরকেই পদে পদে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। মীরজাফর স্বদেশদ্রোহী পরম পাষণ্ড। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক পরম পাষণ্ড মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল! তাহারা সকলেই এখন ইতিহাসের চক্ষে সবিশেষ সমাদরের পাত্র!

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ,—কেহই মীরজাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই! মীরজাফর ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার বংশধরগণ সদাশয় বৃটিশ-বণিকের কৃতজ্ঞতার অমোঘ নিদর্শনস্বরূপ মাসিক বৃত্তি উপভোগ করিয়া এখনও সযত্নে তাঁহার সমাধিমন্দিরে আলোক প্রদান করিতেছেন; অরাজক মুসলমান রাজ্য বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; সুসভ্য বৃটিশ-বণিকের উদার শাসনে হিন্দু মুসলমানের স্নেহবন্ধন দিন দিন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে;—পুরাতন ভাসিয়া গিয়াছে, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মীরজাফরের কলঙ্ককাহিনী বিলুপ্ত হইবার অবসর পাইতেছে না!

হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ, সকলেই মীরজাফরের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের সম্মুখে 'কুর্ণিশ' করিতে করিতে হিন্দুসন্তানের পক্ষে মুসলমান শাসন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল! তাঁহারা মোহান্ধ মুসলমানের অসামান্য বিলাসপ্রবণতার অবসর পাইয়া, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া, মুসলমানের দোহাই দিয়া বাঙ্গালা-

দেশের শাসন ও শোষণ কার্য্য হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্য হিন্দুর নিকট মুসলমান-শাসন কিছুমাত্র অপ্রীতিকর বোধ হইত না। তাঁহারা আবশ্যক হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও মুসলমান-সিংহাসন রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন। দিল্লীর প্রবল প্রতাপ তখন ধীরে ধীরে চূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল, হিন্দু সন্তানেরাই তখন সিংহাসনের মালিক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইচ্ছামত একজনের সিংহাসনে আর একজনকে বসাইয়া দিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইহাতে সম্মত ছিলেন না; বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়া হিন্দু জমিদারদলকে পদানত ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। তাহাতেই অনর্থ উৎপন্ন হইল। হিন্দুগণ মীরজাফরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সুতরাং হিন্দু কখনও মীরজাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না!

মুসলমান অনেক দিনের বাদশাহ। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলকেই মুসলমান-দরবারে জানু পাতিয়া সসম্ভ্রমে উপবেশন করিতে হইত। যে নিতান্ত নগণ্য মুসলমান, তাহার পদভরেও মেদিনী কম্পিত হইত। কেবল মীরজাফরের বুদ্ধিগুণেই মুসলমানের সেই পুরাতন পদগৌরব চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া গেল! সুতরাং মুসলমানেরা মীরজাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই!

ইংরাজের কথা বিশেষ করিয়া আলোচনা করাই নিষ্প্রয়োজন;—বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যাঁহার কল্যাণে এমন স্বর্ণসিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাঁহার কথা ইংরাজ-রাজ কোন্ লজ্জায় বিস্মৃত হইবেন?

এই সকল কারণে মীরজাফরের ইতিহাসের সঙ্গে এ দেশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব। সেই ইতিহাসের কিয়দংশ লোকসমাজে সবিশেষ সুপরিচিত, কিন্তু কিয়দংশে সেরূপ নহে। মীরজাফর কিরূপ উপায়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি কিরূপ ভাবে সেই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজসম্পদ উপভোগ করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব। পরবর্ত্তী ইতিহাস বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব কাহিনীর কিয়দংশ স্মরণ করা আবশ্যক। এই পরিচ্ছেদ কেবল তাহারই উপক্রমণিকা মাত্র।

ইংরাজ-রাজ্যের ন্যায় মুসলমান-রাজ্যেও প্রতিভার সমাদর ছিল। সেই

সর পাইয়াছিলেন। মুরশিদ কুলী খাঁ এইরূপ একজন নগণ্য লোক; জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে মুসলমান, ব্যবসায়ে ক্রীতদাস! কিন্তু শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা সমুজ্জল হইয়াছিল বলিয়া, কুলী খাঁ অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাট আরঙ্গজীবের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে কুলী খাঁ হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে খোরাশান দেশের আফ্‌শার-বংশীয় সুজাউদ্দীন খাঁ নামক আর একজন প্রতিভাশালী তরুণ যুবক হায়দ্রাবাদে বাস করিতেন। কুলী খাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে সেই সুজা খাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। উত্তরকালে মুরশিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম নিযুক্ত হইলে, সুজা খাঁ সেই সুবাদে সুবা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুজার পদোন্নতির সন্ধান পাইয়া তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বেরা একে একে উড়িষ্যার রাজধানীতে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মিরজা মহম্মদ নামক একজন দরিদ্র কুটুম্ব আসিয়া সুজা খাঁর সহিত মিলিত হইলেন।

মিরজা মহম্মদের দুই পুত্র;—হাজি আহম্মদ এবং আলিবর্দ্দী। উভয় পুত্রই বিদ্যাবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ প্রতিভার জন্য উত্তরকালে বাঙ্গলাদেশে চিরপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উৎকল রাজদরবারে উপস্থিত হইবার অল্প দিন পরেই সুজা খাঁর সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

হাজি আহ্মদ যেরূপ কৌশলপরায়ণ, আলিবর্দ্দী সেইরূপ সাহসী, সুচতুর। তাঁহাদের পদোন্নতির সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বেরাও এ দেশে শুভাগমন করিতে ক্রটি করিলেন না। আলিবর্দ্দীর পুত্র সন্তান ছিল না। ভ্রাতা হাজি আহ্মদের তিন পুত্র,—নওয়াজেস, সাইয়েদ আহ্মদ এবং জয়েন্‌উদ্দীন; ইঁহাদের তিন জনের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর তিন কন্যার বিবাহ হইল। হাজি আহ্মদের জামাতা এবং ভগিনীপতি ছিলেন; তাঁহারাও একে একে আলিবর্দ্দীর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। জামাতার নাম আতাউল্লা, ভগিনীপতির নাম মীরজাফর; উভয়েই ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিলেন। আতাউল্লার কথা লোকে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মীরজাফরের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কুলী খাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। জামাতা সুজা খাঁ এবং দৌহিত্র সরফরাজ তাঁহার একমাত্র স্নেহের পাত্র। কিন্তু নানা কারণে তিনি জামাতাকে ঠেলিয়া দৌহিত্রকেই সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর

বর্দ্দীর বাহুবলে, হাজি আহ্‌মদের কুটিল কৌশলে, এবং সুজা খাঁর সৌভাগ্য-গুণে সরফরাজের আশা সফল হইল না! সুজাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সুজাউদ্দীনের কৃপায় আলিবর্দ্দীর পদোন্নতি হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না; তিনি বিহারের শাসনভার লইয়া পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ তাঁহার অধীনে সেনাবিভাগে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, এক এক জন এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন! আলিবর্দ্দী আত্মবংশ চিরস্থায়ী করিবার জন্য দৌহিত্ররত্ন সিরাজদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন।

সুজা খাঁর মৃত্যু হইলে সরফরাজ খাঁ প্রথামত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু "তথ্‌ত মোবারক" অধিকদিন তাঁহার ভার বহন করিতে পারিলেন না। লাম্পট্যদোষে হিন্দু মুসলমানের নিকট সরফরাজের নাম কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। সেই সুযোগে হাজি আহ্‌মদের মন্ত্রণাকৌশলে জমিদারদলের সহায়তা লাভ করিয়া সুচতুর আলিবর্দ্দী সসৈন্যে মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া সুজা খাঁ তাঁহার গতিরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। চতুর আলিবর্দ্দী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পদানত ভৃত্য মাত্র, তিনি কি প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন? তিনি কেবল কতকগুলি অভিযোগ জানাইবার জন্য রাজসমীপে আগমন করিতেছেন!* গিরিয়ার প্রান্তরে সেই সকল অভিযোগের মীমাংসা হইল; সরফরাজ নিহত হইলেন; আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মীরজাফর তরুণ যুবক। আলিবর্দ্দীর সাধু দৃষ্টান্তে যাহা শিক্ষা করিলেন, তাহা আর জীবনে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, সিংহাসনলাভের

---

* Allyvherde began his march, first writing to the Subah, 'that he was oppressed with grief to find he had so many enemies at court, who, by their misrepresentations, had persuaded him to disgrace his brother; that he was coming to fling himself at his feet and prove himself his loyal servant.' The Subah, roused from his delusive slumber, would have taken vigorous measures, but the same traitors assured him, he had nothing to apprehend from Allyvherde Caun. * * * The Subah upbraided his counsellors with their treachery, who pleaded, that themselves were deceived; and he was now to put his life and government to the hazard of a

জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করা নিন্দনীয় নহে; ষড়যন্ত্র এবং বাহুবলে আত্মকার্য্য সাধন করিতে পারিলেই হইল,—তাহার পরে কেহ আর পূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করিয়া তিরস্কার করিবার অবসর পায় না। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজারঞ্জন করিতে পারিলেই হইল, কি উপায়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, সে কথা লইয়া কেহ আর আলোচনা করে না। সেকালের অবস্থা স্মরণ করিলে স্বতই মনে হয় যে, যে দেশে জন্মদাতা পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃসন্তানগণকে বলিদান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বাদশাহ আলমগীর ইস্‌লাম ধর্ম্মের অদ্বিতীয় জয়স্তম্ভ বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন, সে দেশে আশ্রয়দাতা সুজা খাঁর কুক্রিয়াসক্ত অযোগ্য পুত্রকে বলিদান করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লওয়া এমন কি অন্যায় কার্য্য? মীরজাফর তাহাই বুঝিয়াছিলেন; এবং ইতিহাসলেখকেরাও আলিবর্দ্দীকে ধর্ম্মশীল নরপতি বলিয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই! *

মীরজাফর উপযুক্ত অবসর পাইবার অপেক্ষায় নীরবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। আলীবর্দ্দীর কপালে বিশ্রামসুখ মিলিল না; বর্গীর হাঙ্গামায় তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি একবার বর্গীর হাঙ্গামার গতিরোধ করিবার জন্য ভগিনীপতি মীরজাফর ও আতাউল্লাকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে বসিয়া কুটুম্ব-যুগল স্থির করিলেন যে, আর কালবিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; আলিবর্দ্দীকে হত্যা করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লওয়া হউক। আলিবর্দ্দী সুকৌশলে বিদ্রোহ দমন করিলেন, মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া রাজধানীতে পুনরাগমন করিলেন; সিরাজদ্দৌলা এবং আলিবর্দ্দী উভয়েই তাঁহাকে সবিশেষ সন্দেহের চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন।

আলিবর্দ্দীর সময়ে যাহা সফল হইল না, সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেই গুপ্ত কামনা সফল হইয়া গেল! পলাশি-ক্ষেত্রে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল; শূন্য সিংহাসনে ইংরাজের কৃপায় মীরজাফর আরোহণ করিলেন! কিন্তু তিনি আর "তখ্‌ত মোবারকে" পদার্পণ করিলেন না। সেই দিন হইতে এই পুরাতন রাজসিংহাসন অযত্নে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে!

---

* মুসলমান ইতিহাসলেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন কিন্তু আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়া অনেক আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন!

মীরজাফর কি উপায়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু সেই সিংহাসন লাভ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ অদৃষ্টবিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সেরূপ সর্ব্বজনবিদিত নহে। আমরা ক্রমশঃ সেই ইতিহাসের অনুসরণ করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

গঙ্গোত্রীর পথে।

'শুক্রবার'—একখানি অতি ক্ষুদ্র খাতায় এ পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন খাতা খানিতে পেন্সিল দিয়া লিখি, তখন হয় ত মনে করিয়াছিলাম, 'শুক্রবার' লিখিয়া রাখিলেই মাস বৎসর তারিখ সমস্ত স্মরণ হইবে; এখন দেখিতেছি, তাহার কিছুই মনে নাই। তবে স্মৃতিপট হইতে একটি দৃশ্যও লোপ পায় নাই। এই অদৃশ্যপ্রায় হস্তলিপি হিমালয়ের সেই সুন্দর মনোমোহন ছবি নয়নসম্মুখে অতুল শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এখনও এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ক্ষুদ্র একটি গ্রামের প্রান্তে বসিয়া যখনই আমার সেই জীর্ণ খাতাখানি খুলিয়া বসি, তখনই তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমার মানস-নয়নে হিমালয়ের পবিত্র দৃশ্য আনিয়া উপস্থিত করে; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া নির্ঝরিণীর অনন্ত কল্লোল, বৃক্ষবনস্পতির অশ্রান্ত শব্দ ও ঝিল্লীমুখরিত যৌবনশোভাশালিনী প্রকৃতির মধুর গীতধ্বনি অতৃপ্ত হৃদয়ে অনুভব করি; আর সেই দেববাঞ্ছিত, শোভার আস্পদ, পূর্ণ মঙ্গলময়ের সত্বায় জাগ্রত জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। এই ক্ষুদ্র খাতার মধ্যে আমার জীবনের কত সুখ দুঃখ, কত কাতরতা, কত বিষাদের দীর্ঘ কাহিনী অব্যক্ত অলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে! বিশালদেহ উন্নতশীর্ষ বৃক্ষমূলে কত বিনিদ্র রজনীযাপনের সুদীর্ঘ কাহিনী ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত।

আজ শুক্রবার; অতি প্রত্যূষে স্বামীজীকে ডাকিয়া তুলিলাম। নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব জীর্ণ কম্বল ও যষ্টি লইয়া স্বাধীন রাজার রাজধানী ত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা স্বাধীন ও মহারাজ চক্রবর্ত্তীর রাজ্যে অবতরণ করিলাম। গঙ্গার ধারে যেখানে টানা সাঁকো আছে, সেখানে যাইয়া দেখি, এখনও সাঁকো ফেলা

হয় নাই। আমরা দুইটি নগণ্য জীব হইলে বোধ হয়, এ স্থানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত। সূর্য্যোদয় হইলে জমাদার সাহেব যখন সাঁকো ফেলিবার হুকুম দিতেন, তখনই আমরা পার হইতে পাইতাম। কিন্তু এবার সন্ন্যাসী হইলেও আমাদের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে; আমাদের সঙ্গে এবার তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লম্বায় চওড়ায় আমাদের অপেক্ষা খাটো হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে পদমর্য্যাদায় অনেক বড়, তাঁহার ক্ষমতাও অসীম। রাজবাড়ী হইতে এবার আমাদের সঙ্গে একজন পেয়াদা দেওয়া হইয়াছে; তাহার উপর হুকুম আছে যে, সে আমাদিগকে সমস্ত স্থান দেখাইয়া নিরাপদে মশৌরী পৌছাইয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার ঝুলীর মধ্যে রাজবাড়ীর সহি ও মোহরে শোভিত একখানি পরোয়ানা আছে। এই দলিলের বলে সে গড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে আমাদের জন্য রসদ আদায় করিবে, এবং আমরা অনুগ্রহ করিয়া যে দিন যে গ্রামে থাকিব, সে দিন সে গ্রামের লম্বরদার (তহবিলদার) ও পঞ্চায়েতগণ হাজির থাকিয়া আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এ যাত্রায় আমরা পথের ভিখারী নহি, গড়োয়াল রাজ্যের মহাসম্মানিত অতিথি; পরে শুনিয়াছি, এ প্রকার অনুগ্রহ অতি কম লোকই পাইয়া থাকেন।

টানা সাঁকোর নিকট উপস্থিত হইয়া যখন আমরা দাঁড়াইলাম, তখন আমাদের পশ্চাৎ হইতে 'জমাদার হো!' বলিয়া পেয়াদা মহাশয় এমন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন যে, সে শব্দ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, পাহাড়েরা সেই শব্দ লইয়া যেন লোফালুফি করিতে লাগিল! জমাদার সাহেব তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন; পেয়াদা তাহাকে 'বন্দেগী' জানাইয়া আমাদের পরিচয় প্রদান করিল। তখনই 'দোয়ারগা দত্ত হো' 'রামকান্‌হাইয়া হো' প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ডাক হাঁকে গঙ্গার জল কাঁপিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি সাঁকো ফেলা হইল। আমরা সাঁকো পার হইলাম। দোয়ারগা দত্ত, রাম কানাইয়া প্রভৃতি সকলেই বিদায় অভিবাদন করিল, আমিও সকলকে সহাস্যবদনে অভিবাদন করিলাম। স্বামীজী একটি কথাও বলিলেন না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গঙ্গা পার হইয়াই তিনি এক অতি বিষম প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তিহরী হইতে আমরা যে প্রকার পরোয়ানা লইয়া বাহির হইয়াছি, তাহাতে পথে অনেক নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার হইবে, এ কথা তিনি

করিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, "এই দেখ না বাপু দো-হাতে সেলাম! এই কম্বলের উপরে এত সেলাম ত সহিবে না, দুই দিন পরেই জুতা জামার দরকার হইয়া উঠিবে, এ সন্ন্যাস আর তখন ভাল লাগিবে না।" আমি বুঝিলাম, বৃদ্ধ হইলে মানুষ অতিসাবধান হয়। স্বামীজীর কথায় আমি মোটেই ভীত বা চিন্তিত হই নাই; তিনি যে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ হিমালয়ের পথহীন জঙ্গলে আমাকে একাকী ফেলিয়া যাইবেন, সে ভয় আমার মনেও স্থান পায় নাই; স্বামীজীর হৃদয়ের মধ্যে আমি যে কতকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি, এবং প্রতিদিনই যে আমার অধিকারের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ স্বামীজীর সঙ্গে আমার এক নূতন রকমের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, আমি নিতান্ত শিশু, রৌদ্রে গলিয়া যাই, ক্ষুধায় কাতর হই, পথশ্রমে অভিভূত হই; তাঁর সেই দীর্ঘ যষ্টি, প্রকাণ্ড পাগড়ীর ছায়ায় আমাকে লইয়া বেড়াইতে চান, তাঁর সেই বৃদ্ধ শরীরের উপরে ভর দিয়া আমি পথ চলি; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি আমার উপর না রাখিলে আমি নিশ্চয়ই কোন দিন পর্ব্বতের গাত্র হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইব; তিনি সম্মুখে না বসিলে আমি ভোজনপাত্র ফেলিয়া উঠিয়া পড়িব; এই বন জঙ্গলে তিনি পিতার ন্যায় শাসনদণ্ড ও স্নেহের ভাণ্ডার বহিয়া বেড়াইতেছেন; যখন তখন আমার উপরে সেই দণ্ড পরিচালিত হইতেছে, দণ্ডে দশবার দশ রকমের স্নেহের শাসন আমার উপর প্রযুক্ত হইতেছে। আবার এ দিকে আমি মনে করি, আমার মত সবলকায় কষ্টসহিষ্ণু সন্তানের দেহের উপর ভর দিয়াই বৃদ্ধ স্বামীজীর এখন চলা উচিত, আমি না থাকিলে তাঁর দুর্ব্বল পদদ্বয় চলিত না, তিনি হয় ত পথের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। বৃদ্ধ মনে করেন, তিনি আমার অবলম্বন; আমি মনে করি, আমি বৃদ্ধের অবলম্বন; এই ভাবে যখন আমাদের দিন যাইতেছে, এই রকমে পিতৃস্নেহে ও সন্তানভক্তিতে মিলিয়া যখন আমরা দুইটি ভিন্নবয়সী পৃথকপথাবলম্বী জীব নিকট হইতে নিকটতর সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেছি, সে সময়ে বৃদ্ধের মুখ হইতে পৃথক হইবার প্রস্তাবে আমার ভীত হইবার কোনও কারণই ছিল না; তবে এই প্রকার সিপাহী সঙ্গে থাকিলে যে তাঁহার কেমন একটা অশান্তি বোধ হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি কাতর হইলাম।

বৃদ্ধ আমাকে মৌন দেখিয়া নিজের কথাটা একটু চাপিয়া লইলেন ও বলিলেন, "তোমাকে এ জঙ্গলে ত আর একেলা ফেলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়,

কাজেই সব অসুবিধাই সহিতে হইবে।" হায় বহুদর্শী বৃদ্ধ! এ কি কর্ত্তব্যের অনুরোধ! আমি ত দেখিলাম মায়ার বন্ধন; স্বামীজী এক সংসার ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়াছেন, কিন্তু এই প্রশান্ত হিমালয়ের বক্ষের মধ্যে আবার তাঁহার দ্বিতীয়বার সংসারচিন্তা আসিয়া জুটিয়াছে। আমার উপরে তাঁহার স্নেহ দিন দিনই বাড়িতেছে। কত রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার করস্পর্শে জাগিয়া দেখিয়াছি, তিনি আমার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে শরীরে হাত দিয়া দেখিতেছেন, আমার জ্বর হয় নাই ত? কত দিন দেখিয়াছি, আমি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছি কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কত দিন দেখিয়াছি, ঘুমের ঘোরে আমার গায়ের কম্বল পড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী তাহা আমার গায়ে তুলিয়া দিয়াছেন; আমি জাগ্রত অবস্থায় এই সব দেখিয়াছি; হয় ত আমি যখন নিদ্রিত, তখনও কত দিন এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমার শিয়রে মায়ের মত বসিয়া চৌকি দিয়াছেন! হিমালয়ের দারুণ শীতের মধ্যে প্রাণ যে যায় নাই, অনাহারে পথশ্রমে শরীর যে অবসন্ন হয় নাই, এই পবিত্রচেতা সন্ন্যাসীর স্নেহই তাহার প্রধান কারণ। ভগবানের অতুল করুণা, অপার স্নেহ, এই কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ভিতর দিয়া দিবানিশি আমাকে অভিষিক্ত করিত। অন্ধকার রজনীতে প্রবল ঝটিকার সময় দুইটি ক্ষুদ্র প্রাণী অনেক দিন বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবী রসাতলে যাইবার প্রতীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এক দিনও মনে হয় নাই, প্রাণ যাইবে; সর্ব্বদাই স্নেহের অভেদ্য বর্ম্মে আপনাকে সুরক্ষিত মনে করিতাম!

স্বামীজীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, পথের মধ্যে কোন লোকের উপর যখনই কোন প্রকার জুলুম হইতেছে দেখিব, সেই দণ্ডেই সিপাহীকে বিদায় করিয়া দিব; আর হিমালয়ের প্রস্তররাশির মধ্যে আমাদিগকে সেলাম করিবার জন্য লোক বড় বেশী মিলিবে না, তাহার জন্য ভয়েরও কোন কারণ নাই। লোকের অভিবাদনে মানুষের মনে একটা গৌরবের ভাব, একটা অহঙ্কারের ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে, সে কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু এই মহাপবিত্র স্বর্গীয় ছবির মধ্যে সে ভাব বেশী ক্ষণ মনে স্থান পাইবে না, আর তাহাতে স্বামীজীর মত মানুষের বিশেষ কোনও ক্ষতির সম্ভাবনাও নাই। স্বামীজী আমার সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কারণ, তখন তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। আমরা পর্ব্বতের যে পথ ধরিয়া

সলিলা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছিলেন; আমরা সহসা সেই জঙ্গলময় স্থান হইতে একটা পরিষ্কার পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এতক্ষণ সম্মুখের একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গ আমাদের দৃষ্টিরোধ করিয়াছিল, তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই নাই,—কিন্তু এই পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহান্ গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল! বিস্ময়াবিষ্টলোচনে চাহিয়া দেখিলাম, আমরা একটি অতি সুবিশাল বরফমণ্ডিত শৃঙ্গের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; তখন সূর্য্য আকাশে উঠিয়াছে, বালসূর্য্যের কোমল কিরণ সেই সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পতিত হইয়া অতুল শোভায় উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে; প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সেই তুষারধবল আর্দ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়ায়, বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে যে কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইতেছিল, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না; পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রধান চিত্রকর সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে দৃশ্যের সামান্য প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেও তার হস্ত অগ্রসর হইতে চাহিবে না। চিত্রকর তাহার সেই সামান্য হস্তে সেই অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত করিতে গিয়া তাহার দেবভাবের উপরে কলঙ্ক আরোপ করিতে সম্মত হইবে না। মানুষের হস্ত আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে, মানুষ বহু চেষ্টায় বহু যত্নে বহু কৌশলে আগরার তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছিল, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্ব্বেলের সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য স্পর্দ্ধার সহিত অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু এ দৃশ্য অলৌকিক, মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ব, এই বিকট গভীর নগ্ন সৌন্দর্য্যের পাদদেশে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারি; সৃষ্টি দেখিয়া আমরা স্রষ্টার মহত্বের কতক পরিমাণ হৃদয়ে ধারণা করিবার অবসর পাই।

স্বামীজী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, আমাকে সাধকপ্রবর হরি-নাথ মজুমদারের * হিমালয়ের গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমারও

* সেই সাধকপ্রবর, ঋষিপ্রতিম, দেশহিতে উৎসর্গীকৃতজীবন হরিনাথ মজুমদার আর ইহলোকে নাই। এই বৈশাখ মাসে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার ও সংবাদ-পত্রের উন্নতিকল্পে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় বৃদ্ধ জীবনপাত করিয়াছেন, ইঁনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' 'সোমপ্রকাশের' সমসাময়িক; ইঁহার রচিত

প্রাণে "কাঙ্গালের" সেই অপূর্ব্ব গান জাগিতেছিল; আমি হৃদয় খুলিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে,—
কেবা রে আদর কো'রে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে;
আবার সেই চুড়ায় চুড়ায়, কেবা তোমায় হীরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক, চুণি মণি টোপর মাঝে;
ওরে তোর মাথার উপর, এমন টোপর কোন কারিগর গড়ায়েছে।
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, দুটি নয়ন ঝুরিতেছে;
তাইতে রে ঝর ঝর, নিরন্তর, নিঝরের জল পড়িতেছে।
কাঙ্গাল কয় ওরে আঁধা, ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি গলিতেছে;
অথবা ভারতের দুখ দেখেরে বুক ফাটে পাষাণ গলিতেছে।

স্বামীজীও আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। এমন মহান সুন্দর বিরাট দৃশ্যের কারিগরকে দেখিবার জন্য প্রাণে সত্য সত্যই একটা প্রবলতর আগ্রহ উপস্থিত হইল। হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের মধ্যে পড়িলে ভগবানের সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়; লোকালয়ের সৌন্দর্য্য এক ভাবের; সে শোভার একটা বর্ণনা করা যায়, তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ে ধারণা করা যায়, কিন্তু এই প্রকৃতির অভ্রভেদী পাষাণপ্রাচীর, এই বিহঙ্গমকাকলিসমাকুলিত অরণ্য এবং শৈবালময় নির্ঝরিণীর শ্যাম উপকূল, এই অবিরামগীতিনিরত ক্ষুদ্র নদী সকলের কলধ্বনি, এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া এমন এক উন্মাদক সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় যে, মনের ভাষা তাহার বর্ণনা করিতে অসমর্থ। সে শোভা সুধু নয়ন ভরিয়া দেখিতে হয়, ধরাবাসী শোকতাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীকে সেই পবিত্র দৃশ্যের সম্মুখে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে; মনে হয়, এই হর্ষকাকলি শ্রবণ করিলে, এই অবিরামবর্ষী আনন্দধারায় স্নাত হইলে, তাহাদের দুঃখ কষ্ট শোক তাপ দূর হইয়া যাইবে; হিংসা দ্বেষের মলিনতা পঙ্কিলতা চিরদিনের মত ধুইয়া যাইবে।

বেলা ক্রমে বাড়িতেছে দেখিয়া স্বামীজীকে তুলিলাম। সিপাহী আমাদের ভাব গতিক দেখিয়া পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল, এবং কিছু দূরে একটা গ্রামের নিকট অতি সুন্দর এক ঝরণার তীরে ঘনপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষতলে আমাদের মধ্যাহ্ন অবস্থানের আয়োজন করিয়াছিল; গ্রামের লোকদিগকেও সমস্ত সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছিল। আমরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন

পথ চলিয়াই গতিরোধ করা স্বামীজীর অভিপ্রেত হইল না। সিপাহী বলিল, সম্মুখে কতক দূর আর রাস্তার ধারেই গ্রাম মিলিবে না। স্বামীজীর তাহাতে আপত্তি নাই। গ্রাম না মিলে, রাস্তার ধারে বৃক্ষের ছায়া ত মিলিবে; আহার না মিলে, ঝরণার জল ত মিলিবে; খাইবার কথা ভাবিয়া পথের সীমা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলাম। আমাদের অদৃষ্টে আজ বিশেষ কষ্ট আছে ভাবিয়া, সিপাহী কিছু বিষণ্ণ হইয়া আবার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই বৃক্ষবিরল স্থান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল; মস্তকের উপর সূর্য্য প্রখর হইতে লাগিল। বামে দক্ষিণে রাস্তার নিকটে বা দূরে কোনও গ্রাম বা কৃষকের সামান্য কুটীরও দেখিতে পাইলাম না। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বৃদ্ধ স্বামীজী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন; সে দৃষ্টির মধ্যে অনেক খানি সহানুভূতি, এবং তাহার মধ্যে যে একটু অনুশোচনাও ছিল না, তাহা বোধ হয় না। শেষে রৌদ্রের প্রখর তেজে আর চলিতে না পারিয়া একটা সামান্য ঝোপের আড়ালে যে একটু ছায়া ছিল, সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন; আমিও তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম; আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। নিকটে কোনও লোকালয় আছে কি না, সিপাহীকে দেখিতে বলিলাম; সিপাহী তাহার ঝুলি ও কম্বল সেই স্থানে রাখিয়া বাঁশের লাঠি স্কন্ধে লইয়া সেই নির্জ্জন পর্ব্বতের মধ্যে ডুবিয়া গেল। স্বামীজী ধীরে ধীরে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলেন। আমি কি করি; বৃদ্ধকে সজীব করিতে না পারিলে আমার আর চলে না। এই দুই প্রহর রৌদ্রের মধ্যে একাকী বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। এই রৌদ্রময়ী রাত্রির নির্জনতা যেন কেমন ভীষণ বোধ হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন কোনও একটা দৈত্য সমস্ত পৃথিবীটাকে এই দুই প্রহরে যাদুমন্ত্রে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ দেখিয়া বাতাস যেন হায় হায় করিয়া ফিরিতেছে। স্বামীজীকে উঠাইয়া বসাইবার জন্য আমি সেই ভয়ানক দুই প্রহরে গান ধরিলাম,—

"ইয়ে জগদরশন কি মেলা—"

শ্রীজলধর সেন।

সুরবালা।

প্রথম অধ্যায়।

বাজিৎপুরের ভবতারণ ঘোষ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। মধ্যবঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে বাজিৎপুরের ঘোষ পরিবার সুপরিচিত। বাজিৎপুর কোন বিখ্যাত নগর বা বিস্তীর্ণ গ্রাম নহে; বঙ্গের এক ক্ষুদ্রাবয়ব পল্লীমাত্র। নীরদা নামে এক নির্ম্মল নদী ইহার নিম্নে প্রবাহিত। তটিনীর তীরদেশে অশ্বত্থ, বট, দেবদারু, পলাশ প্রভৃতি পাদপশ্রেণী শোভিত। গ্রামের অভ্যন্তরভাগ আম, জাম, কাঁঠাল, তিন্তিড়ী, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদি ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। তাহাদের শাখা প্রশাখা গৃহস্থের বাসভবন অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিলে সমস্ত বাজিৎপুরটি একটি বৃহৎ উদ্যান বলিয়া ভ্রম হয়। সম্মুখে সেই স্বচ্ছসলিলা সরিত্তটের শ্যামল বৃক্ষাবলি যেন সেই উদ্যানের প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান।

ক্ষুদ্র গ্রাম বাজিৎপুর ঘোষেদের বাসস্থান বলিয়াই বিশেষ পরিচিত। ভবতারণের পিতামহ যদুপতি ঘোষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যদুপতি জীবনে কখনও কোন যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করেন নাই; রাজনৈতিক ব্যাপার বিভ্রাট তিনি বুঝিতেনই না; সমাজবিপ্লব বা সমাজসংস্কারের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক কল কৌশলও তিনি আবিষ্কার করেন নাই। বাগ্দেবীর দয়া তাঁহার প্রতি এত সামান্য ছিল যে, বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় তিনি কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থকারও বুক ঠুকিয়া বলিতে প্রস্তুত আছেন যে, সেই অবিদিত-বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধের অপেক্ষা এ পক্ষের বিদ্যা অল্প নহে। স্থূল কথা এই যে, যে সমস্ত কারণ থাকিলে জগতের ইতিহাসে নাম উঠিতে পারে, যদুপতির তাহা কিছুই ছিল না।

যদুপতি তবে কিসে প্রসিদ্ধ? প্রসিদ্ধির হেতু পরে বলিতেছি। জানিয়া রাখুন যে, তাঁহার যশ সুদূরবিস্তৃত। বাজিৎপুরের চতুর্দ্দিকে দিনান্তের পথের মধ্যে এমন কোন গ্রামই নাই, যেখানে দু এক জন লোকও যদুপতির নাম না জানে। চল্লিশ বৎসরের অধিক হইল, যদুপতি লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম এখনও অনেক মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার যুবক

জিজ্ঞাসা করিবে, "সেই যদুঘোষের বাজিৎপুর?" আমরা দিনান্তের পথের কথা বলিয়াছি; এখনকার হিসাবে বলিতে হইলে দশ এগার ক্রোশ বা কুড়ি বাইশ মাইল বলিতাম। যদুপতির সময়ে এ হিসাব প্রচলিত ছিল না। তখন কলিকাতা হইতে কাশী কিম্বা দিল্লীর দূরত্ব বুঝাইতে হইলেও লোকে এত দিনের বা এত মাসের পথ বলিত। কারণ সহজেই অনুমিত হইবে। সে সময়ে লোকের গতিবিধি প্রায় পদব্রজেই সম্পন্ন হইত। অধুনা লৌহপথে দেশ আচ্ছাদিত। বাষ্পীয় শকটে গমনাগমনের দক্ষিণা আবার ক্রোশ হিসাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আট পয়সায় এক সামান্য পাঁজি কিনিলে তাহাতে দেখিতে পাইবে, প্রয়োজনীয় তিথি নক্ষত্র শুদ্ধরূপে লিখিত না থাকিলেও, এক দিকে হাবড়া, বালি, কোন্নগর, অন্য দিকে শিয়ালদহ, দমদমা, বেলঘরিয়া বা বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া প্রভৃতি স্থানের দূরত্ব এবং ভাড়া নির্ভুলরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ক্রোশ বলিতে আর ভাবনা কি? যদুপতি কিসে পরিচিত, তাহা বলা হয় নাই। পাঠক অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন, সদ্‌গুণ তাঁহার প্রসিদ্ধির হেতু। যদুপতি একজন সে কালের নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি ছিল। যদুপতি জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, পরহিতব্রত এবং অতিশয় অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিভব যেমন ছিল, ব্যয়ও তেমনই ছিল। অর্থের একমাত্র ব্যবহার দান, ইহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিয়ম ছিল যে, বাড়ীতে অতিথি আহার না করিলে যদুপতি নিজে জলগ্রহণ করিতেন না। অথচ এক দিনও তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হয় নাই। বাজিৎপুরে যাত্রী কিম্বা পথিক যে কেহ আসিতেন, তাঁহাকে যদুপতির আতিথ্য গ্রহণ করিতেই হইত। অধিক সময়ক্ষেপ হইবে বলিয়া যাঁহারা তাঁহার ভবনে যাইতে অনিচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত পথিপার্শ্বেই সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য বস্তুর এক বিপণি সজ্জিত থাকিত। অতিথির ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া বিপণিকার যদুপতির নিকট হইতে ভুক্ত দ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করিত। প্রবাদ আছে যে, একবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যদুপতির ভবনে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় রন্ধনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠের অভাব হইয়া উঠে। যদুপতি অম্লান-বদনে আপন আলয়ের কতকগুলি মূল্যবান কাঁচা ঘর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে তৃণ কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সহর্ষে কহিয়াছিলেন, ঘর আমি আবার পাইব, কিন্তু এমন অতিথিসমাগম আর হইবে না!

আমরা এ স্থলে যদুপতি সম্বন্ধে আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। সেটি তাঁহার প্রবল ভক্তি বিশ্বাসের পরিচায়ক। যদুপতি সপ্তনবতি বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। এই দীর্ঘজীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ হয় নাই। তিনি মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও দেখিতে শুনিতে ও চলিতে পারিতেন। এমন জীবন যে স্বাস্থ্যের নিদান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদুপতি মধ্য জীবনে একবার মাত্র সামান্য জ্বর ভোগ করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহার জ্বর হয়। চিকিৎসক তাঁহাকে শীতল জল পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে জ্বরের উত্তাপ অধিক হইয়া উঠিলে যদুপতি পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার এক পুত্র নিকটে ছিলেন। যদুপতি তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা, একজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া তাঁহাকে আমার সমক্ষে জল খাইতে দাও।" পুত্র তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণের জলপান শেষ হইলে যদুপতি কহিলেন, "পদধূলি দিন, আমার তৃষ্ণা দূর হইয়াছে।" ইহার পর দিনই জ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

দেব ব্রাহ্মণে যদুপতির যে ভক্তি ছিল, তাঁহার পরিচিত সমগ্র মানবমণ্ডলীরও বোধ হয় তাঁহার প্রতি তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না। বাজিৎপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ আপামর সাধারণ সমস্ত লোকে তাঁহাকে যে সম্ভ্রম দেখাইত, সচরাচর মানুষের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। নিকটস্থ পঞ্চাশ ষাট খানি গ্রাম মধ্যে কাহারও কোন বৃক্ষে ফল না ফলিলে বৃক্ষস্বামী প্রার্থনা করিতেন, "এই গাছের প্রথম ফল যদুঘোষের বাড়ীতে দিব।" ইহাতে সকল গাছেই ফল ফলিত, তাহা নহে; কিন্তু যদুপতির এমন অনেক ফলপ্রাপ্তি হইত, এবং তিনি তাহা অতিথিসৎকারে ব্যয় করিতেন। বাজিৎপুরের নিম্নবাহিনী নীরদা আজিও অনেকের নিকট যদু ঘোষের নদী বলিয়া পরিচিত। যদুপতির ভূসম্পত্তির মধ্যে এক বিস্তীর্ণ বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিল সামান্য বায়ুতেই বড় তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া উঠে। সে সময়ে কোন নৌকা বিপদে পড়িলে কর্ণধার সর্ব্বাগ্রে যদু ঘোষের নাম করিয়া থাকে। মানুষের প্রতি মানুষের ভক্তি ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে কি?

যদুপতির নাম ইতিহাসে উঠে নাই এবং উঠিবে না, ইহা স্থির। নৃশংস নিরো বা সিরাজ, কৃতঘ্ন জয়চাঁদ বা মীরজাফর, দুর্ব্বৃত্ত মীরন বা র‍্যাভেলকের নাম তাহাতে অঙ্কিত থাকিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদুপতির ন্যায় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। যদুপতি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরত্ব তাঁহার কিছুই ছিল না। জীবনে কোনও দিন তাঁহাকে

শান্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। পাঠক দেখিবেন, যখন আমরা যদুপতির গুণগ্রামের কথা বলি, তখন তাঁহার বলবিক্রম বা সাহসের কথা কিছুই বলি নাই। যে সময়ে যদুপতির জন্ম, তৎকালে বাঙ্গালীর সাহসের পরিচয় দিবার পন্থা অতি অল্পই ছিল। সুতরাং যদুপতির সাহসের কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল; কিন্তু ঐ বলের যেরূপ ব্যবহারে অপরের ত্রাস জন্মিতে পারে, তেমন ব্যবহার তিনি জানিতেন না। বাদবিসম্বাদে তাঁহার এতই বিতৃষ্ণা ছিল যে, তিনি জীবনে কখনও কাহারও সহিত কলহ করেন নাই। সম্মুখে এক জনকে অন্যের সহিত বিবাদ করিতে দেখিলে, তিনি নিজে এমনই সঙ্কুচিত হইতেন যে, তাঁহার আকার দেখিলে মনে হইত, কলহকারীরা উভয়ে মিলিয়া যেন তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়াছে!

এ হেন শান্তিপ্রিয় যদুপতি জগতে পরিচিত রহিবেন কেমন করিয়া? মানব ইতিহাসের ইহাই কলঙ্ক যে, পিশাচের মস্তকে রাজমুকুট উঠিলেও তাহার পৈশাচিক কীর্ত্তিকাহিনী ইতিবৃত্তে বিবৃত থাকিবে; কিন্তু যদুপতির ন্যায় যে সমস্ত সৎপুরুষেরা আপন আলয়ে বসিয়া শান্তিময় সাধুজীবন যাপন করেন, আর আদর্শ গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিয়া যান, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের বিন্দুমাত্র বিবরণও ভবিষ্যৎপুরুষের হস্তগত হইবে না।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, ইতিহাসে নৃপতি বা তদনুচর ভিন্ন অন্য নরের চরিত্র কীর্ত্তিত হয় না। পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি, অসাধারণ প্রতিভা থাকিলেও হয়। অসাধারণ প্রতিভার সম্মান না করিয়া উপায় নাই। জগতে এক এক জন প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ আপন মস্তিষ্কের বলে অসংখ্য মানবমণ্ডলীকে যে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া যান, সাধারণ শত নরপতি কর্ত্তৃকও তাহা সাধিত হইবার নহে। বর্ত্তমান কালের বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভার বলে দেশের নিমিত্ত যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চিরদিন স্মরণীয় থাকিবেন, সন্দেহ নাই; এবং তিনি যে জীবনে কত অসহায়ের সাহায্য করিয়াছেন, আর কত অন্নহীনকে অন্ন দিয়াছেন, তাহার কথাও বোধ হয় শীঘ্র বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জননীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে উচ্চ প্রকৃতির লোক এবং আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন, তাহার কথা, বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহা-

সম্বন্ধে সেই অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত ক্ষুদ্র বিবরণ যত বার পড়িয়াছি, ততবারই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে, এমন আদর্শ পরপুরুষের হস্তগত হওয়া আবশ্যক? বিশেষতঃ বাঙ্গালার যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে রাধামোহন এবং যদুপতির ন্যায় আদর্শ অচিরে অদৃশ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূচনা।

ভবতারণ যদুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণের একমাত্র সন্তান। কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণেরও একই পুত্র; তাঁহার নাম প্রেমচাঁদ। যদুপতি যে পরলোকগত, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র রাজকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণও ইহলোকে নাই। রাজকৃষ্ণের স্ত্রীরও কাল হইয়াছে। প্রেমচাঁদের বৃদ্ধা জননী কিন্তু আজিও জীবিতা। প্রেমচাঁদ নিজেই পঞ্চাশের কাছাকাছি গিয়াছেন। ভবতারণ পঞ্চাশ পার হইয়াছেন। উপন্যাসের সম্পর্ক অবশ্য ইঁহাদের অথবা ইঁহাদের পুত্রকন্যাদির সঙ্গে। আমরা কেবল ইঁহাদের বংশের পরিচয় দিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ে যদুপতির জীবনের কয়েকটি কথা বলিয়াছি। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীকুলে যাঁহাদের জন্ম, বংশমর্য্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের কি আছে? হইত ইংরাজ কাহারও কথা, বলিয়া দিতাম যে, তাহার উর্দ্ধতন পঞ্চবিংশ পুরুষ খৃষ্টীয় সহস্রাধিক ষট্‌ষষ্টি অব্দে বিজেতা উইলিয়মের সহিত ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া দ্বীপমৃত্তিকা পবিত্র করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী আমরা—আমাদের কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম অনেক দিন ডুবিয়া গিয়াছে। এখন আমরা কি দিয়া কুলগৌরব প্রতিপন্ন করিব? আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখন আমাদিগকে বংশের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে বলিতে হয় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন, বা আমাদের বাদসাহী যায়গীর আছে, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ আমাদের গৌরবের পরিচয় অন্যবিধ। হিন্দুসমাজ বৃদ্ধ সমাজ। ইহার বাল্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। যৌবনকথাও সম্যক্ স্মরণ নাই। এ সমাজ এতই বৃদ্ধ যে, পৃথিবীতে এত বয়সের আর কেহই জীবিত নাই। ইহার যখন শৈশব কাল, তখন ত জগতে অন্য জাতির জন্মই হয় নাই। যৌবনসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। প্রৌঢ়াবস্থায় যৌবনমদদৃপ্ত যাহাদের

করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। রোম, মিসর, কার্থেজ ইত্যাদি যাহারা দূর হইতে ইহার উন্নতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হিন্দুসমাজ কিন্তু এখনও এমন ভাবে রহিয়াছে যে, ইহার মৃত্যু কবে হইবে, কেহই বলিতে পারে না। ইহার শারীরিক বলবীর্য্য সকলই গিয়াছে। উদ্যম বা অধ্যবসায় নাই। বৃদ্ধের যত দোষ, তাহা সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। আলস্য ও জড়তা তাহার প্রধান কারণ। অন্য দিকে কিন্তু ইহার ধর্ম্মভাব প্রবল। বৃদ্ধেরা যে সকল ভুলিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, এ সমাজেরও সেই অবস্থা। বৃদ্ধ কোমল গুণে পরিপূর্ণ। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরদুঃখকাতরতা তাহার বিলক্ষণ। কিন্তু হাত তুলিয়া অন্যকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। বৃদ্ধের বল ক্রন্দন। হিন্দুসমাজের বলও তাহাই। হিন্দু পরের জন্য কাঁদিতে জানে। বৃদ্ধ যেমন আপনার আহারের নিমিত্ত অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, হিন্দুসমাজও সেইরূপ। অনাহারে রাখিলেও সে যেমন বিলাপ ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারে না, হিন্দুও তাহাই। বৃদ্ধ যেমন যুবককে পরামর্শ দিতে পারে, তেমনই হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তি বড়ই মার্জ্জিত। বৃদ্ধের বৈষয়িক ভাবনা অতি অল্প। পারত্রিক চিন্তা তাহার মজ্জাগত। হিন্দুরও কি তাহাই নহে? যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুসমাজ পুনরায় ঐহিক উন্নতি লাভ করিবেন, তাঁহারা ঠিক ভাবেন, বৃদ্ধ যুবক হইবে। আমাদের মতে ইহা অসম্ভব। পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া বালক না হইলে আর যৌবনবল আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং সেরূপ উন্নতি হিন্দুসমাজকে দিয়া হইবে না। অন্য যে কেহ আসিয়া করিতে চাহে, করুক। বৃদ্ধ হয় মরিয়া যাইবে; নচেৎ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর দেহ লইয়া দর্শকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

এমন অবস্থায় আমরা আজ বংশের প্রাচীনত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত কি প্রমাণ দিব? কে না জানে যে, শত শত বর্ষ গত হইল, আমরা ত জীর্ণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। বৃদ্ধভাবে বসিয়াই ত আমরা কত সমাজের বাল্য, যৌবন ও পতনাবস্থা দেখিলাম। আমাদের বাল্যাবস্থা বলিতে যাওয়াও যাহা, আর ভারতে আর্য্যসন্তানগণ কবে আসিয়াছিলেন, তাহার কালনির্ণয় করিতে যাওয়াও তাহা।

তাই বলিতেছিলাম যে, এত বৃদ্ধ সমাজে বংশের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মই ইহার একমাত্র গৌরবের কারণ। ফলতঃ যদুঘোষের পৌত্র বলিয়া ভবতারণের যে সম্মান ছিল, তিনি রাজা রাজকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুরের পুত্র হইলেও

বোধ হয় সে সম্ভ্রম পাইতেন না। বাজিৎপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ আপামর সাধারণ লোক এই ঘোষ পরিবারকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিত। "পুণ্যের সংসার" বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। এ পরিবারের কোনরূপ উন্নতি দেখিলেই লোকে সহর্ষে কহিত,—"হবে না কেন ? যদু ঘোষের চাল ডালের জোর।"

ভবতারণের পিতা এবং পিতৃব্য উভয়েই তাঁহাদের পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। কিন্তু যদুপতির নামে দেশ ঢাকিয়া রহিয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের যশ তেমন ফুটিতে পারে নাই। পিতার পুত্র বলিয়াই তাঁহারা সমধিক পরিচিত ছিলেন। যদুপতি ভিন্ন অন্য কাহারও পরবর্ত্তী হইলে তাঁহারা স্বয়ং যশস্বী হইয়া যাইতে পারিতেন।

ভবতারণ এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র প্রেমচাঁদ, ইহাঁরাও ঘোষ বংশের সুসন্তান বটেন। তাঁহারা উভয়ে একান্নে পৈতৃক ভবনে বাস করিতেছেন। পরস্পরে সদ্ভাব প্রীতি এতই অধিক যে, সচরাচর সহোদরদ্বয়েও তেমন দৃষ্ট হয় না। লোকে ইহার দুই কারণ বলিয়া থাকে। এক তাঁহাদের উভয়ের সৎ-স্বভাব, আর প্রেমচাঁদের অপত্যহীনতা। ভবতারণের দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রেমচাঁদের পুত্র কন্যা কিছুই হয় নাই। সন্তান হইল না বলিয়া প্রেমচাঁদের মাতা দুই বার তাঁহার বিবাহ দেন। প্রথম বধূ পরলোকগতা। দ্বিতীয়া সন্তান-প্রসবের স্বাভাবিক বয়স অতিক্রম করিলে বৃদ্ধা পুত্রকে আর একবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রেমচাঁদ্ কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বুঝাইতেন, মা, সন্তান ত বংশরক্ষার নিমিত্ত। দাদার ছেলেরা বেঁচে থাকলেই বংশরক্ষা হইবে।

ভবতারণ বার মাস বাড়ীতেই থাকেন। প্রেমচাঁদ অধিকাংশ সময় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। দান এবং অতিথিসৎকার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রবল। এক জন যেন বাহির হইতে অতিথি আর্ত্ত প্রভৃতি দানের পাত্র কুড়াইয়া আনেন, আর এক জন বাড়ীতে বসিয়া তাহাদের সেবা ও সৎকার করেন। উভয়ের অন্তঃকরণ এতই নির্ম্মল এবং পরস্পরের প্রীতি এতই অধিক যে, দানের নামে এক জন সমস্ত সংসারটি ধরিয়া দিলেও অন্যে সন্তুষ্ট বই বিরক্ত হন না। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে বাজিৎপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেকগুলি গ্রামের লোক অন্নাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল। ঘোষেদের গোলায় সে বার অধিক ধান্য ছিল না। প্রেমচাঁদ দেখিলেন, কোন এক কৃপণ মহাজনের ঘরে প্রচুর ধান্য

সম্মত নহে; অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। প্রেমচাঁদ ভবতারণকে কহিলেন, "দাদা, এত মূল্যে কেহই ধান্য ক্রয় করিতে পারিবে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমরা সমস্ত ধান্য কিনিয়া লই, এবং লোককে বিলাই। লোকের অবস্থা ভাল হইলে আপনা হইতেই শোধ করিবে। এক জনের গৃহে অন্ন সঞ্চিত থাকিতে অসংখ্য লোক আহারাভাবে প্রাণ হারাইবে, ইহা অসহ্য। ভবতারণ হৃষ্টান্তঃকরণে নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রেমচাঁদের হাতে দিলেন। প্রেমচাঁদ তদ্দ্বারা ধান্য কিনিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে দান করিতে লাগিলেন। দরিদ্রেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিল, "যদুঘোষের বংশ, হবে না কেন? এখনও সকাল বেলায় তাঁর নাম করিলে দিনটা ভাল যায়। পরমেশ্বর করুক, আরও হউক। আর মানুষকে ওরা এমনি করে খাইয়ে বাঁচা'ক্।"

ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদের সম্পত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। তাঁহাদের কোন বড় জমিদারী নাই, তাঁহারা কোটীপতিও নহেন। ইহাদের পৈতৃক এক তালুক আছে। তাহার আয় বার্ষিক ছয় সহস্র মুদ্রার ন্যূন নহে; বাড়ীতে যে রাধাশ্যাম বিগ্রহ আছেন, তালুক তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত।

এ ছাড়া ইঁহাদের নগদ টাকাও কিছু আছে। তাহা ব্যবসায়ে খাটিয়া থাকে। তাহাতে বৎসরে যে আয় হয়, তাহা ভূসম্পত্তির আয়ের প্রায় সমান। তাই বলিয়াছি, ভবতারণ ঘোষ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। পল্লীগ্রামে ইহাকে সমৃদ্ধিও বলা যাইতে পারে। সেখানে বার্ষিক সহস্র মুদ্রা আয় থাকা সামান্য কথা নহে।

সমগ্র বাজিৎপুরে এই ঘোষপরিবারই একমাত্র সম্ভ্রান্ত বংশ। সম্পত্তিশালী এবং সৎকর্ম্মান্বিত বলিয়া বহু দিন হইতে ইঁহাদের খ্যাতি। ভবতারণের পিতামহ যদুপতি ঘোষবংশের প্রসিদ্ধি অনেক বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্যামাচরণ ঘোষ।

ভবতারণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্যামাচরণ। কনিষ্ঠ শরচ্চন্দ্র। কন্যা সুরবালা সকলের ছোট। আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিলাম, তখন শ্যামাচরণের বয়স ত্রিশ হইয়াছে। শরতের বিশ বৎসর হইবে। সুরবালা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

শ্যামাচরণ সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। চাকরির চেষ্টা কখনও করেন

সদর কাছারী। সুন্নগর বাজিৎপুর হইতে চারি ক্রোশ মাত্র দূর। শ্যামাচরণের যেন কর্ম্মস্থল সুন্নগরে। সচরাচর তিনি সেথানেই অবস্থিতি করেন। প্রয়োজন হইলে বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। সাধারণতঃ তিনি সপ্তাহে একবার প্রায়ই বাড়ী যান। তবে তজ্জন্য তাঁহাকে রবিবার খুঁজিতে হয় না। আর অন্য দিনে বাড়ী যাইতে হইলেও অবশ্য কাহারও অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই।

শ্যামাচরণের কাছারীবাড়ী অনেকের বাড়ী অপেক্ষা ভাল। সুন্নগরে ইহাদের খামার জমি অনেক। তাহাতে ধান্য প্রচুর জন্মিয়া থাকে। রাই সরিষা, মুগমটর প্রভৃতি অন্যান্য শস্যেরও অভাব নাই। এ ছাড়া কাছারীর সংলগ্ন ভূমিতে দু তিনটি বড় বাগান। তাহাতে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি ফলের গাছ অনেক; আর হরিদ্রা, আর্দ্রক আদি ক্ষুদ্র দ্রব্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাউ, বেগুণ, কুমড়ো এবং অন্যান্য শাক শব্জি বাঙ্গালার কোথায় না জন্মে? এ ত গেল ভূমিজ সামগ্রীর কথা। পুকুরের মাছ এবং গরুর দুধ শ্যামাচরণের কাছারীতে যথেষ্ট। সময়ে সময়ে তিনি দুগ্ধ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ঘৃত সর্ব্বদাই যাইয়া থাকে।

সকাল বেলায় মুখ হাত ধুইয়া শ্যামাচরণ কাছারীর বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটি অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। একের বয়স সাঁইত্রিশ আট্‌ত্রিশ, এবং অপরের প্রায় পঞ্চাশ হইবে। শেষোক্ত ব্যক্তি এক কঠোর দৃষ্টিতে যেন শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া লইল। প্রথম লোকটি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখাইল, সে যেন কোন আশ্রয়স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

শ্যামাচরণের নিকটস্থ হইলে তাহারা উভয়েই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি "একবারে খোদ কর্ত্তাকে পাইয়াছি!" বলিয়া একখানি কাগজ শ্যামাচরণের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া কাতরভাবে কহিল, "এই মুসাবিদাটা দেখিয়া দিবেন?"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "আজ্ঞে এই দেবীপুর থেকে। আমাদের গ্রাম কর্ত্তার বাড়ী যাবার রাস্তায় পড়ে। এক দিন বৃষ্টি হওয়াতে কর্ত্তা ঘোড়া শুদ্ধ আমাদের গোয়ালঘরে দাঁড়িয়েছিলেন পর্য্যন্ত।"

এই "পর্য্যন্তে"র অর্থ এই যে, আমরা আপনার একরূপ পরিচিত।

পাঠক এইরূপ কাগজ-হস্ত দুইটি অপরিচিত লোকের আগমনে এবং ...

পেক্ষা তাহাদের এইরূপ পরিচয়প্রদানে, কি মনে করিতেন, জানি না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাহাদিগকে "বস" ভিন্ন অন্য কোনও কথা না বলিয়া মনোযোগসহকারে সেই কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাহাদের পরামর্শদাতা উকিল নহেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে এমন কাজ অনেকেই সন্তোষের সহিত করিয়া দিয়া থাকেন। সেখানে যদি তোমার লেখাপড়া জানা খ্যাতি থাকে, মধ্যে মধ্যে অজ্ঞ লোকেরা আসিয়া এইরূপ বিরক্ত করিবে, "মহাশয়, এই কবলার খসড়াটা দেখে দিন্ না।" "এই রসিদ্‌টা ঠিক্ হয়েছে কি না, দেখুন্‌ত!" "এ দলিলে ইসটাম্ (বা ইষ্টাম্বর) কত নাগ্‌বে বলে দিন্ ত।" যদি তুমি দয়া করিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূরণ কর, প্রায়ই এইরূপ লোক দু একটি দেখা দিবে; আর যদি রুক্ষস্বরে কয়েক ব্যক্তিকে তাড়াইয়া দাও, আর কেহ ঘেঁসিবে না। শ্যামাচরণ প্রথম প্রকারের লোক ছিলেন।

কাগজখানি দেখা শেষ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্ত্তিক কার নাম?"

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমার।" শ্যামাচরণ কহিলেন, "গোপাল গোবিন্দ গুরুচরণ তিন ভাই এরা তোমাকে ১২⁄ বিঘা জমি বিক্রী কচ্ছে?"

কা। আজ্ঞে হাঁ।

অপর ব্যক্তি কহিল, "গোপাল আমার নাম। গোবিন্দ গুরুচরণ আমারই দু ভাই।" গোপালের চক্ষু দিয়া এই সময়ে এক ফোঁটা জল পড়িল। শ্যামাচরণ তাহা দেখিতে পাইলেন। তাহাদের আগমনসময় হইতেই কার্ত্তিক অপেক্ষা গোপালের প্রতি শ্যামাচরণের সমধিক প্রীতি জন্মিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অন্তঃকরণে একরূপ ধারণা হইয়া যায়; এই ধারণা হয় অনুকূল, না হয় প্রতিকূল। আগন্তুকদিগের আকৃতিগত পার্থক্যে শ্যামাচরণের মনে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে প্রতিকূল আর গোপালের সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা হইয়াছিল। তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি যে প্রভেদ দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এ জমি বেচিতেছ কেন?"

গোপাল কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিক আরম্ভ করিল,—"আমি বল্‌ছি শুনুন। ও বল্‌তে গেলে ছ মাস লাগবে। গোবর্দ্ধন দাস নামে এক গুরুমহাশয় আমাদের গাঁয়ে পাঠশালা করিত। গোপালের বাড়ীতেই তার

হইবে। গ্রামে তার নামে আর গোবর্দ্ধনের নামে কলঙ্ক রটিল। আমাদের নমঃশূদ্রজাতির মোড়ল যারা, তারা গোপালদের জেতে ঠেলে রাখতে চাইলে। তখন আমিই তাদের পাঁচ কথা বুঝিয়ে বল্লুম—জিজ্ঞেস করুন গোপালকে সত্য কি মিথ্যে—তারা বল্লে গোবর্দ্ধনকে তাড়িয়ে দিলে আর সমাজে একটি ভোজ দিলে আর আমাদের কথা নাই। ওঁরা গোবর্দ্ধনকে তাড়ান। শেষ দিনে দু একটি যণ্ডা জুটে গুরুমহাশয়কে কিছু দক্ষিণাও দিয়াছিল—তাতেই তার রাগ। সে লেখা পড়া জানে—আইন আদালত বোঝে—এক মাস না যেতে যেতেই এক জাল দলিল করে রেজেষ্টারি করিয়ে বস্‌ল। যেন গোপালেরা তাকে সবটুকু জমি জমা বিক্রী করেছে। ওরা কিছুই জানে না, কিন্তু আবাদের সময় গোবর্দ্ধন এল জমি দখল করতে। গোপাল অজ্ঞান। আমিই ওকে বল বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে গেলুম রেজেষ্টরি আপিসে, জিজ্ঞাসা করুন সত্য কি মিথ্যে—গিয়ে দেখি দলিল রেজেষ্টরি করিয়েছে—ওদের তিন ভাইয়ের নামে। —একবারে গেলুম ওকে নিয়ে হাকিমের কাছারী। সেখানে ওকে দিয়ে করালুম গোবর্দ্ধনের নামে ফৌজদারী। তার পর সেই মোকদ্দামার যোগাড়। ওরা ত সবই বুঝে। যা কিছু সবই আমি কল্লুম। ওরা মাত্র উপলক্ষি। টাকা কড়ি খরচপত্র তাও আমি দিলাম—সবই কেবল ওদের তিনটি ভাইয়ের মুখ চেয়ে—ভগবান তুমি জান্‌বে যার যেমন মন—শেষে বাড়ী আর হাকিমের কাছারী কর্ত্তে কর্ত্তে আমার পায়ের জুতা গেছে! জিজ্ঞেস করুন্ সত্যি কি মিথ্যে। গোবর্দ্ধনের দুই বৎসর কয়েদ হয়ে গেছে, আর সেই খরচার টাকার জন্যে এই দলিল।”

শ্যামাচরণ সমস্ত শুনিয়া গোপালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

গোপাল এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে হাঁ, খরচের টাকা আমরা যত পেরেছি ঘর থেকে দিয়েছি। বাকি উনি দিয়েছেন। আর মোকদ্দমার যোগাড় যাগাড় সে সব উনিই করেছেন।”

শ্যামাচরণ কহিলেন, “একটা ফৌজদারি মোকদ্দমায় এত খরচ?”

কা। আসামী হাজির হয় নাই অনেক কাল। সমন ওয়ারিন্, মাল ক্রোক ইস্তাহার এ সব কর্ত্তে হয়েছে। তার পর সবরেজিষ্ট্রার বাবু আর অন্য সব সাক্ষীর খরচা বারবরদারি এই সব, এতে অনেক পড়ে গেছে। তবু আমি যত কমে পারি, সেরেছি। এই দেখুন না কেন খরচের ফর্দ্দ। ওরা যা দেছে, তাও

গোপালকে আপনার এখানে আস্‌তে আস্‌তে যে, এখানেই যাও, আর যেখানেই যাও, কার্ত্তিকের কাজ কাঁচা পাবে না। আর দলিল দেখান, তা আর দেখাতে হবে কেন? আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার ঐ সব কর্ম্মে কর্ম্মে চুল পেকে গেল। বলিনি ওকে যে, দলিল দেখিয়ে কি হবে? একবার লেখাপড়া করে নে চল সবরেজেষ্টরি আপিসে; রেজিষ্টার বাবু যদি বলে কোন দোষ হয়েছে, তা' হলে কাগজের দাম আমি দিব।

এতক্ষণে কার্ত্তিক তাহার হিসাবের ফর্দ্দটি শ্যামাচরণের হাতে দিল।

শ্যামাচরণ তাহার শেষ কথার উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, দলিল ঠিক লেখা হয়েছে।"

গোপাল কহিল, "ধান জমিটি সব উনি নেবেন। আর বাড়ীটি আমাদের থাক্‌বে। ঐ ১২/ বিঘাই আমাদের মোট জমি। ১০/ বিঘা ধান জমি, আর দু বিঘা বাড়ী।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "কই, তা এতে লেখা নাই।"

কা। তা ওতে থাক্‌বে কেন? আপনি কিছু না বুঝিবেন, এমন নয়। ১২/ বিঘা জমি এক জমার ভিতর। এ খণ্ড করে নিতে গেলে গোল হবে। তাই বল্‌ছি, সবটা লিখে নিয়ে বাড়ীর জমিটার আলাহিদা পাট্টা করে দিব। তাও কিছু বেশী বলি নাই। পাঁচটি টাকা খাজনা চেয়েছি। গোপালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ওহে বাপু, এই একটি কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? খত নাই, পত্র নাই, যখন ঘর থেকে দেড় শত টাকা ক্রমে ক্রমে তোমার জন্যে বার করে দি—তখন ত বিশ্বাস ছিল। কলির ধরণই এই। সবই ত নিয়েছিল গোবর্দ্ধন, ভগবান তুমি জেনো—পরের মন্দতে কোন দিনই আমি যাই নাই, সে মতি গতিও যেন না হয়।" গোপাল কোন উত্তর দিতে পারিল না।

শ্যামাচরণ কহিলেন, "মোট বার বিঘার খাজনা ৯৲ ন' টাকা ত?" গোপাল কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, পৈতৃক জমা—অনেক কালের, তাই এত কম দর।" এতক্ষণে শ্যামাচরণের হিসাবটি দেখা হইয়াছে। তিনি কহিলেন, "ওহে বাপু, এ দেড় শ' টাকার মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি অর্দ্ধেক আন্দাজ ঘুস্।"

কা। আজ্ঞে বলেন কি, ঘুসের বাজার যে চড়েছে। কোম্পানি সব আমলাদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছে; ভাব্‌ছে ঘুস্ কমে যাবে। এ দিকে হচ্ছে উল্‌টো। সেকালে যার মাইনে ছিল ১০৲ টাকা, তাকে চারি গণ্ডা পয়সা ঘুস দেওয়া চল্‌ত। এখন তার মাইনে হয়েছে ত্রিশ টাকা। কাজেই একটা টাকার কম

তার সাম্‌নে ধরা যায় না। তিন কুড়ির কাছাকাছি বয়স হবে আমার। একাল সেকাল সব দেখেছি।

শ্যামাচরণ "তা বটে" ভিন্ন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। ফলতঃ সমস্ত শুনিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, গোপাল বিনা দোষে সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। কাল সে বার বিঘা জমির মালিক্ ছিল, আজ মাত্র দু' বিঘা জমি লইয়া এক জনের কোর্‌ফা হইয়া থাকিবে। তাহার দোষ কি? প্রতারক প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, তাহাই প্রমাণ করিতে সে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়। যে সম্পত্তি উদ্ধারের নিমিত্ত বিচার-প্রার্থনা, বিচারব্যয়ে এখন তাহাই বিক্রীত হইয়া যায়। বিচার এত মহার্ঘ কেন? বিচারদ্বার সকলের পক্ষে সুগম নহে কেন? গোপাল যে কার্ত্তিকের ন্যায় রক্ত-শোষকের আশ্রয় লইয়াছিল, সে কেবল বিচার পাইবার নিমিত্ত। কার্ত্তিক তখন উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক অপকার করিতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্যামাচরণ কার্ত্তিকের হিসাব বিশ্বাস করেন নাই। গোপালের ন্যায় অজ্ঞ কৃষক ভিন্ন কেহই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

শ্যামাচরণ সহসা কহিয়া উঠিলেন, "গোপাল, তোমাদের এ টাকা শোধ কর্‌বার কোনই উপায় নাই?"

গো। আজ্ঞে, কিস্তিবন্দী করে নিলে দিতে পারি। উনি শুদ যা চান, তাই দিতে রাজি আছি। তিনটি ভাই আমরা—সকলেই খাট্‌তে পারি।

শ্যামাচরণ কার্ত্তিককে কহিলেন, "তাই নাও না?"

কা। সে হবে না। আমি নারাজ ছিলাম না। কিন্তু ছেলের মত হয় না। আজ কাল সব সেই করে।

শ্যা। তুমি বুঝিয়ে বল্লে হতে পারে। শুদ পাচ্ছ ত।

কা। আজ্ঞে সে হবে না। তার এক কথা,—হয় টাকা দিক্, না হয় জমি দিক্।

গোপালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কিহে বাপু, উঠ্‌বে!"

এই সময়ে গোপালের কাতর নয়ন শ্যামাচরণের চক্ষুর উপর স্থাপিত। যেন নীরবে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

গোপালের আজ সুপ্রভাত যে, সে বরাবর রেজেষ্টরি আপিসে না যাইয়া শ্যামাচরণের কাছারীর কাছে আসিয়া থামিয়াছিল, এবং একরূপ জোর করি-

গোপালের নীরব প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না।

শ্যামাচরণ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমাদের একজন হালুয়ার দরকার না?"

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে হাঁ।

শ্যা। একজন হালুয়ার মাইনে কত?

কর্ম্মচারী। আড়াই টাকা, তিন টাকা, এই রকম। বার মাস রাখ্‌তে গেলে কম হয়। অল্প দিন হইলে বেশী হয়।

শ্যা। ধর ২৷৷০ টাকা। তা হলে বছরে হল ৩০৲ ত্রিশ টাকা। এ দিকে হচ্ছে ১৫০৲ টাকা। তিন পাঁচে পনের। দেখ গোপাল, তুমি কি তোমার এক ভাই যদি পাঁচ বছর আমার কাজ করে দাও, তা হলে কার্ত্তিকের টাকা আমি দিয়ে দিতে পারি।

গোপাল কহিল, "আজ্ঞে আমরা তিন ভাই সারা জীবন খেটে দিব।" আর কি বলিবে, গোপাল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা তাহার মুখে উছলিয়া পড়িতেছিল।

কার্ত্তিকের ভাব অন্যবিধ। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন চারি দিকে উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া থাকে, সে তাহাই করিতেছিল। তথায় মানুষ আছে বলিয়া মনে ছিল না। শ্যামাচরণ যখন গৃহাভ্যন্তর হইতে দেড় শত টাকা আনিয়া তাহাকে গণিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "এই তোমার টাকা", তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। কোন অপরিচিত স্থানে পরিচিত লোকের দর্শন পাইবার আশায় গমন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ না পাইলে মনে যে চাঞ্চল্য জন্মে, ক্ষুৎ-পিপাসাক্রান্ত পথিক নিশাসমাগমে গৃহস্থের আলয়ে আসিয়া "এখানে থাকিবার স্থান হবে না" শুনিলে অন্তঃকরণে যে কষ্ট অনুভব করে, অ-মুরুব্বী অন্নহীন অথচ উপযুক্ত উমেদার, বিত্তবান বড়লোক-সহায় কিন্তু অনুপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে মনে মনে যেমন রুষ্ট হয়, কার্ত্তিক সে সময়ে তদপেক্ষা অনেক অধিক রোষ, কষ্ট এবং চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল। সম্মুখে টাকা দেখিয়াই সে কহিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, ওর সঙ্গে আমার আরও দেনা পাওনা আছে।"

শ্যামাচরণ গোপালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

গোপাল কহিল, "আজ্ঞে, আর এক পয়সাও না। বয়সে কারও এক কড়া কড়ি ধার করি নাই। এ বার এই গ্রহের ফের—যা এই মোকদ্দমাতে—"

কা। শতের দিন ধরে যে মোক্তার খুঁজে দিলুম, উকিল ধরে দিলুম, তার কি কিছু পাব না?

শ্যা। সে ত তুমি ছেড়েই দিয়েছ।

কা। ছেড়ে দিয়েছিলাম জমি দিচ্ছিল বলে। তা যখন দিলে না, ছাড়ব কেন?

গো। তা বলে আমি দেব পাঁচ টাকা।

শ্যা। তুমি ত নিজেই দেড় শ' টাকা বলেছ?

কা। আমার ছেলেকে না জিজ্ঞেস করে টাকা নিতে পার্ব্ব না।

শ্যা। এই না বলছিলে তোমার ছেলেই বলেছে টাকা নিতে?

বস্তুতঃ যে কার্ত্তিক প্রথম হইতে খুব পাকা লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এখন সেই ঠিক যেন পাগলের মত যা ইচ্ছা তাই আপত্তি তুলিতে লাগিল। সমগ্র দেবীপুরে কার্ত্তিকই একমাত্র লেখাপড়াজানা চণ্ডাল। তাহার জীবনের কার্য্য অপরের মাম্‌লা মোকদ্দমার যোগাড় করা এবং তাহা হইতে আপন স্বার্থ সাধিয়া যাওয়া। গ্রামের কোন মোকদ্দমা হইলে কার্ত্তিকের পোহা-বারো। সে যখন শ্যামাচরণের কাছারীতে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার আশার একবারে মূলোচ্ছেদ হইবে। সে জানিত, হয় তাহার হিসাবে দোষ বাহির হইবে, না হয়, কার্ত্তিকের বাড়ীর জমিটার পাট্টা এক সঙ্গে করিয়া দিতে বলিবে। তাহার মনের দোষ এবং দুর্ব্বলতা এই দুই স্থানেই ছিল। খরচের হিসাবে বিস্তর মিথ্যা কথা লেখা ছিল। আর বাড়ীটির খাজনা এখন বলিতেছিল পাঁচ টাকা, মনে মনে ভাবিয়াছিল, একবার কবালাটা হয়ে গেলে হয়। শেষে এক জনকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিব, কি করি গোপাল, আমি ত পাঁচ টাকায় দিতে রাজি ছিলাম, কিন্তু ছেলে ছাড়ে না। তোমরা উঠে গেলে, অন্য লোকে ৮৲ টাকা দিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ এখনকার হিসাবে সে দু বিঘা জমির খাজনা আট টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে কার্ত্তিকের সপক্ষে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জমিটা দিয়া আর পঞ্চাশটি টাকা নগদ চাহিলেও সে তাহা দিতে রাজি হইত। জমিটিই তাহার লক্ষ্য। এই মন্ত্র ধরিয়াই সে এ ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। সে মন্ত্র একবারে নিষ্ফল হইবে, ইহা সে কখনও ভাবে নাই। তাই তাহার এখন ইহা ভাবিতে এত কষ্ট হইল। জীবনে সে এমন করিয়া কত লোকের জমি অল্প-মূল্যে বা বিনা মূল্যে হস্তগত করিয়াছে। এরূপ মনস্তাপ এই তাহার প্রথম।

কার্ত্তিকের কোন আপত্তিই টিকিল না। অগত্যা তাহাকে দেড় শত টাকা লইয়া রীতিমত একটি রসিদ লিখিয়া দিতে হইল। তখন বেলা হইয়া গিয়াছে, শ্যামাচরণ দু জনকেই কহিলেন, "এখানে স্নান করে ছুটি খেয়ে যাও।"

কার্ত্তিক কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, বাড়ী যেতে হবে।" গোপালের আপত্তি করিতে মন সরিল না। সে কহিল, "আমি ছুটি প্রসাদ পেয়েই যাব।"

যাইবার সময়ে কার্ত্তিক গোপালের দিকে এক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টি প্রসন্ন নহে। তাহার অর্থ এই যে, থাক, আজ যাহা করিলে, ইহা যেন মনে থাকে।

আহারান্তে গোপাল বাড়ী গেল। পরদিন প্রভাতে তাহারা তিন ভাই আসিয়া উপস্থিত। শ্যামাচরণ কহিলেন, "গোবিন্দ থাকুক। পাঁচ বৎসর থাকিবে বলিয়া ঐ একটা দলিল লিখিয়া দিক্।"

গোবিন্দ রহিল। যাইবার সময়ে গোপাল কহিয়া গেল, "আজ্ঞে গোপাল গুরুচরণও আপনারই। যখন বলিবেন, তখনই হাজির পাইবেন।"

বাড়ীতে পূর্ব্ব রাত্রিতে "যদু ঘোষের কাছারীতে আমি থাকিব, আমি থাকিব" বলিয়া, তাহারা তিন ভাই পরস্পর কলহ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীবাসের আঙ্গিনা।

(১)

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উঠিয়াছে কীর্ত্তনের রোল ;
খোল, শিঙ্গা, করতাল, নানাভঙ্গে বাজনার বোল।
ধূলা মাখি' ধূসরিত-কায়
কেহ কাঁদে, কেহ নাচে গায়,
কেহ বা বরষে নীর প্রেম-রসে হরষে বিভোল।

(২)

মাঝখানে দাঁড়াইয়া নাচে গোরা নদীয়ার শশী ;
রূপে ঢল ঢল তনু প্রীতিভরে উঠিছে উল্লসি'।
প্রভুরে পাইয়া নিজ ঘরে,
পুলকিত দিব্য কলেবরে,

(৩)

সহসা ক্রন্দন-রব পশে আসি' শ্রীবাসের কানে ;
শ্রীবাস চকিত-গতি ধেয়ে যায় অন্তঃপুর পানে।
হেরে, নিমীলিয়া দু'টি আঁখি
মা'র কোলে মাথাখানি রাখি'
শিশু তা'র সুকুমার শুয়ে আছে অন্তিম-শয়ানে।

(৪)

শ্রীবাসে হেরিয়া তবে অসম্বিৎ পুরনারীগণ
উন্মত্তা ছুটিয়া আসে ফুকারিয়া করিয়া রোদন।
শ্রীবাস সভয়-চিতে কয়,—
"সর্ব্বনাশ বুঝি এবে হয়!
চুপ! চুপ! আঙ্গিনায় প্রভু মোর করিছে কীর্ত্তন।

(৫)

"প্রেম-অবতার গোরা, প্রেম বিনা আন্ নাহি জানে ;
শুনিলে এ হাহাকার প্রেমধারা শুকা'বে বয়ানে।
উৎসব ভাঙ্গিয়া যদি যায়,
গোরা মোর ব্যথা পাবে তায় ;—
পুত্রশোকাধিক শোক বাজিবে রে শ্রীবাসের প্রাণে।"

(৬)

শ্রীবাসের কথা শুনি' পুরনারী পাষাণে বাঁধিয়া
উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ প্রাণপণে রাখিল চাপিয়া।
মুহূর্ত্তে মুছিয়া আঁখি-ধার,
সঙ্কীর্ত্তনে মিশি' আর বার,
শ্রীবাস উৎসাহে নাচে প্রেমভরে প্রভুরে ঘেরিয়া।

(৭)

ক্রমে সে বিপদ-কথা ভক্ত সব শুনিবারে পায় ;
অমনি মলিনমুখে শ্রীবাসের মুখপানে চায়।
শ্রীবাস দু' বাহু উভ করি'
নাচে, আর বলে, 'হরি হরি' ;—
আননে অপূর্ব্ব শোভা ; বিষাদের লেশ নাহি তায়।

(৮)

বলে ভক্ত, "ধন্য গোরা! ধন্য তব মহিমা অপার!
কি শিক্ষা জীবের চক্ষে তুমি আজ করিলে প্রচার!
ধন্য হে শ্রীবাস মোর ভাই!
মরি তব লইয়া বালাই!
জন্ম-জন্মান্তরে যেন যোগ্য হই চরণ-ধূলার।"

(৯)

অকস্মাৎ নৃত্য ত্যজি' বলে গোরা শ্রীবাসেরে চাই,—
"হে পণ্ডিত! কেন আজি সঙ্কীর্ত্তনে সুখ নাহি পাই?

কেন মোর অন্তর-আগার
কাঁপিবারে চাহে বার বার?
বিপদ ত নহে কিছু? বল দেখি, তোমারে সুধাই।"

(১০)

শ্রীবাস হাসিয়া কয়,—"হে ঠাকুর! তুমি মোর ঘরে;
যাউক বিপদ আর, ভৃত্য তব যমে নাহি ডরে!
কিন্তু,—কিন্তু,—আজি একবার
ওই দু'টি শ্রীপদ তোমার
দাও দেখি সুশীতল, ধরি আমি এ হৃদয় 'পরে।"

(১১)

সহসা মূর্চ্ছিত হ'য়ে, ছিন্নমূল তরুর মতন,
শ্রীবাস ভূমেতে পড়ি' লভে দু'টি রাতুল চরণ।
পুত্রশোক সমাচার তবে
নিমাইরে শুনাইল সবে;—
নিমাই বিস্মিত অতি নীরবেতে মুছিলা নয়ন।

(১২)

ধূলার সে আঙ্গিনায়, ধূলিময় আসনে বসিয়া,
প্রভু মোর শ্রীবাসেরে নিজ কোলে লইলা তুলিয়া।
"ধন্য হে শ্রীবাস," প্রভু কয়,—
"কৃষ্ণেরে করিলে আজি ক্রয়,
ভক্তির উজ্জ্বল দীপ চিরদিন রাখিলে জ্বালিয়া।"

(১৩)

পরশে চেতনা লভি' শ্রীবাস প্রভুরে চাহি' বলে,—
"ধন্য শিশু পুত্র মোর! বড় কীর্ত্তি রাখিল ভূতলে।
আজ মোরে দেহ এই বর,
অমনি ত্যজিয়া কলেবর
তোমার সম্মুখে যেন নিত্যধাম ব্রজে যাই চ'লে।"

(১৪)

রাঙা হাতখানি প্রভু বুলাইলা শ্রীবাসের শিরে;
চরণের ধূলি ল'য়ে শ্রীবাস উঠিল ধীরে ধীরে।
দুইটি লোচনে দু'টি ধার
ঝরিতে লাগিল অনিবার;—
এই কাঁদে, এই মুছে, পুন ভাসে উচ্ছ্বসিত নীরে।

(১৫)

তখন সজল-আঁখি শ্রীবাসেরে কহিলা নিমাই,—
"হে পণ্ডিত! হেন শক্তি নাহি মোর তোমারে বুঝাই।
একমাত্র প্রাণের পুতলী
অকালে ছাড়িয়া গেল চলি';
আজি হ'তে লহ তুমি দু'টি পুত্র,—গৌর নিতাই।"

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

একটি কবিতা।

যে দেশের ইতিহাস নাই, যে দেশের লোক ইতিহাস ভাল বাসে না, সেই দেশের পাঠকদিগকে আমরা একটি কবিতার ইতিহাস উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

টমাস হুডের Song of the Shirt ইংরাজী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ কবিতা; আমরা কোনও ইংরাজী পত্র হইতে সেই কবিতার ইতিহাস প্রদান করিলাম। কবিতাটি প্রথমে

মূল।

প্রসিদ্ধ "পঞ্চ" পত্রে প্রকাশিত হয়। সে সময় উহার আদর অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। অনাহারে মৃতপ্রায় একটি শিশু ক্রোড়ে একটি রমণী একবার ল্যাম্বেথ পুলিস আদালতে তাহার প্রভুর জিনিস বন্ধক রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। তাহাকে দুই পাউণ্ড জামিন দিতে হইয়াছিল। কোন দৈব দুর্ঘটনায় বিধবা হইয়া, সে সূচীকার্য্য করিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার ও দুইটি সন্তানের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সে সপ্তাহে সাত শিলিং পাইত। এই ঘটনার উপর বিলাতের প্রধান পত্র টাইম্‌সে একটি তীব্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হুড স্বভাবতঃ গম্ভীর ও সহানুভূতিময় ছিলেন—এই ঘটনায় তিনিও বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

হুড আপনি বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য হাস্যরসপ্রধান রচনায় ব্যাপৃত হইতেন। সুরসিক হইলেও তিনি যখন কেনও গম্ভীরভাবপূর্ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন,

কবিতা।

তখন তিনি যেমন আপনার অবলম্বিত ব্যবসায়ের গাম্ভীর্য্য এবং স্বীয় শক্তি ও প্রভাব অনুভব করিতেন, তেমন আর কখনও নহে। সূচীকার্য্যরতাগণ প্রত্যেক শার্ট শেলাই করিয়া পাঁচ ফার্দিং পাইত—আবার সূচ তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইতে হইত। এই ব্যাপার অবগত হইয়া হুড তাঁহার Song of the Shirt রচনা করেন। পঞ্চে কবিতাটি পাঠাইবার সময় হুড সেই সঙ্গে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, হয় ত ইহা পঞ্চে প্রকাশোপযোগী নহে—তবে ইহা প্রকাশ করা না করা বিচারকের হাত। ইতিপূর্ব্বেই ইহা তিনটি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন তিনি ইহার জন্য জ্বালাতন হইয়াছেন। মার্কলেমন যখন ইহা পড়িলেন, তখন আফিসের অধিকাংশ লোকেই বলিল যে, হাস্যরসাত্মক সংবাদপত্রে এ কবিতার স্থান হইবে না। কিন্তু লেমন বিচলিত হইলেন না। ক্রিস্‌মাস্ সংখ্যায় গম্ভীর ভাবের, করুণরসাত্মক, দয়া ও প্রেমপূর্ণ কোনও রচনা প্রকাশিত হইলে নিতান্ত বেমানান হইবে না বলিয়া, তিনি উহা প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এত করিয়া তবে সে সময় Song of the Shirt পঞ্চে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবিতাটা প্রকাশিত হইলে তাহার বিস্ময়কর প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। টাইম্‌স প্রভৃতি প্রায় সকল সংবাদপত্রই পঞ্চ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিল। দেশের সর্ব্বাংশে সকলে কেবল ঐ

প্রকাশের পর।

কবিতার কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। কার্লাইল বলিয়াছেন যে, রাস্‌কিনের সত্য সকল বাণবৎ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে; এ কবিতাও সেইরূপ ইংরাজের দয়াপূর্ণ, সহানুভূতিপ্রবণ হৃদয় বিদ্ধ করিল। ইহার রচয়িতা

সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে ডিকেন্সই প্রথমে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন যে, জর্জ্জ ইলিয়ট রমণী, সেই ডিকেন্সই প্রথমেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হুডই এই কবিতার লেখক। হুড যে এই কবিতার লেখক, তাহার প্রমাণ থাকা হুডের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। কারণ শুনিলে অবাক হইতে হয় যে, অনেকে আপনাকে ইহার রচয়িতা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

এই কবিতা প্রকাশ করিয়া পঞ্চের গ্রাহক-সংখ্যা তিন গুণ হইয়া দাঁড়াইল। কবির যশের ত কথাই নাই। কিন্তু ইহাতে শ্রীমতী হুডের যত আনন্দ হইয়াছিল, তত আর কাহারও হয় নাই। কবিপত্নীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নির্ব্বোধ সম্পাদকগণ বারবার এই কবিতা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেও, কবির পত্নীর স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, ইহা অতি সুন্দর কবিতা—ইহা তাঁহার পতির রচনা সকলের মধ্যে একটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

শ্রীমতী হুড।

পবনসহায় হুতাশনের মত এই কবিতা চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীর নিকট হইতে ইহা যেরূপ অসাধারণ অভ্যর্থনা পাইয়াছিল—সেরূপ অভ্যর্থনালাভ অতি অল্প কবিতারই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। যুরোপের সকল ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছিল। স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, রুমালের উপরেও মুদ্রিত হইয়াছিল। আমাদিগের দেশে বোধ হয় একবার এরূপ হুজুগ দেখা গিয়াছিল,—যখন বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ কাপড়ের পাড়ে গান বুনিয়াছিল "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"। হুডের কবিতার অনেক প্রকার চিত্র চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করাই দুর্ঘট। তাহার পর যখন ইহা প্রকাশিত হইবার পর এক সপ্তাহ না যাইতেই একটা সহজ সুরে এই কবিতা গাহিতে গাহিতে এক দরিদ্রা ভিখারিণী রাস্তা দিয়া আসিতেছিল—তখন হুড আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

জীবনচরিত।

আয়ান ম্যাক্লারেন।

আয়ান ম্যাক্লারেন আখ্যাধারী রেভারেণ্ড জন ওয়াট্সন বর্ত্তমান সময়ের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে অন্যতম। ইংরাজী সাহিত্যামোদীর নিকট The Bonnie Brier Bush লেখকের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। সম্প্রতি সন্ডে ম্যাগাজিন পত্রে তাঁহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, আয়ান ম্যাক্লারেন আদৌ স্কচম্যান নহেন। তিনি এসেক্সে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তিনি উত্তর প্রদেশের লোকও নহেন। তবে তিনি পার্থ, ষ্টারলিং ও এডিনবরায় বিদ্যালাভ করেন। ইনি প্রথমে লোগিয়ালমণ্ড নামক স্থানে যাজকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাই Drumtochlyর মূল। সেখানে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণপ্রদেশে আসিয়াছেন। তাহার পর সেদিন ডাক্তার রবার্ট নিকলের অনুরোধে তিনি আপনার পূর্ব্বস্মৃতি সকল পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন; সে পুস্তক এখন জগদ্বিখ্যাত।

জন্মকথা।

মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা বড়ই অল্প; কেবল এখানে ওখানে এক আধখানা প্রসিদ্ধ নভেল।

মতামত। স্কট ও থ্যাকারেই তাঁহার অধিক প্রিয়, তাহার পর মেরিডিথ ও ষ্টিভেন্‌সন। তাঁহার মতে ব্যারি ও ষ্টিভেন্‌সন স্কটের রাজত্ব ভাগ করিয়া লইয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর স্কট ও থ্যাকারের অনেক পুস্তক পাঠ করেন। তিনি বলেন, ইংরাজী ভাষায় থ্যাকারের Esmond এর মত উপন্যাস আর নাই। তাঁহার মতে স্কটের যশ চিরদিনই থাকিবে; বোধ হয়, থ্যাকারেরও থাকিবে।

স্কট ও থ্যাকারে সাহিত্যস্রোতের মধ্যভাগে, তাঁহাদিগকে ভূমিতে আনা যায় না। নিদাঘের সূর্য্যালোকোদ্ভাষিত অপরাহ্নে কোন তরুতলে কোন আবর্ত্ত আছে, তাহা তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা কুসংস্কারশূন্য ভাবে মোটামুটি মানবোচিতভাবে মানবজীবনের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত। উপন্যাসে তাহাই করা উচিত। দীর্ঘকালস্থায়ী উপন্যাস রচনা করিতে হইলে মানবহৃদয়ের গুটিকতক প্রবলবৃত্তির বিষয় আলোচনা করাই সঙ্গত। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ সকল কিছু দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা সাহিত্যস্রোতের মধ্যভাগে যাইতে পারে না।

গৃহসজ্জা। কক্ষের এক পার্শ্ব ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকে পূর্ণ—বাইবেল প্রভৃতির গাদা। তিনি ল্যাটিন ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা গ্রীক ধর্ম্মতত্ত্বেরই অধিক অনুসরণ করেন। কক্ষপ্রাচীরে ছবির বড় স্থান নাই; যে কয়টি স্থান আছে, তাহা প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান শিল্পের অনুকরণেই পূর্ণ। এই সকল কথায় বোধ হয় যে, ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে। তিনি ধর্ম্মালোচনা ও উপন্যাসরচনা এক সঙ্গে উভয়ই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

চরিত্র। এখন আয়ান ম্যাক্‌লারেনের গ্রন্থস্থ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, তাঁহার পুস্তকান্তর্গত [illegible]ও চরিত্রই প্রকৃত চরিত্র হইতে গৃহীত নহে। কিন্তু গ্রন্থকার সে সকল সম্ভব সত্য চরিত্র বলিয়াই মনে করেন। বাস্তব চরিত্র হইতে আদর্শ লইয়া চরিত্র চিত্রিত করিলে তাহাতে সামান্য সামান্য-বিষয়ও বড় বাদ পড়ে না।

বিবিধ।

আইন-ব্যবসায়।

শিক্ষাবিস্তারের সহিত সকল ব্যবসায়ের দ্বারই প্রবেশার্থিপূর্ণ হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দশ সহস্রেরও অধিক কেরাণী কর্ম্মপ্রার্থী উমেদার রূপে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরিতেছে। কিরূপে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়, তাহা একটা অজ্ঞাত রহস্য। আমাদিগের দেশে ওকালতীতে যত ভিড় হইয়াছে, তত আর কোনও ব্যবসায়েই হয় নাই। বাণিজ্যে লোকের প্রবৃত্তি নাই, চাকরী দুষ্প্রাপ্য, কাজেই প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া দলে দলে উকিল আবির্ভূত হইতেছেন। আদালতে উকিলের সংখ্যা করা দুর্ঘট; একটা মক্কেল আসিলে রাশি রাশি উকিল ঝুঁকিয়া পড়েন। আদালতের মাঠে বৃক্ষচ্ছায়ায় এখন আর মক্কেল বিশ্রাম লাভ করিতে পায় না, সেখানেও উকিল! ইহা ভিন্ন ব্যারিষ্টার সম্প্রদায় আছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের লর্ড চিফ জষ্টিস্ আইন

আইন ব্যবসায়ের আজও বিশেষ আকর্ষণ আছে, এবং চিরকালই থাকিবে। আমেরিকার

ব্যবসায়। করনির্দ্ধারণসম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বাগ্মিবর বার্ক বলিয়াছিলেন যে, মানব বিজ্ঞানে আইন ব্যবসায়ের স্থান অতি উচ্চে, এবং উহা একটি মহৎ ব্যবসায়; ইহাতে বোধশক্তি যেরূপ তীক্ষ্ণ এবং সবল হয়, অন্য সকল বিদ্যালোচনা একত্র করিলে তত হয়। কিন্তু সকলেই ইহার উপযোগী নহে।

আইন ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যাঁহারা উপযুক্ত মানসিক

বৃত্তি। এবং চরিত্রগত গুণ লইয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা যশোলাভ করিতে পারেন। আইন ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য কি কি গুণ আবশ্যক? মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, যে যুবক বুদ্ধিমান, তুখড় ও বাক্‌পটু, সে যুবক আইন ব্যবসায়ের উপযুক্ত। কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে বড় ভ্রম হয়। বুদ্ধি থাকিলেই আইন ব্যবসায়ে সাফল্য হয় না; আবার বাকপটু হইলেও সাফল্য নিশ্চিত নহে। পক্ষান্তরে বাক্‌পটুতার সহিত কখন সক্ষমতার গোল হয়; জগতে অধিকাংশ লোকের বলিবার কিছু নাই; কিন্তু তাহারা বেশ গুছাইয়া সময় সময় বাগ্মীর মত বলিতে পারে। যাহার বলিবার কিছু থাকে, সে বলিবার ধারা বা ভাষার দৈন্য সত্ত্বেও ভাল করিয়া বলিতে পারিবে।

আইনব্যবসায়ের অনুপযোগী যত বুদ্ধিমান লোক ঐ ব্যবসায়ে বিপুল ক্ষমতা বৃথা নষ্ট করে, তত আর কোনও ব্যবসায়েই করে না। সংবাদপত্রসেবায়, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে

ভুল। সফলমনোরথ হইতে পারিতেন, এমন অনেক লোক আইনব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। আবার উপযুক্ত গুণশালী, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির ঐ ব্যবসায়ে সাফল্যের সুবিধা আসিবেই আসিবে। হয় ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহাতে ফল দর্শিবেই দর্শিবে। তবে এই ব্যবসায়ের জন্য কি কি আবশ্যক? প্রথমতঃ ব্যবসায়ের প্রতি টান চা[ই।] তাহার পর স্বাস্থ্য ভাল হওয়া চাই। স্বাস্থ্যবান আইন ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট ব্য[ক্তির]ই এ ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত। যাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, তাঁহার এ ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিতই নহে; আইন-ব্যবসায়িগণকে অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যাঁহা-দিগের স্বাস্থ্য ভাল নহে, এরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সাফল্য বা বিচারকার্য্যে দীর্ঘ-কালস্থায়িত্বের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। লেখকের দীর্ঘকালব্যাপিনী অভিজ্ঞতায় তিনি কেবল দুই জন লোকের কথা জানেন,—যাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল না হইলেও তাঁহারা যশোলাভ করিয়া-ছেন। কিন্তু সার জর্জ মেলিস্ ও লর্ড কেয়ার্নস্ উভয়েই অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর হইয়াও দুর্ব্বল স্বাস্থ্যবশতঃ অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যবসায়ের প্রতি টান ও স্বাস্থ্য, এই দুইটিই প্রথমে আবশ্যক।

এখন কথা, আইনব্যবসায়ে মানসিক কোন বৃত্তির প্রাধান্য আবশ্যক। এ কথার উত্তর—পরিষ্কার বুদ্ধি। কল্পনা, রসিকতা, চালাকি এবং ভাবপ্রকাশক্ষমতাও আবশ্যক; কিন্তু

মানসিক। সর্ব্বোপরি আবশ্যক পরিষ্কার বুদ্ধি। আজ কাল কাজের কথা—স্থান-বিশেষে বাগ্মিতার মূল্য অত্যন্ত অধিক, কিন্তু বাগ্মিতাপ্রকাশের সুবিধা নিত্য আইসে না। বিশেষ, এখন লোকে আর কেবল মধুর ভাষার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইতে চাহে না; পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ কাজের কথায় পূর্ণ বক্তৃতাই চাহে। পরিষ্কার বুদ্ধি ও বুঝিবার শক্তিই প্রথম আবশ্যক—তাহার পর সেই ভিত্তির উপর নির্ম্মিত প্রাসাদে কল্পনা ও বাগ্মিতা কাজে আসিতে পারে, সন্দেহ নাই। স্থায়ী যশের জন্য ব্যবসায়বৃত্তি এবং আইনজ্ঞান আবশ্যক। সমসাময়িক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সকল শক্তি, সকল ব্যবসায়, বিশেষ

শেষ কথা।

এখন আর একটি কথা বলিলেই বক্তব্য শেষ হয়। আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার কালে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তাঁহার অপেক্ষা করিবার সঙ্গতি আছে কি না। যদি তাঁহার তদুপযোগী অর্থ না থাকে, বা তিনি রচনা বা অন্য কোনও উপায়ে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারেন, তবে আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু ভাবিয়া দেখেন। আইন ব্যবসায়ে সহসা সাফল্য হয় না। যদি তিন চার বৎসর পরে নবব্রতী ব্যবসায়ে আপনার জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তবে তিনি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিতে পারেন। ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই অচিন্তিতপূর্ব্ব সাফল্যলাভের দৃষ্টান্ত দুই একটি মাত্র দেখা যায় ; সেরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। আবার আর এক ভয় আছে। লেখক অনেক আইনব্যবসায়ীর কথা জানেন, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহারা আর ঋণমুক্ত হইতে পারেন নাই ; এইরূপে তাঁহাদের সকল আশা বিনষ্ট হইয়াছে।

রহস্য।

সথার্ণ।

সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক সথার্ণের বিদ্রূপপ্রিয়তার কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে "সহযোগী সাহিত্যে" একবার সথার্ণের দুই একটি রহস্য আমরা সংগ্রহ করিয়াও দিয়াছি। একবার তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে লইয়া কিরূপে বিদ্রূপপ্রিয়তা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, বিলাতের প্রসিদ্ধ পঞ্চ পত্রের ইতিহাসলেখক মিষ্টার স্পিল্ম্যান তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রিন্স অফ্ ওয়েল্সের বিবাহোপলক্ষে সমৃদ্ধ যাত্রীর দল দর্শন করিবার জন্য, পঞ্চ আফিসে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে সথার্ণও ছিলেন। রাস্তার অপর পার্শ্বে উপনীত হইয়া, সথার্ণ ভিড় ঠেলিয়া আর রাস্তা পার হইতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এক জন পাহারাওয়ালাকে দেখাইয়া দিলেন। সথার্ণ তাহাকে বলিলেন, "ভিড় সরাইয়া আমায় লইয়া যাও, তোমাকে এক সভারেন বক্সিস দিব।" পাহারাওয়ালা বলিল, "চেষ্টা করিয়া দেখি ; কিন্তু লইয়া যাইতে পারিব, এমন ভরসা হয় না।" পাহারাওয়ালার চেষ্টায় কোনও ফলই হইল না ; কেবল ঠেলাঠেলিতে দর্শকবৃন্দ চেঁচামেচি করিতে লাগিল। বিফলমনোরথ সথার্ণ বড় বিষণ্ণ হইলেন ; কিন্তু এমন দলে এমন আহারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া, প্রত্যুৎপন্নমতি পরিহাসরসিক বলিলেন, "দেখ, আমার হাতে হাতকড়ি দিয়া, আমায় টানিয়া লইয়া যাও। আমাকে দ্বারে লইয়া যাইতে পারিলে আমি দুই পাউণ্ড বক্সিস দিব।" তখন পাহারাওয়ালা সথার্ণের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "পথ দাও।" দেশের বিচারপ্রথাকে সাহায্য করিবার জন্য লোকগুলা একটু পথ দিল, এবং কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর সথার্ণ পঞ্চ আফিসের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সথার্ণ পাহারাওয়ালাকে বলিলেন, "আমার ওয়েষ্টকোটের পকেটে অর্থ আছে, লও।" কিন্তু তখন তিনি লক্ষ্য করেন নাই যে, ঐ সময় তাঁহার এক বন্ধু পাহারাওয়ালার হাতে কিছু অর্থ গুঁজিয়া দিলেন। সে চলিয়া গেল ; তখন সথার্ণ বুঝিলেন যে, কিছু ঘুষ দিয়া পাহারাওয়ালাকে সরাইয়া দেওয়াতে ইহাই হইল যে, তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মিশিতেও পারিবেন, আহারও উপভোগ করিবেন ; কিন্তু তাঁহার হাতের হাতকড়ি খুলিবে না।

হাসির গান।

নন্দলাল।

পরজ; একতালা।

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ,—
স্বদেশের তরে যা' করেই হোক রাখিবেই সে জীবন!
সকলে বলিল, আহা হা, কর কি কর কি নন্দলাল!
নন্দ বলিল, বসিয়া বসিয়া রব কি চিরটা কাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ,
তখন সকলে বলিল, বাহবা, বাহবা, বাহবা বেশ!

নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল, যাও না নন্দ, কর না ভাইর সেবা।
নন্দ বলিল, ভাইর জন্য জীবনটা যদি দি,
না হয় দিলাম; কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক;
তখন সকলে বলিল, হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে তা বটে, ঠিক!

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশ গুণ!
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল।
তখন সকলে বলিল, বাহবা, বাহবা নন্দলাল!

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি—
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি!
নন্দ বলিল, আহা হা, কর কি কর কি, ছাড় না ছাই!
কি হবে দেশের? গলাটিপুনীতে আমি যদি মরে যাই।
বল ক' বিঘৎ, নাকে দিব খৎ, যা' বল করিব তাহা।
তখন সকলে বলিল,—বাহবা, বাহবা, বাহবা বাহা!

নন্দ বাড়ীর হোতো না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি!
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন, উল্টায় গাড়ীখানি।
নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিসন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর, আর গাড়ীচাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল!
সকলে বলিল আয় রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

কে ?

গল্প।

শীতের অবসানে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তাঁহার ক্ষীণ দেহ উভয় কূলের বালুকারাশির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া ললিত তরল গতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ; প্রকাণ্ড বালুকাস্তূপ শুভ্রদেহে নিপতিত রহিয়াছে ; নিকটে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, তৃণ পর্য্যন্ত নাই ; শুধু বহুদূরবিস্তীর্ণ শুষ্ক বালুকারাশি ধু ধু করিতেছে ; মধ্যে তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ প্রবাহ। উভয় তীরে সৈকতরাশির মধ্যে জীবনের কোন চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

বসন্তের প্রথম প্রভাতে দুইটি বিহঙ্গ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া, নদীর উভয় কূলে বালুকাস্তূপের উপর আসিয়া বসিল ; তাহাদের একটি চাতক, অপরটি চাতকী। এই নববসন্তসমাগমে তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে, তাহা কেহ জানে না। সুদূর আকাশ যাহাদের বিচরণস্থল, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীসৈকতে কেন আসিয়া বসিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না ; সে কথা চিন্তা করিবারও বোধ করি কাহারও অবসর হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহাদের দেহ ঘর্ম্মাপ্লুত, পক্ষ সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা উদ্বেগকম্পন তাহাদের কোমল বক্ষপঞ্জরকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে।

তাহারা দুইটিতে নদীর দু' পারে বসিয়া পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কাহার অভিশাপে বলা যায় না, বসন্তের এই নির্ম্মল, মেঘনির্ম্মুক্ত প্রভাতে তাহারা পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ; তাই যে সুরে তাহারা আপনাদিগের ব্যথিত হৃদয়ের বিরহকাহিনী গাহিতেছিল, তাহা পুরাতন হইলেও চিরনূতন ; পুষ্পের বিমল সৌরভের মত অনন্ত কাল হইতে তাহা প্রত্যেক নর নারীর ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত হৃদয় হইতে বর্ণের অতীত হইয়া চরাচরের শিরায় শিরায় ধ্বনিত হইতেছে।

তখন দূর কাননে তরুশাখায় বসিয়া পাখীর দল গান করিতেছিল ; জীবজগতের মধ্যে অবিশ্রাম হাস্যকোলাহলের বিরাম ছিল না ; প্রস্ফুটিত ফুলে বৃক্ষশাখা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল ; বসন্তের ঈষদুষ্ণ প্রীতিকর বায়ুপ্রবাহে কোমল লতাপল্লব কম্পিত হইতেছিল ; আর বহুদূরবর্ত্তী কানন হইতে আম্র-

নদীবক্ষের বীচিমালা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এমন দিনে আর কি ভাল লাগে? শুধু হাসি, বাঁশি এবং গান।

চাতকী তাহার সহচরকে ডাকিয়া বলিল, "প্রিয়তম, আরও নিকটে আরও জলের ধারে সরিয়া এস! এমন বসন্ত কাল, এমন উন্মুক্ত নদীতীর, এমন শান্ত সুন্দর প্রভাত; সকলই মাধুর্য্যপূর্ণ, প্রেমসমাগমের এমন উৎকৃষ্ট স্থান এবং কাল আর নাই; দুখানি হৃদয়ও এত খানি ব্যবধানে থাকিয়া বুঝি কখনও এত কাছাকাছি হয় নাই। কি পাপ করিয়াছি যে, তোমার কাছে যাইবার আমার অধিকার নাই?"

চাতক বলিল, "আমি পিপাসাতুর, নিকটে আকণ্ঠ জল, কিন্তু আমার তাহা পান করিবার অধিকার নাই; হায়, প্রিয়ে, কেমন করিয়া বুঝাইব, কি কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে? কিন্তু আরও কয়েক দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সুখের দিন আসিবে, এ কষ্টের অবসান হইবে। বসন্তপূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রিকাবিধৌত হাস্যময় নিশীথে আমরা আবার সম্মিলিত হইব, মনের সুখে উড়িতে উড়িতে আবার অনন্ত আকাশের নীল গর্ভে ডুবিয়া যাইব, যেথানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমাদের বিচরণের অধিকার জন্মিবে, আর কয়েক দিন অপেক্ষা কর, অধিক বিলম্ব নাই।"

চাতকী করুণকণ্ঠে উত্তর করিল, "আর ত এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারি না; তোমার ঐ কোমল বক্ষ, ঐ উত্তপ্ত অধরোষ্ঠ, ঐ স্নেহময় পক্ষপুট আমার কত কালের সাধনার সামগ্রী;—শুধু তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর জল-কল্লোলের সঙ্গে কানে আসিয়া বাজিতেছে, তোমার ঐ ছল ছল চক্ষু মিলনের ব্যাকুল স্পর্শের অভাবে কাতর হইয়া উঠিয়াছে, আমি আর পারি না, সকল বাধা ছিন্ন করিয়া তোমার সুকোমল স্নেহার্দ্র বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, আমাকে আশ্রয় দাও।"

"প্রিয়তমে, আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, আর সাতটি দিন মাত্র; ঐ দেখ, অর্দ্ধচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে—চারি দিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এই শুষ্ক বালুকারাশিও রজতপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, ইহা কি জান?—ইহা আমাদের প্রেমসম্মিলনের পূর্ব্বসূচনা। এই অর্দ্ধচন্দ্র যে দিন পূর্ণ হইবে, সেই দিন আমাদের মিলনের রাত্রি আসিবে; সে আর সাত দিন মাত্র বাকি আছে।"

* * * * *

এক সপ্তাহ অতীত হইল। বসন্তের প্রথম পূর্ণিমা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া দেখা দিল। ফুলে ফুলে কুঞ্জবন ঢাকিয়া গেল, কোকিলের কুহরণ, ভ্রমরের গুঞ্জন, দক্ষিণের বাতাস, বাঁশির গান, জলের কল্লোল, সর্ব্বোপরি আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসি—সব মিলিয়া একটি মোহন মায়াকুহক রচনা করিল। প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবসর আর কোথায়?

বিরহক্লিষ্টা চাতকী প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য উড়িল,—চাতককে ডাকিয়া বলিল, "প্রাণাধিক, আজ আমাদের বিরহের শেষ রাত্রি; ঐ দেখ, পূর্ণচন্দ্র প্রেমালসনেত্রে আমাদের মিলনের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, বৃক্ষশ্রেণী বহুদূরে নিস্তব্ধভাবে ঔৎসুক্যভরে আমাদের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে, সমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভি বহন করিয়া মুক্ত বিশ্বে প্রেমের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। এমন রাত্রে কে একাকী থাকিতে চাহে? অনেক সহিয়াছি, আর নয়; আজ আমরা একবার প্রাণ ভরিয়া একত্র উড়িব! পরিশ্রান্ত হইলেও ভয় নাই, কাননভূমি আমাদের জন্য কোমল পুষ্পরাজিসমাকীর্ণ বাসরশয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

চাতকী উড়িল,—আশা, আনন্দ, ভয়ে তাহার বক্ষ কাঁপিতে লাগিল, তাহার স্পন্দিত পক্ষে স্বেদজল স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

অন্যের অলক্ষ্যে, এক জন ব্যাধ আসিয়া এই নিভৃত নদীসৈকতে উপস্থিত হইল, এবং সহসা সেই নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, স্তব্ধ নিশীথিনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের গভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল।

চাতক কোথায় গেল, কেহ বলিতে পারে না,—ছিন্নপক্ষে চাতকী নদীবক্ষে পতিত হইল; তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়াছিল, পক্ষে শোণিতবিন্দু এবং চক্ষে অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিল।

সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু কোথায় সেই নদী, চাতক ও চ ী? আর এই ব্যাধ কে? সে কি কোন আত্মবিস্মৃত সহৃদয় প্রেমিক, ন াণিতলোলুপ গর্ব্বোদ্ধত নিষ্ঠুর মনুষ্যাধম?—স্বপ্নে সকল চিত্র ঠিক দেখ য় না। অসম্ভব এবং অবাস্তব অনেক দৃশ্য সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই চাতক ও চাতকী কে?—তাহারা কি পূর্ব্বপরিচিত? 'রাজা নী' পড়িতে পড়িতে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের ও মনের মধ্যে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল;—

"—কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা!"

গান।

ইমন ভূপালি। কাওয়ালী।

উজ্জ্বল করহে আজি এ আনন্দ রাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ-মুখ ভাতি।
সভামাঝে তুমি আজ বিরাজ হে রাজ-রাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি।
সুন্দর করহে প্রভু জীবন যৌবন
তোমারি মাধুরী সুধা করি বরিষণ।
লহ তুমি লহ তুলে তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলনমালা প্রেমসূত্রে গাঁথি।
মঙ্গল করহে আজি মঙ্গল বন্ধন
তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা কল্যাণ-কিরণ-ধারা
দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাক চিরসাথী।

১৩ই বৈশাখ, ১৩০৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের " গদ্দৌলা" প্রবন্ধটি অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এবার ইহাতে "মতিঝিলের" একখানি ছবি আছে। "বার মাস" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী বাঙ্গালার উন্নতি অবনতির পরিমাণ অবধারণ করিতে বলিয়াছেন। লে কের একটি কথা অবধানের যোগ্য ;—উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—"মাদ্রাজ, বোম্ব পঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, মধ্যভারত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করি বাঙ্গালী বালকগণ যে বাঙ্গালা ভাষাটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছেন, কখন কি কেহ তাহার অনুসন্ধান লইয়াছেন? ৮৭ হাজার বাঙ্গালীর সন্তান সন্ততি আজ বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানশূন্য!! বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীকে পারস্য ও উর্দ্দু "দ্বিতীয় ভাষা" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গৃহে দাস দাসীর সঙ্গে অন্য ভাষা বলিতে হয়। বাপ মা স্বদেশীয় ভাষার শিক্ষার জন্য বালককে

সুতরাং পরকীয় ভাষাতেই প্রবৃত্তি ও অধিকার জন্মিয়া যায়। মাতৃভাষা নামমাত্র আয়ত্ত থাকে। বয়োবৃদ্ধি হইলে সে যাহা কিছু বাঙ্গালা বলিতে পারে তাহা কেবল নাম মাত্র। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার শিক্ষা ও অনুরাগ হয় না, তাহাতেই বলিতেছি, 'বার মাসের' প্রকৃত সমালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, উন্নতির ত কথাই নাই, নানা দিকে অবনতিরই আশঙ্কা পদে পদে দেখা যাইতেছে।" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "কে বড়" প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি" কবিতাটি সুন্দর। আমরা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

১

"চৈত্রসংক্রান্তির নিশি পোহায়, পোহায়,
যাই তবে বিশ্ববাসি—বিদায়, বিদায়!
আমি অতি ক্লান্ত, শ্রান্ত; সারাটি বরষ
হরষে, মাথায় বহি কর্ত্তব্য কলস,
ঘুরিয়াছি সৌর-রাজ্যে; কাঁপিছে চরণ;
পারাবার-পারে গিয়া করিব শয়ন!

২

যাই তবে বঙ্গবাসি—কায়-মন-প্রাণে
ছিনু ব্রতী তোমাদের মঙ্গল বিধানে!
যদি কোন অপরাধ, যদি কোন ত্রুটি
করে থাকি, হোক্ মগ্ন বিগ্রহ-ভ্রূকুটী
আজি এই বিদায়ের মহা সন্ধি স্থলে,
ডুবুক অশিব-রাশি, ডুবুক [illegible]!

৫

যদি কভু ঢেলে থাকি দীরঘ নিশ্বাস
তব প্রাণ-পক্ষী-বক্ষে, আশ্বাস বিশ্বাস
ঢালিনি কি পক্ষে তার? বিরহবিধুর
ম্লান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর
চির বাহু-আবেষ্টন? পূজা-উপচারে
রাখিনি মঙ্গল-ঘট হাহার আগারে?

১২

নিবিড় ইক্ষুর বনে শালিক চরিছে;
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে
লুকাবারে ডিমগুলি বালির গহ্বরে;
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বৎসরে?
পৌষে শুধু নীলাকাশে, এক দৃষ্টে চাহি,

১৩

মনে নাই—আমি সেই ঝুলন-যাত্রায়,
দিয়ে হর্ষ-কর-দোলা, সুখ হিন্দোলায়
গেয়েছিনু প্রেম-গীত!—যাই বলিহারি,
দোল-পূর্ণিমার রাত্রে ধরি পিচকারি,
ঢালিনু সিন্দূর-রাশি অশোকের শিরে!
ভরিনু তোমার দেহ আবিরে আবিরে!

১৮

লক্ষ্য তুমি কর নাই? বাজায়ে সেতার,
গেয়েছি তোমারি দ্বারে বসন্ত-বাহার!
কদম্ব শিহরি উঠে বাঁশরি ফুকারে—
যুবা বৃদ্ধ নেচে উঠে তারের ঝঙ্কারে!
সেধেছি মঙ্গল কত, কভু চুপি চুপি,
কভু শত রঙ্গভঙ্গে, আমি বহুরূপী!

১৯

যাই—যাই—ওই নিশি পোহায় পোহায়;
যাই তবে বঙ্গবাসি, বিদায়! বিদায়!
সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়,
অদ্ভুত মায়ার খেলা, ভোজবাজিময়!
দুঃখ কোথা? দুঃখ কোথা? স্বপ্নের কল্পনা;
শোক, ব্যথা কোথা? কোথা? অকর্ম্ম জল্পনা!

২০

দেখিছ না? নীলে পীত, পাটল শ্যামলে,
এক রবি-কিরণের বরণ ধবলে!
এক মায়া-যবনিকা পলকে পলকে
ঝলকে, বিশ্বের আঁখি মোহেতে চমকে!
পোহাইল চৈত্রনিশি—বিদায়, বিদায়;

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ইংরাজি ও বাঙ্গালা পোষাক" তুলনায় সমালোচনা। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"ধুতিচাদর পরিয়া ঘোড়ায় চড়ার হাস্যকরত্ব সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং বোধ হয় কাহারও নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার 'শান্তি'নাম্নী বীর বঙ্গনারীর সাড়ি পরিয়া অশ্বারোহণ, ও মলের গুতা দিয়া অশ্বপরিচালনার কিম্ভূতত্ব বঙ্কিমবাবুর স্থায় একজন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যতত্বজ্ঞ 'আর্টিষ্টে'র হৃদয়ঙ্গম হইল না। মলের গুতায় অশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই) সাড়ি পরিয়া পুরুষের মত করিয়া দুই দিকে পা ঝোলাইয়া ঘোড়ায় চড়া যে সাড়ী পরিধানের সার্থকতা রাখিয়া কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনের অগোচর। এই সব কল্পনা উক্ত গ্রন্থকারের শেষ বয়সে বিকৃত মস্তিষ্কের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" শান্তির সহিত এ ক্ষেত্রে আমাদের সহানুভূতি নাই, এবং পোষাক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বক্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দুঃখজনক। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভাষার অসংযম ও শিথিলতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি! বঙ্কিমবাবুর শেষ বয়সের যে "বিকৃত মস্তিষ্ক" হইতে "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রসূত হইয়াছিল, সেই বিকৃত মস্তিষ্ক ধন্য! এবার কলিকাতায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বেশী; এই দারুণ গ্রীষ্মে প্যাণ্ট, জ্যাকেট, বালা, মল, প্রভৃতির গুরুতর ভাবনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজে ঠিক আছেন ত? দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্থায় শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যদি অসঙ্কোচে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা কি কেবল পোষাক, রঙ্গালয় ইত্যাদির সংস্কার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিব; ভাষা ও রসনায় ভাবপ্রকাশপ্রণালীর সংস্কার কি একবারেই অনাবশ্যক?

নব্যভারত। চৈত্র। এবার "বিদ্যাসাগর" দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। "ফুলের বাগান" প্রবন্ধটি সুন্দর ও সময়োপযোগী। এবারকার "নব্যভারতে" আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

৭ম ভাগ। ১৩০৩; জ্যৈষ্ঠ। ২য় সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ., শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্., শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি. এ., স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

মৃত্যু।

লেজটা কোনরূপে লুপ্ত হইলে বানর বনমানুষে দাঁড়ায়, এবং বনমানুষ একটু চিক্কণ হইলে মানুষ হইতে তাহার বড় তফাত থাকে না। উক্ত তিনটি জীবকে পাশাপাশি দাঁড় করাইলেই এইরূপ সংশয় আসিয়া পড়ে, এবং কালক্রমে কোনরূপে বানর লেজহীন হইয়া বনমানুষে ও বনমানুষ চিক্কণ হইয়া মানুষে দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে অধিক মস্তিষ্ক খরচের দরকার করে না। আবার কুমীরের বাচ্চার ঠোঁট দুটাকে চঞ্চুতে পরিণত করিয়া সামনের দুই পায়ে পালক যুড়িয়া দিলে উহা প্রায় পাখীতে পরিণত হয়, প্রাণিতত্ত্ববিদের ইহা বুঝিতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু এই পরিণতি ব্যাপারটা যে কিরূপে সাধিত হইবে, সেইটা স্থির করাই কঠিন সমস্যা। এইখানেই গণ্ডগোল। বানরের লেজ গেলে মানুষ হইবে, কিন্তু লেজ যাবে কিরূপে? কুমীরের বা টিক্‌টিকির পা দুখানাকে ডানায় পরিণত করিতে পারিলে পাখী হইবে বটে, কিন্তু পা সহসা ডানায় পরিণত হইবে কিরূপে?

এই কিরূপে প্রশ্নটার উত্তর দিতে সহজে কেহ সাহসী হয়েন নাই। ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ লামার্ক প্রথমে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিবার চেষ্টা করেন।

সন্তান মা বাপের শরীরগত ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঠিক্ সর্ব্বতোভাবে মা বাপের সদৃশ না হইলেও, প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই মা বাপের সদৃশ হয়। কেন না, গোরুর পেটে হাতীর ছানার উদ্ভব খবরের কাগজ ভিন্ন অন্য কোথাও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সুতরাং সন্তানে নিজধর্ম্মসংক্রমণের ক্ষমতা জীবের প্রধানতম লক্ষণ।

তার পর আর একটা কথা। সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধর্ম্ম পায়, আবার নিজে কিছু কিছু নূতন ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। দেশগুণে, আবাসগুণে, জলবায়ুর গুণে, জীবনের অবস্থাগুণে, ব্যবসায়গুণে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা নূতন ভাবে আক্রান্ত হয়; ফলে জন্মকালে সে যেমনটি ছিল, বয়সকালে ঠিক্ তেমনটি থাকে না। কতকটা পৃথকভাবের জীব হইয়া পড়ে। মা বাপ হইতে বড় বেশী তফাত হয় না; তবে কতকটা তফাৎ হয়। তাহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত উভয়বিধ প্রকৃতিই আবার তাহার নিজ সন্তানে সংক্রমণ করে;

কাজেই তাহার সন্তান আর সর্ব্বাংশে পিতৃপিতামহের সমান থাকে না। এই-রূপে পুরুষানুক্রমে একটু একটু তফাত দাঁড়াইয়া, বহু পুরুষ অতীত হইলে, এতটা পার্থক্য দাঁড়ায় যে, তখন পরপুরুষ ও প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ উভয়কে এক-শ্রেণীস্থ জীব বলিয়া চিনিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

মনে কর, কোন জীবের জীবনবৃত্তি এইরূপ যে, তাহাকে একটা বিশেষ অঙ্গের সর্ব্বদা চালনা করিতে হয়; অভ্যাস ও চালনাবশে তাহার সেই অঙ্গটা বিশেষ পুষ্টি ও সামর্থ্য লাভ করে। তাহার সন্তানে সেই পুষ্টি ও সামর্থ্য সংক্রামিত হয়। সেই সন্তান আবার সেই অঙ্গকে আরও পুষ্ট ও সমর্থ করিয়া নিজ সন্ততিতে সংক্রামিত করে। এইরূপে কয়েক পুরুষে সেই বিশেষ অঙ্গটা এতখানি পুষ্টি লাভ করে যে, মাঝের কয়েক পুরুষের ধারাবাহিক ইতিহাস না জানিলে, এ যে উহার রূপে জন্মিয়াছে, ইহা স্থির করা দুঃসাধ্য ঘটে।

যেমন অঙ্গবিশেষের চালনা দ্বারা ক্রমে তাহার পুষ্টি ঘটিতে পারে, সেইরূপ আবার বৃত্তিভেদ ও ব্যবসায়ভেদ অনুসারে উহার ব্যবহার ও চালনার অভাবে, কালক্রমে সেই অঙ্গের ক্ষয় ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে ক্ষয় ও হ্রাস ও থর্ব্বতা ঘটিয়া অঙ্গটা একেবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নহে।

বলা বাহুল্য, লামার্ক জীবের অভিব্যক্তির এই যে ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতসমাজ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসে জিরেফের গলা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, এবং পুরুষানুক্রমিক অনভ্যাসে উট পাখীর উড়িবার শক্তি লোপ পাইয়াছে, এরূপ স্বীকার কথঞ্চিৎ চলিতে পারে; কিন্তু এই অভ্যাস ও অনভ্যাসের বলে নির্ভর করিয়া বানরকে নরে ও টিক্‌টিকিকে পাখীতে পরিণত করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র।

লামার্কের পর ডারুইন। জীবের ক্রমবিকাশবিধানে অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল ডারুইন স্বীকার করিতেন না, এমন নহে; তবে তিনি ইহাকে মুখ্য কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ডারুইনের মতে অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হইয়া, স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম ও স্বোপার্জ্জিত শক্তি পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া, জীবের ক্রমবিকাশে কতকটা সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিমাণ একেবারে অকিঞ্চিৎকর না হইলেও, যৎসামান্য মাত্র। ডারুইনের মতে জীবের অভিব্যক্তির প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে যৌন নির্ব্বাচনাদি আরও পাঁচটা কারণ অল্প বা অধিক মাত্রায় অভিব্যক্তিসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, সন্দেহ

নাই; কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তুলনায়, আর সকল গুলাই নগণ্য। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল কথা দুইটি।

প্রথম; জীবের জীবনরক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীতে যত জীব আছে, তত আহার নাই। বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতে ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বটে, কিন্তু জীবের সংখ্যাটা গণনা করিলে এবং খাদ্যের পরিমাণটা ওজন করিয়া দেখিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্যে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। এইরূপ গণনা ও ওজন দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ঈশ্বর যত জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের সকলের উপযোগী আহারের ব্যবস্থা করেন নাই। মুষ্টিমেয় খাদ্য লইয়া সংখ্যাতীত জীবে কাড়াকাড়ি করিয়া মরিতেছে, সংসারের ইহাই প্রকৃত অবস্থা। এই ভয়াবহ নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রামে যাহার কোনরূপ একটা সুবিধা আছে, সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। সেই দৈবলব্ধ সুবিধা, হয় ত দুখানা লম্বা পা, অথবা একটু কটা চামড়া, কিংবা একটু ধারাল দাঁত, অথবা একটু মোটা বুদ্ধি, যে রকমেরই সুবিধা হউক না, জীবনসংগ্রামে তাহার অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়; এবং তাহাকে জীবনরক্ষায় ও আহারলাভে সমর্থ করে। জীবনসংগ্রাম এত কঠোর, এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহার ফলাফল এত অনিশ্চিত যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সুবিধাগুলা জীবনসংগ্রামে অমূল্য অস্ত্রের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় কথা এই;—মা বাপের ছেলে মা বাপের মত হয়, কিন্তু ঠিক্ তেমনটি হয় না; একটু নূতনত্ব, একটু বিশেষত্ব কোথা হইতে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার পাঁচটা ছেলে পাঁচ রকম হয়, সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না। কেন হয় না, সে কথার বিচারে প্রয়োজন নাই। হয় না, ইহা নিশ্চিত। কারও বা গায়ের রং একটু কালো, কারও বা একটু ফরসা, কারও বা লোম গুলা লম্বা, কারও বা খাটো হয়, ইত্যাদি। এই যে সকল নূতন লক্ষণ সন্তানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সবগুলা জীবনরক্ষার অনুকূল হইতে পারে না; কোনটা একটু অনুকূল, কোনটা বা একটু প্রতিকূল। যাহারা অনুকূল লক্ষণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, মোটের উপর কঠোর জীবনযুদ্ধে তাহারাই জিতে; আর যাহারা প্রতিকূল লক্ষণ লইয়া জন্মে, মোটের উপর তাহারা সন্তান সন্ততি রাখিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করে।

মোটের উপর, যাহারা সুলক্ষণে সৌভাগ্যশালী, তাহারাই বংশ রাখে, এবং

হইয়াছে, তাহারাই টিকিয়া যায়। এইরূপে পুরুষানুক্রমে একটা বিশেষ লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া একটা বংশকে আর একটা বংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলে, নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি করে। প্রকৃতি যেন স্বহস্তে তাঁহার অসংখ্য সন্ততিগণের মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্তকে বাছাই করিয়া লইতেছেন, আর বাকি সকলকে নিষ্ঠুরভাবে সংসার হইতে সরাইয়া ফেলিতেছেন। ইহা-রই নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনের ফলে বিশেষ বিশেষ নূতন নূতন লক্ষণাক্রান্ত জীব ক্রমে ধরাতলে প্রকাশ পাইতেছে। জীবের এই ক্রমিক অভিব্যক্তিতে কোন্ লক্ষণের বিকাশ হয়? না, যে যে লক্ষণটা কোন-না-কোন প্রকারে জীবনরক্ষায় তাহার অনুকূল। এই প্রশ্নের এই একমাত্র উত্তর।

বলা বাহুল্য, ডারুইনের প্রদর্শিত এই অভিব্যক্তির বিধান সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে। জীবনসংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই যে বিবিধ জীবের অভিব্যক্তির একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ, তাহা স্বীকার করিতে কেহই বড় ইতস্ততঃ করেন না।

লামার্ক ও ডারুইন, উভয়ের প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তিবিধানে এক বিষয়ে মিল ও এক বিষয়ে তফাৎ দেখা যাইতেছে। পিতার ধর্ম্ম পুত্রে বর্ত্তে, উভয়েই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; এবং এই পৈতৃক ধর্ম্মে অধিকারলাভ জীবমাত্রেরই স্বভাব-সঙ্গত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেন না। এই বিষয়ে লামার্ক ও ডারুইন একমত। ক তাহার পিতার নিকট হইতে কতকগুলি গুণ স্বভাবধর্ম্মে পায়; এবং নিজ আয়াস, শিক্ষা, ব্যবসায় ইত্যাদির ফলে, মোটের উপর তাহার সমগ্র জীবনের উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাববলে, যে নূতন গুণগুলি অর্জ্জন করে, তাহাও তাহার পুত্র খ'তে সংক্রান্ত করিয়া যায়। খ আবার পিতৃলব্ধ গুণের উপর স্বোপার্জ্জিত গুণ চাপাইয়া নিজ সন্ততি গ-কে দিয়া যায়। ইহাই লামার্কের মত। ডারুইন এটা মানেন, কিন্তু ইহাকে তত প্রাধান্য দেন না। তাঁহার মতে খ'র জন্মকালে তাহার পৈতৃক গুণ ব্যতীত আরও কতকগুলি নূতন গুণ তাহাতে আবির্ভূত হয়। কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহার অন্বেষণে সম্প্রতি প্রয়ো-জন নাই। কতকগুলি নূতন চিহ্ন তাহাতে দেখা দেয়, যাহা তাহার পিতৃপিতা-মহে বর্ত্তমান ছিল না, ইহা স্বীকার্য্য। এইগুলি যদি দৈবক্রমে তাহার জীবন-রক্ষার অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে জীবনসংগ্রামে বাঁচায় ও কালক্রমে তাহার সন্ততি গ'তে সংক্রান্ত হয়; আর যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সন্তানোৎপাদনের অবসর দেয় না, তৎপূর্ব্বেই তাহাকে

করিতে হয়। কাজেই সেই দৈবলব্ধ জীবনসংগ্রামে অনুকূল লক্ষণগুলি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টি ও বিকাশ লাভ করে। বংশের মধ্যে যাহারা সেই সেই লক্ষণ পায়, তাহারই বাঁচে; যাহারা পায় না, তাহারা বাঁচেও না, বংশও বাঁচে না। ক্রমে জীবনরক্ষার অনুকূল লক্ষণগুলি বংশক্রমে বিকশিত হইয়া জীবকে ক্রমশঃ উন্নত ও অভিব্যক্ত করিয়া তুলে।

এই শেষ কথাটা ডারুইনের পূর্ব্বে আর কাহারও মাথায় আইসে নাই। ডারুইনের ইহাই গৌরব। এবং লামার্কের সহিত ডারুইনের এইখানেই প্রভেদ।

প্রভেদ এতকাল এই পর্য্যন্তই ছিল। সম্প্রতি প্রভেদের মাত্রা সহসা আরও খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। জীবশরীরে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাও পরপুরুষে সংক্রমণ করিতে পারে; লামার্কের এই মত ডারুইন একেবারে অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু ডারুইনের এক সম্প্রদায় শিষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা এই ব্যাপারটা একবারেই উড়াইয়া দেন। হাতুড়ি পিটিয়া কামারের ও লাঙ্গল ধরিয়া চাষার হাতের পেশীগুলা মোটা ও শক্ত হয়, এবং কামারের ছেলে ও চাষার ছেলেও এই পেশীর সবলতা উত্তরাধিকারসূত্রে জন্মকালে প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বসাধারণেরই সংস্কার এইরূপ। সর্ব্বসাধারণের এই সংস্কারটাকেই লামার্ক তৎপ্রণীত অভিব্যক্তিতত্ত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু নূতন ডারুইন-শিষ্যেরা বলিতে চাহেন যে, সাধারণের এই সংস্কারটা কুসংস্কার, অথবা মিথ্যা ভ্রান্ত ও অমূলক সংস্কার। ইহার সমূলতাপক্ষে প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব। বিবিধ জীব লইয়া বহুপুরুষ ধরিয়া বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মানুষের মধ্যে পণ্ডিতের বংশে পাণ্ডিত্য ও গায়কের বংশে গীতানুরক্তির বিকাশ প্রভৃতির যে সকল উদাহরণ প্রচলিত আছে, তাহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ফলে ডারুইনের এই শিষ্যসম্প্রদায় ডারুইনেরও উপর উঠিয়াছেন। ডারুইন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে অভিব্যক্তির কারণ সকলের মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছিলেন মাত্র; ইঁহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিয়াছেন। ডারুইন বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে জীবকর্ত্তৃক নবোপার্জ্জিত ধর্ম্মের পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রমণক্ষমতা অস্বীকার করিতেন না; ইঁহারা তাহা একবারে অস্বীকার করেন। এই উপার্জ্জিত ধর্ম্ম পরপুরুষে সংক্রান্ত হইতে পারে কি না, ইহা এক পরীক্ষা ও প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। অন্যবিধ যুক্তি ইহার প্রতি-

পাদনে অসমর্থ। উভয় পক্ষে বিস্তর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে ; এবং হাওয়ার গতি যেরূপ, তাহাতে অনুমান হয় যে, নবোত্থিত ডারুইন-শিষ্যেরাই বোধ করি জয়লাভ করিবেন। মানবসাধারণের একটা চিরন্তন বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে, বোধ হয়, এতদিনে কুঠারাঘাত পড়িল।

নূতন সম্প্রদায়ের মত কতকটা এইরূপ। জীব পিতৃপিতামহ হইতে আগত কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যতীত আরও কতিপয় নূতন ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ, নিজ স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ করে। এই ধর্ম্মগুলিকে তাহার সহজাত বা সহজ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পরে উত্তরকালে তাহার জীবনে নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তি আধিপত্য করিয়া, তাহার শরীর ও অন্তঃকরণকে বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত, মার্জ্জিত, সংস্কৃত, বা বিকৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে সে জন্মের পর মরণকাল পর্য্যন্ত আর এক শ্রেণীর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মকে তাহার অর্জ্জিত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লামার্কের মতে সহজ ও অর্জ্জিত দ্বিবিধ ধর্ম্মই পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে বংশমধ্যে প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি লাভ করে। ডারুইনের নূতন শিষ্যদের মতে, প্রথম শ্রেণীর ধর্ম্মগুলিই অর্থাৎ সহজ ধর্ম্মগুলিই পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ; অর্জ্জিত ধর্ম্মগুলি এক পুরুষ ছাড়িয়া পুরুষান্তরে যায়, ইহার প্রমাণাভাব ; যে পুরুষে অর্জ্জিত, সেই পুরুষের সহিতই তাহাদের শেষ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সহজ ধর্ম্মগুলির উপরই একান্ত নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনরক্ষায় উভয়বিধ ধর্ম্মই সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু বংশরক্ষায় ও জাতিরক্ষায় সহজ ধর্ম্ম গুলিরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। কেন না, অর্জ্জিত ধর্ম্ম এক পুরুষের পর পরপুরুষে যায় না ; সহজ ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া যায়। স্নতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সহজ ধর্ম্মের মধ্যেই কতকগুলিকে বাছিয়া লয়, ক্রমশঃ পুষ্ট ও পরিস্ফুট করে ও কতকগুলিকে ক্রমশঃ লুপ্ত করে। সহজ ধর্ম্মগুলির মধ্যে যে গুলি জীবনের অনুকূল, সেই গুলিই নির্ব্বাচিত ও প্রস্ফুটিত হয় ; যে গুলি প্রতিকূল, সে গুলি ক্রমশঃ কয়েক পুরুষে লোপ পায়। মানুষের মধ্যে পাণ্ডিত্য বা সঙ্গীতপটুতা কোন বংশবিশেষে সহজ ধর্ম্ম মধ্যে থাকিলে উহা বংশপরম্পরায় পুষ্ট হইতে পারে ; উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্জ্জিত বিদ্যামাত্র হইলে পরবর্ত্তী পুরুষের কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই।

জর্ম্মন পণ্ডিত বাইসমান এই নূতন সম্প্রদায়ের নেতা। জীব মধ্যে উল্লিখিত

জীবমধ্যে সাধারণ সন্তানোৎপত্তির প্রণালীটা এইরূপ। জীব জন্মগ্রহণের পর, অর্থাৎ পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জীবত্বলাভের পর, কিছুকাল ধরিয়া বৃদ্ধি পায় ;—চতুর্দ্দিক্ হইতে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ ও বৃদ্ধিলাভ করে। এই পুষ্টিলাভ ও বৃদ্ধিলাভ ব্যাপার কিছুকাল চলিয়া পরে স্থগিত হয়। জীবমাত্রেরই জীবনে এমন সময় আইসে, যখন সে আর বাড়ে না ; তখন তাহার জীবত্ব পরিণত ও পূর্ণ। সাধারণতঃ এই সময় উপস্থিত হইলে, তাহার শরীরের কিয়দংশ স্বশরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হয়। এই ভাগটাকে বীজ বলা যাইতে পারে। বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইলে ক্রমশই আবার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিয়া পুষ্টি ও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ পুরুষপরম্পরায় চলিতে থাকে।

বীজ হইতে উদ্ভূত নূতন পুরুষ পূর্ব্বতন পুরুষের ধর্ম্ম পাইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের সমগ্র শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি যেন সেই কণামাত্র বীজে কোনরূপে নিহিত ও লুক্কায়িত থাকে ; কাল পাইয়া ও সুযোগ পাইয়া ক্রমে বাহির হইয়া ফুটিয়া উঠে। সহজেই অনুমান হয়, বীজটুকু পূর্ব্বপুরুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র প্রতিনিধিস্বরূপ। পূর্ব্বতন পুরুষের সমগ্র শরীরে যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেরই কিছু-না-কিছু অংশ বীজের মধ্যে নিহিত থাকে। কালে তাহা পুষ্ট, ব্যক্ত ও বিকশিত হইয়া উঠে।

বাইসমান অন্যরূপ বলিতে চাহেন। বীজের সহিত সমগ্র শরীরের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। জীবশরীরের স্থূলতর দুইটা ভাগ। এইরূপ নির্দ্দেশ প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে খাটে। একটা ভাগকে বীজভাগ বলা যাইতে পারে ; দ্বিতীয় ভাগকে আবরণভাগ বলা যাইতে পারে। বীজভাগটাই প্রকৃত প্রাণী, উহাই প্রকৃত জীব। প্রকৃতির নিকট উহারই মূল্য। আবরণভাগটার অস্তিত্ব কেবল বীজভাগকে রক্ষা করিবার জন্য, উহাকে আবরণ করিয়া, ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। উহার অস্তিত্বের অন্য অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। নাক মুখ চোখ কান, স্নায়ু অস্থি পেশী ত্বক্ শিরা ধমনী, প্রভৃতি লইয়া সাধারণতঃ যেটা জীবের শরীর বলিয়া পরিচিত, সেটা প্রায় সমগ্রই এই আবরণ কার্য্যের জন্য, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বীজভাগকে প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান। এই আবরণভাগ আবার বীজভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। বীজ আপনার আবরণ আপনি প্রস্তুত করিয়া লয়। বীজ আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ; এক ভাগ বীজই থাকে ; অপর ভাগ সেই বীজকে বাহ্য-

প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গঠিত ও নির্ম্মিত হয়। আবরণ-শরীর বীজ-শরীর হইতে উদ্ভূত হয়; কাজেই বীজের ধর্ম্ম আবরণে বর্ত্তমান। যে যেমন বীজ, তদুৎপন্ন আবরণ তেমনি। গাছের বীজ হইতে গাছের দেহ, মানুষের বীজ হইতে মানুষের দেহ জন্মে। বীজকে রক্ষা করাই আবরণের কাজ। বহিঃস্থ প্রকৃতির সহিত আবরণেরই কারবার। বহিঃস্থ প্রকৃতির যাহা কিছু অত্যাচার-উপদ্রব, তাহা আবরণের উপর দিয়াই যায়। আবরণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবারের ফলে পীড়িত, দলিত, বিকৃত, পরিবর্ত্তিত হয়। বাহ্য প্রকৃতি আবরণকে ভেদ করিয়া বীজের উপর আক্রমণ বা তাহার বিকার সম্পাদন সহজে করিতে পারে না। বীজ আবরণকে সৃষ্টি করে; কিন্তু আবরণ হইতে বীজ জন্মে না। বীজ শস্য, আবরণ তাহার খোসা মাত্র। আবরণের বিকারে বীজের বিকার হয় না। আবরণের উন্নতিতে বীজের উন্নতি হয় না। জীবনের প্রথম বয়সে বীজ আবরণের সৃষ্টি করে; আবরণ বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজে পুষ্ট, বিকৃত বা সংস্কৃত হইয়া বীজকে রক্ষা করে। জীবনে পূর্ণ বয়স উপস্থিত হইলে, বীজ জীবনের প্রধান কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। আপনি আপনাকে ভাগ করে; আপনার খানিকটা ভাগ আপনা হইতে বিচ্যুত করে; এই ভাগটা পৃথক হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে; আপনার স্বভাবানুযায়ী নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া, আপনার জীবলীলা আরম্ভ করে। এই ব্যাপারের নাম সন্তানোৎপাদন।

বীজ ভাগ ক ও আবরণ ভাগ খ। ক ও খ উভয় লইয়া সম্পূর্ণ জীব-শরীর। ক' হইতে খ'এর উৎপত্তি। খ'এর উৎপত্তি ক'কে রক্ষা করিবার জন্য, বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ক'কে বিনষ্ট করিতে উদ্যত আছে, তাহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য। খ বাহির হইতে আহার সংগ্রহ করে, আত্মপুষ্টি করে, আত্মরক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে ক'কে নিভৃতে সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখে। ক'য়ে যে সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহা জীবের সহজ ধর্ম্ম; খ বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাবে যে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, তাহাই জীবের অর্জ্জিত ধর্ম্ম। খ সহজে বিকৃত হয়; কিন্তু ক সহজে বিকৃত হয় না। খ ক্রমশঃ পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া আপন সামর্থ্যের সীমায় বা পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় জীবের পূর্ণ বয়স বা যৌবনকাল। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত খ-য়ের যে সংগ্রাম, তাহা চিরকাল চলিতে পারে না। যত দিন খ-য়ের জয়, তত দিন

তখন বাহ্য প্রকৃতি খ'য়ের উপর জয় লাভ করিতে আরম্ভ করে। খ তখন ক্রমে জীর্ণ হইতে থাকে। খ'য়ের পুষ্টির ও বৃদ্ধির অবস্থা জীবের বাল্য। খ'য়ের পরিণত অবস্থা জীবের যৌবন। খ'য়ের জীর্ণতাপ্রাপ্তির অবস্থা জীবের বার্দ্ধক্য। যৌবনে বা বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ক আপন প্রাচীন বার্দ্ধক্যোন্মুখ আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে চায়। আর প্রাচীন, বার্দ্ধক্যোন্মুখ আবরণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীন আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে, অথবা আপনারই খানিকটা অংশ বাহির করিয়া দেয়। ক প্রাচীন খ'-এর আবরণ হইতে বাহিরে আসিয়া নূতন ঘর পাতিয়া নূতন সংসারযাত্রা আরম্ভ করে। ক, খ' হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসে ও নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সেই নূতন আবরণের নাম যেন গ। পূর্ব্বতন পুরুষে খ যেমন ক হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পুরুষে গ তেমনি সেই ক হইতেই নির্ম্মিত হয়। ক ও খ একত্র যোগে পিতা বা মাতা। জীবতত্ত্বে পিতা ও মাতা উভয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। ক ও গ একত্র যোগে পুত্র বা কন্যা। ক ও খ উভয়ের সমষ্টি পূর্ব্বপুরুষ, ক ও গ উভয়ের সমষ্টি পরপুরুষ। সহজ ধর্ম্ম, যাহা পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান ছিল, তাহা পরপুরুষেও দেখা দেয়। কেন না, সহজ ধর্ম্ম ক'য়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বপুরুষের ক অবিকৃত অবস্থায় পরপুরুষে যায়। পূর্ব্বে ক ছিল এক আবরণের ভিতর, এখন সেই ক আছে অন্য আবরণের ভিতর। পিতা ও পুত্রে এইমাত্র তফাত। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধর্ম্ম পরপুরুষে যায় না; কেন না, গ'এর সহিত খ'এর কোন সম্বন্ধ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি খ'য়ে যে পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাহা ক'য়ে সংক্রামিত হয় না, কাজেই গ'য়ে যায় না। পরপুরুষের ক এবং গ পূর্ব্বপুরুষের সহজ ধর্ম্মমাত্র পায়; অর্জ্জিত ধর্ম্ম পায় না; তেমনি আবার গ যে সকল নূতন ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহা তৎপরবর্ত্তী পুরুষে যায় না; আপন জীবনেই তাহার সমাপ্তি হয়।

বীজ.ক প্রাচীন জীর্ণ আবরণ খ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন আবরণ গ'কে নির্ম্মাণ করে, ও তাহার মধ্যে আবার যৌবনকাল পর্য্যন্ত বসবাস করে। ক মুক্তি লাভ করিয়া নূতন স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে খ'য়ের কাজ ফুরাইল। গ'য়ের কাজ যখন আরম্ভ হইল, খ'য়ের কাজ তখন শেষ হইল। প্রকৃতির আর তখন খ'য়ের উপর অণুমাত্র মমতা নাই। পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ। পিতার উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন। পিতার জীবনের উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহার অস্তিত্ব ধরার ভার-স্বরূপ। তাহার অস্তিত্ব এখন জীবনসংগ্রামের

তীব্রতা বাড়ায় মাত্র। শিশু স্ফূর্ত্তি ও আগ্রহসহকারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উৎসাহে জীবনসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধের জীবন আর নিরর্থক। প্রকৃতি তাহাকে এক পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। সে এখন সেই পন্থায় চলুক। সেখানে সে শান্তিলাভ করিবে। সেই পন্থার নাম মৃত্যুর পন্থা। বৃদ্ধের মরণই মঙ্গল। বৃদ্ধ যেন জীবিত থাকিয়া ভবের বোঝা ভারী না করে।

ক ও খ লইয়া প্রথম পুরুষ; ক ও গ লইয়া দ্বিতীয় পুরুষ, ক ও ঘ লইয়া তৃতীয় পুরুষ। এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ চলিয়া জীবনের প্রবাহ বাহিত রাখে। পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চলে। খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি পুরুষে পুরুষে বদল হয়। খ, গ, ঘ, তিনই ক' হইতে মূলতঃ উৎপন্ন, তাই শৈশবকালে খ, গ, ঘ অনেকটা একভাবাপন্ন থাকে; বয়সের সহিত খ, গ, ঘ, ব্যবসায়ভেদে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্নরূপে বিকৃত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করে। খ, গ, ঘ'এর যে সাদৃশ্য, তাহা ক হইতে উৎপন্ন; সহজ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। যে বিভেদ, তাহা বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। পুরুষানুক্রমে সহজ ধর্ম্মের স্রোত চলে, অর্জ্জিত ধর্ম্ম এক পুরুষেই আবদ্ধ থাকে।

যাহা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জীবের আবরণশরীরের যতই বিকার, যতই পরিবর্ত্তন ঘটুক না, উহার বীজশরীরের বিকারসম্ভাবনা বিরল। তবে কি বীজ একবারেই অবিকৃত থাকে? তাহা হইলে ত অভিব্যক্তির দ্বার একবারে রুদ্ধ হয়। ক'য়ের অর্থাৎ বীজেরও বিকারক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে ক রথী; খ তাহার রথ। ক'কে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। খ'য়ের সৃষ্টি আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়মাত্র। ক আপনাকে আপনি বিকৃত করিতে পারে। সংগ্রামে যখন যেমন দরকার, তখন সেইমত পরিবর্ত্তিত হইবার ক্ষমতা রাখে। কোথা হইতে এই ক্ষমতার উৎপত্তি, তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে পার; সে স্বতন্ত্র কথা। যতদিন সে কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পার, ততদিন উহাই তাহার স্বভাব জানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্ততঃ তাহার ঐরূপ স্বভাব না হইলে জীবনযুদ্ধে সে এতদিন বিলুপ্ত হইত। ঐরূপ স্বভাব আছে, তাই সে আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ক ধীরে ধীরে জীবনসমরের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ, জীবের সহজ ধর্ম্মগুলিও পুরুষপরম্পরায় ঠিক্ সমান না থাকিয়া ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়। যে ভাবে পরিবর্ত্তন হইলে সংগ্রামে ফললাভের সম্ভাবনা, সেই ভাবে

এখানে নির্ব্বাচনপরায়ণা। অনুকূল ধর্ম্ম গুলি পুষ্ট হয়, প্রতিকূল ধর্ম্মগুলি লোপ পায়। ক ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাব সহজ ধর্ম্মের উপর। অর্জ্জিত ধর্ম্মের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই।

জীবের ইতিহাসে প্রথম দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত জীবের যে উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বীজের উন্নতির ফলে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই প্রধানতঃ এই বীজের উন্নতির সাধক। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কি উপায়ে অলক্ষ্যে বীজের উন্নতি সাধন করে, বীজ তাহার উন্নতিসাধনক্ষমতা কোথা হইতে পাইল, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। এখন সে দিক্ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

জীব নশ্বর, কি অনশ্বর, এই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যাহা দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইতেছে, ক অনশ্বর, অর্থাৎ বীজদেহ অনশ্বর; খ নশ্বর, আবরণদেহ নশ্বর। মৃত্যু বীজের ধর্ম্ম নহে; মৃত্যু আববণশরীরের ধর্ম্ম। বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহান্তরে যায়; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করে। পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া যায়; জীর্ণ পরিধান কালক্রমে ছিঁড়িয়া যায়। ক মরে না; খ হইতে গ'য়ে যায়, গ হইতে ঘ'য়ে যায়। কিন্তু খ, গ, ঘ'-এর শেষ পরিণতি মৃত্যু। বীজের আকস্মিক মরণ ঘটিতে পারে; কিন্তু আবরণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্,—এইরূপ নির্দ্দেশ তবে এই অর্থে বুঝি সত্য নহে। মৃত্যু জীবের আবরণশরীরের ধর্ম্ম, সুতরাং অর্জ্জিত ধর্ম্ম। বীজে ঐ ধর্ম্ম নিহিত নাই। বীজের আবরণভাগ ঐ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে। কেন? কি উদ্দেশ্যে? জীর্ণ আবরণের জীবনসংগ্রামে কোন উপকারিতা নাই। উহা জীবনের ভার লঘু না করিয়া বোঝা বাড়ায়; সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ায়। জীর্ণ আবরণের লোপাপত্তিই মঙ্গল। বৃদ্ধের মরণ বালকের কল্যাণপ্রদ। অতএব প্রকৃতির আদেশ,—বৃদ্ধ সরিয়া যাও, তরুণকে স্থান দাও। প্রকৃতির কঠোর আদেশ পালন করিতেই হইবে। যে আদেশপালনে বিমুখ, প্রকৃতি তাহার প্রতি প্রীতি দেখান না। তাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে মৃত্যুর সৃষ্টি।

জীবের এই অর্থে মরণ নাই। জীব সৃষ্টির পর অবধি আর মরে নাই। সেই স্রোত যে দিন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর থামে নাই। পিতার মৃত্যু নাই; পিতা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন মাত্র। শাস্ত্রের বাক্য এই অর্থে সত্য।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বাহাদুর শাহ।

শাহ বাহাদুর শাহ দিল্লীর সর্ব্বশেষ মোগল ভূপতি। চিরস্মরণীয় সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অপরাধে ইনি রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হয়েন। ইঁহার প্রণয়িণী জেনত্‌মহলও এই নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সমকালে বাহাদুর শাহ বার্দ্ধক্যে অবসন্ন হইয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের অনেকে এই বৃদ্ধ ভূপতিকে দিল্লীতে ইউরোপীয়দিগের হত্যা ও সিপাহীদিগের নানারূপ অত্যাচারের কারণস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ে মোগল ভূপতি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কিরূপ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার প্রাসাদে বিপন্ন ইউরোপীয়গণ কিরূপে রক্ষিত হইতেছিল, তাহা উপস্থিত প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইবে।

বৃদ্ধ মোগল সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামে আদেশ প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার নামে ফিরিঙ্গি-ধ্বংসের নানারূপ অভাবনীয় প্রস্তাব দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষিত হইতেছিল, তাঁহার নামে দরবারে ওমরাহ ও সেনাপতিদিগের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতেছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। বয়সের আধিক্যে তিনি যেরূপ শক্তিহীন, উত্তেজিত সিপাহীদিগের দলবৃদ্ধি ও প্রভাববৃদ্ধিতে সেইরূপ ক্ষমতাহীন হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার তাঁহার কোনও ক্ষমতা ছিল না। নগরস্থিত উত্তেজিত মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচারী হইতে তাঁহার কোনরূপ সাহস ছিল না। কৌতুকপ্রিয় জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহার সমক্ষে নির্দ্দেশ করিতেছিল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ফিরিঙ্গিকুল সমূলে বিনষ্ট হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার যে প্রাসাদে এক সময়ে জনসাধারণ সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না, সেই প্রাসাদ এখন বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সিপাহীদিগের আরামস্থল হইয়াছিল। উহার এক স্থল সিপাহীদিগের বাহনগুলির আশ্রয়স্থল হইয়াছিল; স্থানান্তর স্তূপীকৃত অস্ত্র শস্ত্রের ভাণ্ডার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; স্থানবিশেষে পরিশ্রান্ত সিপাহীদিগের বিনোদগৃহস্বরূপ হইয়াছিল। ইংরাজের শিবিরে সকলে যখন এক পরামর্শে একবাক্যে পরস্পর ঐক্যসম্পন্ন

ছিল, তখন দিল্লীর প্রাসাদে সকলে অনৈক্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও মতের বিভিন্নতায় পরস্পর বিভিন্নপথানুবর্ত্তী হইতেছিল। ইহাদের প্রকৃত পরিচালক ছিল না, কেহ ইহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ ছিলেন না। দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে সমুদায় কার্য্য হইতেছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আজ তাঁহার যে আদেশ বিজ্ঞাপিত হইতেছিল, কাল তাঁহার সেই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ দেখা যাইতেছিল। আজ যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছিল, কাল সেই বিষয়েরই বৈপরীত্য ঘটিতেছিল। নগরের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মুসলমানগণ গোহত্যা করিতে উদ্যত হওয়াতে হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। গোলযোগের শান্তি ছিল না। মহাজনদিগের দ্রব্যাদি নিরাপদ ছিল না। সিপাহীদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, দোকানদারেরা প্রায়ই আপনাদের দোকান রুদ্ধ করিয়া রাখিত। তাহারা সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিত। কিন্তু সম্রাট তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারিতেন না। বৃদ্ধ মোগলের পরিবর্ত্তে উত্তেজিত সিপাহীরাই দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার কারাগার হইতে কয়েদীগণ বিমুক্ত হইয়া দলে দলে দিল্লীতে আসিয়াছিল। ইহাদের আবির্ভাবে নগর অধিকতর বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। তাহাদের ক্ষতস্থান অনাবৃত ভাবেই থাকিত, মলম বা পটী কিছুরই সংস্থান ছিল না। এইরূপে ক্ষত স্থানে নালী ধরাতে দুর্ভাগ্য আহতগণ অসহনীয় যাতনায় অধিকতর নিপীড়িত হইত। বেরেলীর কামানরক্ষক দলের বখত খাঁ নামক একজন সুবাদার দিল্লীর সৈনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহার বয়স ষাটি বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ছয় ফিট ছিল। ইঁহার স্থূলতাও কম ছিল না। ইনি চল্লিশ বৎসর কাল কোম্পানীর সৈনিকদলে কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থূলতাপ্রযুক্ত অশ্বারোহণে তাদৃশ পটু না থাকিলেও, ইনি সাধারণতঃ কর্ম্মঠ ও সামরিক কার্য্যকুশল ছিলেন। এই অতিদীর্ঘ, অতিস্থূল, সমরতত্ত্বজ্ঞ, বর্ষীয়ান্ পুরুষ সেনাপতি হইলেও, সমগ্র সিপাহীদলে তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। নিমচ হইতে যে সকল সিপাহী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা বখত খাঁকে সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করে নাই। এ দিকে ঘাউস্ খাঁ নামক অন্য একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁর বিরোধী হয়েন। সেনাপতি সরদার সিংহের সৈনিকদল বখত খাঁর

ঔদাস্যবশতঃ দুই দিন বৃষ্টির মধ্যে থাকাতে, উক্ত সেনাপতিও বখত খাঁর প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে প্রাসাদপ্রাচীরের মধ্যে পরিচালকগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। কাপ্তেন হড্‌সন নামক একজন সৈনিক পুরুষ বার্ত্তা সংগ্রহ করিবার জন্য কার্য্যবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিভাগের রুজুব আলি নামক একজন মীর মুন্সীর কৌশলে হাকিম আসান উল্লা খাঁ নামক ভূপতির একজন প্রধান কর্ম্মচারী সিপাহী-দিগের সমক্ষে যেরূপ অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন, সেইরূপ আততায়ী বলিয়া নিগৃহীত ও অপদস্থ হইয়া উঠেন।

নগরে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু ইংরাজশিবিরের ন্যায় সেখানেও বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোগাক্রান্তগণ যথানিয়মে ঔষধ পাইত না। এতদ্ব্যতীত নিরন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামায় নগরবাসিগণ এরূপ নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কিয়ৎকালের জন্য ইংরাজের আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়াতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সমগ্র সিপাহীদলের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি বা ঐক্য ছিল না। সমগ্র দলকে আপনার অধীন করিয়া সুপ্রণালীক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন, এমন কেহ সেনা-পতি ছিলেন না। সিপাহীরা যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাও এক প্রধান দুর্গস্বরূপ পরিগণিত হইত। দুর্ভেদ্য ও উন্নত প্রাচীর উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছিল। প্রশস্ত পরিখা উহাকে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য করিয়া তুলিয়া-ছিল। উহার বহির্ভাগ যেমন পরাক্রান্ত বিপক্ষের আক্রমণজনিত বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার অন্তর্ভাগও সেইরূপ বিপক্ষকে বাধা দিবার জন্য বিবিধ যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল। উহাতে রাশীকৃত গোলা-গুলি ছিল। উহার বারুদস্তূপ যথানিয়মে রক্ষিত হইতেছিল। কামান সকল উহার যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। বন্দুক, সঙ্গীন, তরবারি প্রভৃতি উহার স্থানে স্থানে স্থাপিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রচুর খাদ্য, বহুসংখ্যক ঘোটক প্রভৃতি সৈনিকদিগের বলবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত হইতেছিল। এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও, একমাত্র প্রকৃত পরিচালকের অভাবে, সিপাহীরা নিরতিশয় ক্ষীণ-বল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ শিবাস্তোপোল আক্রমণের সহিত ইংরা-জের দিল্লী আক্রমণের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে এই সাদৃশ্যের কোনও কারণ দেখা যায় না। শিবাস্তোপোলের ন্যায় দিল্লীতে কোন ইউরোপীয় যুদ্ধবীর ছিলেন না। শিবাস্তোপোলের ন্যায় দিল্লী

একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের যাবতীয় যুদ্ধোপকরণে বলসম্পন্ন হয় নাই। শ্রীরঙ্গপত্তন বা ভরতপুরের সহিতও উহার তুলনা হইতে পারে না। দিল্লীতে কোনও টিপুসুলতান, হায়দর আলির ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ রণকুশল ভূপতির সুশিক্ষিত ও প্রভুভক্ত সৈনিকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া, অসামান্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার রাজ্যরক্ষার জন্য আপনার দুর্গের দ্বারদেশে বীরশয্যায় শয়ন করেন নাই। দিল্লীতে জাঠদিগের ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠগণ সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশলের একশেষ দেখাইয়া, আক্রমণকারী ইংরাজ সৈন্যকে বারংবার তাড়িত করে নাই। টিপুর সাহসে, জাঠদিগের পরাক্রমে, শ্রীরঙ্গপত্তন ও ভরতপুর আক্রমণ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক, বোধ হয়, এ চিরপ্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত দিল্লীর ঘটনার তুলনা করিতে অগ্রসর হইবেন না। অশীতিপর বৃদ্ধ মোগল দিল্লীর নামমাত্র ভূপতি ছিলেন। এই ভূপতির কিরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বৃদ্ধ মোগলের মর্ম্মস্পর্শিনী যাতনার বর্ণনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নানারূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও রসশালিনী কবিতার রচনায় আমোদ লাভ করিতেন। বাবর সাহের কবিত্ব তাঁহার সন্তানগণেও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হুমায়ুন যেরূপ বিদ্যানুশীলনে তৎপর ছিলেন, আকবর সাহ প্রভৃতিও সেইরূপ শাস্ত্রানুশীলনে তৃপ্তি লাভ করিতেন। অনেক সময়ে রসময়ী কবিতা মোগল ভূপতিদিগের চিত্তবিনোদনের অদ্বিতীয় উপায় ছিল। বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম যখন আপনার নিদারুণ দুর্দ্দশায় একান্ত সন্তপ্ত হইতেন, তখন তিনি কবিতার আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং কবিতা লিখিয়া শান্তিলাভ করিতেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহও আপনার এইরূপ দুর্দ্দশায় একান্ত অধীর হইয়া স্বরচিত কবিতায় গভীর মনোযাতনা প্রকাশ করিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল, তাঁহার সমুদয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল, তাঁহার বিস্তৃত ও রমণীয় প্রাসাদ সৈনিকবাসে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার পরিবারের মধ্যে শান্তিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল; তিনি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কবিতায় বলিতেন;—

"আমায় সৈনিকদলে করেছে বেষ্টন;
নাহি শান্তি, নাহি হায়! স্থিরতা এখন।
কেবল জীবনমাত্র রয়েছে আমার,
তাহাও করিবে তারা ত্বরায় সংহার।"

উত্তেজিত সিপাহীদিগের সমাগমে বৃদ্ধ বাহাদুরের কিরূপ মর্ম্মপীড়া ঘটি-

হইয়া, এক এক দিন তিনি দরবার-গৃহে আমীর ওমরাহগণের সমক্ষে শ্বেত শ্মশ্রু-গুচ্ছ উৎপাটিত করিতেন; মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া উহা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আপনার এইরূপ দুর্দ্দশার মূলীভূত ব্যক্তিদিগকে অভিসম্পাত দিতেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যেও মোগলের প্রাসাদ নিরাশ্রয় ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহার পরিবারস্থ অনেককে এ জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সমক্ষে লাঞ্ছিত হইতে হয়। মীরজা মোগল নামক একজন রাজকুমার ইংরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করাতে সৈনিক-বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়েন। মীরজা হাজি নামক অন্য একটি রাজকুমার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লুকাইয়া রাখাতে সিপাহীদিগের নিরতিশয় বিরাগভাজন হয়েন। বেগম জেনতমহল ইউরোপীয়দিগের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করাতে, উত্তেজিত লোকের মধ্যে সাতিশয় নিন্দার পাত্রী হইয়া উঠেন।

বৃদ্ধ বাহাদুর সাহের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সিপাহীদিগের এইরূপ উত্তেজনা দেখিয়াও তাঁহার আত্মীয়গণ বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবনরক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র বা পৌত্রগণ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এইরূপ মহৎ কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন। দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া, দাঙ্গাহাঙ্গামায় একান্ত বিরক্তি ভোগ করিয়া, বাহাদুর শাহ পরিশেষে ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করেন। এক দিন ইংরেজের শিবিরে প্রচারিত হইল যে, শাহ বাহাদুর শাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্—সন্ধিপ্রার্থী হইয়া লোক পাঠাইয়াছেন। তিনি সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রাসাদে ইংরেজের সৈন্যপ্রবেশের জন্য নৌসেতুর নিকটবর্ত্তী সলিমগড়ের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তদীয় পূর্ব্বতন রাজসম্মান রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে যথানিয়মে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি দিতে হইবে। বেগম জেনতমহল এবং দিল্লীর অনেক রাজকুমার ও ওমারহগণ এইরূপ প্রস্তাবানুসারে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব স্যার জন লরেন্সের গোচর হইয়াছিল। কলিকাতার গবর্ণর জেনারেলের সমক্ষে উহা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুর্ভাগ্য বাহাদুর শাহেরও দুর্দ্দশার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কমলা।

প্রথম।

১

রাজপুর। ৭ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

বড় দুঃখে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। নিরাশার বেদনা বড় তীব্র, পত্রে যদি তাহার লক্ষণ দেখিতে পাও, আশা করি, আমায় ক্ষমা করিবে।

তুমি আজ সাত মাস দেশে আস নাই। এক অজ্ঞাতকুলশীলার মোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি, স্বদেশ, স্বজন, স্বার্থ, সব ভুলিয়া আছ, ইহা বিচিত্র হইলেও সত্য। তুমি আমা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি সব বিষয়ে বড়। তোমায় সুপরামর্শ দিবার প্রগল্‌ভতা আমার নাই। কিন্তু বন্ধু জনের স্নেহকোমল চিত্তে সর্ব্বদা আশঙ্কার আবেগ;—তাই করযোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি দেশে এসো। যাহা হইবার হইয়াছে; সব ভুলিয়া যাও। তোমার আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া আর তোমায় ব্যথা দিতে চাহি না।

শ্রীবিজয়কুমার বসু।

২

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
১১ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বড় দুঃখে এই পত্র লিখিয়াছ;—সম্ভব;—কিন্তু আমার দুঃখও অল্প নহে।

নিজের সহিত সংগ্রামে নিজে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। অনেক ভাবিয়াছি, অনেক সহিয়াছি, কিন্তু আর ভাবিতেও পারি না, সহিতেও পারিব না।

সাত মাস দেশে যাই নাই; এবং এখন যাইতেও পারিব না। আমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, আমার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, শক্তি নাই। যা ছিল, সব হারাইয়াছি।

আমি সব জানি ও সব বুঝি। কিন্তু নিরুপায়। এ পৃথিবীতে যাহার সংযম নাই, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? আমার চিত্ত দুর্ব্বল, বাসনা অদম্য, কিন্তু সঙ্কল্প

স্থির। এ অবস্থায় আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিব, আত্মীয় স্বজনের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হইব, তাহা স্বাভাবিক। আমার মত দুর্ভাগ্য বোধ করি বড় অল্প; আমি তোমাদের স্নেহের অযোগ্য, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের কৃপা ভিক্ষা করি।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের এত আশঙ্কা, এত উদ্বেগ কেন? পৃথিবীতে যাহার কেহ নাই, তাহাকে যদি আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? এ জগতে মানুষের অনেক কর্ত্তব্য আছে, স্বীকার করি; তোমাদের বিধানে যাহার বিধি নাই, এমন কাজ করিয়াও কি জীবনটা কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করা যায় না? চিরাচরিত প্রথার যূপ-মূলে জীবন-বলি না দিলে কি মানুষের সকল কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে? তোমাদের বিধি তোমরাই বুঝিতে পার; আমার বুঝিবার প্রবৃত্তিও ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

আমি শারীরিক ভাল আছি,—এবং যদি বিশ্বাস কর ত বলি, আমার জন্য তোমাদের আশঙ্কার বিশেষ কোনও কারণ নাই। প্রমথ।

৩

—কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
১১ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় কমল,

যদি অনুমতি দাও, আজ তোমাকে একবার দেখিতে যাই। তুমি দেখা করিতেও এত কুণ্ঠিত কেন, বলিতে পারি না। যদি আমার দুঃখ বুঝিতে, তাহা হইলে এত কষ্ট দিতে না। আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, তুমি বুঝিয়াও তাহা বুঝিবে না, এই আমার দুঃখ। তোমার প্রমথ।

৪

প্রমথ বাবু,

আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন কেন? আমি সহস্র বার আপনার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, আজও মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমায় রক্ষা করুন। আপনার দয়া আমি কখনও ভুলিব না। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন, আপনার যাহাতে মন্দ হয়, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে কখনও করিব না। আপনি অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে চলিয়া যাই। আপনার প্রাসাদে আপনি আসুন, আমার জন্য আপনি গৃহত্যাগী হইয়া থাকিবেন কেন?

কমলা।

৫

কলিকাতা। ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় কমল,

তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উপর রাগ করিও না; অনেক কথা বলিবার ছিল, তাই তোমার নিষেধ না মানিয়াও তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমায় ক্ষমা করিবে কি না বল?

তুমি ভুল বুঝিয়াছ—আমার দয়া মায়া নাই,—স্বার্থ আমার সর্ব্বস্ব। সেই স্বার্থের জন্যই তোমার সাধনা করিতেছি। বোধ করি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। তাই আমার কাতর প্রার্থনাও কানে শুনিতে পাও না, আমার দুঃখ দেখিয়াও দেখ না।

তুমি কেন আমার হইতে চাও না,—তাহার দুই কারণ আমি স্থির করিয়াছি। প্রথম,—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না;—দু দিনের মোহ দু দিনে যাবে, তার পর তুমি পথে বসিবে, এই তোমার আশঙ্কা। দ্বিতীয়,—আমার আত্মীয় স্বজন কি ভাবিবে, আমার মান মর্য্যাদার দশা কি হইবে। ইহা ভিন্ন আর কোনও কারণ ত আমার মাথায় আসিতেছে না।

ইহার উত্তরে বলি,—আমাকে বিশ্বাস কর। আমি বিশ্বাসের ভিত্তি গড়িয়া দিতেছি;—এস;—আমি তোমাকে বিবাহ করি। আমি কি তোমার এতই অযোগ্য? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজন্ম আমি দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করিব। যদি চিরদিন তোমার সাধনা করি, তুমি কি কখনও আমায় ভালবাসিতে পারিবে না?

আর আমার আত্মীয়, স্বজন, মান, মর্য্যাদা, গৌরব, এ সব আমি তুচ্ছ মনে করি। তোমাকে আমি ভালবাসি,—আমার করিব, ইহাতে যদি আমার মান যায়, যাক। আত্মীয় স্বজন যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি নিরুপায়।

আমি আর এ সংশয়ে থাকিতে পারি না। তুমি বল, কি করিবে?

এ জীবনে কখনও তোমার আশা ত্যাগ করিব না, যদি চিরদিন দগ্ধ হই, তবু তোমায় কখনও ভুলিব না। মনে রাখিও,—আমার সুখ দুঃখ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। পাষাণি! আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সকল সুখ হরণ করিতেছ?

প্রমথ।

৬

রাজপুর। ১৬ই ফাল্গুন, ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

কাল তোমার পত্র পাইয়াছি। কাল সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি তোমার কথা

ভাবিয়াছি। একটা তুচ্ছ বাসনা চরিতার্থ না হইলে মানুষের জীবন চিরদিনের জন্য বিফল হইয়া যায়, এ কথা তোমার মুখে প্রথম শুনিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আমার পরামর্শ, দেশে ফিরিয়া এসো। দিন কতক অন্য বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ,—তখন নিজে বুঝিতে পারিবে, কি তুচ্ছ বিষয়ে আপনাকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছ। কলিকাতায় বিলাসিতার স্রোতে ভাসিতেছ, এবং এই সব sentimental nonsense লইয়া নিজের অসুখের পথ প্রশস্ত করিতেছ। যদি আপনাকে বর্ত্তমান মোহ হইতে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত কর, মনটাকে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে অল্প দিনে সব ভুলিতে পারিবে।

তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশের মান মর্য্যাদা তোমারই রক্ষণীয়। যদি আত্মসুখের জন্য নিজের অকলঙ্ক বংশগরিমায় কলঙ্কারোপ কর, তাহার পরিণাম অনন্ত অনুশোচনা। পশুরাও আত্মসুখের জন্য বাঁচিয়া থাকে; মানুষও যদি আত্মসুখই জীবনের সার ও চরম লক্ষ্য মনে করে, তাহা হইলে মানবে ও ইতর জীবে কি প্রভেদ থাকে?

সংযম মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। মানুষ চিত্তবৃত্তি সংযত করিতে পারে, বিধাতা মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন। তোমার কাছে আমরা সংযমের আশা করিব না কেন?

নীতি, ধর্ম্ম, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তুমি একটা সুন্দরী লইয়া কলিকাতায় পড়িয়া আছ, রূপতৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া অমৃতভ্রমে বিষপান করিতেছ। ভাবিলেও ক্ষোভে লজ্জায় আমি মর্ম্মাহত হই। তুমি কি এত অধঃপাতে যাইতে পার?

তুমি যাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছ, সে কি তোমায় ভালবাসে? তুমি যাহার জন্য নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছ, সে তোমার জন্য কি করিয়াছে? তোমার মঙ্গলের জন্য সে কি তোমায় ত্যাগ করিতে পারিত না? যে অবৈধ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আর এক জনকে দুর্নীতির পথে টানিয়া আনে, তাহার প্রতি কেমন করিয়া ঘৃণার পরিবর্ত্তে মানুষের মনে অন্য ভাব আসিতে পারে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। তোমার মত অনেকে এ পথে গিয়াছে, আপনারা মজিয়াছে, কিন্তু আবার ফিরিয়াছে। তুমিও ফিরিতে পার; কিন্তু তখন তুমি অনুশোচনায় দগ্ধ হইবে। আমি তোমার মন জানি; রূপতৃষ্ণা

উদ্দাম বাসনা; বিলাস মোহ অজর অমর নয়; যখন নিজের দুর্ব্বলতায় নিজে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন এই অবৈধ সম্বন্ধ কি চক্ষে দেখিবে, বলিতে পার? আমার মিনতি, নিজের জীবনে সে অনুতাপের বীজ বপন করিও না।

সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র; এই বিচিত্র জগতে নিজের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন কর। ক্ষুদ্র বন্ধনে, তুচ্ছ মোহপাশে অমর জীবন বন্দী করিয়া রাখিও না। "গতস্য শোচনা নাস্তি;"—অতীতের কাহিনী ভুলিয়া যাও, জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত কর, নিজের কর্ত্তব্য পালন কর, কালে স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিবে।

বিজয়।

৭

—কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।

২০শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি তর্ক করিতে অক্ষম। আমার সংযম নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। পশুতে আমাতে প্রভেদ অল্প, তাহাও আমি জানি।

তোমরা একটা বড় ভুল করিতেছ। রূপতৃষ্ণা নয়, সত্যই আমি তাহাকে ভালবাসি। আর আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার প্রতি অন্ততঃ তুমি অবিচার করিও না। তাহার অপরাধ কি? ঘটনাচক্রে আমি তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছি—সে নিজে যাহাই হউক,—তুমি তাহাকে যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সত্য নহে।

আমার চিত্ত দুর্ব্বল, কিন্তু এখনও অধঃপাতে যাই নাই। রূপ বল, মোহ বল, ভ্রম বল,—কোনও অজ্ঞাত কারণে আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছি—বিবাহবন্ধন অবৈধ নহে। তুমি আমাকে পাগল বলিবে; কিন্তু—

আজ সকালে তোমাকে এই চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। লিখিতে লিখিতে কমলার একখানি পত্র পাই,—তাই তোমাকে আর লিখিতে পারি নাই। কমলার পত্র তোমায় নকল করিয়া দিতেছি,—

"আমি আপনাকে কখনও বিবাহ করিব না। দুঃখিনীকে আর দুঃখ দিবেন না। আমাকে বিবাহ করিলে সকলে আপনাকে ঘৃণা করিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি মরিলে যদি আপনি সুখী হন, আমি স্বচ্ছন্দে মরিতে পারি। কিন্তু আপনার যাহাতে মন্দ

আমাকে বিবাহ করিলে কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে চলিয়া যাই।

কমলা।"

এখনও কি তুমি কমলাকে অপরাধিনী মনে করিবে? আজ আমি এই-খানেই বন্ধ করি, আর লিখিতে পারিতেছি না।

প্রমথ।

৮

কমল,

সোমবার।

আমি মূর্খ,—তুমি কেন আমার হইতে চাহ না,—তাহার দুইটি সামান্য কারণ আমার মনে হইয়াছিল। আজ তোমার পত্র পড়িয়া আর একটি কারণ আমার মাথায় আসিয়াছে, এ জন্য তোমাকে এবং আমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ। বোধ হয়, তুমি আর কাহাকেও ভালবাস—নহিলে "তোমায় বিবাহ করিয়া আমি কখনও সুখী হইতে পারিব না," তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ কি? আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তোমাকে এত বিরক্ত করিতাম না। ভালবাসা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়,—তাহা হইলে আমিও এত দিন তোমায় ভুলিতে পারিতাম। যাহা আমি পারি নাই, তুমি তাহা পারিবে কেন? তুমি কুণ্ঠিত হইও না; তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই আমার সুখ।

প্রমথ।

৯

বিজয়ের টেলিগ্রামের অনুবাদ।

মিনতি, সে রাজী হইলেও বিবাহ করিও না। অন্ততঃ আমার পত্রের প্রতীক্ষা করিও। সহসা কিছু করিও না।

বিজয়কুমার বসু।

১০

কমল,

আমার চিঠির উত্তর কৈ? আমার জন্য ভাবিও না; আমি আর কখনও তোমায় বিরক্ত করিব না। বল, কিসে তুমি সুখী হইবে?

প্রমথ।

১১

কমল,

এই ক' দিনে তোমায় কত চিঠি লিখিয়াছি, তুমি কি এক লাইনও লিখিতে পার না? শুনিলাম, তোমার অসুখ হইয়াছে। পাছে তুমি বিরক্ত হও, তাই আমি দেখিতে যাইতে পারি না। কি অসুখ? আমার উদ্বেগে তোমার লাভ কি কমল?

প্রমথ।

১২

রাজপুর। ২৩শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় প্রমথ,

তুমি পাগল হইয়াছ। নহিলে একটা সন্দিগ্ধচরিত্রা অজ্ঞাতকুলশীলার রূপে ভুলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে কেন? ছি, একবারে অধঃপাতে গিয়াছ?

আমি কলিকাতায় যাইতেছি। তোমাকে আমার সঙ্গে অতি অবশ্য এখানে ফিরিতে হইবে। যদি আমাদের উপর তোমার বিন্দুমাত্র দয়া থাকে, যদি আত্মীয় স্বজনের প্রতি তোমার তিলমাত্র স্নেহ থাকে, পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র স্মৃতিতে যদি জলাঞ্জলি না দিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্য আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে। আশা করি, তুমি এখনও পদে আছ,—এখনও আমাদের কথা শুনিবে।

বিজয়।

১৩

"বিরাম-কুঞ্জ"; বরাহনগর।
২৮শে ফাল্গুন; ১২৯৮।

প্রিয় বিজয়,

আমার দেখা পাইলে না বলিয়া কিছু মনে করিও না। আমি তোমার সহিত দেখা করিতাম। কিন্তু দেওয়ানজীর পত্রে অবগত হইলাম, ছোটমা কলিকাতায় আসিতেছেন—হায়! ছোটমাও যদি বড়মার সঙ্গে স্বর্গে যেতেন! —আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। তাই একটু গা-ঢাকা দিয়া আছি।

বেশ আছি। আমার জন্য ভাবিও না। গঙ্গার ধারে সেই মার্ব্বেলের ঘাটে বসিয়া আছি। পাশে মোজেলের বোতল, সম্মুখে গঙ্গা, বাঁধা ঘাটের পাশে আমার সখের পিনেস্‌খানি তরঙ্গে নাচিতেছে। একবার তরী বাহিব না কি? কি বল?

তোমাদের কোনও ভয় নাই! পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াছি। কমলাকে বিবাহ করি নাই; বিবাহের প্রস্তাবে কোনও মতে তাহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। হোম করিয়া বিবাহ করি নাই, অতএব আইন ও তোমাদের ধর্ম্মমতে বিবাহ হয় নাই। কিন্তু হে বঙ্গীয় বৃদ্ধ বিজয়বাবু! প্রস্তুত হও, একটা নীতিবিরুদ্ধ প্রসঙ্গ তোমার কর্ণে ঢালিতে হইবে,—আমি আর্য্য-

করণে কমলার গলায় মালা দিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি। যা বলিতে হয় বল, প্রকৃত কথা এই,—কমলা এখন আমার।

ভাল মন্দ, এ সব ভাবিব না, ঠিক করিয়াছি। অতএব, এ বিষয়ে তোমার বক্তৃতা বৃথা। সে পক্ষে মোজেল বরং মন্দ নয়। যতক্ষণ মাথায় থাকে,—আমি যাহা চাই,—ভাল মন্দ মাথায় আসিতে দেয় না।—শুধু কমলা ও মোজেল্! শুধু কমলা ও গঙ্গা! শুধু কমলা ও সৌরভ! শুধু কমলা ও সুখ! শুধু কমলা, কমলা, কমলা!

প্রমথ।

কাল তোমার চিঠি রওনা করা হয় নাই। ভালই হইয়াছে। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম, ভ্রম সংশোধন করিয়া দি। তুমি লাটিমের মত ঘুরিয়া না মর, আমার এই ইচ্ছা। তাহার পরও যদি লাটিম হও, সে তোমার মর্জ্জি! আমি গঙ্গার ধারে আছি শুনিয়া, এ বাগানে আমায় খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা করিও না। আমি এখানে আর থাকিব না, আজই পাততাড়ি গুটাই-তেছি। তুমি যদি গঙ্গার উভয় তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে হরিদ্বার পার হইয়া গোমুখী পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাও, তাহা হইলেও আমার দেখা পাইবে না। তবে বরানগরের বাগানবাড়ীতে আমার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইবে,—মোজেলের খালি বোতল,—এক রাশি। জানি তুমি 'নীল-ফিতে', নহিলে তোমার জন্য এক আধটা পুরা বোতল রাখিয়া আসিতাম।

ছোটমাকে বলিও, আমি পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছি। উদ্বেগের কোনও কারণ নাই; কেন না, আবার ফিরিতেছি, ফকির হইব না। ইহার উপর আর কিছু বলিয়া যদি তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে চাও, সে তোমার দায়িত্বে।

যদি বিশেষ কোনও আবশ্যক হয়, আমাদের এটর্ণী B. K. Royর কাছে আমার চিঠি পাঠিও—তাহা হইলে আমি পাইব। অজ্ঞাতবাস,—কিছু মনে করো না। আমেন!

প্রমথ।

দ্বিতীয়।

১

কালবা দেবী রোড্; বম্বে।
৬ই বৈশাখ; ১৩০১।

প্রিয় বিজয়,

বহুদিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। লিখিবার বিষয়ও বিশেষ কিছু নাই। বহুদিন প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া মনটা নিতান্ত [illegible]

আজ পুরাতন চিঠিপত্র দেখিতে দেখিতে তোমার ক'খানি চিঠি পড়িলাম। আজ মনে হইতেছে, তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় ছুটিয়া যাই। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বিচিত্র দৃশ্য, মাথার মধ্যে ভিড় করিয়া আছে। নিত্য নূতনের আর আকর্ষণ নাই,—এখন সেই পুরাতন অতীতের জন্য একটা প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তৃষ্ণা মাত্র। আবার যদি সেই পুরাতন স্মৃতির রাজ্যে উপস্থিত হই, তখন হয় ত সে সব অত্যন্ত পুরাতন, নিতান্ত অসহ্য বোধ হইবে। আশ্চর্য্য হইও না, নিজের বিষয়ে সত্যই আমি এইরূপ সন্দিহান।

এই দুই বৎসরে তোমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। আমার নিজের পরিবর্ত্তনও বিস্ময়জনক। আশা করি, তোমাদের পরিবর্ত্তন অসুখের কারণ হয় নাই।

কমলা এখন আমার সঙ্গে ;—ভাল কথা, শেষ পত্রে তুমি কমলাকে "সন্দিগ্ধ-চরিত্রা" বলিয়াছ। এই দুই বৎসর কমলাকে দেখিলে তোমার এ ভ্রম থাকিত না। আমি জানিয়া শুনিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি। কমলার জীবনের সমস্ত কাহিনী আমি তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম। তাহার জীবন পবিত্র নয় বটে, কিন্তু এমন পদস্খলন কাহার না হয় ? পুরুষের স্বেচ্ছাচারের ক্ষমা আছে,—আর রমণী জীবনে একবার ভ্রম করিলে আর তাহার মার্জ্জনা নাই কেন, বুঝিতে পারি না। তাই কমলাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। আমার মঙ্গলের জন্য কমলা বিবাহে সম্মত হয় নাই—কিন্তু আমার সুখের জন্য সে অনায়াসে আত্মবলি দিয়াছে।—যে অদম্য আবেগে আমি তাহার জন্য পাগল হইয়াছিলাম, সেই তীব্র বিদ্যুৎ তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। আমি তখন অন্ধ, অস্থির ;—তখন কেবল মনে হইতেছিল,—যেমন করিয়া হউক, কমলাকে আমার করিব। আমি কমলাকে আমার করিয়াছি, কিন্তু হায় কোথায় তৃপ্তি !

আমার সুখের জন্য যে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে,—আমি কি তাহার যোগ্য ? আমি আত্মসুখের জন্য চিরজীবনের মত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এ চিন্তা সুখের নহে। কমলার আকারে একটা চিরস্থায়ী বিষাদের ছায়া, তাহার হৃদয়ে গভীর আত্মগ্লানির বিষম যাতনা, আমি প্রতি পদে অনুভব করি। ভাই বিজয়, এখন বুঝিয়াছি, সুখ সকলের জন্য নয়, জগতে শান্তি বড় দুর্ল্লভ ;—কিন্তু বড় চড়া দামে এ অভিজ্ঞতা কিনিতে হইয়াছে !

দারুণ অশান্তি, অত্যন্ত অতৃপ্তি বরং ভাল। কিন্তু এই অসহ অবসাদ আর

সহ্য হয় না। আমি এখন অতীতের দুর্ব্বলতায় শ্রান্ত, জীবনভারে ক্লান্ত ; অন্ধ পথিকের মত চলিয়াছি ;—কিন্তু কেন, কোথায়, কে জানে ? এমন উদ্দেশ্য-হীন বিফল জীবন বহিয়া ফল কি ? তবু বহিতে হয়, এই বিড়ম্বনা !

তোমার প্রমথ।

২

রাজপুর। ১০ই বৈশাখ ; ১৩০১।

প্রিয় প্রমথ,

যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, দেখিতেছি, তাই ফলিল। তোমার পত্র পড়িয়া বোধ হইল, তুমি ইতিমধ্যেই অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছ। তখন যদি কথা শুনিতে ; যখন প্রতীকারের পথ ছিল, তখন যদি ফিরিতে।

তুমি ভুলের উপর ভুল করিতেছ ; যে মোহে তুমি কমলার অপবিত্র জীবনে চরিত্রের পবিত্রতা ঢালিয়া দিয়াছ, তুমি এখনও তাহাতে আচ্ছন্ন। তোমার পূর্ব্ব আচরণ অনুতাপের যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু তোমার পক্ষেও বক্তব্য আছে। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ বটে, কিন্তু কমলার সর্ব্বনাশ কর নাই, ইহা নিশ্চিত। কমলার পূর্ব্বজীবন জানিয়া তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ,—কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বজীবনের কলঙ্ক যায় না। তোমার এই মূর্খতার আগেও তাহার কিছু ছিল না, এবং পরেও কিছু যায় নাই। অতএব, কমলার সর্ব্বনাশ তুমি কর নাই,—তুমি নিজের সুখের পথে নিজে কাঁটা দিয়াছ। কমলা তাহার উপলক্ষ ;—ইহাতে যদি অনুতাপের অবকাশ থাকে, তাহা কমলার।

আপাততঃ তোমার উদ্বেগের আরও গুরুতর কারণ উপস্থিত। হরিনারায়ণ-পুরের চরের মকদ্দমায় তোমার হার হইয়াছে ; তুমি যে দেনা করিয়া গিয়া-ছিলে,—তাহা সুদে আসলে অনেক হইয়া পড়িয়াছে। তোমার মহাজন হাই-কোর্টে মাম্‌লা জুড়িয়াছে ; সে নিশ্চয়ই ডিক্রী পাইবে। তুমি এই দুই বৎসরে ক্রমাগত জলের মত টাকা খরচ করিয়াছ ; তহবিলে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত নাই। যদি এখনও না আস, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব, পত্র-পাঠ, যে অবস্থায় থাক, কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। কোনও মতে অন্যথা করিও না।

তোমার বিজয়।

৩

—কালবা দেবী রোড ; বম্বে।

প্রিয় বিজয়,

ভুল দিয়া ভুল ঢাকা যায় না। তোমার স্নেহ অমূল্য, কিন্তু তোমার চেষ্টা বিফল।

কুচক্রে পড়িয়া একবার তাহার পদস্খলন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার পর? তাহার বর্ত্তমান যাতনার কারণ কে? আমারই বোঝা উচিত ছিল,—কিন্তু আমি বুঝি নাই। তাহার পরও আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করি নাই,—স্বার্থপরের হৃদয়ে কাহারও স্থান নাই। কমলা যদি নিজের দুঃখে নিজে দগ্ধ হইত, তাহা বরং আমি সহিতে পারিতাম। সে যে আপনাকে আমার দুঃখের কারণ ভাবিয়া মর্ম্মে মরিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার আত্মগ্লানির কারণ আর কি হইতে পারে? যদি আমার জন্য দুঃখ করিতে কুণ্ঠিত না হও, তাহা হইলে কমলার জন্যও দুঃখ করিতে পার। আমার তুলনায় সে দেবতা; যদি যথার্থ সহানুভূতির যোগ্য কেহ থাকে, তবে সে কমলা।

আমার বৈষয়িক অবস্থার কথা শুনিয়া আমি সুখী হইয়াছি। সকলে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, আমি করিব না কেন?

আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আমার সর্ব্বস্ব যায় যায় শুনিয়া আমার মনে একটু শান্তি আসিয়াছে। যখন সব যাবে, তখন আর একবার খবর দিও। তাহার অপেক্ষা প্রিয় সংবাদ তুমি আর কখনও দিতে পারিবে না। যায় যাক্, থাকে থাক্, আমি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি—কোথায় ভাসিয়া যাই, দেখি।

যাহার চিত্তে সুখ নাই, বিত্তে তাহার আবশ্যক? যাহার জীবনে কোনও আশা নাই, তাহার পক্ষে ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য উভয়ই সমান। তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? সুখ হউক, দুঃখ হউক,—তীব্র কিছু দাও, এমন নিশ্চেষ্ট অবশ জীবন আর বহন করা যায় না।

তোমার প্রমথ।

তৃতীয়।

১

কম্বুলিয়াটোলা; কলিকাতা।
৭ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০১।

প্রিয় বিজয়,

অসম্ভব। সুখে শ্রান্ত হইয়াছি, আর আমি সুখ চাহি না। সুখের প্রলোভন আমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর,—এখন নীরবে জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন কাটাইতে দাও।

তুমি কি বলিতে চাও, স্বার্থের মন্দিরে একটি নিরীহ বালিকার ইহজন্মের আশা ভরসা বলি দিব? সত্য, আমি জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই ভুল করিয়াছি, আপনাকে অধঃপাতের শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু এখনও এত দূর

আমি কোনও মতে বিবাহে সম্মত নহি। আমি এই মরুময় জীবনে কেমন করিয়া নূতন আশালতা রোপণ করিব? তাহা কি সম্ভব মনে কর?

জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক অবসাদ, অনেক অশান্তি সহিতেছি। যৌবনের মধ্যাহ্নেই আমার হৃদয় জরাজীর্ণ হইয়াছে। কিশোর হৃদয়ের উন্মেষোন্মুখ আশা আকাঙ্ক্ষার অভিনব মুকুল আমি দলন করিতে পারি, তাহা ফুটাইয়া তুলিবার আনন্দ-কিরণ আমার অকালবৃদ্ধ জীবনে মোটে নাই। যে এ অবস্থায় আর একটি তরুণ জীবন নিজের জীবনে জড়াইতে চাহে, সে নিতান্ত স্বার্থপর।

প্রমথ।

২

প্রিয়তম,

কত দিন তোমাকে দেখি নাই। আর আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। একবার দেখা দিও;—তোমার কাছে আর কিছু চাহি না,—প্রেম নয়, সোহাগ নয়; যত্ন নয়, আদর নয়; দয়া নয়, অনুগ্রহ নয়; শুধু একবার তোমার দেখা চাই। আমি তোমায় বিরক্ত করিব না, বিরক্ত করিবার অধিকার আমার নাই। একবার দেখা দিতেও কি তোমার এত আপত্তি? কমলা।

৩

কমল,

আজ আমি যাইতে পারিব না। নিজে কি করিতেছি, নিজেও তাহা জানি না। আমাকে ক্ষমা করিও। আমি হৃদয়হীন, স্নেহহীন, পশুতুল্য। তুমি তাহা জান। আমার দুর্ভাগ্য, তোমায় আমি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ দিলাম। হায়! আমার সেই সুখের স্বপ্ন কোথায় গেল? প্রমথ।

৪

রাজপুর। ১১ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০১।

প্রমথ,

মানবজীবন অভ্রান্ত নয়; একবার নিরাশ হইয়াছ, বিপথে গিয়াছ, অতএব, চিরদিনের জন্য তোমার জীবন মরুময় হইয়া থাকিবে, স্বভাবের এরূপ নিয়ম নহে।

নূতন করিয়া জীবনযাগ আরম্ভ কর, অতীতের স্মৃতি আহুতি দাও;—অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে।

তুমি কেন বিবাহ করিবে না? তোমার হৃদয় কোমল, স্নেহময়, প্রেমপূর্ণ;

তুমি একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় স্নেহরসে সিক্ত করিতে পারিবে না? আমি তাহা কখনও বিশ্বাস করিব না।

তবে কথা আছে। যদি কাপুরুষের মত এখনও সেই হতভাগিনীর মায়াজাল ছিন্ন করিতে ভীত হও, সে স্বতন্ত্র। তুমি কি মনে কর,—কমলাকে তুমি যথার্থ ভালবাস? তোমার কি বিশ্বাস, কমলাকে লইয়া তুমি কখনও সুখী হইবে? যদি কমলার মায়া কাটাইতে না পার, তাহা হইলে তোমার আর কোনও আশা নাই।

তোমার ছোটমার বুকে তুমি বজ্রাঘাত করিতেছ; সেটা কি মনুষ্যোচিত মনে কর?

বিজয়।

৫

কলিকাতা। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০১।

ভাই বিজয়,

রাগ করিও না। আমি মরিয়াছি মনে করিলেই ত সব চুকিয়া যায়! মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন?

কমলাকে ভালবাসি, কেমন করিয়া বলিব? যে মন্ত্রমুগ্ধ নেত্রে ইন্দ্রজালের আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টি কোথায় গেল? হৃদয়ের অন্তস্তলে মর্ম্মের শোণিতরাগে যে মানসীর ছবি আঁকিয়াছিলাম, তাহা কোথায় মিশিল? সুখসূত্রে আশাফুলে যে মালা গাঁথিয়াছিলাম, তাহা কে ছিঁড়িল? আমার সেই ঘুমের ঘোর, আত্মবিস্মৃতির নেশা, সুখের স্বপ্ন কোথায় গেল?

যৌবনের তরুণ ঊষায় মনে করিয়াছিলাম, কমলাকে লইয়া সুখী হইব। এখন বুঝিয়াছি, আমি মনুষ্যনামের অযোগ্য, আমার পক্ষে প্রেম অসম্ভব। আমার হৃদয়ে সে বৃত্তি থাকিলে আমি কমলাকে ভালবাসিতে পারিতাম।

আমি নিজের সুখের জন্য অন্যের শান্তি হরণ করিয়াছি; আমার মত নীচ জগতে বিরল।—আমাকে আর নীচতার পথে যাইতে বলিও না। আপনার জন্য আর আমি অন্যের অনাবিল জীবনে অশান্তির বিষ ঢালিতে পারিব না।

প্রমথ।

৬

প্রিয়তম,

আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক। দুঃস্বপ্নের মত আমি তোমার জীবন চঞ্চল আকুল করিতেছি। কিন্তু হায়! সে কি আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ?

আর আমি লুকাইয়া রাখিতে পারি না; আমার সর্ব্বস্ব! না চাহিতে

কেন আমার হাতে স্বর্গসুখ তুলিয়া দিলে? যদি দিলে, তবে আবার বিনা অপরাধে কাড়িয়া লইলে কেন?

আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, তুমি কি করিবে? তোমার আত্মগ্লানি কেন? এ জগতে আমার সুখের আশা ছিল না,—তুমি চিরদুঃখিনীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই আমার যথেষ্ট। তুমি যদি বিফল হও, সে দোষ তোমার নহে। তুমি কুণ্ঠিত হও কেন? তুমি একবার এস, একবার দেখা দাও।

কমলা।

৭

কমলা,

আমিই অপরাধী; আমায় ক্ষমা কর। আকাশে মন্দির গড়িব, মনে করিয়াছিলাম; এখন বুঝিতেছি, তাহা অসম্ভব। এ মরু হৃদয়ে কাহারও স্থান নাই। —মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে লইয়া সুখী হইব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তোমার ও আমার মধ্যে কিসের ব্যবধান, কিসের বাধা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এ জীবনে সে ব্যবধান ঘুচিবে না। হায়! তুমি আমি কত ভিন্ন! তুমি আমায় ঘৃণা কর, অভিশাপ দাও, আমি শান্তি পাই। তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার আগ্রহ, তোমার অবিচলিত অনুরাগ, আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে! তোমার স্নেহ তোমার মমতা আমার আর সহ্য হয় না।

প্রমথ।

৮

কলিকাতা।

প্রিয়তম,

আমি কলঙ্কিনী; বিধাতার অভিশাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ, আমি সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন আমার জন্য আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হও?

অপরাধ আমার। আমি কেন তোমায় দুঃখের সমুদ্রে ডুবাইলাম? আমার পাপস্পর্শে আসিয়া তোমার এই জ্বালা, আমি কেন তোমার কথায় সম্মত হইলাম?

প্রিয়তম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমি তোমাকে ভালবাসি; এখন বলিতে দোষ নাই, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। যাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহার বুকে বিষের ধারা ঢালিয়া দিলাম কেন? ইহজন্মে আর কেহ আমার মত তুষের আগুনে পুড়িয়াছে কি না, জানি না; আবার পরজন্মেও নরকের আগুনে পুড়িব। তাহাতেও কি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?

প্রাণাধিক, তুমি জান, প্রথম যৌবনের অতৃপ্ত আবেগে আমি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে বিসর্জ্জন দি। আমি আত্মসংযম শিখি নাই; প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া আমি নারীধর্ম্মে বঞ্চিত হই। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়, এক পলের লালসায় নারীজন্মের সার রত্ন হারাইয়া বুকে যে আগুন জ্বালিয়াছি, তাহা আর নিভিল না। এক দিন, এক মুহূর্ত্ত,—কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কখন মনে হইত, মরি; কিন্তু ভয়ে পারিতাম না। তখন যদি মরিতাম!

নিজে মরিতে চাহিতাম; কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, আমি না মরিলে আমার শ্বশুরকুলের গৌরব যায়, তখন বিষের বাটী হাতে করিয়া এই তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় কাঁদিতে লাগিলাম। পারিলাম না; কত তিরস্কার, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিলাম, কিন্তু মরিতে পারিলাম না। সেই দিন এই কলঙ্কিনীর কলুষিত প্রাণ রক্ষা করিবার আশায় গৃহ ত্যাগ করি। তার পর, তুমি আমায় আশ্রয় দাও। আমি দিবসে নিশীথে কত কাঁদিয়াছি, তবু এ কলঙ্ককালিমা ধৌত হইল না; নিশিদিন অনুতাপদহনে পুড়িয়াছি, তবু এ পাপ পুড়িল না!

তার পর তুমি,—আমার দেবতা, ধীরে ধীরে আমার অন্ধকার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে;—ধীরে ধীরে ধীরে আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোয় উদ্ভাসিত করিলে! হৃদয়ে আর কিছু ছিল না, কেবল তুমি! চিন্তায় আর কিছু ছিল না, কেবল তুমি! দিবসে নিশীথে, জাগরণে স্বপ্নে, কেবল তোমায় দেখিয়াছি, তোমায় ভাবিয়াছি। তখন জীবন আনন্দময়, পৃথিবী পুণ্যময়, আকাশ আলোক-ময় বোধ হইত! কিন্তু দু দিনে সে মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

মনে হইল, আমি পাপীয়সী; আমার দেবতাকে কেন পাপের পথে টানিয়া আনি। তখন স্থির করিলাম, নিজে মরিব, তবু তোমায় কলুষিত করিব না।

কিন্তু তুমি বিধির নির্ব্বন্ধে আমায় সোনার চক্ষে দেখিলে! মনে করিয়া দেখ, আমি কত কাঁদিয়াছি, কত সাধিয়াছি,—তুমি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না। আমার জীবনকাহিনী শুনিয়াও তুমি নিরস্ত হইলে না। তুমি আমায় বিবাহ করিতে চাহিলে।

যে পত্রে তুমি বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে, সেই পত্র পড়িয়া, তোমার অন্ধ আবেগের পরিণাম বিদ্যুতের শিখার মত হৃদয়ে ঝলসিয়া গেল। আমি আমার জন্য ভাবি নাই; তোমার মঙ্গলের জন্য তখনও আমি কঠিন বন্ধনে বুক বাঁধিয়াছিলাম।

তার পর সেই মিলনের জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী! প্রিয়তম, আমার সর্ব্বস্ব,

আমার দেবতা, আমার চিত্ত দুর্ব্বল, আমায় ক্ষমা কর; আমি হৃদয়ের আবেগে প্রাণের উচ্ছ্বাসে তোমার পদতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। হায় আমি হতভাগিনীর নিজের সুখের আশায় কেন তোমার পবিত্র হৃদয়ে অশান্তির বীজ বপন করিলাম?

সুখ চকিতের জন্য; আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিতাম,—আমার সুখের পরমায়ু অল্প; আমি স্থির জানিতাম, নিভিবার আগে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হয়, আমার আনন্দও সেইরূপ। জানিতাম, এই উজ্জ্বল আলোক নিভিলে আমি আবার ঘোর অন্ধকারে ডুবিব; কিন্তু এত শীঘ্র, তাহা ভয়ে কখনও মনেও আনিতে পারি নাই।

তার পর কত সহিয়াছি; বুক ফাটিয়াছে, তবু মুখ ফুটিয়া তোমায় কিছু বলি নাই। কেন বলিব? আমি কে? তোমার জন্যই ত আমি!

সুখের পর দুঃখ সহ্য হয় না। স্বর্গসুখ দিয়াছিলে, তাহার পর বড় অনাদর;—বড় কষ্টে কেবল তোমার মুখ চাহিয়া তাহাও সহিয়াছিলাম। আমার নিজের দুঃখ আমি অনায়াসে সহিতে পারি, কিন্তু আমার জন্য তুমি দগ্ধ হও, তাহা কোন প্রাণে সহ্য করিব?

প্রিয়তম, আমার জীবনের আলো, মরণের দেবতা, আমায় ক্ষমা কর। এক দিন, যে দিন শ্বশুরকুলের পরিজনেরা আমার মুখে বিষের বাটী ধরিয়াছিল, সে দিন মরিতে পারি নাই। তখন জীবন বড় সুন্দর বোধ হইয়াছিল। হায় এই সেই জীবন!-তখন কেন এ জীবনের মায়া কাটাইতে পারি নাই? এখন বোধ হইতেছে,—মরণ সুন্দর! জীবনের কলরব, বাসনার উচ্ছ্বাস, কামনার উদ্দাম আবেগ, অনুতাপের তীব্র বিষ, আর তোমার জন্য আমার সমস্ত শরীরের সমস্ত হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা আর সহ্য হয় না। তোমার চরণে অপরাধিনী এই কলঙ্কিনীকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন মরণের কোলে স্নিগ্ধ সুপ্তি লাভ করি।

প্রিয়তম, আমি সুখে মরিতেছি, দুঃখে নয়। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। আমি তোমার সুখশান্তির পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। তুমি বিবাহ কর, সুখে থাক,—এ হতভাগিনীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাও। যদি কখনও নারীজন্ম পাই, যেন আবার তোমার দাসী হইতে পারি; কিন্তু হে ভগবান, তখন আর ইহলোকে এই নরকযাতনা আমার অদৃষ্টে লিখিও না।

কমলা।

গৌরাঙ্গের বাল্যজীবন।

গৌরাঙ্গের বাল্যজীবনের ইতিবৃত্ত অধিকাংশই কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঈশ্বর সাজাইবার জন্যই এই সকল অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি। তিনি খ্যাতিলাভ করিলে, মুরারি গুপ্ত নামে জনৈক ভক্ত তাঁহার বাল্যাবস্থার কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাহা মুরারি গুপ্তের সূত্র বলিয়া উল্লেখিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও আমরা এই সূত্র দেখিতে পাই নাই। ইহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে কি না, তাহাও অবগত নহি। পরবর্ত্তী লেখকেরা মুরারির সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য বাছিয়া লওয়া আয়াসসাধ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,—

"*   *   *   গুপ্ত মুরারি। বিস্তারি বলিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥"

বৃন্দাবন দাস যদি বিস্তার না করিয়া এবং মধুর না করিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ প্রীত হইতাম। কিন্তু বৃন্দাবনের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার জিহ্বায় সরস্বতী বাস করেন। যে সকল পয়ার তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, তাহা তিনি নিজের রচনা বলিয়া মনে করিতেন না। এবং অকৈতবে খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেই সরল বিশ্বাস আমাদের না থাকায়, আমরা তদীয় রচনাকে ইতিবৃত্ত না ভাবিয়া কাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে বাধ্য হই।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের পৈতৃক বাসভবনের চিহ্নমাত্র নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর নির্ণয় হইয়াছে যে, মায়াপুর নামক পল্লীতে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র বাস করিতেন। জগন্নাথ দরিদ্র হইলেও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহ কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরমাত্র। কিন্তু এই কুটীরের মধ্যেও একটি সামান্য বিষ্ণুগৃহ ছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর ক্রমান্বয়ে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং সকলেই মরিয়া যায়। অবশেষে বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর নামে দুইটি পুত্র হয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন,—

"বহু কন্যাপুত্রের হইল তিরোভাব। তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
তবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥ শচীজগন্নাথগেহে হইল অধিষ্ঠান॥

তাহাতে কৃষ্ণদাসের আটটি কন্যার কথা মিলিতেছে না। উভয় বিবরণ

পাঠ করিলে এই পর্য্যন্ত অনুমান হয় যে, শচীর অনেকগুলি পুত্র কন্যা মরিয়া, শেষে বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর নামে দুইটিমাত্র পুত্র জীবিত থাকে। বৃন্দাবনের বর্ণনায় বিশ্বম্ভর অপেক্ষা বিশ্বরূপ অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, বিবেচনা হয়। বিশ্বম্ভরের শৈশবেই বিশ্বরূপ বিবেকী হইয়া সংসার ছাড়িয়া যান। বিশ্বম্ভর বড়ই চপল ছিলেন,—

"পিতামাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়। বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥"

অর্থাৎ বিশ্বম্ভর দুষ্টামি করিলে, বিশ্বরূপ তাহাকে শাসন করিতেন, এবং তজ্জন্য তিনি দাদাকে ডরাইতেন। অদ্বৈত নাড়িয়াল নামক এক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শচীঠাকুরাণীর প্রতিবেশী ছিলেন। ইঁহার গৃহে বৈষ্ণবদের একটি আড্ডা ছিল। বিশ্বরূপ সেই আড্ডায় যাইতে ভাল বাসিতেন, এবং তথায় ভাগবত পুরাণ পড়িতেন।

"উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈতসভায় আসি হয় উপস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যাখ্যানয়ে কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
* * *
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসে আপন মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈতসভায়।
প্রভু আইলেন জ্যেষ্ঠ নিবার ছলায়॥
* * *
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥
ভোজনে আইসহ ভাই ডাকেরে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলিল আপনি॥

ইহাতে দেখা যায়, গৌরাঙ্গ যখন উলঙ্গ হইয়া ধূলা খেলা করিয়া বেড়াইতেন, তখনও বিশ্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

যদিও গৌরাঙ্গের বাল্যজীবনের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ নাই, তথাপি তৎসম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, তাহাতে মূল সত্যের কিয়ৎ পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করেন, এবং প্রকাশ করেন যে, শিশুটি—

"বৃহস্পতি সমান হইবে বিদ্যাবান। অল্পেই হইবে সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান॥"

অর্থাৎ, অল্পদিন এবং অল্প পুস্তক পড়িয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে। অল্প দিনের মধ্যে দুই চারি খানি পুস্তক পড়িয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে নিপুণ হওয়া যায় কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু এই কোষ্ঠীগণনায় প্রকাশ যে, গৌরাঙ্গ বহু দিন ধরিয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। পরে প্রকাশ পাইবে যে, কেবল ব্যাকরণ পড়িয়াই তাঁহার বিদ্যাভ্যাস শেষ হইয়াছিল।

কোষ্ঠীগণনার সময় আর এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া গৌরাঙ্গের ভাবী জীবনের ঘটনা সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
* * *
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
* * *
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥"

যবনের মধ্যে প্রধানতঃ তিন জন—হরিদাস, রূপ ও সনাতন, গৌরাঙ্গের চরণে শরণ লইয়াছিল। তন্মধ্যে হরিদাস গৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বেই বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। হরিদাসকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করা চৈতন্যের কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত নহে। রূপ ও সনাতনকে তিনি যে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সূচিত হইয়াছে। এবং রূপসনাতন যে পূর্ব্বাশ্রমে 'বিষ্ণুদ্রোহী যবন' ছিলেন, তাহারও আভাস এ স্থলে পাওয়া যায়।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান শুনিয়া মহা উল্লাসিত হইলেন।

"আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান।
কিছু নাহি সুদরিদ্র;—তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥"
* * *

ইহাতে জানা যায়, জগন্নাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন।

জগন্নাথের পরিবারে প্রসূতিদের এক মাস সূতিকাগারে থাকিবার নিয়ম ছিল। এক মাস পরিপূর্ণ হইলে,—

"বালক উত্থান পূর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন॥
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পুজি তবে গেলা ষষ্ঠীস্থান।
যথাবিধি পুজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ॥
খই কলা তৈল সিন্দুর গুআ পান।
সবারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান॥"

সূতিকাগার হইতে নিষ্ক্রমণের কিয়ৎকাল পরে,

"নামকরণের কাল হইল সম্মুখ।"

তদবসরে শচীগৃহে অনেক 'বিদ্যাবান' ও 'পতিব্রতাগণের' সমাগম হইল। বিদ্যাবানগণের রুচি অনুসারে, 'প্রচণ্ডঘনগর্জ্জিতপ্রতিরবানুকারী' একটা বিকট শব্দে নামকরণের প্রস্তাব হইল; কিন্তু মঞ্জুভাষিণী পতিব্রতাগণ তাহাতে সম্মতা হইলেন না। তাঁহারা বলিয়া বসিলেন,—

"ইহার অনেক জেষ্ঠ কন্যাপুত্র নাই। শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাই॥"

অবশেষে রফা হইল যে, 'বিদ্যাবান'দের কথামত বালকের নাম বিশ্বম্ভরই হউক, কিন্তু—

"নিমাই যে বলিলেন পতিব্রতাগণ। সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥"

পতিব্রতাগণই জয়ী হইলেন।—বিশ্বম্ভর নাম রাখা হইল মাত্র, কিন্তু কেহ সে নাম উচ্চারণ করিল না; বালক 'নিমাই' বলিয়াই সংসারে পরিচিত হইল।

নামকরণের সময় এক্ষণকার ন্যায় তখনও একটি পাত্রে ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি দ্রব্য স্থাপন করিয়া, শিশু কোনটি লয়, দেখিবার জন্য, তাহার সম্মুখে ধারণ করা হইত। নিমাই সব ছাড়িয়া ভাগবত ধরিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তখন—

"সবেই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত। অল্পে সকল শাস্ত্রের জানিবে অনুভব॥"
সবে বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব। * * *

তৎকালে 'ভাগবত' পড়িতে পারিলেই মহা পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হওয়া যাইত।—বিদ্যার এইরূপই অবনতি হইয়াছিল। এ স্থলেও আভাস রহিয়াছে যে, পঠদ্দশায় চৈতন্যের অধ্যয়ন অতীব অল্পমাত্রাতেই হইয়াছিল। ফলতঃ, তৎকালে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুশাস্ত্রের আলোচনা দেশ হইতে একবারেই উঠিয়া গিয়াছিল।—

নিমাই দেখিতে অতীব সুশ্রী ছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁহার লাবণ্য এই-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষঃপরিসর॥
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষ অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর॥
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥"

চৈতন্য যে অনেকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিবিধ কারণের মধ্যে তদীয় মধুর আকৃতি অন্যতম। আমরা যেমন মনুষ্যের গুণে মোহিত হই, তেমন তদীয় সৌন্দর্য্যেও মোহিত হইয়া থাকি। মানবাকৃতি স্বভাবতঃই মাধুর্য্যের খনি। সর্ব্বদা দেখা যায় বলিয়া অভ্যস্ত বিধায়ে তৎ প্রতি আমাদের তাদৃশ মনোযোগ হয় না; কিন্তু জনমানবশূন্য স্থানে দুই এক দিন থাকিয়া যে কোনও এক মনুষ্যকে দেখিয়া যেন চক্ষু জুড়াইল মনে হয়। এরূপ স্থলে বহুসংখ্যক সুন্দর নরনারীর মধ্যে যখন কোনও এক নর-নারীতে সাধারণ মনুষ্যসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখা যায়, তখন সকলকেই চমকিয়া উঠিতে হয়। গুণের বিকাশ সকল সময়ে হয় না—গুণগ্রাহীর সংখ্যাও বিরল;—কেন না, গুণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ। কিন্তু লাবণ্যের বিকাশ সকল সময়েই হইয়া থাকে, আর যাহার চক্ষু আছে, সেই তদ্দর্শনে বিমল আনন্দ উপভোগ

করিতে পারে। তজ্জন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, সুন্দর নরনারীগণ মনের বা হৃদয়ের বিশেষ কোনও গুণ না থাকিলেও অন্যের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমধিক সমর্থ হয়। তাদৃশ নরনারীগণ আবার যদি গুণশালী হয়, তবে 'সোণায় সোহাগা' হইয়া উঠে, এবং তাহাদের ভক্তের অসদ্ভাব হয় না। গৌরাঙ্গের লাবণ্য কিরূপে তাঁহার সমকালীন লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, তাহা তাঁহার 'গৌরাঙ্গ' নামেই প্রকাশ। তরুণ বয়সে যখন তিনি সংসারের ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক ধারণ করিলেন, তখন সেই নবীন তপস্বীর মনোহর রূপে অনেকের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বাল্যাবস্থায় হামাগুড়ি দিবার কালে গৌরাঙ্গ কিরূপে এক বিষধর সর্প ধরিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বরত্বব্যঞ্জক এবং অলৌকিক বৃত্তান্ত সকল আমরা ভক্ত লেখক ও ভক্ত পাঠকদের জন্য রাখিয়া দিলাম। এ স্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চৈতন্য জনসমাজে বিখ্যাত হইলে, যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা স্মরণ করিতে পারিয়াছিল যে, বাল্যে তিনি অতিশয় উদ্ধত ও চপলস্বভাব ছিলেন। পাড়া পড়শীর ছেলেদিগকে ধরিয়া মারিতেন, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দ্রব্যসামগ্রী চুরী করিয়া খাইতেন, জলে ঝাঁপাই ঝুড়িতেন,—এবং তজ্জন্য পিতা মাতার নিকট অনেক সময়ে মার খাইতেন।

প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরা ছেলের নামে বাপ মায়ের নিকট মধ্যে মধ্যে নালীশ করিতে আসিত। ছেলেও বাপ মায়ের বড়ই অবাধ্য ছিল। মাতা মারিতে গেলে ছুটিয়া ছুতো হাঁড়ীর বনে গিয়া আশ্রয় লইত ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বাল্যচরিত্রে প্রবল মনোবেগের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার প্রবৃত্তি সকল অতি তেজস্বিনী ছিল, জানা যায়। প্রবৃত্তি সকলের উপর বিবেকের আধিপত্য স্থাপিত হইলে স্বভাব ধীর হয় ; ভাবী জীবনে যাহাদের বিবেকের সম্যক স্ফূর্ত্তি হইবার কথা, বাল্যেও তাহাদিগকে ভয় মৈত্রের সমধিক বশীভূত হইতে দেখা যায়। তাহাদিগকে বুঝাইলে বুঝে—শাসন করিলে মানে।—কিন্তু যে স্বভাবে প্রৌঢ়াবস্থাতেও বিবেকশক্তি প্রবৃত্তিনিচয়ের অধীন থাকার কথা, বাল্যে তাহা অশান্ত ও অদমনীয় হইবার কথা। এরূপ লোকে সময়ে সময়ে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির আবেগে মহৎকার্য্য সাধন করে, দেখা যায় ; কিন্তু তাহা বিবেকের সাহায্যে নয়। তাহা সময়ের গুণে ও অবস্থার গুণে ফলিয়া যায় মাত্র।

যথাসময়ে হাতে খড়ি লইয়া নিমাই পাঠশালায় প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পাঠশালায় পাঠের কালেই বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ঘটনা হয়। কথিত আছে, এই ঘটনায় নিমাইএর পিতা অতীব ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। বড় পুত্রটিকে তিনি সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন, এবং সে ভাগবত পড়িতে সমর্থ হইয়াছিল, দেখা যায়। জগন্নাথের হৃদয়ে অনেক আশার সঞ্চার অবশ্যই হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল একবারে উন্মূলিত হইল।

তিনি নিমাইএর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। ছেলেটি মূর্খ হইতে বসিল দেখিয়া, শচী দেবী স্বামীকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে কিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবে? মূর্খ পুত্রকে কেহ কন্যাদানও করিবে না, অতএব বংশই বা কিরূপে থাকিবে? পত্নীর বাক্যে জগন্নাথ উত্তর করিলেন,—

"—তুমি ত অবোধ বিপ্রসুতা!
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
পণ্ডিত পোষয়ে কেবা কহিল তোমাত॥
কিবা মূর্খ কিবা পণ্ডিত যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হইবে আপনে।
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ববল॥
সাক্ষাতেই এই কেন না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরেতে নাহি ভাত॥
ভাল মতে বর্ণ উচ্চারিতে যেবা নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥"

এই কথোপকথনে আমরা সেই সময়ের চিত্র সুস্পষ্ট নয়নগোচর করিতে পারি। ব্রাহ্মণসমাজের অতীব ক্লেশ ও দুর্দ্দশার সময়ে নিমাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল কথা তাঁহার পিতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উদিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তিনি অনেক মূর্খের দ্বারে অপমানিত হইয়া লেখাপড়ার উপর হতাদর হইয়াছিলেন। শচী ঘরের বাহির হন না—বাহিরে অধ্যাপক পণ্ডিতের কিরূপ সম্ভ্রম, তাহা তিনি দেখিতে পান না।—অবরোধে থাকিয়া পতিব্রতাগণ প্রাচীন বিদ্যার দুর্দ্দশা তত দেখিতে পাইতেন না। অধ্যাপকের পত্নী হওয়া যেমন পূর্ব্বে মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল, স্ত্রীলোকদের পক্ষে এখন অনেকটা তাদৃশ ছিল; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়েরা তৎকালীন বিষয়ী লোকের দ্বারে ধাক্কা খাইয়া, বিদ্যার প্রতি হতাদর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং নিমাইএর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যে অযত্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কারণ অতি সহজেই উপলব্ধি হয়।

নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ হইল। তিনি কিছু দিন বিদ্যালয়ে যাইতে বিরত হইলেন। ভক্ত লেখকেরা বলেন, ঈদৃশ অবস্থায় পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে

প্রেরিত হইবার উদ্দেশে নিমাই অতীব দুর্ব্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, অথবা মোটেই কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন। তবে অল্পবয়স্ক শিশু,—বিশেষ যাহার পিতামাতা দরিদ্র এবং ছেলেকে চক্ষুর উপর সর্ব্বদা রাখিতে অক্ষম,—গুরুমহাশয়ের হস্তে বাঁধা না পড়িলে যেরূপ দুঃশীল হয়, নিমাইও তদ্রূপ হইয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত সুব্যক্ত।

"পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু সঙ্গে।
কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে॥
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে।
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষপ্রায় চলয়ে হইয়া কুতুহলী॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হইলে বৃষ হইয়া ভাঙ্গয়ে আপনে।
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশুসংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
ডাকিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পালায়॥
এতেক চাঞ্চল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥"

অবশেষে এক দিন দেখা গেল, নিমাই ছুতা হাঁড়ির মধ্যে বসিয়া আছে। শচীদেবী সংবাদ পাইয়া হায় হায় করিয়া দৌড়িয়া গেলেন। ভক্ত লেখকেরা বলেন, এই অবস্থায় শিশু মাতাকে নাকি ঋষির ন্যায় অনেক গূঢ় শাস্ত্রকথা কহিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ধরিয়া স্নান করাইয়া ঘরে আনিলেন, এবং ছেলেটার পরকাল নষ্ট হইল বলিয়া স্বামীকে তর্জ্জনগর্জ্জন করিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিয়া যোগ দিল। সকলেই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন নিমাইএর উপনয়নসংস্কার করিয়া, জগন্নাথ তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ব্যাকরণের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

স্থরবালা।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশাখ মাস। বেলা তিনটা বাজিয়াছে। ঘোষেদের বাড়ীতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গিয়াছে। বাটীর ভিতরে, নিম্নতলের একটি প্রকোষ্ঠে একখানি পালঙ্কোপরি ভবতারণ শুইয়া আছেন। ভবতারণ সাধারণতঃ এই স্থানেই ঘুমান। কিন্তু সেটি যে শয়নকক্ষ, ইহা পালঙ্ক এবং নিদ্রিত ব্যক্তি দেখিয়াই

বুঝা যায়। তাহাতে বড় আরসি নাই, টেবিল নাই, ছবি নাই ; বরং এক ধারে একটি সেকালের সিন্ধুক আছে।

ভবতারণ নিদ্রিত বটে, কিন্তু নিদ্রা যেন গাঢ় নহে। শয়নের ভাব দেখিলেই বোধ হয় যে, বিশ্রাম তাঁহার উদ্দেশ্য। পা দুইটি পালঙ্কের বাহিরে ; উপাধান মস্তকে নহে, বক্ষঃস্থলে। দিনের বেলা ভবতারণ এইরূপেই ঘুমান। প্রয়োজনমত সামান্য শব্দ শুনিলেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; আবার যাহাতে তাঁহার উঠিবার আবশ্যক নাই, এমন শব্দ সহস্র হইলেও তাঁহার বিশ্রামে বাধা হয় না। একজন অতিথি আসুক, বাহিরে আসিয়া শব্দ করিবামাত্র তিনি উঠিয়া বসিবেন ; মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি বহির্বাটীতে। ঠিক যেন জাগ্রতের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে অন্য কারণে ভৃত্যেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করুক, গৃহিণী কন্যা কিম্বা বধূর সহিত কথাবার্ত্তা বলুন, ভবতারণের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিবে না। দার্শনিকেরা ত এইরূপই বলিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ মনের দাস। মন সর্ব্বদা জাগরিত। ইচ্ছা করিলে সে তাহাদিগকে জাগাইতে পারে ; আবার নাও পারে।

কাজ না থাকিলেও ভবতারণ যে সময়ে উঠেন, সে সময় প্রায় হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার গৃহিণী আহারান্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একটি তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদের মাতা বৃদ্ধ বলিয়া ভবতারণের স্ত্রীই এখন সংসারের কর্ত্রী। বাটীর সকলের সেবা করাই যেন তাঁহার জীবনের কর্ম্ম। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে পরিশ্রম করেন। বাটীর এমন স্থান নাই, যাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই তিনি অতিথশালায়, এই তিনি রন্ধনগৃহে, এই তিনি ঠাকুরঘরে, এই তিনি ভাণ্ডারে। বাটীতে এক জন ভৃত্য অভুক্ত থাকিতে তিনি নিজে আহার করেন না। দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের কেহ অনাহারে রহিল কি না, এ সংবাদও তাঁহার লওয়া আছে। এমন কি, গাভীগুলি উপযুক্ত আহার পাইল কি না, তাহাও তিনি সন্ধান করিয়া থাকেন। প্রভাতে বাটীর অন্যান্য গৃহ এবং প্রাঙ্গনগুলি যেমন পরিষ্কৃত হয়, তেমনই গোশালা হইতে গোময়, গোমূত্র প্রভৃতি অপসৃত হইল কি না, ইহা তাঁহার জানা চাই। দিনে আড়াই প্রহর এবং রাত্রিতে দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে মৎস্য, দুগ্ধ এবং অন্যান্য আহার্য্য সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত থাকে। বাড়ীর সামান্য কোন চাকর চাকরাণীর পীড়া হইলে, সহস্র কাজ সত্ত্বেও গৃহিণী দিনে দশ বার

তাহার শয্যাপার্শ্বে। গৃহিণী দেখিলেন, পশ্চিম দিকের একটি জানলা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে, এবং ভবতারণের ললাটে ও বক্ষঃস্থলে দু এক বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তিনি জানলাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভবতারণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং ক্ষণকালমধ্যেই উঠিয়া বসিলেন। গৃহিণী কহিলেন, "ঘুম হ'ল ?"

ভ। হাঁ, একটু জল দাও চখে দি।

চক্ষে জল দিয়া ভবতারণ বসিয়াছেন, গৃহিণী সহাস্তবদনে কহিলেন, "দেখ্‌বে এস।"

ভ। কি দেখ্‌ব ?

গৃ। দেখ্‌বে এস না।

এই বলিয়া গৃহিণী তাঁহাকে ভাঁড়ারঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

ভবতারণ কহিলেন, "কি দেখাবে বলই না ?"

গৃহিণী কহিলেন, "সে দিন যখন ছোট বউ (প্রেমচাঁদের স্ত্রী) বাপের বাড়ী যায়, সুরি তাকে সব গুছিয়ে দিলে। কাল সুরি যাবে শ্বশুরবাড়ী, আমি বলিলাম, 'নে না, যা তোর ইচ্ছা হয়, ভাঁড়ার থেকে গুছিয়ে নে।' সে কিছুতেই হাত দিল না। তাই আমি বউমাকে বলেছিলাম, তোমার ননদ শ্বশুরবাড়ী যাবে, কিছু জিনিষ পত্র দাও। তা, এমনি গুছিয়ে রেখেছে, তুমি দেখ্‌লে অবাক হবে।"

ভ। বটে।

গৃ। দেখনা।

ভবতারণ দেখিলেন, কতকগুলি মুখবাঁধা হাঁড়ি ভাঁড়ারের একধারে সজ্জিত রহিয়াছে।

ভবতারণ কহিলেন, "খোল দেখি এক একটি, আমি দেখি।"

গৃহিণী মুখ খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন, কোনটিতে ঘি, কোনটিতে আকের গুড়, কোনটিতে মুগের দাইল, কোনটিতে পুরাণ তেঁতুল, ইত্যাদি।

সুরবালা এবং কামিনী পার্শ্বের এক ঘরে বসিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের স্ত্রীর নাম কামিনী।

ভবতারণ পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা, একবার এ দিকে এস!"

কামিনী শ্বশুরের সাক্ষাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহির হন না, কিন্তু ভবতারণ নাছোড় বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আসিতে হইত।

তাঁহার শ্বাশুড়ী বাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যাও না একবার ডাক্‌ছেন যে। যাও, ওঠ।"

কামিনী বাহির হইয়া শ্বশুরের সমক্ষে আসিলেন।

ভবতারণ সুরবালাকে শুনাইয়া কহিলেন, "হাঁ মা, পরের ঘরে নেবার জন্যে এমন করে গুছিয়া দিয়েছ?"

কামিনী কথা না কহিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং সাবগুণ্ঠনমস্তকে এক বার শ্বশুরের চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন।

ভবতারণ, "লক্ষ্মী মা আমার—সাবিত্রী সমান হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হিন্দুর গৃহ ভিন্ন শ্বশুরের এমন আদর বধূর ভাগ্যে অন্য কোথাও ঘটে কি?

ভবতারণ ও গৃহিণী ফিরিলেন। উভয়ের মুখে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। গৃহিণী কহিলেন, "এ বয়সে অমন বুদ্ধি আমি দেখি নাই। সুরিকে এত ভাল বাসে। আর মন কেমন—আমি শুন্‌ছি দাঁড়িয়ে—সুরি বল্‌ছে 'প্রায় সব ঘিটাই যে দিলে'; বউমা বলছেন, 'দিলাম দিলাম, আমাদের হয় ত কালই আবার আস্‌বে তালুক থেকে'।"

ভবতারণ বলিলেন, "সাধে কি বলি, 'সে কালের কথা বড় ঠিক।' মেয়ে আন্‌বে পড়ন্ত ঘর থেকে—দেবে উঠন্ত ঘর দেখে—কত বড় ঘরের মেয়ে—আজ কাল পড়ে গেছে—নজরটা যাবে কোথায়?"

গৃ। তা ঠিক। লোককে দিতে পারলে কি এত খুসি। গরীব দেখলে আর রক্ষা নাই। মাস পাঁচেকের কথা হবে—তখন বউমা আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কন না—একটা কাঙ্গাল বুড়ী এসেছে সকাল বেলায় ভিক্ষা কর্ত্তে, শীতে কাঁপছে থর থর করে—এসেই বলছে, 'মা এক খানা—কাপড়।' বউমা নিজের বাক্স থেকে দিব্যি এক খানি মোটা কাপড় বা'র করে এনে আমাকে দেখাচ্ছেন—কেন না 'দিব?' আমি বলিলাম, 'দাও। ও পাড়ার বামুন ঠাকরুণ তোমাকে যে কাপড় খানা দিয়াছিলেন, সেইখানা দিলে হ'ত না?' তা ঝিকে দিয়ে বলালেন, 'ও খানা এর চাইতে পাতলা। বেশী দিন টেক্‌বে না—আর, ও বুড়ী যদি এখনই তাঁর বাড়ীতে যায়, তিনি হয় ত কাপড় দেখে চিন্তে পারবেন, তাঁর মনে কষ্ট হবে। ভাববেন যে খারাপ কাপড় বলে পরেনি।' বুঝ বিবেচনা।"

ভ। বটে!

এই সময়ে সুরবালা দরজার নিকটে আসিয়া ব্যগ্রতার সহিত কহিল, "ওমা, মা, ছোটদা এসেছেন।"

গৃ। কই?

শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—

ভ। কাল আসবার কথা ছিল না? এক দিন এগিয়ে এসেছ।

শরৎ পিতা মাতার চরণ বন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হাঁ কালই আসবার কথা ছিল, কলেজ বন্দ হল—দুপুরের পরই বেরিয়ে পড়লাম।"

ভ। তা বেশ করেছ—কাল এলে হয় ত সুরবালার সঙ্গে দেখা হত না। ও কালই শ্বশুরবাড়ী যাবে।

এই সময়ে সুরবালা আসিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইল।

পাঠক একবার সুরবালাকে দেখিয়া নিন। সুরবালা সুরবালাই বটে। তাহার পদ নখে শরদিন্দুর ছড়াছড়ি নাই। কৃষ্ণ কেশরাশি দেখিলেও কেহ সর্পভয়ে যষ্টি তুলিবে না। দন্তপাঁতির এক একটি খুলিয়া দিলেও কেহ মুক্তা-ভ্রমে ক্রয় করিবে না, ইহা নিশ্চয়। অথচ সুরবালা সুকেশী, সুদতী, তাহার পদনখ বিনা অলক্তেও রক্তিম-আভাযুক্ত বটে। এক কথায় সুরবালা সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক এবং স্থির। তাহাতে মাধুরী আছে, মোহ নাই। লাবণ্য আছে, চাঞ্চল্য নাই। সে অযত্নসুলভ সৌন্দর্য্যে কৃত্রিমতা বা অভি-মানের ছায়ামাত্র নাই। দেখিলেই মনে হইবে, সে যেন সেবিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না—সেবা করিতে চাহে। সাধু সেমূর্ত্তিতে যাহা দেখিতে পাইবে, পাপী তাহা পাইবে না। একের প্রতি দেবতাজ্ঞানে সে যেন আকৃষ্ট হয়, অন্যকে পশু ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দুর গৃহে অন্যবিধ সৌন্দর্য্যের আদর অতি অল্প।

শরৎ সুরবালার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি হাব্লি! কাল এলে তোর সঙ্গে দেখা হ'ত না?"

শরৎ সুরবালাকে আদর করিয়া হাব্লি নামে ডাকিতেন। এ নামের কিছু অর্থও না ছিল, তাহা নহে। সাধারণতঃ কোন বালিকা কিছু বোকা হইলে তাহাকে হাব্লি নাম দেওয়া হয়। সুরবালা শৈশব হইতেই সরলতার প্রতিমা ছিলেন। তাই শরৎ তাহাকে আহ্লাদ করিয়া এই নাম দেন। শরৎ সুর-বালার ভালবাসা বড়ই অধিক। বয়সের অল্প পার্থক্য বলিয়া তাহাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা। শ্যামাচরণ তাহাদের উভয়ের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া

তাহারা তাঁহার কাছে বড় ঘেঁসিতেন না। সুরবালা শ্বশুরবাড়ীর নাম শুনিয়াই লজ্জিত হইল, এবং কোন কথা না কহিয়া অবনতবদনে শরতের চরণে নমস্কার করিল। সঙ্গে সঙ্গেই পিতা মাতাও এক এক নমস্কার পাইলেন।

বঙ্গগৃহে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখনও এই নিয়ম যে, যেখানে কাহাকেও নমস্কার করিবার প্রয়োজন হইবে, সেখানে সমাগত সমস্ত গুরুজনকেই অভিবাদন করিতে হইবে। নমস্কার ব্যাপারে সুরবালার মস্তকের অযত্নসংন্যস্ত কেশগুলি ললাটদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল—দুএকটি চক্ষের উপরও না আসিয়াছিল, এমন নহে। সুরবালা মস্তক উত্তোলন করিতেই শরৎ তাহার চুলগুলি মাথার উপরে আনিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, "আঃ হাব্‌লি, চুলগুলিও সমান কর্ত্তে শিখ্‌লে না, কাল না শ্বশুরবাড়ী যাবে ?"

সুরবালা শরতের কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "ছোট্‌দা, তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

শ। সন্ধ্যা হয়, আর আমার খাওয়া হয় নি। রাস্তায় খেয়ে এসেছি।

গৃহিণী সুরবালার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শরতের একটু পা ধোবার জল এনে দে।"

সুরবালা চলিল।

শরৎ বলিলেন, "থাক্‌, এসে মুখ হাত ধুচ্ছি। যাই একবার ঠাকুরঘরে—প্রণাম করে আসি ছোট্ ঠাক্‌মাকে। কাকা বাবু বুঝি বাড়ীতে নাই ?"

ভ। না, আস্‌বে আজ সন্ধ্যা বেলায়। শ্যামও আস্‌বে কথা আছে। শরৎ চলিয়া গেলে গৃহিণী কথা পাড়িলেন, "এইবার শরতের বে'টা দিয়ে ফেল।"

ভ। মুখ দিয়ে ব'র কর্‌লেই হয়। কত যায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে।

গৃ। দত্তপুকুরের মিত্রেরা ত অনেক দিতে থুতে চায়, আর শুনেছি মেয়েটিও পরীর মত।

ভ। ও কথা বলো না। শ্বশুরের দেওয়ায় কি মানুষের কুলায় ? আজ কাল যে সব কাণ্ড আরম্ভ হচ্ছে শুনি—তারা যা ইচ্ছা করে দেবে, সেই ভাল। লোককে জব্দ করে নেওয়া পেজোমি।

গৃ। সে তুমি যা ভাল বোঝ, করো। বে'টা দিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি।

ভ। আসুক প্রেমচাঁদ আর শ্যামাচরণ—শরৎকেও একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল।

গৃ। ওকে আবার কি জিজ্ঞেস কর্‌বে ?

ভ। বয়স হয়েছে—বুদ্ধি হয়েছে—

গৃ। হাঁ, যা নয় তাই—ছেলেকে আবার জিজ্ঞাসা।

এই সময়ে শরতের প্রত্যাগমনে ইঁহাদের কথোপকথন চাপা পড়িয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়।

"না, সে ছেলে কিছুতেই মাছ খাবে না।"

প্রেমচাঁদের জননী এই কথা বলিতে বলিতে ভবতারণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন—

ভবতারণ জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে কাকিমা ?"

পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিত ঘটনার পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে,ভবতারণের আহার শেষ হয়,এমন সময়ে, শরৎ আসিয়া বাড়ীতে পঁহুছিয়াছেন। আহারান্তে ভবতারণ তাম্বুল চর্ব্বণ এবং তামাকু সেবন করিতেছেন, শরৎ বাড়ীর ভিতরে আহারে নিযুক্ত, সেই সময়ে ভবতারণের পিতৃব্য-পত্নী—যেন আপন মনে বকিতে বকিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন; তাহাতেই ভবতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে কাকিমা ?"

বাস্তবিক বৃদ্ধার আপন মনে বকা উদ্দেশ্য নহে। ভবতারণকে কথাটি শুনাইবেন বলিয়াই তিনি সেখানে আসিয়াছেন। অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ইচ্ছায় অনেকে অনেক সময়ে এই ভাবে কথা আরম্ভ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক এবং মূর্খেরই এই স্বভাব প্রবল। তুমি বসিয়া আছ—রামার মা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, বাতাসের সহিত বলিতে বলিতে যাইতেছে, "যিনি যেমন দেখেন, ভগবান জান্‌বেন। কখনও কারও মন্দ জানি না, যিনি মন্দ ভাব্‌বেন, তার বিচার তিনিই করিবেন"—তোমার কর্ণ আছে, তুমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবে, "কি হয়েছে রামার মা ?"

"এই ও বাড়ীর বড় কর্ত্তার কথা বল্‌ছিলাম—আমার রামাকে দু চক্ষের বিষ দেখেন। সে দিন"—বলিয়া রামার মা তার বক্তৃতার ঝুড়ি খুলিয়া বসিল।

অথবা রামার বাপ দীনু দত্তই যাইতেছেন—

বিড়্ বিড়্ কচ্ছেন, "না এলেন, নাই এলেন—পড়সী আর আর্‌সি সমান; যেমন দেখাবে, তেমনি দেখাব—"

তুমি জিজ্ঞাসিলে, "কি হয়েছে গা ?"

"এই রামার বে'তে নিমন্ত্রণ করেছিলাম্ প্রতাপ ঘোষকে, তা অহমিকে

করে আসা হল না” বলিয়া দীনু তাহার ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত সমস্তব্য বিবৃত করিতে লাগিল।

প্রেমচাঁদের জননীও ঠিক এই ভাবে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভবতারণ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কাকিমা, কি হয়েছে?” অমনি তাঁহার উৎস ছুটিল। আরম্ভ করিলেন, “না, ঐ তোমার বিদ্বান্ ছেলে, এবার নূতন বিদ্যা করে এসেছেন ‘মাছ খাব না’।”

ভ। কে? শরৎ? মাছ খাবে না? প্রবৃত্তি না হয়, নাই বা খেলে।

এই সময়ে ভবতারণের গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বৃদ্ধা সরিয়া গেলেন।

গৃহিণী আরম্ভ করিলেন, “নাই বা খেলে? তুমিই ত মাথা খেলে। একেবারে কিছু বলবে না?

ভ। কি বল্‌ব? অন্যায়টা কি করেছে যে বলব্?

গৃ। অন্যায় কি করবে? ছেলে যে বিগড়েছে, তা কি টের পাচ্ছ না? সুরি শ্বশুরবাড়ী গেছে বৈশাখ মাসে—এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অঘ্রাণ, সাত আট মাসের মধ্যে ছেলের যেন সব উল্‌টে গেছে। পূজোর ছুটীতে ত বাড়ীই এল না, শীতের ছুটীতে এসেই এই। সেই এক বের কথা বল্লে, ভাল, তাই না হয় শুনুক; তা না—বি এ পাশ না করে আমি বে করিব না। ছেলের বে বাপ মায় দেবে—এ আবার কি নূতন কথা যে, ছেলের মন না হলে বে হবে না। তুমিই ত সব নষ্টের মূল। ছেলে বল্লে,—সুরিকে ছেলে বয়সে বে দেওয়া হবে না, তা প্রকৃত বার বছরের না হলে ঘর থেকে মেয়ে বা’র কল্লে না। ছেলে এখন ভাবে, মেয়ের বেলায়ই যখন আমার আব্‌দার চলেছে, তখন আমার বেলায় আমি যত বয়স বল্‌ব, তাই হবে। আর—”

এইবার গৃহিণী স্বর ছোট করিলেন, এবং স্বামীর কর্ণের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন, “এই বেলা যা’ তা’ একটা গলায় গেঁথে না দিলে ত ছেলেই আর বশে থাকবে না—হয় ত কোন দিন কলকাতায় বে করে বস্‌বে। এই যে পূজোর সময় বাড়ী এল না, ঘরে সোমত্ত বউটি থাক্‌লে অবশ্যই আস্‌ত।”

ভ। আঃ বুদ্ধি! শীতের ছুটী কাছে বলে পূজোয় আসেনি। আর কল্‌কাতায় বে করবে, তাতে তোমার ভয় কি? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ তাই থাকে, হবে।

গৃ। অমন কথা বলো না। ছেলে বে দিয়ে ঘরে বউ আনে—সেখানে শুনেছি, বে দিয়ে ছেলেটিকে বেচে আস্‌তে হয়।

ভ। সে ঘর বিশেষ আছে—মেয়ে বিশেষ আছে—ছেলে বিশেষ আছে—কপালে তাই থাকে, হবে।

গৃ। তুমি ত এক কপাল ভেবে রেখেছ—সব তাতেই কপাল—আপাততঃ যা হয়েছে, তার কি?

ভ। কি হয়েছে?

গৃ। মাছ যে খাবে না? আর সে কেমন? আমি, ছোট ঠাকরুণ, শেষ-কালে বউমা, যে আজও ওর সাম্‌নে বেরোয় না, সে পর্য্যন্ত এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, আমি এত সাধ্য সাধনা—ছেলে চকের জল ছেড়ে দিলে। বলে, 'মা, আপনি মা হয়ে আমাকে অন্যায় কাজ কর্ত্তে বলেন?'

ভ। বেশ ত বলেছে। ওর যদি প্রবৃত্তি না হয়, নাই বা খেলে মাছ।

গৃ। ও যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাবে—

ভ। ব্রহ্মজ্ঞানী কি গালাগালি? ব্রাহ্মদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন শুনেছি—যে তাঁদের পূজা কর্ত্তে হয়। ভগবানকে ভজ, যিনি যে ভাবেই ডাকুন, মনটা ঠিক থাক্‌লেই হল।

গৃ। তোমার কাছে ত সকলই ভাল। নিজে ভাল—তাই জগৎ ভাল।

ভ। আর কে বলেছে তোমায় যে ব্রাহ্মেরা মাছ খায় না? মাছ না খাওয়া কি হিন্দুর ধর্ম্ম নয়?

গৃ। ধর্ম্ম টর্ম্ম তত বুঝি না—এই টুকু বুঝি যে, ছেলে না বেগড়ায়। তুমি যাই বল, যাই কও, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। শরৎ আমার কথা শুন্‌লে না? ওর কি সন্ন্যাসী হবার বয়স হয়েছে? ওর যখন এগার বছর বয়স, সেই সময়ে একদিন আমি নদীর ঘাটে বলে দি, 'বাবা, নদীতে সাঁতার কাট্‌তে নাই।' আর গেল বছর জামাই এসে ওর সঙ্গে নাইতে গেছেন—বল্লেন, 'শরৎ বাবু, এস না একটু সাঁতার কেটে আসি।' ও বল্লে, 'না—মা এক দিন বারণ করে-ছিলেন—সেই থেকে আমি সাঁতার কাটিনে।' জামাই হাস্‌তে লাগলেন—বল্লেন—'কবে মা বারণ করেছেন—আর আজও তাই মনে মনে ঠিক আছে।' সেই শরৎ—আমি নিজে মাছের ঝোল পাতে ঢেলে দিলাম, এ ছুঁলে না।

গৃহিণীর অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

শরতের কার্য্যে জননীর চক্ষের জল এই প্রথম বিসর্জ্জিত হইল।

শরৎ! তুমি দেখিলে না। এ জল কিন্তু সন্তানের সহস্র সৎকর্ম্মের বিরুদ্ধে সঞ্চিত হয়।

ভবতারণ বুঝাইলেন—"কেন তুমি অন্যায় অনুরোধ কর্ত্তে গেলে। ছেলের বয়স হয়েছে—বুদ্ধি হয়েছে—এখন ওর ইচ্ছা। এ সব বিষয়ে সহ্য করে থাকাই ভাল। কথাটা না বল্লে আর এ কষ্ট টুকু পেতে হ'ত না।"

গৃহিণী এবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এতক্ষণে তিনি স্বামীর সহানুভূতি পাইয়াছেন। হৃদয় আর ধৈর্য্য মানে কি?

ভবতারণ যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "দেখ, ব্রাহ্ম হলেও এসে যায় না। হিন্দু হলেও এসে যায় না। মানুষ হলেই হল। ভাল মন্দ সব সমাজেই আছে। এদিকে মালা টপ্ টপ্, ওদিকে পরের সর্ব্বনাশ, এমন লোকও ত আছে। মনটা ঠিক চাই। ভগবানে ভক্তি আর লোকের প্রতি ভালবাসা, এই জিনিষ—তবে সমাজ ছেড়ে যাওয়া, আমাদের ছেড়ে যাওয়া—ওর যদি তেমন মতি গতি হয়—যাবে। তুমি কাঁদলেও কিছু হবে না—আমি কাঁদলেও কিছু হবে না। সংসারে কে কার? নিজের নিজের পথ দেখ। কার বা ছেলে, কার বা মেয়ে?" গৃহিণীর এ সব কথা যেন ভাল লাগিল না। তিনি ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

'আত্ম-জীবনচরিত'।

তৎকালে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত আট দশ ক্রোশের বহির্দ্দেশে ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও কেরাণীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কর্ম্ম মফঃস্বলে দৃষ্ট হইত না, এবং এই সকল পদের বেতন বা মান অধিক ছিল না। দেশের সমস্ত জেলার রাজকার্য্য পারস্য ভাষায় নির্ব্বাহ হইত। সে সকল পদের বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত, এবং পদেরও গৌরব বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পরিবারেরা আপন আপন সন্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া পারস্য বিদ্যার শিক্ষা দিতেন।

অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দুস্থানীয় লালা শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তিন টাকা বেতন পাইতেন ও বাটীতে আহা-

রাদি করিতেন। আমি ও আমার পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন রায় তাঁহার নিকট পাঠারম্ভ করি। মধুসূদনকে আমি মধ্যম দাদা বলিয়া ডাকিতাম, এবং এক্ষণেও বলিয়া থাকি। কিয়ৎকালানন্তর শিক্ষকের সুরাসক্তিদোষ প্রকাশ হইল। তৎকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুত বা বিক্রীত হইত না। তিনি প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ঐ বাজার হইতে মদ্যপান করিয়া যাইতেন, এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। একারণ গুরুজনেরা তাঁহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

এ ওস্তাদের পানদোষ ছিল না বটে, কিন্তু বিষম দোষান্তর প্রকাশ হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্য দ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন; এ কারণ তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। নিবারণ রায় নামক একটি প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম দাদার ও ঐ বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হয় যে, উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বারা ৫৲ টাকা ওস্তাদের নিকট পাঠাইবেন। নির্দ্ধারিত দিবসে মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিলেন যে, বাক্সের চাবি পিতার নিকট আছে। দাদা মহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া ওস্তাদকে দিলেন। পর দিবস বালকের পিতা বাক্সের মধ্যে টাকার সংখ্যা ন্যূন দেখিয়া বালককে তাড়না করাতে, তিনি ইহার প্রকৃত অবস্থা পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। পিতা আমাদের কর্ত্তৃপক্ষকে বিদিত করিলেন ও মধ্যম দাদাও অপহরণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং ওস্তাদকে দূরীভূত করা হইল।

তদনন্তর ক্রমান্বয়ে আর দুই ওস্তাদ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের দোষ গুণের কথা স্মরণ নাই। প্রাতঃকাল অবধি বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ও তৃতীয় প্রহর হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ওস্তাদের গৃহে থাকিয়া পড়িতে হইত। কিন্তু তিন বৎসর মধ্যে একখানি পুস্তকেরও পাঠ সমাপ্ত হয় নাই। এই দুই ওস্তাদ আপনারাই বিদায় হন, কি কর্ত্তারা তাঁহাদিগকে বিদায় করেন, তাহা স্মরণ হয় না।

পঞ্চম ওস্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণভোজনের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওস্তাদের আর আনন্দের সীমা

থাকিল না। মধ্যম দাদা ভাণ্ডারগৃহের জানালা দিয়া খাদ্যদ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহা ওস্তাদের গৃহে পৌছিয়া দিতাম। বিবাহের ৩।৪ দিন পুর্ব্বে এক রাত্রিতে ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইলাম। আমি দ্রব্যজাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম, ওস্তাদজি মহা আনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, অদ্য আর পড়িতে হইবে না, তোমাদিগকে ছুটি দিলাম। ওস্তাদজিকে সদয় দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তাঁহার এতাধিক সদয় হইবার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পর তৃতীয় দিবসের প্রাতে মধ্যম দাদা কর্ত্তাদিগকে কহিলেন যে, "ওস্তাদজি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, 'বিবাহের পর দিবস যখন পাত্র পাত্রীকে বরণকরণার্থ সমারোহ হইবেক, তখন তুমি তোমার ভাইয়ের গলা হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া আমাকে আনিয়া দিবে।' আমি ভয়ে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কথামত কার্য্য করিতে পারি নাই। কল্য রাত্রিতে তিনি আমাকে অত্যন্ত তাড়না করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার ঘরে যাইলেই কোন ছলে আমাকে পীড়ন করিবেন। অতএব তাঁহার ঘরে যাইয়া পড়িবার সাহস হইতেছে না।" এই বৃত্তান্তশ্রবণে কর্ত্তারা কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে ওস্তাদ আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "আমার ঘরের এঁটো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" ওস্তাদের বাসের নিমিত্ত একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। তাহার একাংশে তিনি রন্ধন ও ভোজন করিতেন, অপরাংশে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আমরা পড়িতাম। উভয়াংশের মধ্যে একটি সামান্য আবরণ ছিল। যে অংশে আমরা বসিতাম, তাহা উচ্ছিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং আমার ঘরের এঁটো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস,—"শিবের মন্দিরে কে, আমি কলা খাই নাই",—সেইরূপ অসঙ্গত কথাতে, মধ্যম দাদার বাক্য সত্য জ্ঞান হইল। ওস্তাদের এ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; যে হেতুক তৎকালে শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞান হয় নাই। যাহা হউক, ওস্তাদজি বিদায় হইলেন, এবং আমরাও আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

বোধ হয়, ১২৩৭ বঙ্গাব্দে উপরোক্ত ঘটনা হইয়াছিল। এই বৎসর আমার উপনয়ন হয়। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। ইদানীং যে যজ্ঞসূত্র যুবকেরা অশ্রদ্ধা বা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, সেই যজ্ঞসূত্রের জন্য তদানীন্তন বালকেরা লালায়িত হইত, এবং অদ্যাপিও অনেক বালক হইয়া

থাকে। গত বর্ষে আমার উপনয়নের দিন স্থির হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাগর্জ্জন হওয়াতে উহা ঘটে নাই। এই দুর্ঘটনাতে আমি কতই দুঃখিত হইয়াছিলাম, এবং মাতা ঠাকুরাণীকে ক্রন্দন করিয়া কতই জ্বালাতন করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমার জন্য একজোড় হরিদ্রা বর্ণের কার্পাসবস্ত্র আনীত হইয়াছিল। উপনয়ন না ঘটাতে তাহা ফেরত দেওয়া হইল। এই বস্ত্র ফেরত দেওয়াতে আমার যত দূর দুঃখ হইয়াছিল, বোধ হয়, ব্রাহ্মণ হইতে না পারাতে তত দুঃখ হয় নাই।

আহা! দেশের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বসুগঠিত দ্রব্য ভগ্ন হইল, অথচ তৎপরিবর্ত্তে কোন উত্তম দ্রব্য পুনর্নির্ম্মিত হইল না। অতি প্রাচীন কালে উপবীত না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হইত না বলিয়া বালককে উপবীত ধারণ করাইয়া উপযুক্ত গুরুসন্নিধানে প্রেরণ করা হইত, এবং বালক যথোচিত পাঠসমাপনান্তে পিতৃনিকেতনে প্রত্যাগত হইত। এ বিষয় বহুকালাবধি এ দেশস্থ লোকের চিন্তাতীত হইয়াছে। ইদানীং কেবল ব্রাহ্মণ হইবার জন্য যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন, ইহাই সকলের বোধ আছে। কিন্তু কি কি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণনামধারণের উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহার বিচার-চক্ষু এককালে অন্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে জ্ঞানলাভের জন্য যে উপনয়নের প্রয়োজন হইত, তাহা এই কালে কেবল ঠাকুর পূজা করিবার ও ফলাহারলাভের নিমিত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলে বালকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ উপবীত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিব, এই ভাবিয়া, বালকের হৃদয়ে আহ্লাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তাদের মুসলমান শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবাতে, এক জন কায়স্থজাতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তিনি অতি শান্তস্বভাব ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি সতত সদয় থাকিতেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত আমাকে কখন কখন কহিতেন যে, "তুমি অধিক দুগ্ধ পান করিতে পাও বলিয়া এত গৌরাঙ্গ হইয়াছ; যদি আমি অন্ততঃ এক পোয়াও পাই, তথাপি গৌরবর্ণ হইতে পারি।" এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকের নিকট যেরূপ শিক্ষা হইল, তাহা লেখা বাহুল্য। এক বৎসর পরেই তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত এক যোগ্যতর মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

যত দিন আমি বাঙ্গালা লেখা পড়া করিতাম, ততদিন প্রায়ই পিতার সহিত তাঁতিমা গ্রামের গোলাবাটীতে থাকিতাম। তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম,

অথচ তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি কখন আমাকে সঙ্গে না লইতেন, তবে নিরন্তর কান্দিয়া মাতাঠাকুরাণীকে অস্থির করিয়া দিতাম। সুতরাং তিনি আমাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই গোলাবাটী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং তথায় কৃষিকার্য্যও বাহুল্যপরিমাণে চলিত। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় এই বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি রাজবাটীর আমিনী-পদে নিযুক্ত হইলে পিতাঠাকুর এই গোলাবাটীর কারবারের ও কৃষিকার্য্যের অভিভাবকতা করিতেন। মধ্যম তাত মহাশয় আমাদের শাঁকদহ ও ভগবান-পুর নামে যে দুই দরপত্তনী তালুক ছিল ও তাহাতে যে নীলকুঠী ছিল, তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিতেন।

আমরা পারস্যবিদ্যারম্ভকরণের দুই বৎসর পরে ওস্তাদ সহিত উক্ত কুঠীতে বৎসরের কিয়দংশ কাটাইতাম। বাটী থাকিলে পাছে কেবল খেলা করিয়া বেড়াই, এই জন্য আমাদিগকে কুঠী লইয়া যাওয়া হইত। ঐ দুই তালুকে ইতর জাতি ব্যতীত ভদ্র.লোকের বসতি ছিল না। সুতরাং প্রতিবাসী কোন বাল-কের সহিত সাক্ষাৎ হইত না। দিবারাত্রি বন্দীর ন্যায় কুঠীতে বদ্ধ থাকিতাম। পল্‌দাবিলের উভয় পার্শ্বে এই দুই গ্রাম অবস্থিত। বিলের ধারে এই কুঠী ছিল, এবং তাহার সম্মুখে এক বিস্তৃত মাঠ দৃষ্ট হইত। যখন বর্ষাকালে ঐ সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে নবীন শ্যামল ধান্যবৃক্ষরাজি শোভা পাইত ও যখন পবন-হিল্লোলে এই সকল নৃত্য করিতে থাকিত, তখন কি মনোহর সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইত। অথবা শীত-কালে যখন ঐ মাঠ সর্ষপবৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত হইত, তখন কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিত। বোধ হইত, যেন সমস্ত ক্ষেত্রে স্বর্ণ-বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। কিন্তু কি উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগরসন্নিধানে, কি অত্যুচ্চ শোভনীয় শৈলশৃঙ্গে, কি বিশালবৃক্ষ-পূর্ণ রমণীয় গহন-কাননে, কি অমরাপুরীসম অতি মনোহর নগরে, কোন স্থানেই বন্দীর সুখানুভব হয় না। আমরা একে বালক, তাহাতে বন্দীর ন্যায় অবস্থিত, সুতরাং আমাদের এ সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা কি ছিল; আমরা বাল্যসখাদের সহবাসসুখে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদাই অসুখে কালযাপন করিতাম। কত দিনে আবার তাহা-দের সঙ্গে সুখভোগ করিব, ইহাই ভাবিয়া ম্রিয়মাণ থাকিতাম। একে পাঠ্য-পুস্তক আমাদের বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য, তাহার উপর আবার শিক্ষকের অপ্রীতি-কর ব্যবহার ছিল। সুতরাং যতক্ষণ ওস্তাদ সমীপে থাকিতাম, ততক্ষণ যে আমাদের কি কষ্টে যাইত, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

No. 8811

(1.) Title and English translation. Sahitya Vol VII No 203

(2.) Language, Bengali

(3.) Name of the Author, Translator, or Editor, Pandit Suresh Chandra Samajpati

(4.) Subject, Misc:

(5.) Places of printing and publication, 13/7 Brindabon Bose's Lane

(6.) Names of Printer and Publisher, Do Jogneswar Ghosh Do Satish Chandra Mukherjee

(7.) Date of issue, 8th Sraban 1313 BS

(8.) Number of sheets, leaves, or pages, 64 Pages

(9.) Size, 8vo

(10.) Number of the edition, First

(11.) Number of copies of which the edition consists, 1500

(12.) Printed or lithographed, Printed

(13.) Price, 1/4

(14.) Name and residence of the proprietor of copy-right, The Editor 13/7 Brindabon Bose's Lane

[illegible signature]

Inspector-General of Registration.

প্রথমে আমরা সেথ মসলহার্দ্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশপুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতিক্ষুদ্র ও অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরবন্দনা, ২য় অধ্যায়ে আত্মোপদেশ, ৩য় অধ্যায়ে দয়ার মাহাত্ম্য, ৪র্থ অধ্যায়ে দানের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে কৃপণতার দোষ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নম্রতার গুণ, ৭ম অধ্যায়ে অহঙ্কারের দোষ, ৮ম অধ্যায়ে বিদ্যার মহিমা, ৯ম অধ্যায়ে মূঢ়সঙ্গত্যাগ, ১০ম অধ্যায়ে সুবিচার, ১১শ অধ্যায়ে দৌরাত্ম্যের নিন্দা, ১২শ অধ্যায়ে সন্তোষের গুণ, ১৩শ অধ্যায়ে লোভের দোষ, ১৪শ অধ্যায়ে ঈশ্বরের বশ্য থাকন, ১৫শ অধ্যায়ে কৃতজ্ঞতা, ১৬শ অধ্যায়ে সত্যের মহিমা, ১৭শ অধ্যায়ে মিথ্যার অযশ, ১৮শ অধ্যায়ে সংসারের অনিত্যতা, ১৯শ অধ্যায়ে সম্পদের অস্থায়িত্ব, এবং ২০শ অধ্যায়ে সংসারাসক্তির দমন কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরলভাষায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনামা পারস্য বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঠেই বা কি লাভ হইবে? কারণ তৎকালে কোন পারস্যপুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু ভাষায় অর্থশিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ, বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুস্তিকা বাঙ্গালা অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত।

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদীর বিরচিত গোলস্তাঁ অর্থাৎ গোলাব-ফুল-কানন নামে গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। এই খানি গদ্য পদ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপক্রমণিকার আরম্ভে পারস্যরীত্যনুসারে প্রথমে ঈশ্বরের মহিমাবর্ণন, তৎপরে মহম্মদ ও পায়গম্বরের মাহাত্ম্যকথন, তদনন্তর স্বদেশের রাজার যশ কীর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পর রচয়িতা এই গ্রন্থ রচনার এইরূপ কারণ লিখিয়াছেন যে, সংসারে লিপ্ত থাকিলে নানাবিধ পাপে মুগ্ধ হইতে হয়। অতএব নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ঈশ্বর আরাধনায় জীবন যাপন করিব, একদা এই মনে ভাবিয়া গৃহাভ্যন্তরে পরমেশ্বরের চিন্তায় চিত্তার্পণ করিলাম। কিছুদিন পরে

আমার এক পরম প্রিয়তম বান্ধব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে অস্মদের মানসিক অবস্থা ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করে। তিনি পূর্ব্বসখ্যের বলে তাহাদের নিষেধ না মানিয়া আমার সন্নিহিত হইলেন, এবং এইরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে, "কেবল আত্মোপকার লাভে মন নিবিষ্ট করা তোমার ন্যায় পণ্ডিতবরের উচিত হয় না। যাহাতে অন্যের উপকার হয়, তদ্বিষয়ে তোমার চিত্ত সংযোগ করা কর্ত্তব্য। তোমার মৌন হইয়া থাকা কোনও মতেই বিধেয় হয় না।

"কহিবার শক্তি তব আছে হে এখন
আনন্দে করহ ভ্রাতা কথোপকথন।
কল্য যবে যমদূত উপনীত হবে,
কঠিন আদেশে তার বাক্যহীন রবে।"

বন্ধুর এই কথা শ্রবণে আমার যেন চক্ষুরুন্মীলন হইল। আমি তাঁহার হৃদয়-গত ভাবানুসারে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজচরিত্র, ২য় অধ্যায়ে ফকিরের কর্ত্তব্য, ৩য় অধ্যায়ে সন্তোষের উৎকর্ষ, ৪র্থ অধ্যায়ে মৌনাবলম্বনের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে যৌবন ও প্রেম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃদ্ধাবস্থা, ৭ম অধ্যায়ে বিদ্যাশিক্ষার গুণ এবং ৮ম অধ্যায়ে জীবনযাপনের সুপ্রণালী অতিসুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমে আমরা এই গ্রন্থেরও আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ হইলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি ; দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার বিরচিত বুস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্যপুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। এই গ্রন্থসূচনায় এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আমি পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, এবং বহু ব্যক্তির সংসর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে আত্মীয় স্বজনের নিমিত্ত কি মিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাই, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, বাক্যের অপেক্ষা কিছুই মিষ্টতর দ্রব্য নাই। অতএব তাঁহাদিগকে উপহার দিবার জন্য এই বুস্তাঁ গ্রন্থ রচনা করিলাম।"

ক্রমশঃ।

৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

চিন্তাসূত্র।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল দুই এক খানা বাঙ্গলা পুস্তক য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে ; ইহাতে বাঙ্গালীর চিন্তাসূত্র য়ুরোপেও প্রসারিত হইতেছে। আবার ইংরাজের চিন্তাসূত্র এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে, ফরাসীর চিন্তাসূত্রও বঙ্গদেশে প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তাবিনিময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে একটা একীকরণ হইতেছে। "ফর্টনাইটলি রিভিউ" পত্রে শ্রীমতী অলিভ স্ক্রিনার একটি প্রবন্ধে এই চিন্তাসূত্র-সম্প্রসারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এখানে প্রদত্ত হইল।

সাহিত্যের প্রভাব।

মতামত সাহিত্যে পরিণত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে, এবং তাহার প্রভাবেই য়ুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে একীকরণ চলিতেছে। মধ্যযুগেও য়ুরোপীয় জাতি সকল এইরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ ছিল। তখন গতায়াতের অসুবিধা ও মুদ্রাযন্ত্রের অভাব সত্তেও বিনিময়ের বিরাম ছিল না ; কারণ তখন য়ুরোপের সকল সভ্যদেশের পণ্ডিতগণ লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; কাজেই চিন্তা ও জ্ঞান দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। এখন সেরূপ কোন ভাষা না থাকিলেও, এখন সেই ভাববিনিময় ক্রিয়া ও এই একীকরণ আরও অধিক হইতেছে। সংবাদপত্র ও টেলিগ্রাফের কৃপায় ভাষা সর্ব্বত্র স্থিতিশীল হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যাহা সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক, তাহাই ভাষান্তরিত হওয়ায়, মধ্যযুগে পার্শ্ববর্ত্তী দুই গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যে বন্ধন না ছিল, এখন পৃথিবীর অতি দূরতম প্রদেশের শিক্ষিতদিগের মধ্যে সে বন্ধন বিদ্যমান। আজ এক জন বৈজ্ঞানিক তাঁহার বৈজ্ঞানিক কর্ম্মকক্ষে যে আবিষ্কার করিবেন, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে লিখিত হইয়া সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই য়ুরোপে শত শত বৈজ্ঞানিকের শ্রম লাঘব করিবে। কোথায় সুদূর হাঙ্গেরীতে ধর্ম্মঘট করায় দুই জন শ্রমজীবীকে গুলি করা হইয়াছে, সে সংবাদ তারযোগে আনীত হইয়া রাত্রির পূর্ব্বেই য়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, এবং সেই রক্তপাতের পর চব্বিশ ঘণ্টা কাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই, দেশে দেশে শত সহস্র শ্রমজীবী যেন দুই জন আত্মীয়ের বিয়োগদুঃখ ভোগ করিবে।

বন্ধন।

সভ্য জগতে সাহিত্যসৃষ্ট এই বন্ধনের বিষয় লেখক স্বয়ং যেমন বুঝিতে পারেন, তেমন বোধ হয়, আর কেহ পারেন না। প্যারিসে বা লণ্ডনে এক দিন নিশীথে বিনিদ্র হইয়া তিনি যাহা চিন্তা করেন, তাহা যদি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া কোনও ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত করেন, তবে দুই মাসের মধ্যে তাহা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে। য়ুরোপসংস্পৃষ্ট জাপানী তাহার টোকিয়োস্থ উদ্যানে বসিয়া উহা পাঠ করিবে ; উপনিবেশস্থ কৃষক উহা অধ্যয়ন করিবে, এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সকল পুস্তকাগারেই উহা স্থান পাইবে। আবার যদি তাহা মূল্যবান্ হয়, তবে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে, যত দিনেই হউক, উহা ইংরাজী সাহিত্যস্রোতে ভাসমান হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে। অষ্ট্রেলিয়ান ইহা পাঠ করিবে, লণ্ডনের কেরাণী কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দিনে ওমনিবাসে ইহা পড়িতে পড়িতে যাইবে, স্কচ শ্রমজীবী ইহা পড়িবে ; আমেরিকার বালিকারা ইহা পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিবে, শিক্ষিত হিন্দুও ইহা অধ্যয়ন করিবে। তাহার পর, পুস্তকখানা ভাল হইলে, তাহা

ভাষান্তরিত হইবে। জার্ম্মান্ ছাত্র যখন রাইন নদীর তটে বেড়াইবে, তখন উহা তাহার পকেটে থাকিবে; ফরাসী সমালোচক সংবাদপত্রের উদরপূর্ত্তির জন্য উহা পাঠ করিবেন; রসিয়ান ও ডচও এ ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিবে; হয় ত দেখিবে, বহুবিবাহপ্রিয় তুরুষ্ক-দেশীয়ও কফি পান করিতে করিতে ঐ ফরাসী অনুবাদ নাড়াচাড়া করিবে। তাহার পর, কয় বৎসর পরে লেখক দেখিবেন, পৃথিবীর কত স্থান হইতে কত প্রকারের লোক পত্র লিখিয়াছে। তাঁহার সামান্য চিন্তাসূত্র এত দূর ব্যাপ্ত হইয়াছে!

এইরূপে একজন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার অনেকের শ্রম লাঘব করিয়া উন্নতির পথ আবিষ্কৃত করে; কোনও কবি বা ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট মানবজীবনের চিত্র শত শত মানবের জীবন নিয়মিত করে। এইরূপে একজন লেখকের এক রজনীর চিন্তা তাঁহাকে জগতের নানা স্থানের নরনারীদিগের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত করে। নানা স্থান হইতে লিখিত পত্রগুলি দেখিবার সময় সহজেই তাঁহার মনে হয় যে, তাঁহার সামান্য চিন্তাসূত্রও দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া মানব জাতিকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত একীকরণে সাহায্য করিতেছে। যাঁহাদিগের সহিত তিনি এক গৃহে বাস করেন, কেবল তাঁহারাই যে বর্ত্তমান কালের লেখকের স্বজন, তাহা নহে; পরন্তু, নানা-জাতীয় নানাবর্ণবিশিষ্ট যে সকল পাঠক তাঁহার চিন্তার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্বজন। নানাজাতীয়, নানাভাষাভাষী, নানাবর্ণবৈচিত্র্যময় লোক তাঁহার স্বজাতীয়; তাঁহার স্বজাতীয়গণই তাঁহার পাঠক, আর সকল সাহিত্যসেবকই তাঁহার স্বদেশীয়।

চিন্তার ব্যাপ্তি।

ইংরাজের সহানুভূতির অভাব চিরপ্রসিদ্ধ, যদি কেবল সাহিত্যসেবক ইংরাজগণও আপনা-দিগের দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতায় পরিহার করিয়া এই উদার মত গ্রহণ করেন, তবে যথেষ্ট উপকার হয়; কারণ, তাঁহারাই প্রধানতঃ দেশের লোকের মতের নিয়ন্তা।

জীবনচরিত।

রসেল লাওয়েল।

আমেরিকার বিখ্যাত কবি লাওয়েলের ইংলণ্ডে অবস্থানকালের কথায়, মিষ্টার এস্‌মলি "হার্পার্স ম্যাগাজিন" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কবি তাঁহার, তাঁহার পত্নীর ও তাঁহার সন্তানগণের বন্ধু ছিলেন। আমরা নিম্নে কয়টা বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

স্প্যানিস শিক্ষার জন্য তিনি ম্যাডরিডে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে আসিতে তাঁহার ইচ্ছাই ছিল না, কারণ দৌত্যকার্য্য তাঁহার ভালই লাগিত না। একটা কথা আছে যে, পৃথিবী ধ্বংস হইলে যদি এক জন মাত্র লোক বাঁচিয়া যায়, তবে সে ইংরাজ হইলে একটা ডিনারের আয়োজন করিবে, আর আমেরিকান হইলে একখানা মানচিত্র অঙ্কিত করিবে। আবার আমেরিকান বলে যে, ইংরাজ খাইবার জন্যই জীবনধারণ করে,—আর আমেরিকান জীবন-ধারণের জন্যই আহার করে। ইংরাজের এ ভাবপ্রিয় ডিনার, লাওয়েল ইহা ভালবাসিতেন না। তিনি 'সোসাইটিতে' মিশিতে চাহিতেন না। সরকারী নিমন্ত্রণে অবশ্য তাঁহাকে যাইতে হইত; আর বন্ধুগৃহেও তিনি যাইতেন। বাছাই-করা লোক ছাড়া তিনি নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে লোকের সহিত মিশিতে আরম্ভ করেন। লণ্ডন তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলে তিনি আপনার আঁধার আগার ছাড়িয়া, শোভাময় সোসাইটিতে মিশিতে আরম্ভ করেন। তিনি

নিমন্ত্রণরক্ষা।

বুঝিলেন যে, মানবের বিষয় জানিতে হইলে কেবল পুস্তক পাঠ না করিয়া লোকের সহিত মিশিতে হয়। এই প্রথম তিনি জগতের জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। লণ্ডন সোসাইটি শীঘ্রই লাওয়েলকে পরিপাক করিয়া ফেলিল। তবে যে সহিষ্ণুতা না থাকিলে সমাজে লোক ভাল মিশ খায় না;—সে গুণ লাওয়েলের বড় ছিল না। লাওয়েলের বিবেক জ্ঞানটা সময় সময় যোল আনা ছাড়াইয়া আঠার আনায় পৌঁছিত। কেহ কোনও ভ্রম করিলে, তিনি তখনই তাহা সংশোধন করিয়া তবে ছাড়িতেন। এই জন্যই বোধ হয়, কোনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাহাকেও লাওয়েলের মত ভালবাসিতেন না, এবং লাওয়েলকে নিজগৃহে অতিথিরূপে পাইলে যত আনন্দিত হইতেন, তত আর কাহাকেও পাইলে হইতেন না; তবে অতিথি গৃহত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার ভয় যাইত না।

খাঁটি আমেরিকান।

লাওয়েল খাঁটি আমেরিকান ছিলেন। লণ্ডনে তাঁহাকে লইয়া অতটা হুজুগ হইবার তাহাও একটা কারণ। ইহা যে কেবল লণ্ডনবাসীদিগের হুজুগপ্রিয়তা হইতেই উৎপন্ন, তাহাই নহে। ইংরাজ সর্ব্বত্রই খাঁটি ইংরাজ,—সে কোথাও তাহার আপনাকে এতটুকু পরিবর্ত্তিত করিতে বা দেখিতে ভালবাসে না। সেই জন্যই যে সকল ইংরাজ আপনার উদ্ধত স্বভাবকে কোমল করিয়া ভিন্নদেশীয়দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহাদের উপর অপর ইংরাজগণ হাড়ে হাড়ে চটিয়া যায়। এটা ইংরাজকলঙ্ক,—ইহা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়। তাই মহামতি হিউম পাগল বলিয়া পরিহসিত। ইংরাজ খাঁটি ভালবাসে, তাই সে তাহার দোষও অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। সেই জন্যই ইংরাজ খাঁটি আমেরিকান লাওয়েলকেও ভালবাসিত।

প্রাসাদে।

লাওয়েল মহারাণীর প্রিয় অতিথি ছিলেন। একে ত সাম্রাজ্ঞী তাঁহার গুণের জন্যই প্রশংসা করিতেন, তাহাতে আবার তিনি জানিতেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, লাওয়েল সে জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। সাম্রাজ্ঞীরও ইচ্ছা যে, এই শান্তিচ্ছায়াস্নিগ্ধ পথে অশান্তির ভীষণ ভেরীনাদ শ্রুত না হয়। তিনি জানিতেন যে, লাওয়েল এই শান্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন; তাই তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। পরিচয়ান্তে তিনি কবির সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং কবির বাক্যে ও চিন্তায় কিছু অধিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও বিরক্ত হইতেন না। তিনি লাওয়েলকে জানিতেন।

নানা কথা।

লাওয়েল সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন, প্রকৃতির সরলতা তাঁহার ভাল লাগিত। এক স্থানে তিনি কবিসুলভ বাসনাবশে বলিয়াছেন, "Towin the secret of a weed's plain heart." তিনি বলিয়াছিলেন যে, মানব আমাদিগকে নগরবাসী করিবার বহু পূর্ব্বে প্রকৃতি আমাদিগকে মানব করিয়াছিল। কবি শিশুদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। সরলচিত্ত কবি হিসাবপত্র রাখিতে পারিতেন না। লর্ড রোজবেরি আমেরিকা ও আমেরিকানদিগকে ভালবাসেন। তাঁহার সহিত কবির বিশেষ সম্প্রীতি ছিল।

গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাজ্য।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত ও সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্য লাওয়েল সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। বলিতে কি, তিনিই তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্র মনে করে যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে অসদ্ভাব আনয়ন করাই প্রকৃত দেশহিতৈষীর কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে তাহা কেবল আইরিসদিগের ভোটের জন্য। অত্যাচারপীড়িত আইরিস এখন ইংরাজের নিন্দা শুনিলেই আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাই তাহাকে ভুলাইয়া কাজ আদায় করিবার তাহারা এই উপায় অবলম্বন করে—আর কিছুই নহে। লাওয়েলের বিশ্বাস ছিল যে, একতাবদ্ধ হইলে জগতের ভবিষ্যৎ

গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হস্তে—বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা ইংলণ্ডেরও নহে, যুক্তরাজ্যেরও নহে। এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লাওয়েল উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

আজ আমেরিকার যতই উন্নতি হইবে, ইংলণ্ডের আপশোস ততই বাড়িবে বই কমিবে না। তখন লাগাম অত জোরে না টানিলে, আজ আমেরিকা স্বতন্ত্র হইত না। ইংরাজের আপনার মূর্খতায়, সহানুভূতির অভাবে ইংরাজ আমেরিকা হারাইয়াছে—তাই আজ লাওয়েলের মত যাঁহারা উভয় রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাবসংস্থাপনে সমুৎসুক, ইংরাজ তাঁহাদের পূজা করে।

সমাজনীতি।

বঙ্গে সামাজিক উন্নতি।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, বিগত ত্রিশ বৎসরে বঙ্গে সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড রিভিউ" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মিষ্টার ঘোষের এই বক্তৃতা লইয়া এ দেশে বড় তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। বম্বে, মান্দ্রাজ, বঙ্গ, তিন প্রদেশের অনেক সংবাদপত্র এ বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত—প্রসিদ্ধ সম্পাদকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা ইংরাজি রচনার মক্স করিতেছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত অনেকে এই তর্কে যোগ দিয়াছেন। কলিকাতার দেশীয় শত্রু ইংলিশ্‌ম্যান পর্য্যন্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিষয় ছাড়িয়া "নেটিবের" এই তর্কে যোগ দিয়াছেন। সমস্ত বাদানুবাদ প্রকাশের স্থান আমাদিগের নাই। আমরা মিষ্টার ঘোষের বক্তৃতার সার, ও কোথাও কোথাও মতামত, প্রদান করিলাম।

মিষ্টার ঘোষ প্রথমেই বলিয়াছেন যে, বক্তৃতার বিষয় বৃহৎ; তাহার নানা ভাগ আছে, এবং প্রত্যেক বিভাগ-সম্বন্ধে নানা কথা বলা যাইতে পারে। বিগত ত্রিশ বৎসরে বঙ্গে সামাজিক উন্নতিবিষয়ক সর্ব্বপ্রধান তিন চারিটি বিষয়ে কিছু বলাই তাহার উদ্দেশ্য। তবে দুইটা কথা আছে; ভারতবর্ষের যে প্রদেশের অবস্থা তিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, সেই প্রদেশ সম্বন্ধে বলাই সঙ্গত। আবার হিন্দু ভিন্ন অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অল্প। কাজেই তিনি বিগত ত্রিশ বৎসরে নিম্নবঙ্গের হিন্দুদিগের সামাজিক উন্নতির কথাই বলিবেন। দ্বিতীয় কথা সময়ের,—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ড হইতে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; এই ত্রিশ বৎসরে তিনি স্বয়ং যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই বক্তৃতার বিষয়ীভূত হইবে।

বিষয়নির্ব্বাচন।

গত ত্রিশ বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, পূর্ব্বের অবস্থা এবং বঙ্গবাসিগণ যে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে হইবে। যখন বঙ্গবাসিগণ প্রথম ইংরাজের সংস্পর্শে আইসে, তাহাদিগের তৎকালীন ধারণা প্রভৃতিও দেখিতে হইবে। তাহা না বুঝিলে বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝা অসম্ভব। ধরুন, জাপানের পূর্ব্বাবস্থা এবং তাহার বর্ত্তমান উন্নতির সহিত তুলনা করিলে বঙ্গের সামাজিক উন্নতি নিতান্ত সামান্য বোধ হইবে। কিন্তু নানা কারণে বঙ্গদেশের সহিত জাপানের তুলনা করা অসম্ভব। হিন্দুরা রক্ষণশীল, প্রচলিত লোকাচারের অনুরাগী এবং বিদেশীয় আচারের বিদ্বেষী।

নূতন ও পুরাতন।

যে সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হইবে, তন্মধ্যে জাতিপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—তৎসম্পর্কে বিবাহপ্রথা ও অন্যান্য কয়টি বিষয় প্রধান। উন্নতির পথে বিঘ্নেরও উল্লেখ আবশ্যক—এই সম্পর্কে য়ুরোপীয় ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহারও উল্লেখ করিতে হয়।

"জাতি।"

ভারতবর্ষে প্রচলিত জাতিপ্রথাই তদ্দেশীয়দিগের মধ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতাবিস্তারের প্রধান অন্তরায়। ধর্ম্ম, প্রচলিত আচার ব্যবহার, ধারণা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই দুই জাতির মধ্যে বিষম বিরোধ। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ম্লেচ্ছস্পর্শেও পাপ জন্মে। যখন হিন্দুদিগের এইরূপ অবস্থা, তখন ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইল। হিন্দুরা যে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দান করায়, গভর্ণমেণ্টের কোনও উদ্দেশ্য আছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আহারীয় ও পানীয়ের বাচবিচারেই ভারতবর্ষের জাতিপ্রথার বিশেষত্ব। দ্রব্যবিশেষ আহারে ক্রমে লোকের এমনই বাধা হইল যে, তাহারা বিদেশীয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন ফলমূলও আহার করিতে সম্মত হইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে লোকে গোল আলু খাইতে সম্মত হইত না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বক্তার পিতামহের মৃত্যু হয়; যতই অবিশ্বাস্য বোধ হউক না কেন, তিনি স্বীয় পরিবারস্থদিগের মধ্যে গোল আলু প্রচলনে সম্মত হয়েন নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ছয় শত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া হিন্দুদিগের মনে এই বিদেশীয়বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। স্বাদ বা গন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুগণ পলাণ্ডু আহারে অসম্মত। এই কারণ-বশতঃ অনেক হিন্দুবিধবা এখনও কপি খাইতে সম্মত নহেন। যখন ইংরাজগণ প্রথমে ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দেশের এই অবস্থা। সমুদ্র-যাত্রায় হিন্দুর জাতিচ্যুতি ঘটে; তাহার কারণ, লোকের বিশ্বাস যে, কেহ সমুদ্রলঙ্ঘন করিলে, তাহাকে খাদ্যসম্বন্ধীয় নিয়মও লঙ্ঘন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় বঙ্গদেশে সামাজিক নিয়ম যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে কেহ কয়েক বৎসর ইংলণ্ডবাসের পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তবে যদি তিনি আপনার ব্যবহারদোষে স্বদেশীয়দিগের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, সে স্বতন্ত্র কথা। গত ত্রিশ বৎসরে অনেক বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করা ব্যতীত "জাতে উঠার" উপায় ছিল না; কিন্তু এখন অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়েন। বিগত কয়েক বৎসরে কলিকাতার অনেক গোঁড়া হিন্দুপরিবারের ছেলেরা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব পরিবারে গৃহীত হইয়াছে। আবার অনেকে ইংলণ্ডে গমন না করিয়াও ইংরাজের চালচলন গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। এখন যে এইরূপ হইবে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ তাহা বুঝিতেও পারে নাই। বিগত কয়েক বৎসরে কয়েকটি অসবর্ণ বিবাহও হইয়াছে; কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে হিন্দুসমাজের একেবারে মূলে কুঠারাঘাত হয়, সেই জন্য তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। উন্নতির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্ত-রায় খাদ্যের বাছবিচারে এখন আর তেমন কঠোরতা নাই।

"অখাদ্যে" এখন অনেক হিন্দুই অভ্যস্ত। ইংলণ্ড-প্রত্যাগতগণ এখন কোন-না-কোনরূপে সমাজে চলিতেছেন; তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। যে জাতির অর্দ্ধভাগ অধীনতা এবং অজ্ঞানতার অন্ধতিমিরাচ্ছন্ন, সে জাতির সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নহে। বহু শতাব্দী হইতে বঙ্গে হিন্দুমহিলাগণ অবরোধে অভ্যস্তা। হয় ত ইহা কতকাংশে মুসলমানদিগের প্রভাবের ফল; কিন্তু সে যাহাই হউক, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে হিন্দুমহিলাদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্ত্রীজাতি।

মহিলাগণের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবরোধ সম্বন্ধে এখন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলওয়ে প্রচলন এবং দেশভ্রমণের আবশ্যকতা, এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুমহিলাগণকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া ট্রেণে তুলিবার জন্য ও ট্রেণ হইতে নামাইবার জন্য, ষ্টেশনে ষ্টেশনে পর্দ্দা ও পাল্কির প্রাচুর্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। আর এখন প্রত্যেক ষ্টেশনেই দেখা যায়, মধ্যঅবস্থাপন্না মহিলাগণ পর্দ্দা বা পাল্কি ব্যতীত যাতায়াত করিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এখন প্রভূত উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, রমণীগণকে শিক্ষাপ্রদান করিলে গৃহবন্ধন ও সমাজবন্ধন ছিন্ন হইবে। এখন দেশের প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, আর কলিকাতায় গভর্মেণ্টের পোষকতায় হিন্দু মহিলাগণের জন্য যে কলেজ আছে, তাহাতে হিন্দুমহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার জন্যও পাঠ করেন। এ বিষয়ে আমরা ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয় সকলকে পরাভূত করিয়াছি; কারণ অনেকগুলি হিন্দুমহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বেথুন কলেজের ছাত্রাবাসে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুমহিলাগণ বাস করিতেছেন, এবং শিক্ষা পাইতেছেন। প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী অ্যাকরইড (শ্রীমতী বিভারিজ) লেডি ফিয়ারের সহযোগে হিন্দুমহিলাদিগের নিমিত্ত প্রথম ছাত্রাবাসসম্বলিত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তখনকার অধিকাংশ ছাত্রীই বিবাহিতা বা বিধবা, তাঁহাদিগকে বৃত্তি দিয়া বিদ্যালয়ে আনিতে হইত। বেঙ্গল গভর্মেণ্ট উহা বেথুন কলেজের সহিত সম্মিলিত করেন; তৎপূর্ব্বে বেথুন কলেজে কেবল দিবাভাগে নিতান্ত অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন উভয় বিদ্যালয় সম্মিলিত হয়, তখন ছাত্রাবাসে ছয় জন মাত্র ছাত্রী ছিল, এবং ইহার সহিত হিন্দুসম্প্রদায়ের সহানুভূতি না থাকায়, ইহা রাখা উচিত কি না, এ সন্দেহও লোকের মনে উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল গভর্মেণ্ট ছাত্রাবাসের ᅟ বহুব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে যখন গৃহ নির্ম্মিত হয়, তখন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, গৃহের অর্দ্ধেক স্থানও পূর্ণ হইবে না। গৃহে ছচল্লিশটি ছাত্রীর থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। এখন ছাত্রাবাস পূর্ণ, এমন কি, স্থানাভাবপ্রযুক্ত সম্পাদককে (বক্তা স্বয়ং) ছয়খানি প্রবেশ-প্রার্থনা ফিরাইতে হইয়াছে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার তুলনায় ছচল্লিশ নিতান্ত অল্প, তথাপি সকল বাধার কথা মনে করিলে বোধ হয় যে, আরম্ভ আশাপ্রদ বটে। যে সকল বঙ্গমহিলা ছাত্রাবাসে স্থান প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিতা হয়েন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল ব্রাহ্মমহিলারাই বিদ্যালয়ে পাঠ করেন না;—এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মমহিলাগণের সংখ্যা অধিক। এখন আর পূর্ব্বের মত বৃত্তি দিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে হয় না, অধিকন্তু এখন বিদ্যালয়ের নিয়মিত বেতন সানন্দে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মধ্য-অবস্থাপন্না রমণীদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার এই বিস্ময়কর বিস্তারের কথা বলিবার সময় ইহাও বলিতে হয় যে, সাধারণ জনগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বিস্তার হয় নাই।

অবরোধ সম্বন্ধে বঙ্গের মনীষী মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে * * স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্যপশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে।" স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত।"

বঙ্গরমণীদিগের উন্নতির সহিত দেশের প্রচলিত বিবাহপ্রথার বড় নিকট সম্বন্ধ। সাধারণতঃ ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুরা বহুবিবাহপ্রিয়। এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত।

বিবাহপ্রথা।

পুরুষের বহুবিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয় না হইলেও, যাঁহারা বঙ্গবাসীদিগের সহিত পরিচিত, তাঁহারা অবগত আছেন যে, হিন্দুগণ আসলে একবিবাহরত। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে বহুবিবাহের বিধান আছে; কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সে বিধান অনুসৃত হয় না। হিন্দুসমাজে বহুবিবাহবিদ্বেষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল দেশে বহুবিবাহ আইনে দণ্ডনীয়, সে সকল দেশে চুরি করিয়া যত বহুবিবাহ হয়, বঙ্গদেশে শাস্ত্রের বিধান সত্ত্বেও তত বহুবিবাহ হয় না। অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ বা শৈশববিবাহের সহিতও স্ত্রীশিক্ষার ও উন্নতির সম্বন্ধ নিকট। শৈশববিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বেথুন কলেজে দশ বৎসরের অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা ছাত্রী প্রায় ছিল না; আর এখন পূর্ব্বোল্লিত ছাত্রাবাসের সকল ছাত্রীই অবিবাহিতা। অন্য ছাত্রীদিগের মধ্যেও অনেকে হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিবাহের বয়সসত্ত্বেও কুমারী আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধেও উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

হিন্দুদিগের প্রাচীন আচারপ্রিয়তার কথা মনে করিলে বোধ হইবে যে, গত কয়েক বৎসর বঙ্গবাসিগণ গার্হস্থ্যজীবনে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। এ কথা

গার্হস্থ্যজীবন।

হিন্দুদিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য। মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বক্তার অভিজ্ঞতা নাই। তবে একটা কথা বলিবার আছে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, মুসলমানদিগের প্রভাবেই হিন্দুরমণীগণের অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়। হিন্দুমহিলাগণ ক্রমে ক্রমে এই প্রথা পরিত্যাগ করিতেছেন; কিন্তু মুসলমান মহিলামণ্ডলীর অবস্থা স্বতন্ত্র। গবর্মেণ্ট মুসলমান বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে, বক্তা তাহা বলিতে পারেন না। যে সকল হিন্দু কিছু দিন ইংলণ্ডে ইংরাজমণ্ডলীর মধ্যে বাস করেন, সমাজে রমণীর স্থান সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তিত হয়। মুসলমানদিগেরও তাহা হয় কি? ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর কোন মুসলমানই অবরোধপ্রথা অবহেলা করা উচিত মনে করেন নাই। তবে যাঁহাদিগের মত বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমন দুই এক জন মুসলমান ইংরাজললনা বিবাহ করিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের স্বদেশীয় মহিলাগণের অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বক্তার মতে যাহা বঙ্গদেশে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কয় বৎসর হইতে বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে পশ্চাৎ-

পুনরুত্থান প্রভৃতি।

গমন প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন—তাঁহারা ইহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে, আশা করিয়া, দেশমধ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতাবিস্তারে বাধা দিতেছেন। দেশের প্রাচীন আচার ব্যবহারের জন্য প্রায় গর্ব্বে পর্য্যবসিত অতিরিক্ত শ্রদ্ধাই, বোধ হয়, এই পুনরুত্থান বা পশ্চাৎগমনকারীদিগের উত্থানের কতকটা কারণ। হিন্দুদিগের য়ুরোপীয় আচার ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা এবং ইংরাজ-অপসন্দ হইতে এই পুনরুত্থান উৎপন্ন, এ বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক, পুনরুত্থানকারীদিগের দেশহিতোদ্দিষ্ট মতের প্রশংসা করাই সঙ্গত হইত। আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতা গর্ব্বের বিষয় বটে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সভ্যতা যে অন্য সকল সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন, এবং তাঁহাদিগের ভাষা ও সাহিত্য যে প্রভূত অনুশীলনের পরিচায়ক, ইহাতে সকল হিন্দুরই গর্ব্বিত হইবার কথা। যদি ইংরাজী শিক্ষা সেই গর্ব্ব বিনাশ করে, তবে

দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু এই গর্ব্বের সীমা থাকা উচিত—ইহার আতিশয্যে যাহ উন্নতির গতি মন্দীভূত না হয়, তাহা করা আবশ্যক। ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবাসী যুবকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই পুনরুত্থানতরঙ্গাভিঘাততাড়িত, ইহা শুনিয়াই এত কথা বলিতে হইল। এখন ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা পুনরানয়নের নামে ইংরাজ ও ইংরাজী সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতিরোধপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কারণ, ইহাতে উন্নতির পথে বাধা পড়িবে। ইংলণ্ড হইতে পুনরুত্থানকারীদিগের দল পুষ্ট হইতেছে, থিয়সফিষ্ট ও ইংরাজ নেতৃগণ তাঁহাদিগের সহিত যোগ দান করিতেছেন। তাঁহাদিগের সদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত কথায় কেবল ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বর্ত্তমান অসন্তোষজনক সম্বন্ধ আরও অসন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইবে। ইংলণ্ড হইতে বক্তারা ভারতবর্ষে গিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন দোষমাত্র দেখাইলে ভারতবাসীদিগের একাংশ তাঁহাদিগকে অবশ্য প্রশংসা করে। তাহারা য়ুরোপীয় সভ্যতার বিষয় অবগত আছে বলিয়া যে প্রশংসা করে, তাহা নহে; পরন্তু প্রথম হইতে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করায়, ইংরাজদিগের নিন্দাবাদে তাহারা সন্তুষ্ট হয়। ইংরাজদিগের সাহায্য না লইলেও যদি আমাদিগের চলিত, তাহা হইলে এই শুভফলপ্রার্থী সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ হইত, কিন্তু এখনও কিছু কালের মধ্যে আমরা ইংলণ্ড ও ইংরাজী সভ্যতার সাহায্য ব্যতীত কিছু করিতে পারিব না। বর্ত্তমান সময় আমরা ইংলণ্ড ও ইংরাজী আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা অবগত আছি, তদপেক্ষা অধিক অবগত হওয়াই আমাদিগের আবশ্যক। কাজেই এই পুনরুত্থানকারীদিগের কার্য্যে দেশের অনিষ্টের সম্ভাবনা। রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলা এ ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য না হইলেও এ কথা বলা আবশ্যক যে, দোষ কেবল ভারতবাসীদিগেরই নহে। ইংরাজগণ সমাজসংস্কারকার্য্যে আমাদিগকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারিতেন, সেরূপ সাহায্য করেন নাই, এবং ইংরাজগণ আমাদিগকে যে ভাবে দেখেন, তাহাও পুনরুত্থানচেষ্টার উত্তেজনার অন্যতম কারণ। উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। উভয় পক্ষেরই ভ্রম দুই জাতির মধ্যে এই অসদ্ভাবের অনেকটা কারণ বলিতে হইবে। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু পঁচিশ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থানের পর রেভারেণ্ড মিষ্টার বনার যাহা বলেন, তাহাও সত্য। তিনি বলেন যে, ইংরাজ ভারতবর্ষে নানা মহদনুষ্ঠান সত্ত্বেও ভারতবাসীকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই যে, তাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। যদি ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ ভারতবাসীদিগকে বুঝাইতে পারিতেন যে, তাঁহাদিগের এই সমাজসংস্কার কার্য্যে ইংরাজের সহানুভূতি আছে, তবে এ কার্য্য আরও শীঘ্র সম্পাদিত হইত। ভারতবাসীদিগের আর একটু সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন, ইংরাজদিগেরও বিদেশীয় আচার ব্যবহার সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করা আবশ্যক। বক্তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ যাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সিদ্ধ হইবে; প্রাচ্যে প্রতীচ্য সভ্যতাবিস্তারের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে। সাফল্যের পথে বহুবিঘ্ন সত্ত্বেও বক্তার স্থির বিশ্বাস যে, যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সহানুভূতি আছে, তাহা হইলে সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। এই মাসে ভারতী বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রথম সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "নববর্ষের আগমন-উক্তি" নামক একটি কবিতা। কবিতাটি মন্দ নহে; ইহার ছন্দ একটু নূতন;—কিন্তু একটু শিথিল, 'এলোমেলো', মনে হয়,—সহজে ছন্দের ওজন বুঝা যায় না। "সেকালের পাঠশালার কাহিনী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা;—প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও সমুজ্জ্বল। বোধ হয়, দীনেন্দ্র বাবুর এই পল্লীচিত্রগুলি স্থায়ী হইবে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কলবেদনা" একটি 'গদ্য' কবিতা। ইহার ভাষা কবিতার ন্যায় মধুর, সুন্দর; কিন্তু বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই;—বলেন্দ্র বাবুর ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তুলনায় ইহা অতি যৎসামান্য। কলবেদনা লালসাপূর্ণ অন্তরের করুণ গান, দেহের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শারীরিক ললিত লাবণ্যেই তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। আমরা একে 'সেন্টিমেণ্ট'-রসে বঞ্চিত, তাহাতে আবার বাঙ্গালা সাহিত্য বিরহবিকারে, নিরাশার হাহাকারে ইতিপুর্ব্বেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং বলেন্দ্র বাবু তাঁহার এই 'দিব্য' ভাষা 'তামসী' কামনার বিলাসমন্দিরে ডালি দিতেছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি" প্রবন্ধের নামটি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু লেখকের বলিবার প্রণালী জটিল বলিয়া সহজে বিষয়গ্রহ করা দুষ্কর। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ~~"কাহাকে" প্রবন্ধটি~~ ভালবাসার বিশ্লেষণ—লেখিকা দর্শন না উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাই যখন বুঝিতে পারিলাম না,—তখন নীরব থাকাই বিধি। "আলোক" শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি চলনসই কবিতা। শ্রীমতী সরলা দেবীর "একালে সেকাল" মহীশূরের বিবরণ—"যেকালে কালিদাস মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করেন, ভবভূতি মালতীমাধবকাহিনী গাহেন, দণ্ডী গোমিনীবৃত্তান্ত কহেন—সেই কাল এখানে বিরাজমান।" লেখিকা নূতন বর্ত্তমানে প্রতিফলিত পুরাতন অতীতের এই ছবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে বোধ হয়, যেন সংস্কৃত কাব্য নাটকের দেশ কাল পাত্র আবার নূতন করিয়া চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে;—মহীশূরের বাস্তব বিবরণ লেখিকার ভাবময় হৃদয়সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হইয়া কবিত্বপূর্ণ কাহিনীর ন্যায় পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়। ভাষাও সেই প্রাচীন চিত্রের অনুরূপ পুরাতন বর্ণে রঞ্জিত; লেখিকার ভাষায় বলিতে গেলে, যদিও 'প্রচণ্ডঘনগর্জ্জিত-প্রতিরবানুকারী' সংস্কৃত বাক্য গুলি মধ্যে মধ্যে কর্ণজ্বালার উৎপাদন করে, তথাপি ভাষা বিষয়ের অনুপযোগিনী নহে। এবারকার "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্গেশ্বর ও বাঙ্গালী, পাস্তো পলিটিক্স্, বরোক্রেসী বনাম বাবুক্রেসী, বজেট ও বোর্ড, এই চারিটি বিষয় সঙ্কলিত ও সমালোচিত হইয়াছে। এগুলি খবরের কাগজের ক্ষুদ্র লীডারের মত;—তদপেক্ষা উচ্চ ভূমি অধিকার করিবার যোগ্য নহে;—বিলাতী মাসিকে যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকে,—তাহাতে অভিনব মৌলিকতা, ব্যক্তিবিশেষের বিশেষত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীন চিন্তার অস্তিত্বও প্রতিফলিত থাকে;—বক্ষ্যমাণ "সাময়িক প্রসঙ্গ" বাঙ্গলা কাগজের ভাড়াটিয়া মন্তব্যের এক ধাপ উপরে উঠিলেও, ইহা সাহিত্যমন্দিরের রাজনৈতিক কক্ষের নিম্নতম সোপানমূলে পড়িয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত ডেমোক্রাট 'দেবশর্ম্মণঃ' নিজের ভাষায়—তাঁহার ইহাও 'পান্তো পলিটিক্স্'। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "সিরাজদ্দৌলা" প্রথম খণ্ড গত বর্ষে শেষ হইয়াছে; নববর্ষে দ্বিতীয় খণ্ড আরব্ধ হইয়াছে;—সিরাজ পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের একখানি মানচিত্র এবার এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শচিকান্ত মজুমদারের "সোনায় অরুচি" একটি ক্ষুদ্র গল্প; গল্পটির আখ্যান-

বস্তু ভাল, কিন্তু লেখক ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "নববর্ষের আকিঞ্চন" কবিতাটি তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই; আকিঞ্চন প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু তদুপলক্ষে বিকশিত কবিতাটির কোনও বিশেষত্ব নাই। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত।" লেখক রাশীকৃত উপমার সাহায্যে ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীতের প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—কিন্তু সফল হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে অক্ষম; কেন না,—দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন,—"এত উপমাতেও যদি পাঠক উভয় সঙ্গীতের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যে আর কোন প্রকারে তাহা পারিবেন, সে বিষয়ে আশা ভগ্নাংশিক ও সুদূর ব্যবস্থিত; এবং তাহা হইলে তিনি বাড়ী গিয়া কচু নামক একটি উদ্ভিদবিশেষকে দগ্ধ করিয়া অনায়াসে আহার করিতে পারেন;" কোনও প্রহসনের পাত্রবিশেষের তরিবতের ন্যায়, দ্বিজেন্দ্র বাবুরও বিনয় আছে;—তিনি উপমাজালজড়িত হতবুদ্ধি পাঠক বেচারাদের জন্য কচুপোড়ার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—পরন্তু তাহার পর সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন, "বন্দার গোস্তাকি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়।" দ্বিজেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রশান্ত কবিত্বে ও কলহাস্যমুখরিত রহস্যসঙ্গীতে পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছেন; আশা করি, তাহার খাতিরে সকলে সানন্দে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবে; কিন্তু কোনও অল্পবুদ্ধি কচু পোড়াইবার জন্য এই মান্ধাতার আমলের পচা রসিকতা'টুকু ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করিলে কে বারণ করিবে?—বস্তুতঃ, দ্বিজেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীতের উপলক্ষে উৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাস্তবের বিশ্লেষণ করেন নাই। তাঁহার উপমাগুলি অতিসুন্দর, এবং তাহাতে উভয় সঙ্গীতের একটা কবিত্বগত বর্ণনা পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা উহাদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। সে জন্য তিনি যদি সঙ্গীতসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণধন বাবু ও [illegible]তরিন্দ্র বাবুর পদানুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহাকে নিরুপায় ও মরিয়া হইয়া "কচু" সংগ্রহ করিতে হইত না!

নব্যভারত। বৈশাখ। এই সংখ্যায় নব্যভারত চতুর্দ্দশ বর্ষে প্রবেশ করিল। নব্যভারতের নিয়ম অনুসারে সম্পাদক নববর্ষে সর্ব্বপ্রথমে "আশাশিশু—নিরাশার মন্দিরে" ইতিশীর্ষক একটি অন্তঃসারশূন্য ও গালাগালিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ নিতান্ত উজ্জ্বল নহে, এ কথা স্বীকার করিলেও বলা চলে যে, সে জন্য এইরূপ হাস্যরসোদ্দীপক মুরুব্বিয়ানা না করিলেও দুনিয়া অচল হইত না। লেখক এ দেশের প্রায় কাহারও উপর আশা না করিয়া, এক এক জন প্রসিদ্ধ লোককে ধরিয়া মিষ্টভাষায় সম্ভাষণ করিয়াছেন, এবং পরিশেষে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মত "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। প্রবন্ধটির ভাষা যেমন অদ্ভুত ও উদ্ভট, তেমনই হাস্যরসাত্মক ও আমোদজনক;—এ জন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "ভারত, মিসর ও খৃষ্টধর্ম্ম" প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু "বাঙ্গালার প্রাচীন কবি" প্রবন্ধে বলিতেছেন, "ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ব্যাস-প্রণীত মহাভারত গীত আকারে রচনা করিয়াছিলেন। * * * ত্রিলোচন, কিশোর বয়সে এই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থ আমরা পাই নাই। এই জন্য ত্রিলোচনের পরিচয় ও রচনার কাল জানা যায় নাই। ত্রিলোচনের মহাভারতের যে অংশ আমরা পাইয়াছি, উহা ন্যূন পক্ষে একশত বৎসরের লেখা। যে প্রদেশে উহা পাওয়া গিয়াছে, সে প্রদেশ ত্রিলোচনের নিবাসভূমি নহে। হস্তলিখিত গ্রন্থের বিস্তৃতির কথা মনে করিলে কবিকে অন্ততঃ ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।" রসিক বাবুর প্রবন্ধে ত্রিলোচন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

৭ম ভাগ। ১৩০৩; আষাঢ়। ৩য় সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্., শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী, এম্.এ., শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ., স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্. এ., সি. এস্., শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি. এ., শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা।

সাহিত্যের নিয়মাবলী।

১। কি সহর, কি মফঃস্বল, সর্ব্বত্র "সাহিত্যের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৲ দুই টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে, কাহাকেও "সাহিত্য" পাঠান হয় না। এক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

২। "সাহিত্য" প্রতি মাসের শেষ দিবসে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ কোনও মাসে কাগজ না পান, পর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। গ্রাহকগণ পত্রের উত্তর পাইবার ইচ্ছা করিলে টিকিট পাঠাইবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সফিস্যেণ্ট পত্র গ্রহণ করা হয় না।

৪। "সাহিত্যে" প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি ও বিনিময়ের সংবাদ পত্রাদি সাহিত্য-সম্পাদকের নামে সাহিত্য-কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। নূতন লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কোনও রচনা মনোনীত না হইলে সম্পাদক পাণ্ডুলিপি ফেরত দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষম।

এই যন্ত্রে, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, এই তিন ভাষার সকল প্রকার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। যাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভ্রমশূন্য কাজ চান, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আবশ্যক হইলে, প্রুফ্ দেখিবার ভারও লওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। যাঁহারা "সাহিত্য"-যন্ত্রে কোনও কাজ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন,—তাঁহারা আমার সবিশেষ অবগত হইবেন।

৬। সাহিত্যের মূল্যাদি নিম্নস্বাক্ষরকারী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হয়।

৭। বিলি করিবার অনিয়ম ঘটিলে বা সাহিত্য-সংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয়ে গ্রাহকগণের কিছু বক্তব্য থাকিলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হয়।

সাহিত্য-যন্ত্র।
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন;
কলিকাতা।

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি।

মীরজাফর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পলাশি।

পলাশির নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন পলাশির এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। "লক্ষবাগ" নামক বিখ্যাত আম্রকাননের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও লক্ষবাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। (১) কিন্তু কালক্রমে তাহা এখন ভাগীরথী-গর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একটিমাত্র অতীতসাক্ষী পুরাতন আম্রবৃক্ষ জীবিত ছিল;—সাহেবেরা তাহাকে সমূলে উৎখাত করিয়া দারুখণ্ডগুলি বিলাতে চালান করিয়া দিয়াছেন। এখন কেবল ভাগীরথীতীরে একটি জয়স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; আধুনিক হইলেও, তাহাই পলাশির একমাত্র পরিচায়ক। সেই জয়স্তম্ভে লিখিত আছে;—

PLASSEY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT, 1883. (২)

পলাশি অনেক দিনের পুরাতন স্থান। নবাবী আমলে পলাশিতে সিপাহী-দিগের একটি ছাউনি ছিল। শিকারপ্রিয় মুসলমান নবাবের চিত্তবিনোদনের জন্য ভাগীরথীতীরে একটি সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত মৃগয়া-মঞ্চ রচিত হইয়াছিল। এ সব এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার পরিবর্ত্তে পলাশিতে একটি [illegible]গী এবং বাজার বসিয়াছে; গ্রামের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে।

কোম্পানীর আমলে পলাশি মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত ছিল; এখন তাহা নদীয়ার অন্তর্গত। পলাশি গ্রামে যুদ্ধ হয় নাই;—যুদ্ধ হইয়াছিল পলাশির উত্তরে তেজনগরের প্রান্তরে। কিন্তু তেজনগরের নাম ডুবিয়া গিয়া পলাশির নামই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

তেজনগরের সুবিস্তৃত প্রান্তরে ভাগীরথীতটে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন

(১) In 1802 Lord Valentia changed bearers here. He speaks of the magnificent tope.—H. Beveridge, C. S.

(২) এই জয়স্তম্ভে পলাশির যুদ্ধের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। ইহাতে বিচক্ষণ বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণবুদ্ধির বাহাদুরী আছে।

বৃহস্পতিবারে ফিরীঙ্গির সঙ্গে মুসলমানের যে যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল, তাহাই এখন ইতিহাসে "পলাশির যুদ্ধ" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে যুদ্ধক্ষেত্রের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। একটি ঈষদুন্নত মৃত্তিকাস্তূপের নাম "বুরুজ-ডাঙ্গা"; তাহা একডালা গ্রামের নিকটে;—লোকে বলে যে, তাহা একটি তোপমঞ্চের চিহ্ন।

পলাশি অঞ্চলের নিরক্ষর কৃষকেরাও যুদ্ধের সমাচার অবগত ছিল। কবি কল্পনা-চক্ষে পলাশির ক্রোড়-বাহিনী ভাগীরথী মধ্যে প্রাতঃস্নানপরায়ণ দ্বিজ-গণকে "কোষাকুশী করে" পিতৃতর্পণে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সে অঞ্চলে প্রায়ই নিরক্ষর কৃষকদিগের বসতি ছিল। তাহাদের বংশধরেরা এখনও অনেক অদ্ভুত কথা শুনাইয়া থাকে;—সে কথা আর কিছুই নহে; কেবল মোহান্ধ মীরজাফরের কলঙ্ককাহিনী।

এখনও প্রতি বৃহস্পতিবারে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। তাহারা নানা গ্রাম হইতে আসিয়া দলে দলে শুদ্ধশান্তচিত্তে পবিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া একটি সমাধিস্তূপের পূজা করিয়া থাকে। ঐ সমাধি কাহার, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ। কিন্তু সকলেই বলে যে, তাহা একজন প্রভুভক্ত মুসলমান বীরের সমাধিস্তূপ। সাহসী স্বধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান বীর অসিহস্তে সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, সে অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে "পীরের" ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছে। পলাশি ভিন্ন বাঙ্গলা দেশের আর কোন স্থানে এরূপ বীরপূজা প্রচলিত আছে কি না, জানি না। তাহারা যেরূপ অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সমাধিক্ষেত্রে ফুল ফল ও তণ্ডুলাদি উপহার প্রদান করে, তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। (১)

পলাশির আড়াই ক্রোশ উত্তরে ফরিদটোলা। সেখানে পলাশি-[illegible] পতি মীরমদনের সমাধি-মন্দির; তাহা এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসি-তেছে। লোকে তাঁহাকেও পূজা করিয়া থাকে। মীরমদনের পূর্ব্বকাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবল এইমাত্র শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একজন ঢাকা অঞ্চলের অজ্ঞাতনামা মুসলমান;—সিরাজদ্দৌলার অনুকম্পায় নানারূপে পদোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে প্রধান সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১) মুরশিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ইতিহাস-প্রিয় বিভারিজ সাহেব স্বচক্ষে বাঙ্গালীর বীরপূজা দেখিবার জন্য একবার বৃহস্পতিবারে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মীরমদনের ন্যায় প্রভুভক্ত সেনাপতি জীবিত থাকিলে, সিরাজদ্দৌলার পরিণাম কিরূপ হইত, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি যেমন প্রভুভক্ত, সেইরূপ সাহসী, সুচতুর এবং রণকৌশলসম্পন্ন মহাবীর। কলিকাতা-জয়ের সময়ে ইংরাজেরা তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হন। পলাশি ক্ষেত্রে বীরবর মীরমদন যেরূপ অসীমসাহসে শত্রুসেনার উপর প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহাবীর ক্লাইবকেও কম্পিতকলেবরে সসৈন্যে ভাগীরথী-তটতলে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ইংরাজের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালী বীর মীরমদন ভিন্ন সিরাজ-শিবিরের আর কোন সেনাপতি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন না। অশিক্ষিত বাঙ্গালী সেনাপতিকে পরাজয় করিতে কতক্ষণ? সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই মহামতি ক্লাইব সসৈন্যে আম্রকানন হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজীদিগের যুদ্ধকৌশল ছিল না; তাহারা হস্তী অশ্ব পদাতিক এবং কামান লইয়া ছত্রভঙ্গভাবে আক্রমণ করিত। ক্লাইব ভাবিয়াছিলেন যে, মীরমদনও তাহাই করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, পদাতিকসেনা পশ্চাতে রাখিয়া, উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহীদিগকে সুসজ্জিত করিয়া, মধ্যস্থলে তোপমঞ্চ রাখিয়া, মীরমদন ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন, তখনই বৃটিশ-সেনাপতির চেতনা হইয়াছিল; তাহার পরে মীরমদনের অমোঘ সন্ধানে বৃটিশ-বাহিনী পলায়ন করিবার পথ পায় নাই। (১)

ইংরাজেরা তটতলে পলায়ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার কামান দাগিতেছিল; মধ্যাহ্নে তাহারই একটি প্রচণ্ড গোলা লাগিয়া মীরমদনের

(১) The enemy's army kept marching towards ours in deep columns, supported by a large train of artillery, consisting of 53 pieces of cannon. Their manœuvres, upon this occasion, differed materially from those they had been accustomed to; for instead of posting their artillery all together, as was their usual practice, they disposed them between the divisions of their troops, and had not above two or three pieces of cannon on a spot; so that an attack upon any one part of their artillery could not have been decisive. * * * Our little army was at first drawn up without the bank which surrounded the grove, but soon found such a shower of balls pouring upon them from the enemy's cannon, that the Colonel thought proper they should retire under cover of the bank, leaving two field-pieces without, while the other four were kept playing through the

উরুস্থল ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে উপস্থিত করিবার অল্পক্ষণ পরেই প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। মীরমদন বেশী কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না; কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, সেনাপতিরা সকলেই নিমকহারাম; শত্রুদল অতি ক্ষীণ, কিন্তু তথাপি নবাবের পক্ষে কেহ যুদ্ধ করিতেছে না, কাহার জয় কাহার পরাজয় হয়, কেবল তাহাই পরিদর্শন করিতেছে!

মীরমদনের মৃত্যুর পরে আর রীতিমত যুদ্ধ হইল না। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে পলাশির যুদ্ধাভিনয়ের শোচনীয় শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইল। কুচক্রীদলের কুপরামর্শে সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিলেন, মোহনলাল ছত্রভঙ্গ নবাবসেনার শৃঙ্খলাবিধান করিতে সক্ষম হইলেন না, ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁ কিছুক্ষণ অতুল সাহসে শত্রুসেনার উপর অনলবর্ষণ করিয়া অবশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; সুতরাং প্রায় বিনা বাক্যব্যয়েই ক্লাইবের জয় হইল; ইংরাজ পক্ষে অতি অল্প কয়েক জন সৈনিক হত ও আহত হইয়াছিল। এত অল্প সেনাক্ষয়ে এরূপ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা ক্লাইবকে আকাশে তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই ক্লাইব উত্তরকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, "আমরা তটতলে লুকাইয়া ছিলাম, আর নবাবের সেনাপতিগণ বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করেন নাই; কেবল সেই জন্যই এত অল্প সেনাক্ষয়ে আমাদিগের জয়লাভ হইয়াছিল।" (১)

যুদ্ধাবসানে নবাবের বিচিত্র পটমণ্ডপগুলি বৃটিশ সৈনিকের করতলগত হইল; তাহারা লুণ্ঠনলোভে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্লাইবের তখনও বিভীষিকা দূর হয় নাই; পাছে মোহনলাল কি নবাবের আর কোন সেনাপতি তাঁহাকে সসৈন্যে আক্রমণ করেন, সেই আশঙ্কায় ক্লাইব সেনাদল লইয়া দূরে সরিয়া পড়িলেন, এবং দাউদপুর নামক স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া সতর্কভাবে রজনীযাপন করিতে লাগিলেন।

---

(১) The battle's being attended with so little bloodshed arose from two causes; first, the army was sheltered by so high a bank that the heavy artillery of the enemy could not possibly make them much mischief; the other was, that Shuraj Dowla had not confidence in his army, nor his army any confidence in him, and therefore *they did not do their duty upon that occasion.*—Clive's evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

মীরজাফর সময় বুঝিয়া ক্লাইবের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সঙ্কেতচিহ্নের ত্রুটিবশতঃ ইংরাজেরা তাঁহাকেও শত্রুপক্ষ ভাবিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া দূরে তাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে এ সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

দাউদপুরের বৃটিশশিবিরে ক্লাইবের সঙ্গে মীরজাফরের প্রথম সন্দর্শন ; সেই সন্দর্শনে উভয়েরই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। ক্লাইব মীরজাফরকে দেখিলেন ; মীরজাফরও ক্লাইবকে দেখিলেন। উভয়ের মধ্যে শুভদৃষ্টিসঞ্চালনে সৌহার্দ্দ্যের সূচনা হইল ; কিন্তু উভয়েই বুঝিলেন যে, কেহ কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করা নিরাপদ নহে !

যুদ্ধ জয় হইল। কিন্তু একটি যুদ্ধের জয় পরাজয়ে কোন দেশের ভাগ্যনির্ণয় হয় না। আজ পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হইল, কিন্তু কল্য বা দশ দিন পরে আর কোন যুদ্ধে ক্লাইবের পরাজয় হইতে কতক্ষণ? ক্লাইব তাহা জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, বাহুবলে সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং মীরজাফরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের শিষ্টাচার শেষ হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে সসৈন্যে মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া রাজকোষ হস্তগত করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না ; সেই দিনই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন।

মীরজাফর যখন মুরশিদাবাদে উপনীত হইলেন, রাজধানী তখন প্রায় জনশূন্য ; লুণ্ঠনভয়ে সকলেই ধনরত্ন লইয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। সিরাজদ্দৌলা নাই, দরবারের পাত্রমিত্র নাই, রাজধানীর বিলাসলোলুপ ধনকুবেরগণ নাই ; কেবল জনশূন্য সুদীর্ঘ রাজপথ শ্মশানের মত শূন্যদৃষ্টিতে সীমাশূন্য নীল নভোমণ্ডলের দিকে হতাশ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে !

মীরজাফর আসিয়া হিরাঝিল অধিকার করিলেন ; সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য দেশে দেশে সেনা প্রেরণ করিলেন ; এবং সুরচিত রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত দরবার-কক্ষে শূন্য সিংহাসন সম্মুখে করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত ক্লাইবের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন !

ক্লাইব সহসা রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বার্থান্ধ মীরজাফরের চক্রান্তে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার যাহা হইবার হইয়া যাউক, তাহার পরে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন। তাহা হইল না।

ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই যখন রাজধানীতে উপস্থিত, সেই সময়ে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইল! সকলেই মীরজাফরের দুর্ব্বিনীত পুত্র দুরাত্মা মীরণের উপর সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধের আরোপ করিয়া ইতিহাসের নিকট নিষ্কৃতিলাভ করিবার আয়োজন করিলেন। মীরজাফর আসিয়া ক্লাইবকে সকরুণভাবে হত্যাবিবরণ জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমি কিছুই জানি না!" ক্লাইবও উত্তরকালে বিলাতের মহাসভায় বলিয়া গিয়াছেন, "আমিও ইহার কিছুই জানি না!" ইংরাজ ইতিহাস-লেখক তাহার সমালোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, আর যাহাই হউক, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ইংরাজ সেনাপতির যে কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না, তাহার প্রধান প্রমাণ মুসলমান ইতিহাসলেখক। তাঁহারা কেহই ইহার জন্য ক্লাইবের উপর কটাক্ষপাত করেন নাই! (১) এ কথা ঠিক নহে! যাঁহারা "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" নামক বিখ্যাত মুসলমান-ইতিহাস অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, ক্লাইবকেও কেহ কেহ অপরাধী করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। (২) পরচিত্ত অন্ধকার। কাহার মনে কি ছিল, এতকাল পরে কে তাহার সমস্যা পূরণ করিবে? তবে আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সমালোচনা করিলে সন্দেহ বড়ই দুরপনেয় হইয়া উঠে! (৩)

মীরজাফর নবাব হইয়াও "তখ্‌ত মোবারকে" পদার্পণ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না, কে জানে তখন তাঁহার প্রাণে কি মর্ম্মবেদনা বা চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল! ক্লাইব তাঁহার ইতস্ততের কারণ বুঝিতে পারিলেন; এবং স্বয়ং মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া অভিবাদন করিয়া ইংরাজবণিকের প্রতিনিধিস্বরূপ "নজর" প্রদান করিয়া মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন! (৪)

---

(১) Stewart's History of Bengal.

(২) The Ryaz says that Shiraj-ud-doula was put to death at the instigation of the English chiefs and Jagat Sett.—H. Beveridge, C. S.

(৩) বিভারিজ বলেন যে, ক্লাইবের পক্ষে ইহা নিতান্তই মিথ্যা কলঙ্কের কথা! সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য ক্লাইবই মীরজাফরকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, সিংহাসন নিরাপদ করাই তাহার উদ্দেশ্য বা "পলিসি"। মীরজাফর প্রকারান্তরে সে "পলিসি" সফল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে? স্বয়ং ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "Mir Jaffier thought it necessary to palliate the matter on motives of policy."

(৪) Jaffier, after the first salutation at the Entrance, returned towards the inner part of the hall with Colonel Clive, and seemed desirous to avoid the *Musnud*, which Clive perceiving, led him to it, and having placed

এই সূত্রে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ চিরদিনের মত এ দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিল! সকলেই বুঝিল যে, ইংরাজের পদাশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই ধন-প্রাণ নিরাপদ হইবে। তখন লোকে আত্মরক্ষার জন্য, কেহ বা আত্মাধিকার বর্দ্ধন করিবার জন্য, ইংরাজ সেনাপতির শরণাগত হইতে লাগিল। চারি দিকে ইংরাজের নাম জয়যুক্ত হইল। ইংরাজবীর কর্ণেল ক্লাইব ভারতবর্ষে "সাবুদ-জঙ্গ" নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইলেন! (১)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উমাচরণের পুরস্কার-লাভ!

সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া মীরজাফর সুখী হইতে পারিলেন না। যে ইংরাজ-বণিকের সহায়তা লাভ করিয়া রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, সেই ইংরাজ-বণিকের ব্যবহার দেখিয়া মীরজাফরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল!

ইংরাজ বণিক। কেবল লাভের গন্ধ পাইয়াই সুদূর ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান প্রাচ্য রাজ্যে পদার্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন! এ দেশের সুখ দুঃখ বা উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? কেবল যে কোন উপায়ে হউক, কিঞ্চিৎ কুক্ষিগত করিয়া বিলাতে পলায়ন করা; আর শ্বেতদ্বীপের শান্তশীতল কুজ্ঝটিকা-বৃত নিভৃত নিকেতনে বসিয়া অবশিষ্ট জীবন সেই ধনরত্ন উপভোগ করা;—ইহাই সেকালের ইংরাজদিগের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহারা দয়াধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না! এতদিন মীরজাফর ইংরাজচরিত্রের গূঢ়মর্ম্ম অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না; এখন সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতেই, ইংরাজবণিকের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল! এ কালের ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা সেকালের ইংরাজ মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিকাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাতে কিছু-মাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন যে, "ভারতবর্ষ ত আর সুসভ্য ইউরোপ নহে; ভারতবর্ষে বাস করিবার সময়ে ধর্ম্মনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি মানিয়া চলিবার প্রয়োজন কি?" (২) সুতরাং অর্থই তাঁহাদের

---

(১) The title conferred on Colonel Clive by the Court of Delhi. It means *the proved warrior*.—Dubais.

(২) It seems, indeed, at this time to have been too generally thought that the ethics of Europe were not applicable to Asia, and their plainest rules were violated without hesitation. Englishmen sometimes manifested

একমাত্র পরমার্থ হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিতে, এবং আবশ্যকমত জাল জুয়াচুরি করিয়াও আত্মকার্য্য সাধন করিতে কাহারও কিছুমাত্র লজ্জা হইত না! মীরজাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার নিকৃষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ইংরাজদিগের সঙ্গে মীরজাফরের যে গুপ্ত-সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই সন্ধি-সূত্রে ইংরাজ-কোম্পানী, ইংরাজকর্ম্মচারী, ইংরাজসেনানায়ক এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ, কে কিরূপ পুরস্কার পাইবেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সিরাজ-দ্দৌলা আশৈশব ইংরাজবিদ্বেষী; তিনি মীরজাফরকেও বিলক্ষণ সন্দেহ করিতেন। সুতরাং মীরজাফর বা ইংরাজদিগের উপর তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। সিরাজের কর্ত্তব্যপরায়ণ গুপ্তচরগণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে চারি দিকে বিচরণ করিত, এবং চরাধিপতি রাজা রামরাম সিংহ সবিশেষ সুকৌশলে গুপ্তসন্ধান সংগ্রহ করিতেন। এই সকল কারণে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের সহজে কথা-বার্ত্তা চলিতে পারিত না। ইংরাজদিগের মুখপাত্র ওয়াটস্ সাহেব কাশিম-বাজারে থাকিয়া কলিকাতার ইংরাজদরবারের গুপ্তসমিতির সঙ্গে এবং মীরজাফরের সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদন করা যে কত দূর আপদসঙ্কুল,* ওয়াটস্ সাহেব তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। একখানি পত্র বা একখানি প্রত্যুত্তর ধরা পড়িলে, কিম্বা সিরাজদ্দৌলা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার অবসর পাইলে, ওয়াটস্ সাহেবের সর্ব্বনাশ ঘটিতে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব হইবে না;—ওয়াটস্ সাহেব তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সেই জন্য ওয়াটস্ সাহেবের একজন মধ্যবর্ত্তী লোক সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ষড়যন্ত্রকারীদিগের পরামর্শে ওয়াটস্ সাহেব উমাচরণ নামক বিখ্যাত বণিকরাজকে মধ্যস্থ মনোনীত করিয়াছিলেন। উমাচরণ এ দেশের ইতিহাসে "ধূর্ত্ত উমিচাঁদ" নামে পরিচিত; বলা বাহুল্য যে, অধিকতর ধূর্ত্ত ইংরাজবণিকেরাই তাঁহাকে এই অকীর্ত্তিকর উপাধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উমাচরণের প্রকৃত পরিচয় ইতিহাসে স্থান-

---

a degree of cupidity, which might rival that of the most rapacious servants of the worst Oriental Governments. They seem to have thought principally, if not solely, of the means of amassing fortunes, and to have acted as though they were in India for no other purpose.—

Thornton, vol. I. 252.

লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি বাঙ্গলা, বিহারের বাণিজ্যাধিপতি হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থবলে কি ইংরাজ-দরবারে, কি নবাব-দরবারে, সর্ব্বত্রই সবিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজদিগের সঙ্গে ইঁহার বহু দিনের বন্ধুত্ব। যে সময়ে ইংরাজদিগকে নিতান্ত বিদেশী বণিক বলিয়া কেহ সহসা বিশ্বাস করিত না, উমাচরণ সেই সময়ে ইংরাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে দেশের লোকের বাণিজ্যসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ইংরাজবণিকের সঙ্গে লাভের অংশ লইয়া উমাচরণের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সেই সূত্রে উমাচরণ মুরশিদাবাদের নবাবদরবারের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়া, ইংরাজদিগের নিকট শত্রুপক্ষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যাহাই বলুন, উমাচরণ কিন্তু এক দিনের জন্যও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ইংরাজের সন্দেহে পড়িয়া তিনি কলিকাতা দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন; ইংরাজসেনার অত্যাচারভয়ে তাঁহার মহিলাবর্গ অকালে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার কলিকাতার সুধাধবল রাজবাটী ইংরাজের কৃপায় অগ্নিদাহে ভস্মপরিণত হইয়াছিল (১);—কিন্তু কিছুতেই উমাচরণের ইংরাজ-হিতৈষণা বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজেরা যখন কলিকাতা দুর্গে অবরুদ্ধ, তখন সন্ধিসংস্থাপনের জন্য উমাচরণ মাণিকচাঁদকে পত্র লিখিয়াছিলেন (২); কলিকাতা ধ্বংসের পর অন্নবস্ত্রাভাবে ইংরাজগণ যখন পথের কাঙ্গাল হইয়া দেশে দেশে রোদন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, উমাচরণ তখন অন্ন বস্ত্র দিয়া তাঁহাদিগের লজ্জারক্ষা করিয়াছিলেন (৩); আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজ যখন আকুল, উমাচরণ তখন বড়ই ব্যাকুল হৃদয়ে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন (৪); সিরাজদ্দৌলা যখন ইংরাজের দুষ্ট-

(১) Orme's Indostan, vol. II.

(২) Stewart's History of Bengal.

(৩) When an order was published that such of the English as had escaped the black hole might return to their homes, they were supplied with provisions by Omichund, "whose intercession", says Orme, "had probably procured their return."—Mill's History of British India, vol. III. 170.

(৪) His tales and artifices prevented Suraj Dowla from believing the representations of his most trusty servants, who early suspected, and at length were convinced, that the English were confederated with Jaffier.—Orme's Indostan, vol. II. 182.

বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে ধনে বংশে বিনষ্ট করিবার জন্য অভিসন্ধি করেন, তখন উমাচরণই ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া ইংরাজের সাধুস্বভাবের সাক্ষ্যদান করায়, ইংরাজবণিক ধনে প্রাণে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন (১); ইংরাজের অত্যাচারে শোকসন্তপ্ত হইয়া এবং ইংরাজের অবিচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, উমাচরণ যখন নীরবে অশ্রুপ্লাবিতনয়নে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও যথাসর্ব্বস্ব ইংরাজের কল্যাণের জন্য দানপত্রে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন! (২)

মীরজাফরের সঙ্গে যখন লাভের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইতেছিল, তখন উমাচরণ দেখিলেন যে, যাঁহারা আত্মপ্রকাশ না করিয়া গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই সবিশেষ পুরস্কারলাভের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, এবং মীরজাফরের কৃপায় সকলেই কোন-না-কোন আকারে পুরস্কৃত হইবার ভরসা পাইতেছেন। তখন উমাচরণও নিজের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি স্বয়ং নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা গুপ্ত মন্ত্রণার সহায়তা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যই সিরাজদ্দৌলা জানিয়া শুনিয়াও সহসা কোন কথায় আস্থা স্থাপন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। যদি গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে অন্য লোকে না হয় পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে; কিন্তু উমাচরণকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে তপ্ত-শূলে আরোহণ করিতে হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি স্বভাবতই ওয়াটসকে বলিলেন যে, "লক্ষাভাগের সময়ে তাঁহাকেও অংশ দিতে হইবে; ত্রিশ লক্ষ টাকার কমে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।" ইহাতেই উমাচরণের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল! (৩)

---

(১) Mr. Watts writes from Moorshidabad, that "Omichund told the Nabob that he had lived under the English protection these forty years and never knew them once to be guilty of breaking their word;—to the truth of which he took his oath by touching a Brahmin's foot,—and that if a lie could be proved in England on any one, they were spat upon and never trusted.—Select Committee's Proceedings, 25 February, 1757.

(২) Omichund by his Will left Rs 1500 to the Treasurer of the Foundling Asylum, the same to the Magdalen, both were paid.—Long's Selections from the Records of the Government of India, vol. I.

(৩) To men whose minds were in such a state, the great demands of Omichund appeared (the reader will laugh—but they did literally appear) a crime. They were voted a crime; and so great a crime, as to deserve

কলিকাতার গুপ্ত-সমিতি যখন 'ধূর্ত্ত উমিচাঁদের' এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন ক্রোধে ঘৃণায় সকলেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন! ক্লাইব দেখিলেন যে, এখনই গৃহকলহে সকল চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে! তিনি সকলকে শান্ত করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উমাচরণ যাহা চাহিতেছেন, তাহাতেই আপাততঃ সম্মত হইতে হইবে; কার্য্যকালে উমাচরণের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেই হইল। ইংরাজগণ সম্মত হইলেন। ক্লাইবের পরামর্শে দুই খানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল। এক খানি লাল কাগজে, সেখানি জাল;—তাহাতে উমাচরণের কথা লিখিত রহিল। আর এক খানি সাদা কাগজে; সেখানি আসল,—তাহাতে উমাচরণের নামগন্ধও থাকিল না! উমাচরণকে লাল সন্ধিপত্র দেখাইয়া সকল সমস্যার মীমাংসা করা হইল। সেনাপতি ওয়াটসন্ এই জাল সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইয়া একটু গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন; কিন্তু ক্লাইবের প্রত্যুৎপন্নমতি এ সকল ক্ষুদ্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে বিলম্ব করিল না। ওয়াটসনের নাম জাল করিয়া ইংরাজের পথ নিষ্কণ্টক করা হইল! (১)

এ সকল কলঙ্ককাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া, ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন! তাঁহারা বলেন যে, মীরজাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র ক্লাইব দলবল লইয়া জগৎশেঠের মন্ত্রভবনে সম্মিলিত হইলেন; সেখানে গুপ্ত সন্ধিপত্র প্রকাশ্যভাবে পাঠ করা হইল। সে সন্ধিপত্র সাদা কাগজের, তাহাতে উমাচরণের নামগন্ধও নাই। উমাচরণ সোৎকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ভুল হইতেছে; এ কোন্ সন্ধিপত্র পাঠ করিতেছ? আমাকে যাহা দেখান হইয়াছিল, সে যে লাল কাগজের সন্ধিপত্র!" ক্লাইব তখন সময় পাইয়াছেন; সুতরাং সগর্ব্বে উত্তর দান করিলেন, "হাঁ, তোমাকে

---

to be punished,—to be punished, not only by depriving him of all reward, but depriving him of his compensation, that compensation which was stipulated for to every body,—Mill's History of British India, vol. III. 171.

(১) Clive, whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang, proposed, that two treaties with Meer Jaffier should be drawn up and signed; one, in which satisfaction to Omichund should be provided for, which Omichund should see: another, that which should be really executed, in which he should not be named. To his honour be it spoken, Admiral Watson refused to be a party in this treachery. He would not sign the false treaty; and the committee forged his name.—Mill's History of British India, vol. III. 171-172.

লাল কাগজের সন্ধিপত্রই দেখান হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা সাদা কাগজের সন্ধিপত্র!" তাহার পরে পার্শ্বস্থ স্ক্রাফ্‌টন্‌ সাহেবের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে ঈঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আর কেন? এখন প্রকৃত সংবাদ শুনাইয়া দেও।" স্ক্রাফ্‌টন্‌ অবলীলাক্রমে বলিতে লাগিলেন, "উমাচরণ! তোমাকে যে সন্ধিপত্র দেখান হইয়াছিল, তাহা জাল; এখন যাহা পাঠ করা হইল, তাহাই প্রকৃত;—তুমি এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইবে না!" (১)

ইতিহাসে-লেখকেরা বলেন যে, এই নিদারুণ সংবাদে উমাচরণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন; তাঁহার আর বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল না; অল্প দিন মাত্র উন্মাদের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া তিনি ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন!

ইংরাজের আদর্শ-স্বভাবের পরিচয় পাইয়া মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন! সকলেরই মনে হইল যে, ইঁহারা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য নাই; সুতরাং মৌখিক সৌজন্য প্রকাশের ক্রটি না থাকিলেও, মনে মনে পাত্র মিত্র সহ নবাব মীরজাফর ইংরাজকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিলেন! এত দিনের পর মীরজাফরের জ্ঞানোদয় হইল! আশ্রয়দাতা আলিবর্দ্দির অন্তিম উন্মাদের কথা স্মরণ হইল; স্নেহভাজন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার ইংরাজবিদ্বেষের কথা স্মরণ হইল; কিন্তু আর সে সকল কথা স্মরণ করিয়া কি হইবে? ইংরাজবীর কর্ণেল ক্লাইব অসিহস্তে পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বারম্বার বলিতেছেন, "টাকা কোথায়? আমাদিগের পাওনা-গণ্ডা চুকাইয়া দেও!"

সাহিত্যে প্রেম।

(মনুষ্যত্ব)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে কেমন দেবত্বের সৃষ্টি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমে কেমন পাশব ভাব। মানবপ্রকৃতি যেমন পাশবপ্রবৃত্তির আধার, তেমনি দেবপ্রবৃত্তির লীলাভূমি। মানব যত দেবভাবে সমুন্নত হইতে থাকে, তাহার পাশবপ্রবৃত্তি ততই তিরোহিত হইতে থাকে।

(১) বিলাতের মহাসভায় সাক্ষ্যদান করিবার সময়ে ক্লাইব এ সকল কথা আপন মুখেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য অন্য লোকে লজ্জিত;—কিন্তু ক্লাইব কখনও লজ্জা বোধ করেন নাই; তাঁহারধারণা ছিল যে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—ইহাই সমীচীন রাজনীতি

ধর্ম্মব্যাধ বলিয়াছিলেন, যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন ; সেইরূপ কল্যাণকর পুণ্যকর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে। ইউরোপীয় সাহিত্য পাশবপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে যত শিক্ষা দেয়, দেবপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তিসাধনোদ্দেশে অন্তরকে তত উত্তেজিত করে না। আর্য্যসাহিত্য বলে, এই পাশবপ্রবৃত্তি শাসন করিবার দ্বিবিধ উপায় ;—(১) পাপের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ কর, এবং (২) পুণ্যের স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া পাপপথ হইতে নিবৃত্ত হও। আর্য্যসাহিত্য দেখাইয়া দেয়, যত অধিক পুণ্যের সঞ্চার হইবে, সেই পরিমাণে পাপ আপনা-আপনি দূরে যাইবে। পুণ্যের ও দেবত্বের উচ্চ আদর্শে অন্তরকে উত্তোলিত করিয়া পাপকে বিদূরিত করিবার জন্য আর্য্যকবিগণের রচনা-কৌশলের বিস্তৃত সৃষ্টি। এই উচ্চাদর্শে অন্তরকে নিয়োজিত করাই মনুষ্যত্ব।

পাশবপ্রবৃত্তিসমূহ মনুষ্যে এত প্রবল যে, স্বভাবতঃই মনুষ্য পাশব ব্যবহারে নিরত হয়। অন্য দিকে তাহার দেবাংশ তাহাকে দেবসৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করে। তাহার পাশব কার্য্য সকল দুঃখপ্রধান, এবং দেবকর্ম্মসমূহ সুখপ্রধান। এই সুখ আবার এত দীর্ঘকালস্থায়ী যে, তাহার সহিত তুলনায় পাশবপ্রবৃত্তিজনিত সুখ কিছুই নহে বলিলে হয়। পাশবপ্রবৃত্তি সুখদুঃখের প্রসূতি, কিন্তু দেবপ্রবৃত্তি শান্তির জননী। এই শান্তিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া মনুষ্য পাশবপ্রবৃত্তিসুখ পরিহার করিতে উদ্যত হন। বিবেচনা, চিন্তা ও বিচারশক্তি তাঁহার বুদ্ধিকে সদুপায় দেখাইয়া দেয়। এই সদুপায়ের নির্দ্ধারণে এবং তাহার অবলম্বনে তাঁহার মনুষ্যত্ব। মানব এইখানে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের এই উপায় অনায়াসলব্ধ এবং স্বাভাবিক বলিয়া, মনুষ্য দেবতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাহার পক্ষে এই উপায়াবলম্বন যত সহজ ও অনায়াসলব্ধ, তিনি তত দেবোপম,—তাঁহার দেবশক্তি তত স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আর্য্যসমাজে এরূপ রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা এই উপায় সকল অবলম্বিত হইতে পারে। আর্য্যসমাজ ও তাহার রীতিনীতি এই জন্য মনুষ্যত্বলাভের অনুকূল। সেই রীতিনীতিতে পশুত্বের পরিহার এবং দেবত্বের অবলম্ব। তজ্জন্য যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযম আর্য্যসমাজের প্রধান বল ও নীতি। যে পরিমাণে এই বলোপচয় হইবে, সেই পরিমাণে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা। কারণ, দেবত্বের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর্য্যসমাজের রীতিনীতির দৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছেদন করা যাহা, আর দেবত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে যাওয়াও তাহা। এই বন্ধনসমূহের অনুগামী হইয়া যিনি সংযমী হইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় দেবত্বের

অধিকারী হইতে সমর্থ। এই বন্ধনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করাতে যে সংযমের প্রয়োজন, সেই সংযমের সাধনাই মনুষ্যত্ব। আর্য্যসমাজে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

পূর্ব্বকালে সতীর গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া আর্য্যনারী কেমন বীরত্ব ও সংযমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের আর্য্যসাহিত্যে পরিদৃশ্যমান। সেই গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহারা নিজ পবিত্রতা রক্ষার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কাতর হইতেন না। কত রাজপুত বীরাঙ্গনা যবনস্পর্শভয়ে ভীতা হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণদান করিয়া গিয়াছেন। স্বামিগরিমায় উন্মত্তা সতী পলমাত্রও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিতেন না। যাঁহার সেই গরিমা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইত, সেই বীরাঙ্গনা সতী সহমরণেও ভীতা হইতেন না; স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে চিতারোহণ করিতেন। যে আন্তরিক বলে এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত, সে বল কি সামান্য? সেই বলে আর্য্যসতী বলবতী হইয়া সংসারধর্ম্মে আত্মসংযমের সম্যক্ পরিচয় দিতেন। স্বামীর নিমিত্ত সকল কষ্টভোগ ও সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিতেন। সতীত্বগৌরব এক্ষণকার কালে যত অন্তর্হিত হইতেছে, সেই বলও ততই অদৃশ্য হইতেছে। কিন্তু সেই প্রবর্ত্তনার পরিবর্ত্তে কি আমরা আর কোনও সমপ্রবল উত্তেজনশক্তি আমাদিগের স্ত্রীজাতিকে দিতে পারিয়াছি? যদি না দিতে পারিয়া থাকি, তবে সেই পূর্ব্বতন সতীত্বগৌরব তাহাদিগের মন হইতে অপনীত করি কেন? আর কোন প্রবর্ত্তনা যে তত বলবতী হইতে পারে, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যাহার পরিচয় আর্য্যসাহিত্যে আছে, সেই প্রবর্ত্তনার বল অত্যন্ত অধিক বলিয়াই দেখা গিয়াছে। তাহাকে আর পরীক্ষা করিতে হইবে না। সুতরাং সেই প্রবর্ত্তনাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখাই উচিত। সেই উত্তেজনশক্তি যদি নারীসমাজকে বলপ্রদান করে, সে বল পর্ব্বতের মত অলঙ্ঘ্য। সেই অলঙ্ঘ্য বলে বলবান আমাদের নারীসমাজের ধর্ম্মনৈতিক বলের সমতুল্য বল আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব আমাদের সমাজে পূর্ব্বতন সতীত্বগৌরব যাহাতে সুরক্ষিত হয়, এমন উপায় অবলম্বন করা এবং যদ্দ্বারা সেই গৌরবের হ্রাস হয়, তাহার পরিহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এই সতীত্বগৌরবরক্ষার্থ রামজননী কৌশল্যা দেবী আত্মসংযমের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বামী, কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হওয়াতে, সাধ্বী চিরকালই একান্ত মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন; কৈকেয়ী এবং তাঁহার দাসী পর্য্যন্ত কত অপমান ও বিদ্রূপ করিয়াছিল। তবু কৌশল্যা দশরথকে

ভালবাসিতেন। ভাবিয়াছিলেন, পুত্রের রাজত্বকালে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইবে। 'সেই রামাভিষেককাল সমুপস্থিত। কৌশল্যার অন্তরে শত চন্দ্রের উদয় হইল। কিন্তু তৎপরেই যখন রাম বনবাসে যাইবার নিমিত্ত মাতৃবিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন, কৌশল্যার অন্তর একেবারে শতধা বিদীর্ণ হইল। তাঁহার কোন দিকে আর কোন সান্ত্বনা রহিল না। প্রবল অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয়ে শত সমুদ্র উছলিয়া উঠিল। তিনি কিরূপে গৃহে তিষ্ঠিবেন? কৌশল্যার সুখ অযোধ্যায় নাই,—তাঁহার সুখ রামের সঙ্গে বনবাসে। কৌশল্যা মনের দারুণ আবেগে রামের সঙ্গে বনে যাইতে চাহিলেন; কিছুতেই গৃহে থাকিবেন না। তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে যেইমাত্র সতীর কর্ত্তব্যের দিকে দেখিতে বলিলেন,—পিতৃদেব দশরথ জীবিত থাকিতে তিনি ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারেন না, অমনি কৌশল্যা দেবীর চমক ভাঙ্গিল। মনের দারুণ আবেগ, কর্ত্তব্যের বলে প্রতিরোধ করিলেন। এক দিকে দারুণ অপত্যস্নেহ, অন্য দিকে স্বামীর প্রতি অনুরাগ, তন্মধ্যে সতীর কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তব্যবুদ্ধি আত্মসংযম আনিয়া দিল। আর কৌশল্যা দশরথকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে বনবাসে যাইতে পারিলেন না। প্রেমের এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গকে সংযত করিল। সতীর অনুরাগ অপত্যস্নেহের উপর বিজয়ী হইল। সতী দশরথসেবায় আবার নিযুক্তা হইলেন।

রামবনবাস পিতৃনিয়োজিত; লক্ষ্মণ কেন বনবাসে যান? তথাপি সুমিত্রা দেবী ত কাঁদিয়া অধীরা নহেন? তাঁহার ধৈর্য্য বুঝি আরও চমৎকার। সুমিত্রার বিষাদ কি কেহ টের পায়? সুমিত্রার আত্মসংযম অন্তরে অন্তরে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছিল। কিন্তু সতী সে সংগ্রাম গোপন রাখিয়া অতি বিশ্বস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে অকাতরে বিদায় দিয়া গৃহধামে পতিপার্শ্বেই রহিলেন।

আত্মশাসন দেখ সেক্সপিয়রের ইজাবেলায়। ইজাবেলা সমুদায় সাংসারিক প্রেম সংযত করিয়া তাহা ভগবানে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার মানুষপ্রেম দেবপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। আর্য্যবিধবার সমস্ত সংসারাসক্তি যেমন দেবতায় নিবেদিত হয়, ইজাবেলার সংসারাসক্তি বুঝি সেইরূপই নিবেদিত হইয়াছিল। ইজাবেলা সেইরূপ দেবপ্রেমে পরিপূর্ণা হইয়া ধর্ম্মমঠে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। তখন সেই নবীন তপস্বিনীর যৌবনানুরাগের উচ্ছ্বাস দেখে কে? এই দেবপ্রেমের ছবি সেক্সপিয়ার কেবল ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মে পাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম বৌদ্ধমঠের নিয়ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয় সমাজে

তাহা কেমন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, আধুনিক ইউরোপীয় উদারচেতা সমালোচকগণ তাহা দেখাইয়াছেন। সে যাহা হউক, নবীন তপস্বিনী ইজাবেলা নিজ ভ্রাতার প্রাণরক্ষার্থ ঘোর নিশীথে একাকিনী এঞ্জিলোর নিকট দ্বিতীয় বার উপস্থিত। এঞ্জিলো তখন স্বীয় পাপাভিলাষ প্রকাশ করিলে ইজাবেলা ধর্ম্মকোপে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"যায়, ভাই যা'ক, তথাপি তাহার প্রাণরক্ষার্থ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত ভগ্নী কখনই অধঃপাতে যাইতে পারিবে না।"

আবার যখন সেই ভাই আত্মরক্ষার্থ ভগিনীকে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল, তখন ইজাবেলা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন ;—

"রে দুর্ব্বৃত্ত নরাধম! ভগিনীকে পাপে লিপ্ত করিয়া তোর বাঁচিবার সাধ, ধিক তোরে!"

এই দুই স্থলে ইজাবেলা নিজ ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আত্মসংযমের সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। ইজাবেলার অন্তর যখন ধর্ম্মরাগে পরিপূর্ণ ও পরিপূত হইয়াছে, যখন তিনি সেই নবরাগে মঠে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি যে এঞ্জিলোকে প্রত্যাখ্যান করিবেন, এ বড় বিচিত্র নহে। তাঁহার তখনকার মনোবেগের সমক্ষে পাপপ্রবৃত্ত এঞ্জিলো কি দাঁড়াইতে পারেন? এরূপ চিত্র সেক্সপিয়ারে অধিক পরিমাণে থাকিলে সেক্সপিয়ার বড়ই উপাদেয় হইত।

কীচকের প্রলোভনে দ্রৌপদীর এই প্রকার আত্মসংযম। দ্রৌপদী আত্মসংযম করিয়া কীচকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন।

আর, আত্মশাসন দেখ ভরতের। ভরতের জন্য অযোধ্যার সিংহাসন প্রস্তুত; তাঁহার মাতা সকল কণ্টক কাটিয়া রাজসিংহাসন তাঁহার পদতলে দিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত কি সেই সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি নিজ মাতার ব্যবহার সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের বনবাসে সেই সিংহাসন ক্রীত হইয়াছিল। পিতৃদেব দশরথের তজ্জন্য প্রাণবিয়োগ হইয়াছে; সমস্ত পরিজনবর্গের রোদনরোল উত্থিত হইয়াছে; অযোধ্যাবাসিগণ রামের জন্য হাহাকার করিতেছেন। তখন ভরত কি সিংহাসনে বসিতে পারেন? তখন না হয়, তার পরেও কি তিনি রাজমুকুট ধারণ করিতে পারেন? তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি উত্তেজিত হইল। সেই ভ্রাতৃভক্তিবশে তিনি জননীকে ভর্ৎসনা করিলেন; সিংহাসনের লোভ সম্বরণ করিলেন। যখন

রাম তাঁহার আহ্বানে—তাঁহার অনুনয়ে বিনয়ে—গৃহে ফিরিয়া আসিলেন না, তখন তিনি সেই সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া, যে রাজকার্য্য না করিলে নয়, সেই রাজকার্য্যে অনাসক্ত হইয়া ব্যাপৃত হইলেন। এক দিকে অগ্রজের পাদুকা পূজা করিতেন, অন্য দিকে তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই আত্মসংযমবলে ভরত যাহা করিলেন, তাহাতে ভরতকে, রাজসিংহাসন কি তুচ্ছ, দেবাসনে বসাইয়াছে। অযোধ্যায় রাজা হইলে ভরতের কি হইত? আজি ভরত সর্ব্বজনের ও সর্ব্বকালের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি তাঁহাকে দেবোপম করিয়াছে।

আর আত্মশাসন দেখ কচের। কচ শুক্রাচার্য্যগৃহে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিতে গিয়াছেন। দেবযানী তাঁহার সহচরী। দেবযানী তাঁহার সংসর্গ ভালবাসিতেন। সমস্ত দিন দুই জনে একত্র থাকিতেন। কচের রূপ ও গুণে দেবযানী মুগ্ধা। দেবযানীর অনুগ্রহে তিনি চার বার মৃতসঞ্জীবিত হইয়াছেন। কচ তথাপি দেবযানীর পাপস্পৃহার পক্ষপাতী নহেন। কচ দেবযানীর মনোভিলাষ বিলক্ষণ জানিতেন; সেই জন্য তিনি গুরুকন্যাকে ভগ্নীভাবে দেখিতেন ও সম্বোধন করিতেন। অবশেষে কচ যখন নিজ ইষ্টলাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত, দেবযানী তখন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। মুনির নিকট দেবযানী আত্মপ্রকাশ করিলেন। কচ তাঁহাকে অসামান্য আত্মসংযমবলে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কচ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, দেবযানীও আত্মশাসন করিয়া নিজ অভিলাষ সংযত করিলেন। চন্দ্র ও তারার প্রেমে এবং সেক্সপিয়রের আইমজিন, হেলেনা, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট প্রভৃতির প্রেমে যে আত্মশাসনের অভাব, সেই আত্মশাসনপ্রভাবে কচ ও দেবযানীর প্রেমচিত্র দেবসৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে; ইন্দ্রিয়লালসার পাপান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে। সেক্সপিয়র এবং তদনুবর্ত্তী শত শত উপন্যাসলেখকের রচনায় প্রেমের এরূপ দেবপ্রতিম শাসন কি লক্ষিত হয়? পশুত্ব কি দেবত্ব দ্বারা অনুশাসিত হয়? সেই অনুশাসনের বল আত্মশাসন ও মনুষ্যত্ব।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমচিত্রসকল এই আত্মসংযমপ্রভাবে গৌরবান্বিত। প্রেম কেমন আত্মশাসন ও ভক্তিতে অনুশাসিত, তাহা যদি দেখিতে চাও, তবে একবার শুধু কৌশল্যাকে কেন, বাল্মীকির সীতা ও সুমিত্রা দেবীকে দেখ। দেখ ব্যাসের দ্রৌপদী, কুন্তী ও গান্ধারীকে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে দেখ। দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা ও শকুন্তলাকে দেখ। রাধিকা, রমা ও

উমাকে দেখ। সুভদ্রা, রুক্মিণী ও সত্যভামাকে দেখ। দেখ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নকে। আত্মশাসন দেখ, রাজসভায় আনীতা শকুন্তলার সমক্ষে দুষ্মন্তচরিত্রে। আর যদি আত্মশাসনের প্রকাণ্ড ছবি দেখিতে চাও, তবে একবার মহাভারতে যে স্থলে কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হইতেছে, সেই স্থলে পঞ্চপাণ্ডবের পানে চাহিয়া দেখ। ভীম আক্রোশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে-ছেন,—একবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্কেত পাইলে হয়, অমনি পৃথিবী রসাতলে দেন। অর্জ্জুন বীরত্বে ফুলিয়া উঠিয়া কোপপ্রজ্বলিতনয়নে যুধিষ্ঠিরের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—আর দেখিতেছেন—একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন—কতক্ষণে তাঁহার শির একবার নড়িয়া উঠিবে—কতক্ষণে অগ্রজ একবার মুখোত্তোলন করিয়া ইঙ্গিত করিবেন—আর তিনি অমনি সেই কুরুসভা চুরমার করিয়া ফেলিবেন। যদি আত্মশাসন দেখিতে চাও, যদি ধৈর্য্য দেখিতে চাও, যদি ভ্রাতৃভক্তির বল দেখিতে চাও, একবার সেই দিকে দেখ। দেখ সম্মুখে নিজ পত্নীর লাঞ্ছনা—সমুদায় শত্রু কর্ত্তৃক ঘোর লাঞ্ছনা; আর গাত্রে অপরিসীম বল, বিক্রম ও বীর্য্য। উষ্ণ শোণিতে আপাদমস্তক জ্বলিতেছে। শত্রুগণ সদর্পে হাসিতেছে। দ্রৌপদী রাগে ও অপমানে ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া আছেন। তথাপি ভ্রাতৃভক্তি, ধৈর্য্য ও আত্মশাসনের গণ্ডী কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিল না। দ্রৌপদী ভগবানের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভগবান দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। এই আত্মশাসনের চিত্র, পৃথিবীর কোন্ কবি ধরিতে পারিয়াছেন ?

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রেমাদর্শ আমাদের আর্য্যসাহিত্যে। সে প্রেম ভক্তিতে সমুন্নত এবং স্নেহরসে বিগলিত। সীতার প্রেম পতিভক্তিতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে একদা প্রেম ও ভক্তির পরিচয়! তেমন প্রেমমাখা পতিভক্তি কে কোথায় দেখিয়াছে! তেমনই প্রেমমাখা ভক্তি বুঝি ভরতের ও লক্ষ্মণের। উত্তরচরিতের "চিত্রদর্শন" নামক প্রথম অঙ্কে সীতার প্রেম ও ভক্তির বিরাট বিকাশ। "ছায়া" নামক তৃতীয় অঙ্কে রামচন্দ্র সীতার প্রেমে কতই অধীর হইয়াছিলেন! যে প্রেমে তিনি সোণার সীতা গড়িয়া রাখিয়া চিরদিন মনোদুঃখে কাঁদিতেন, সেই প্রেম ও হৃদয়বেদনা ভবভূতি এই অঙ্কে কত সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন! আর দেখ প্রেম কৌশল্যা ও জনকের—তাহা চতুর্থ অঙ্কে প্রদর্শিত। সীতা ত বনবাসে

সেই প্রেমকে চারিদিকে বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছিল। দেখাইয়াছিল, সীতা কেমন রামের প্রেমসর্ব্বস্ব-ধন, জনকের কত আদরের সামগ্রী, কৌশল্যার কত যত্নের গৃহলক্ষ্মী, দেবর লক্ষ্মণের কেমন প্রেম ও ভক্তিময়ী প্রতিমা।

হিন্দুনারী বড় যতনের ধন। তিনি গৃহলক্ষ্মী, তাঁহাকে লইয়াই হিন্দু-পরিবারের মান, সম্ভ্রম, সকলই। তিনি ভক্তিতে পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকল গুরুজনেরই অধীন, আবার স্নেহে সন্তানের ও দেবরের অধীন। স্বতন্ত্রতা তাঁহার কোথাও নাই, কখনই নাই। দুর্ব্বলা নারী, কিরূপে স্বতন্ত্রা থাকিবে? প্রকৃতিকে পরাধীন হইতেই হইবে। তাঁহাকে যে সন্তান গর্ব্ভে ধারণ করিতে হয়—সন্তান সন্ততিগণকে লালনপালন করিয়া মানুষ করিতে হয়। সুতরাং পরাধীনতা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা। তাই হিন্দুনারী শত বন্ধনে বাঁধা; মনু সে বন্ধন দেন নাই। তিনি যেমন ভক্তি, প্রেম ও স্নেহে সকলকে বাঁধিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে আবার সেই প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতে, হিন্দুপরিবার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। এ ত প্রেমাধীনতা নহে, প্রেমের পরিপুষ্টিসাধন, প্রেমের পরিপূর্ণতা। প্রেম ভক্তিতে মিশ্রিত, ভক্তি প্রেমে মিশ্রিত। ভক্তি ও স্নেহসূত্রে হিন্দুসংসার মিলিত। সেই সংসারের ছবি ও আদর্শ আমাদের আর্য্যসাহিত্যে।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে আমরা দেখিতে পাই না,—নায়ক নায়িকা বার বার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, আমি তোমায় বড় ভালবাসি—শপথ করিয়া বলিতেছি ভালবাসি; ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি; তোমার জন্য প্রাণ যায়, বুক যায়। এ দোকানদারির আবশ্যকতা হিন্দু সমাজে নাই। হিন্দু সমাজে যে যাহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে;—তাহাই যথেষ্ট। সেই কর্ত্তব্যসাধনেই সকল ভালবাসা, স্নেহ মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। বিবাহ দিবার ভার গুরুজনের হস্তে। সুতরাং এখানে প্রেম বা পতিপত্নী শিকার করিবার প্রয়োজন নাই। বিবাহের পর যে যাহার কর্ত্তব্য সাধন করিলেই যথেষ্ট হইল। এখানে রূপপিপাসা ও ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বিবাহ নহে। সেই কারণে বিবাহ কন্যাপুত্রের হস্তে বিন্যস্ত নাই। গুরুজনেরা কন্যা পুত্রের বিবাহ দেন। এখানে স্ত্রীর শাসন পতি; পতির শাসন পত্নী। উভয়ে পরস্পরের মহাশাসনে আবদ্ধ। এই পারিবারিক ও নৈতিক শাসনে আনিবার নিমিত্ত গুরুজনেরা কন্যাপুত্রের বিবাহ দেন। সংসারের শৃঙ্খলে শীঘ্র শীঘ্র বাঁধিবার জন্য অল্প বয়সে পুত্রকন্যার বিবাহ। যখন

যৌবনের প্রবৃত্তিস্রোত বহিবে, যখন রিপু সকল প্রবল হইবে, তখন সেই পুত্র-কন্যা সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাহাদের আবার হয় ত পুত্র কন্যা হইয়াছে— তাহারা তখন ঘোর সংসারী। সেই সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাদের কি কিছু করিবার যো আছে ? চারি দিকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা। এ বড় শক্ত বন্ধন ; ছেদন করে কাহার সাধ্য ? কেবল ঈশ্বরের পরম ভক্তই পারেন। নহিলে হিন্দুসংসার হইতে এক পা দূরে যাওয়া বড়ই কঠিন। যৌবনপথে পদার্পণ করিয়া হিন্দুসংসারে যথেচ্ছাচারী হওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য। যে সমাজ এত বন্ধনে বাঁধা, সে সমাজে প্রেম ও ভালবাসা চীৎকার করিয়া প্রকাশ করিতে হয় না। তাহা আপনাআপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে। সংসার-কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হয়। সংসারবন্ধনে তাহা আরও বর্দ্ধিত হয়। সংসারের মহাযজ্ঞ-সাধনে তাহার মাত্রা পরিপূরিত হয়। গোড়ায় পতিপত্নীর ভালবাসা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইয়া একত্র সহবাসে, সংসারের কর্ত্তব্যসাধনে, পুত্র কন্যার লালনপালনে, সেই পতিপত্নী যতই একনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, যতই তাহাদের সম্মিলন ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া আইসে, ততই তাহাদের স্নেহ মমতা বাড়িতে থাকে ; তাহাদের প্রেমের মাত্রা রোগে, শোকে, সেবায়, যত্নে, ক্রমশই পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এ ত দুই এক বৎসরের সম্বন্ধ নয়, চিরজীবনের সম্বন্ধ। প্রথমে গুরুজনেরা তাহাদিগকে একত্র রাখিয়াছিল, একত্র তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়া যৌবনসীমায় পৌঁছিয়া দিয়াছিল। ক্রমে সেই গুরুজনেরা হয় ত একে একে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যাইলে কি হইবে, তাঁহারা নাতিপুতি রাখিয়া গিয়াছেন। তোমার আর সংসারের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি নাই। এ ত ইউরোপীয় সমাজ নহে যে, পুত্রকন্যাগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহাদের বিবাহ নাই, সংসার ধর্ম্ম নাই, তাহারা যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের ইন্দ্রিয়লালসা প্রবল, অথচ সেই লালসার পারিবারিক শাসনের কোন ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছু তত প্রবল নহে যে, তাহারা আত্মশাসনে থাকিবে। সুতরাং যৌবনের মহা তরঙ্গ তুফানে তাহারা ভাসিয়া যায়। সেই তরঙ্গে যে কে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। যৌবনের প্রকৃতিকে বাঁধিয়া রাখা বড়ই কঠিন। যেখানে হিন্দুসংসারের সুদৃঢ় শাসনাভাব, সেখানে ত যৌবন যথেচ্ছাচারী হইবারই কথা। সেই দুর্দ্দান্ত যৌবনের যথেচ্ছাচারিতারই ছবি আমরা বিলাতী সাহিত্যে দেখিতে পাই।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে, পতিপত্নীর প্রেম অতি নীরবে অথচ বিপুল তরঙ্গে স্ফীত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। সে প্রেম প্রথমে পূর্ব্বানুরাগে অতি প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিতে থাকে। অল্পবয়স্ক পতিপত্নীর প্রেমে এই পূর্ব্বানুরাগের প্রবল স্রোত। সে স্রোতের জোর চারি দিকের শাসনে বরং অন্তরে অন্তরে বাড়িতে থাকে। গোপনে গোপনে সে স্রোতের জোর যেন বাহির হইতে চায়। সে তরঙ্গের ঈষৎ আভাস দেখিলে গুরুজনের কতই না আনন্দ হয়। নবানুরাগ পাছে প্রকাশ হয় বলিয়া বধূ কত গোপনে তাহা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখেন! তত গোপনে রাখিবার জন্যই তাহার বেগ দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে। তাহা মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভায় দেখা দেয়। এই পূর্ব্বরাগ প্রকাশিত হইবার নহে বলিয়া তাহার চিত্র আমাদের আর্য্যসাহিত্যে অতি নীরবে, ঈষৎ মাত্রায়, কেবল সঙ্কেতে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। বধূর প্রেম গৃহিণীতে বর্দ্ধিত হইয়া দেখা দেয়। গৃহিণীরই প্রেমের সংসার। তাঁহার প্রেম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত—স্বামীতে, দেবরে, ভাসুরে, শ্বশুরে শাশুড়ীতে এবং নিজ পুত্র কন্যায় প্রবাহিত। আর্য্যসাহিত্যে এই ছবির বিরাট বিকাশ। কৌশল্যা, গান্ধারী, সুমিত্রা, কুন্তী, সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলই এই প্রেমের চিত্র। মায়া মমতায় বৃদ্ধা হিন্দুনারী নিতান্ত জড়িত। বৃদ্ধার হৃদয় স্নেহের সাগর। সেই স্নেহে তিনি জগৎ শুদ্ধ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। গৌতমীর সেই স্নেহ, কৌশল্যার সেই স্নেহ। সেই স্নেহভরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আর্য্যসাহিত্যের এত সৌন্দর্য্য।

এই প্রেমবর্ণনচ্ছলে কালিদাস প্রভৃতি আর্য্যসাহিত্যের আধুনিক কবিগণ শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিয়া, দাম্পত্যপ্রেমের নানা ভাবভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। সেই সকল স্থলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অনেকে বলিবেন, আর্য্যসাহিত্যও কি বিলাসিতাদোষে দূষিত নহে? আমরা বলি, এই দোষ চাঁদের কলঙ্ক। যাহা বাস্তবিক চন্দ্র, তাহা কলঙ্করেখায় অধিকতর শোভমান হয়; কিন্তু যাহা চন্দ্র নয়, তাহার আবার কলঙ্ক কি? তাহার আগাগোড়া সমস্তই কলঙ্ক। আর্য্যসাহিত্যের স্থানে স্থানে এরূপ কলঙ্ক থাকিলেও তদ্দ্বারা চন্দ্রমাসম সমগ্র কাব্যরসের ব্যাঘাত হয় নাই। সমগ্র কাব্য বিলাসিতার দূষিত রসে কলঙ্কিত নহে। আমাদের কবিগণ রসের খেলা ও কাব্যের স্থায়ী রসের বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতেন। যে রসে হৃদয়কে আর্দ্র করিতে হইবে, যে রস কাব্যপাঠান্তে হৃদয়ে স্থায়িভাবে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারা সেই প্রধান রসের প্রতি

কাব্যে কারুণ্যের, এবং কোন কাব্যে অন্য কোন রসের প্রাধান্য। তন্মধ্যে অপরাপর রসের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু সেই রসাভাস প্রধান রসের ব্যাঘাত ঘটায় না। যে যে রস যাহার বিরোধী নহে, তাহাদের সমাবেশে কাব্য নানা রসে অলঙ্কৃত হয়। কাব্য নানা রসের আধার হইলেও প্রধান রসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত। সেই প্রধান রস হৃদয়কে বরাবর অধিকার করিয়া কাব্য-পাঠান্তে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান থাকে। তাই, আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'।

আর্য্যসমাজে পতিপত্নীর প্রেম কেমন সংসারের সুব্যবস্থাক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এ জন্য হিন্দুসংসারে পত্নী পতির প্রতি যত আসক্ত ও একনিষ্ঠ, পতিও পত্নীর প্রতি ততোধিক। অনেক স্থলেই হিন্দুসংসারে পতিপত্নীর প্রেম অবশ্যম্ভাবী। পত্নীর প্রতি পতির প্রেমাভাব অতি বিরল। সীতা রামকে যত ভালবাসিতেন, রামও সীতাকে ততই ভালবাসিতেন। পতিতে একান্ত আসক্তা হইয়া থাকা পত্নীর পক্ষে চলিতে পারে, কিন্তু পত্নীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলা করা পতির পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়। এ জন্য, ভার্য্যাসক্তি স্ত্রৈণতায় পরিণত হওয়া আর্য্যসমাজে বড় দোষের কথা। লজ্জা যেমন হিন্দুনারীর অনুরাগকে শাসন করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি তেমনি স্ত্রৈণতার বিরোধিনী। পতি শুধু ত পত্নীর পতি নহেন, তিনি যে সমগ্র পরিবারের পতি, সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং তিনি যদি ভূপতি হন, তবে সমগ্র প্রজামণ্ডলীর তিনি প্রতিপালক। পত্নীর কর্ত্তব্য কেবল পরিবারমধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু পতির কর্ত্তব্য সর্ব্বসংসারে। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগরূক রাখিয়া ভার্য্যাসক্তিকে শাসন করিতে হইবে। এইরূপ শাসনে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া "মেঘদূতের যক্ষ" দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। সেই দেশান্তরিত যক্ষের প্রেম কত প্রগাঢ়, তাহা কালিদাস অতুল্য তুলিকারাগে চিত্রিত করিয়াছেন। অন্যদিকে দেখ, রামচন্দ্র প্রজানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তেমন প্রেমময়ী প্রতিমা সীতাকেও বনবাস দিয়াছিলেন; তা বলিয়া সীতাকে কি রাম অত্যন্ত ভালবাসিতেন না? আর্য্যসাহিত্যে প্রগাঢ় পতি-অনুরাগের নাম পতিভক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাতিশয় ভার্য্যাসক্তির নাম স্ত্রৈণতা, কিন্তু পত্নীভক্তি নহে। আর্য্যসমাজের সুনিয়মরক্ষার্থ যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতেই মনুষ্যত্ব।

আর্য্যসমাজের নৈতিকবন্ধনমধ্যে যেরূপে নরনারী অবস্থিতা, তাহা আমরা

কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিলাম। এ সমাজের গঠনই এই প্রকার যে, তাহাতে মানবপ্রকৃতির পশুভাবের স্ফূর্ত্তি হইবার যো নাই। দেশাচারের অনুশাসনে দেবত্বেরই বিকাশ হইবার কথা। দেশাচার সমস্ত মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের প্রতি-পোষক হওয়াতে, সেই দেশাচারের অধীনতা এবং দেবত্বের অধীনতা একই কথা হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া নরনারীকে দেবত্বো-ন্মুখ করিয়া রাখা সামাজিক নীতি ও কৌশল। দেবত্বের অধীনতাই মানবের আত্ম-অধীনতা। এই প্রকার আত্ম-অধীনতা বা পরমার্থের পরতন্ত্রতাই মনুষ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা। আত্মা যখন পরমাত্মার পরমার্থের অধীন, তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন। যিনি এই অধীনতা বা প্রকৃত স্বাধীনতা ছাড়িয়া বহিরি-ন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকার করেন, তিনি ত স্বাধীন নহেন; তিনি স্বকীয় ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছা বহির্জগতের প্রভাবে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হই-তেছে। সেই ইচ্ছা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অধীন হইয়া বহির্জগতের অধীন। সেই ইচ্ছার দাস হওয়াই স্বেচ্ছাচারিতা। যিনি স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া প্রকৃত স্বাধীন পথে আইসেন, তিনিই মনুষ্যত্বলাভের যোগ্যপাত্র। আমাদের দেশা-চারের প্রকৃত উদ্দেশ্যানুগামী হইলে, সেইরূপ মনুষ্যত্বলাভের যোগ্যপাত্র হওয়া যায়। যে প্রেমপ্রবৃত্তি এই মনুষ্যত্ব-সাধক, সেই প্রবৃত্তির বিকাশ আর্য্যসমাজে। যাহা আর্য্যসমাজে, আর্য্যসাহিত্যে তাহার স্থান।

আর্য্যসাহিত্যে প্রেম ভক্তিতে পরিদৃশ্যমান। এই ভক্তিতে প্রেম একদা বর্দ্ধিত ও অনুশাসিত। সেই শাসন ও পরিবর্দ্ধনে প্রেমের উচ্চতা ও গৌরব। আর্য্যসাহিত্যের এই গৌরব পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। আর্য্য-সাহিত্যের পতিভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বাৎসল্য, ভার্য্যানুরাগ, শিষ্যানুরাগ প্রভৃতি অনুরাগে যেরূপ প্রেমের বিকাশ, প্রেমের সেরূপ বিকাশ পাশ্চাত্য-সাহিত্যে কই? পাশ্চাত্য-সাহিত্যে কি সীতা আছে, লক্ষ্মণ আছে, রাম আছে, না যুধিষ্ঠির আছে? থাকিবার যো নাই।

আর্য্যসাহিত্যে যে প্রেমাদর্শ, তাহা প্রেমের সৌন্দর্য্য। সীতা যদি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আর্য্যসাহিত্যেই প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রস্ফু-টিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের মূর্ত্তিতে আর্য্যসাহিত্য চিত্রিত। আমাদের নারী-গণের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য আর্য্যসমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। সুকুমারমতি বালিকাগণের নবানুরাগ অল্প বয়স হইতে পতি ও গুরুজনে সঞ্চারিত হয়। হৃদয়ে যখন অনুরাগ মুকুলিত হইতেছে, তখন

হইতে কোমলহৃদয়া কন্যাগণ উপযুক্ত পতির অঙ্কে অর্পিত হয়। তাহাদের অনুরাগ নিজ বিষয় পাইয়া স্বতঃ উপযুক্ত পাত্রে ধাবিত ও ন্যস্ত হয়। যৌবনসঞ্চারে সেই অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পতিতেই আবদ্ধ হয়। তরুণকাল হইতে কন্যাগণ শ্বশুরকুলে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, সেই কুলেই স্নেহ মমতায় জড়িত থাকে। পতির এবং গুরুজনের সেবাশুশ্রূষায় তাহাদের আনুগত্য অতি সহজ বোধ হয়। তজ্জন্য আর্য্যনারীগণের সংসার শান্তিময় প্রেমনিকেতনে পরিণত হয়। আর্য্যনারী অনেক গুণের আধার। পাতিব্রত্য, প্রেম, স্নেহ, মমতা, ভক্তি, সরলতা, সত্যাচরণ, দয়া, ক্ষমা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, বিনয়, বশ্যতা, লজ্জা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি নানা মহার্ঘ গুণে আর্য্যসতী ভূষিতা হয়েন। নানাবিধ গুণভূষিতা আর্য্যনারী আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বাল্যবিবাহের ফল। এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে সে ফলও দুষ্প্রাপ্য হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থা এবং বন্দোবস্ত যাহাতে অব্যাহত থাকে, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য।

আজি কালি অনেক ইংরাজীওয়ালা না বুঝিয়া আমাদের বাল্যবিবাহ ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যবিবাহকে সমাজের অনিষ্টের কারণ জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে। মনুর ব্যবস্থানুরূপ আর্য্যসমাজ অতি প্রাচীনকালেও অবস্থিত ছিল। মনুর ব্যবস্থায় স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহই প্রসিদ্ধ এবং প্রশস্ত। গৌরীদানের ফল আর্য্যসাহিত্যে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু এক দিকে যেমন গৌরীদান, অন্য দিকে তেমনি আর্য্যভূমি বীরমাতৃরূপে চিত্রিত। এই আর্য্যভূমি যখন বীরগণের লীলাক্ষেত্র ছিল; কি ক্ষত্রিয়-বীরত্ব, কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনৈতিক বীরত্ব,—এই উভয়বিধ বীরত্বে যখন ভারত গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; যখন ব্রাহ্মণ নিবৃত্তি-ধর্ম্মের বীরত্ব দেখাইতেন; যখন ক্ষত্রিয় তেজ ও ক্ষত্রিয়রাজ ভারতরাজ্যের শাসন ও রক্ষা করিত; যখন ধন, মান ও জ্ঞানের গৌরবে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল; তখনও বাল্যবিবাহ ছিল, এবং সেই বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ ভারতীয় আর্য্যবীরগণের সমুদ্ভব হইত। এসিয়ার মহা ভূখণ্ডের অনেক দেশ এবং জাতির মধ্যেও ত বাল্যবিবাহ প্রচলিত। মুসলমান জাতি মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে বাল্যবিবাহ বিদ্যমান দেখা যায়। যমদূতস্বরূপ পাঠানগণ আজিও বাল্যবিবাহের অনুকূল সাক্ষ্যই দিতেছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বলিষ্ঠ হিন্দু সন্তানগণ, বীর রাজপুত ও হিন্দু পাঞ্জাবীগণ ত বাল্যবিবাহজাত। তবে দেশের গুণে যে স্থানে জীবজন্ত

স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হয়, সে স্থানের কথা স্বতন্ত্র। খর্ব্বকায় হইলেই যে মনস্বিতায় খর্ব্ব হইতে হইবে, এমত কিছু নিয়ম নহে। খর্ব্ব মহারাষ্ট্র বা গুরখা যে উন্নতকায় পঞ্জাবী অপেক্ষা তেজস্বিতায় ন্যূন, এ কথা প্রমাণসাপেক্ষ। ইংরাজ সৈন্যদলভুক্ত খর্ব্বকায় ওয়েলশ্ সেনা যে দীর্ঘদেহ হাইল্যাণ্ডার অপেক্ষা তেজস্বিতায় ন্যূন, এ কথা সপ্রমাণ হয় না। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সরসক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জের যেমন সমৃদ্ধি, জীব জন্তু ও মনুষ্যের তদ্রূপ নহে। বাঙ্গালার ফিরিঙ্গীগণের মধ্যে ত বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি সেই ফিরিঙ্গীগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি কেন? যাহা অন্য কারণের ফল, অনেকে না বুঝিয়া তাহা বাল্যবিবাহে আরোপ করিয়া বসে।

ভক্তি বলিয়া যে জিনিষ হিন্দুসংসার ও সমাজে বর্ত্তমান, যাহা সেই সংসার ও সমাজের সুদৃঢ়বন্ধনী, সে জিনিষ বিলাতী সংসার ও সমাজে বড়ই দুর্ল্ভ। কারণ, সেখানে পতিপত্নীর সম্বন্ধে উচ্চনীচতা ও অধীনতা নাই, উভয়ই সমান। সেখানে প্রেমের বিনিময় আছে—তুমি ভালবাস, আমি ভালবাসিব; নহিলে তুমিই বা কে, আমিই বা কে? তোমাতে আমাতে কোন সম্বন্ধ নাই; আজই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হউক। সে সমাজে পতিপত্নীত্যাগ, রমণীগণের বহুবার বিবাহ, এবং যৌবনে ইচ্ছাবরী হইবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, পতিপত্নীর মধ্যে সাম্যভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা এত প্রবল। তাই সাম্যভাব ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে। সেই সাহিত্যের নিয়ত আলোচনায় সুতরাং পাঠকের মনে সেই সাম্যভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে। এই সাম্যভাবেরই ছবি আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠক আমাদের তরুণবয়স্ক যুবক এবং যুবতীগণ। ইংরাজগণের ও বিবিদিগের সংসর্গগুণেও এই সাম্যভাব আমাদের সমাজে ও অন্তঃপুরমধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইতেছে। সেকালের বৃদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন আর জীবিত নাই। যাহারা এক্ষণে সংসারের পতি, তাহারা অনেকেই ইংরাজী সাম্যভাবে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহারা নিজেই আমাদের রমণীগণের মনে সাম্যভাব আরও সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু এ সমাজে বিলাতী সাম্যভাব ও প্রেমের স্থান কোথায়? বিলাতী প্রেমের সাম্যভাব এখানে আনিলে প্রলয় ঘটিবে। যে সমাজে বিবাহবন্ধনের ছেদন নাই; পতিপত্নীর সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য, যে সমাজ ভক্তি ও স্নেহবন্ধনে গাঁথা; সতী ও পতিব্রতা নারীর লীলা-

সংসারিণীর গুণ, সেখানে সাম্যভাবের প্রাবল্য হইলে মহাশান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। সেখানে চাই উচ্চনীচতা, আত্মশাসন-অধীনতা, এবং যে আত্মশাসনের নামান্তর স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা হিন্দুসমাজে, তাহা পাশ্চাত্য সমাজে নাই। যে স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সমাজে, হিন্দুসমাজে তাহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা।

আর্য্যসাহিত্যে যে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ, সেই প্রেমাদর্শ হইতে পতিত হইয়া আমাদের বঙ্কিম অভক্তির সহিত বলিয়াছিলেন, আর্য্যসাহিত্যে সকল নারীই হয় সীতার ছাঁচে, না হয় দ্রৌপদীর ছাঁচে গঠিত। সীতা ও দ্রৌপদী যে প্রেমাদর্শের সৃষ্টি, তিনি সেই প্রেমাদর্শ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে তখন ফষ্টর ও শৈবলিনীর বিলাতী পাপপ্রেম জাগিতেছিল। তাই তিনি বিলাতী প্রেমে হিন্দুনারীকে গড়িতে গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণ এক একটি বিলাতী হিন্দুনারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী কাব্য নাটকের নারীচরিত্রের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার সেই সুন্দরীগণের সেই সৌন্দর্য্য। কিন্তু যে লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, সরলতা, পাতিব্রত্য, সতীত্ব, ভক্তি ও পবিত্রতায় হিন্দুনারী অসাধারণ গুণভূষিতা হইয়া জগতের মনোহরণ করেন, হিন্দুনারীর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই। বঙ্কিম বাবুর ঔপন্যাসিক নারীগণের মানবপ্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য আমি "কাব্যসুন্দরী"তে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মানবপ্রকৃতি হিন্দুনারীতে যেরূপে দেবত্বে উঠিয়া পবিত্র হইয়াছে, সেই পুণ্য প্রকৃতি আমি সেই নারীগণে দেখিতে পাই নাই, এজন্য তাহাদের সৌন্দর্য্য বিবৃত করিবার সময়ে সে কথা মূলেই উত্থাপিত করি নাই। যে হিন্দু কল্পনায় সীতা ও দ্রৌপদী জাজ্বল্যমান, সে কল্পনার সহিত কি বঙ্কিম বাবুর সুন্দরীগণ মিশিতে পারেন? সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুকল্পনায় সে সুন্দরীগণ মিশ খায় নাই; তাহারা বিলক্ষণ স্বতন্ত্র হইয়া সেই কল্পনা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। কখন মিশিবে কি না, কে বলিতে পারে?

আমরা কি বিলাতী সমাজের প্রয়াসী? আমরা কি প্রেম ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজ উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী সমাজ আনিতে চাই? এই দুই সমাজের গঠন সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের প্রেমাদর্শে এ কথার অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। আমাদের সাহিত্যের প্রেমাদর্শে, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি এবং ধর্ম্মনৈতিক

ইন্দ্রিয়সুখেরই অনুকূল, এবং শান্তিসাধক প্রেম, ভক্তি, দয়া, ধর্ম্মাদির প্রতিকূল। এ আদর্শে ধর্ম্মনৈতিক শাসনের অধীনতা; সে আদর্শে স্বার্থপর সাম্যভাব। এ আদর্শে স্বাধীনতা, সে আদর্শে স্বেচ্ছাচারিতা। এক স্থানে সুতরাং এই দ্বিবিধ আদর্শের সমাবেশ হইতে পারে না। তাহাদের সামঞ্জস্য সম্ভাবিত নহে। দেশীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া যতই আমরা বিদেশীয় সমাজনীতির অনুসরণ করিব, আমাদের সমাজ ততই সেইরূপে সংগঠিত হইতে থাকিবে। অবশেষে হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিলাতী সমাজ আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বিলাতী সমাজ নানা দোষের আধার। আবার আমরা সেই সমস্ত দোষে আমাদের বেদপূত ও সংস্কৃত সমাজকে নিমজ্জিত করিতে চাই না; দেবত্ব এবং মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে নামিতে চাহি না। কি উপায়ে আমরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হই? বিলাতী সাহিত্যের আলোচনা ত আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে নয়। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্যও তাহার আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু সেই বিদ্যালোচনায় যেরূপ উদ্ধত বিলাতী ভাবের ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তাহার দমন করা আবশ্যক। স্বদেশীয় সাহিত্যালোচনায় তাহার দমন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই নিমিত্ত এখন ইংরাজী বিদ্যার সহিত সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক আলোচনা আবশ্যক। আমাদিগের গৃহধাম ও পরিবার মধ্যে যেন বিলাতী সাহিত্যের বিষভাগ প্রবেশ লাভ না করে, তদ্বিষয়ে আমাদের একান্ত সাবধান হওয়া উচিত। যে স্বদেশীয় সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমাদের পুরস্ত্রীগণ এককালে নানা গুণে ভূষিতা হইয়া বিনীত সাধুভাবে ও হিন্দুসংস্কারে প্রবৃদ্ধা হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সাহিত্যালোচনায় তাঁহাদিগকে নিরত করিয়া রাখিলে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্য দিকে, তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া আমরাও সেই সাহিত্যের সাধুভাব, পবিত্রতা, সংযমশিক্ষা, বিনয়, নৈতিক সৌন্দর্য্য ও মহান উপদেশসমুদায় নিজে পর্য্যালোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উদ্ধত বিলাতী ভাবস্ফূর্ত্তির দমন করিব, এবং হিন্দুসংস্কার সমুদায় প্রাদুর্ভূত রাখিয়া হিন্দু সমাজের বিধ্বংস নিবারণ করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পাঁচ ফুলের সাজি।

উদ্ভিদ ও জন্তু। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, উদ্ভিদ্ ও জন্তুর মধ্যে একটি প্রভেদ * এই,—যে সমুদায় উদ্ভিদ হরিদ্বর্ণের, তাহারা সূর্য্যালোকে অবস্থিত হইলে, তাহাদের ক্লোরোফিলের (chlorophyll) সাহায্যে বায়ুস্থ কার্ব্বণিক অ্যাসিড্ গ্যাসের বিশ্লেষণ করিয়া, কার্ব্বণটুকু নিজের শরীরপোষণের জন্য গ্রহণ করে ও অক্সিজেন্ গ্যাস্ পরিত্যাগ করে। কিন্তু জন্তু বায়ু হইতে অক্সিজেন্ গ্রহণ করে ও কার্ব্বণিক অ্যাসিড্ পরিত্যাগ করে। এ প্রভেদ শুধু হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্গুলির পক্ষেই খাটে, এবং তাহাও শুধু যখন তাহারা সূর্য্যালোকে অবস্থিত হয়; নহিলে অন্ধকারে হরিৎ উদ্ভিদ্ও অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্ব্বণিক্ অ্যাসিড পরিত্যাগ করে। অপরঞ্চ, যে সকল উদ্ভিদের (যেমন fungus) ক্লোরোফিল নাই, এবং যাহারা হরিৎ নয়, তাহাদের শ্বাসক্রিয়া ঠিক জন্তুর ন্যায়ই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারা অক্সিজেন্ গ্রহণ করে ও কার্ব্বণিক অ্যাসিড বাহির করিয়া দেয়। এমন কি, এরূপ বিশ্বাসের প্রচুর হেতু বর্ত্তমান যে,—সমুদায় সজীব উদ্ভিদ্ই সজীব জন্তুর ন্যায় শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং তাহাতে ঠিক জন্তুর মতই অক্সিজেন্ শরীরের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে ও কার্ব্বণিক্ অ্যাসিড পরিত্যাগ করে। তবে কথাটা এই যে, কেবল হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্ গুলিরই একটা বিশিষ্ট যন্ত্র আছে;—যখন সেগুলি সূর্য্যালোকে অথবা তাড়িতালোকে অবস্থিত হয়, তখন সেই যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা বায়ুস্থ কার্ব্বণিক্ অ্যাসিডের বিশ্লেষণ সম্পাদন করে, এবং এই হেতু যে অক্সিজেন্ উদ্ভূত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহার পরিমাণ, শ্বাসক্রিয়ার সময় (যাহা সকল সময়েই হইতেছে) তাহারা বায়ু হইতে যে অক্সিজেন্ লইয়া শরীরের মধ্যগত করে, তাহা অপেক্ষা অধিক।

অধিকন্তু উদ্ভিদের হরিৎ অংশগুলি যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাতে ক্লোরোফিলের কার্য্যকারিতা কতটুকু, সে বিষয়েও অনেক সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে। হয় ত এমনও হইতে পারে যে, ক্লোরোফিল্ প্রকৃত বিশ্লেষণকারী যন্ত্রের একটা চিরন্তন সহচরমাত্র (যাহাকে ইংরাজিতে বলে—a constant concomitant).—হক্স্‌লি।

ফুলের গন্ধ। কথাটা সকলেই ব্যবহার করে। এ ফুলে বেশ গন্ধ, ও ফুলে কিছুই নাই, এটা সুগন্ধবিশিষ্ট ফুল, ইত্যাদি; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখা যাউক। বস্তুতঃ, গন্ধ, বর্ণ, প্রভৃতি

---

* উদ্ভিদ্ ও জন্তুর মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ সম্বন্ধে অল্প কথায় বলা যাইতে পারে যে, উদ্ভিদ্ নিজেই বহিঃস্থ খনিজ দ্রব্য, জল, বায়ু, কার্ব্বণিক্ অ্যাসিড ইত্যাদি হইতেই নিজের শরীরপোষণ, এবং জীবনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু জন্তু তাহা পারে না; সে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এ জন্য উদ্ভিদের কাছে ঋণী;—অপর কোনও দ্রব্যের জন্য না হইলেও, অন্ততঃ তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় রূঢ় পদার্থ (organic substance) প্রোটিনের (Protein) জন্য। এ প্রভেদ টুকুও কখনও কখনও খাটে না; কারণ কতকগুলি প্রাণী আছে, (যেমন Myxomycetes) তাহারা জীবনের একাংশে প্রোটীন পদার্থের জন্য অপর প্রাণীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, ও অপরাংশে নিজেরাই উহা প্রস্তুত করিয়া লয়; সুতরাং জীবনের এক ভাগে তাহারা জন্তুবৎ আচরণ করে, অপরাংশে তাহারা উদ্ভিদ্। অধ্যাপক হক্স্‌লির কথায়,—"The difference between animal and plant is one of degree rather than of kind; and the problem whether in a given case an organism is

আমাদের অনুভূতিমাত্র (Sensation)। অনুভূতির উৎপত্তি হয় কিরূপে? প্রথমতঃ, বহিঃস্থ পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে, ইন্দ্রিয়স্থ অনুপ্রমাণ cell-সমূহে কম্পন উৎপন্ন করে; ঐ কম্পন পরে জ্ঞানতন্তু (nerve) কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পন উৎপাদন করে, এবং এই কম্পনের ফল একপ্রকার অনুভূতি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন নার্ভ্ দ্বারা মস্তিষ্ক-পদার্থের বিভিন্ন কম্পন জনন করিয়া বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির উৎপাদন করে। অনুভূতির উৎপাদনে বহিঃস্থ পদার্থের যেমন প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়, nerve ও মস্তিষ্কপদার্থের তেমনই প্রয়োজন। এখন মনে কর, একটা অনুভূতি হইল,—পদ্মগন্ধ (একটা বিশেষ অনুভূতিমাত্র); এই অনুভূতির পরক্ষণেই মনের একটা বিশ্বাস জন্মে যে, নিকটেই এমন একটা দ্রব্য আছে, যাহা কর্তৃক এই অনুভূতির উৎপত্তি হইয়াছে। সে দ্রব্য হয় ত একটা পদ্মফুল, বা (মনে কর) প্রিয়তমার মুখপদ্ম, বা অপর কোনও পদার্থ; কিন্তু আমাদের বহির্দ্দেশে যে এইরূপ কোনও একটা দ্রব্য কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই বিশ্বাস জন্মে; এবং সেই দ্রব্যকে আমরা গন্ধদ্রব্য বলিয়া আখ্যাত করি। এই আখ্যানের সময়েই আমরা বড় গোল করি, আমরা যাহা বুঝি ও জানি, তাহা না বলিয়া নূতন কথা গড়িয়া দিই। পদ্মফুল পদ্মগন্ধরূপ অনুভূতির কারণ, শুধু এই কথাটি না বলিয়া আমরা বলি যে, ঐ গন্ধ পদ্মফুলের অন্তর্নিহিত একটা গুণ বা property, উহা পদ্মফুলেরই নিজস্ব, তাহাতেই অবস্থিত। পদ্মফুল পদ্মগন্ধ-বিশিষ্ট। কিন্তু এমন বলিবার আমাদের অধিকার আছে কি? বাস্তবিক পদ্মগন্ধ একটা মানসিক অনুভূতিমাত্র, মনের বাহিরে ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,—অনুভূতি যদি বহিঃস্থ উত্তেজক পদার্থের গুণ হয়, তবে যখন কাঁটা ফুটিলে যন্ত্রণার অনুভব হয়, তখন ওই যন্ত্রণাও কাঁটার গুণ বা property. একটি ত্বগিন্দ্রিয়ের অনুভূতি, অপরটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের—প্রভেদ এইটুকু মাত্র।—হক্‌স্‌লি।

মনুষ্যের উৎপত্তি। চার্লস্ ডারউইনের নাম সকলেই জানেন, এবং তাঁহার বিচিত্র সিদ্ধান্তটা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে পুস্তক পড়িয়া পরিজ্ঞাত হউন আর নাই হউন, জানিয়া রাখিয়াছেন। সিদ্ধান্তটা প্রকৃতপক্ষে তত বিচিত্র না হইলেও, তাহার বিকৃতিটা বাস্তবিকই বিচিত্র। অনেকেই,—এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেও,—ডারউইনের ঘাড়ে এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান বানরই মনুষ্যের পিতৃপদে বরণীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডারউইন এমন কথাটা কোথাও বলেন নাই, এবং স্পষ্টাক্ষরে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানুষ যে বর্ত্তমান গরিলা শিম্পাঞ্জির বংশধর,—এ মতটা ডারউইনের অভি-প্রেত নয়, তাঁহার বিরুদ্ধ। আধুনিক কেহ কেহ missing link * বলিয়া যে একটা বৃথা অপবাদ দেন, তাহার উৎপত্তির প্রকৃত কোনও কারণ দেখা যায় না। ডারউইন মনুষ্যের গঠনপ্রণালী, সংস্কার, ব্যবহার, মানসিক অভিব্যক্তি, ভ্রূণের অবস্থা ও বিকাশ, অবিকশিত ও নিষ্প্রয়োজন ইন্দ্রিয়পেশী প্রভৃতির আবির্ভাব, ইত্যাদি নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া

* ইহার বিকৃত অর্থ এই যে,—বর্ত্তমান বানরের বংশধর মনুষ্য, কিন্তু বানর ও মনুষ্যের মধ্যে একটা link missing; পাঠক ডারউইন-কথিত পত্রশাখাপ্রশাখাসংবলিত প্রাণিবৃক্ষের উপমাটি স্মরণে রাখিবেন।

তাহার যেরূপ বংশাবলী স্থির করিয়াছেন, পাদটীকায় তাহার একটা মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল। *

পাঠক তাঁহার নিজের কথাটা শুনিবেন কি ?

"The Catarhine and Platyrhine monkeys agree in a multitude of characters, as is shown by their unquestionably belonging to one and the same order. The many characters which they possess in common can hardly have been independently acquired by so many distinct species; so that these characters must have been inherited. But a naturalist would undoubtedly have ranked as an ape or a monkey, an ancient form which possessed many characters common to the Catarhine and Platyrhine monkeys, other characters in an intermediate condition, and some few perhaps, distinct from those now found in either group. And as man from a genealogical point of view belongs to the Catarhine or Old World Stock, we must conclude, however much the conclusion may revolt our pride, that our early progenitors would have been properly thus designated. But we must not fall into the error of supposing that the early progenitor of the whole Simian Stock, including man, was identical with, or even closely resembled, any existing ape or monkey".—Darwin's Descent of Man (2nd. Edition, 1881), p. 155. †

"ক্যাটারাইন এবং প্লাটিরাইন বানর যে পূর্ব্বপুরুষের দুইটি শাখামাত্র, সেই পূর্ব্বতন প্রাণী বানরেরই সদৃশ হইবে; মানুষও ক্যাটারাইন বানরের একটি দূরবর্ত্তিনী শাখা, সুতরাং মানুষের পূর্ব্বপুরুষও বানরের সদৃশ বটে। কিন্তু এমন কথা বলা যায় না যে, সমুদায় সিমিয়ান্ বংশের পূর্ব্বপুরুষ কোনও বর্ত্তমান বানরের সহিত একরূপ বা একান্ত সদৃশ হইবে।"

ম্যালেরিয়া। ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল গেজেটে (১ নম্বরের ১৮৭১) ম্যাক্‌নামারা সাহেব নাকি কারণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রদেশের অধিবাসীরা বন্ধ্য বা স্বল্পসন্তানবিশিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

---

* Primatis (mammal)

- Simiadæ
  - Catarhine (old world monkeys)
    - Anthropomorphous
      - Apes (as gorilla, chimpanzee, orang, hylobates)
    - Non-anthropomorphous
      - Man (মনুষ্য)
  - Platyrhine (New world monkeys)
- Lemuridæ

ইহার বাঙ্গালা করিবার প্রয়াস পাইলাম না। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, গরিলা শিম্পাঞ্জি মনুষ্যের পিতৃপুরুষ নহে, জ্ঞাতি ভ্রাতা মাত্র।

† অতি প্রাচীনকালে মনুষ্যের পিতৃপুরুষ যে জলচর জীব ছিল, তাহারও কতক কারণ

ভাটপাড়ায় সভা।

প্রথম প্রস্তাব।

(১)

একদিন ভাটপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,—
"তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল",—
সে গম্ভীর প্রশ্ন, সে বিষম তর্ক,
মীমাংসা করিতে সব যত পক্ক পক্ক
পণ্ডিতেরা শেষে,
টোলেতে এসে,
করিলেন এক মহাসভা এই বঙ্গদেশে।

(২)

টোলের মাটি,
যতনে ঝাঁটি,
পড়িল সতরঞ্চ, ফরাস ও পাটি;
আসিল ফরসী, গুড়গুড়ি, গড়গড়ি,
আর বহুবিধ হুঁকো মাথায় বাঁধা কড়ি,
কোনটির খোল নারিকেলের কোনটির খোল রূপোর,
কোনটি বা ফরাসে বৈঠকের উপর,
কোনটি বা কোণে,
দুঃখিত মনে,
পড়ে' আছে—তাদের যেন করেছে হেলা;
যেন, পাশেতে বসে আছে ছোট লোক মেলা।

(৩)

সূর্য্য যায় অস্ত,
সবাই অতিব্যস্ত,
সন্ধ্যার পরই পণ্ডিতেরা আসবে মস্ত মস্ত;
সব হোল গোছান,
হুঁকো টুঁকো মোছান,
পাটি সব বিছান, 'ফরাস টরাস' ঝাড়া;
অত্যাশ্চর্য্য যষ্টি'পরে প্রদীপ হোল খাড়া;
দিন গত হৈল,
চাকররা রৈল
পণ্ডিতদের অপেক্ষায়, স্তব্ধ হোল পাড়া।

(৪)

ইত্যবসরে,—
এস ভাল করে,
দেখে নিই টোলটির চারিদিক পাঠক,
যেথা এখনই অভিনীত হবে মহা নাটক,
টোল না মাড়িয়ে,
বাহিরেতে দাঁড়িয়ে,
দেখিব, তাহাতে কেউ দিবে নাক আটক।

(৫)

টোলটির নাম,
"নব হরিধাম",
চারি দিকে অত্যাশ্চর্য্য চৌকণা থাম,
বোঝান শক্ত তার কি আশ্চর্য্য কাজ,
যখন দেখনি সেণ্টপিটার, পার্লেমেণ্ট, কি তাজ;
তারি কারিকুরি,
করে' সব চুরি,
ফ্রান্স দেশে রচে 'ভার্সাই' চমৎকার,
(—স্বীকার করেন গেটে ও মোক্ষমূলার—),
বর্ণনা আর করিব না সে অপূর্ব্ব কর্ম্ম;
ইচ্ছা হয় দেখ এসো সেই চারু হর্ম্ম্য।

(৬)

সে হর্ম্ম্যের কোন স্থানে সর্ষপ তৈল মাখা;
কোথাও বা সিন্দূরে গণপতি আঁকা;
সে অপূর্ব্ব টোলে,
কোথাও বা দোলে
পট শ্রীকৃষ্ণের—শ্যাম বংশীধর বাঁকা
যমুনার কূলে,
কদম্বের মূলে;
(আহা—যার জন্য শ্রীরাধা কালি দিলেন কুলে)
এরূপ চিত্র কেউ দেখিনিক আগে,
কোথায় রাফেল বা টিসিয়ান লাগে?
—আর্য্য ঋষিরা বড় ছিলেন নাক যে সে,
করে গেছেন যা তাঁ'রা আর্য্যাবর্ত্তে এসে,
পারেনিক কোন কালে কেউ কোন দেশে।

(৭)

সে কথা যাক্—দূর্! এ উড়ো তর্ক তুলি,
কি বলিতেছিলাম যে তা গেলাম ভুলি;
—এইরূপ হর্ম্ম্যে আসিলেন ক্রমে,
বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি; গেল জমে
ক্রমেই সে টোল;—
বলে' 'হরিবোল!'
বসিলেন পণ্ডিতেরা হয়ে নানা-মুখো,
কারো হাতে নস্যদান, কারো হাতে হুঁকো।

(৮)

সবাই অতিব্যস্ত;
চাকররা ত্রস্ত,
জ্বালিল অমনি সেই প্রদীপ সমস্ত;
ক্রমে টোলের শোভা,
হোল মনোলোভা,
কোথায় বা লাগে রোম কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ!

(৯)

পণ্ডিতরা বসিলেন সব কোলাকুলি করে,
ভ্রাতৃভাবে; তার পর নানান্ কথার পরে,
উঠিলেন রাম শাস্ত্রী—মনু 'হাতে করে';
বলেন একটু হেসে,
মধ্যস্থলে এসে,
"হে বিদ্যার ভাণ্ড,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম পণ্ডিত-সমাজ,
সবাই জানেন অদ্য সভার যে কাজ!
লেখে সবাই জানে,
মার্কণ্ড-পুরাণে,—
'পাত্রাধারে তৈলং' কিন্তু শুনুন্ মনু থেকে,
'তৈলাধারে কাংস্যপাত্রে' এইরূপ লেখে!
আপনারা ইহার অতি করুন সুবিচার,
'তৈলাধার পাত্র' কিম্বা 'তৈল পাত্রাধার'।
যে বিচার জন্য,
হবেন বিশ্বগণ্য,
আর মূর্খ পৃথিবীতে হবেন ধন্য ধন্য;
কেন না, এ প্রশ্ন বিষম ও কুটিল অতি,
করিছে যা পৃথিবীর সবিশেষ ক্ষতি।

(১০)

তখন হোল মহাতর্ক,
পণ্ডিতরা পক্ক,
দিলেন নানান্ মত সবে নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ পুরাণ থেকে;
বিদ্যারত্ন খুঁজেন ব্যাস; তর্করত্ন তিনি,
খুঁজেন বোপদেব; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি;
শিরোমণি অলঙ্কার; আর ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্রখানি করে' অতি যত্ন;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ; শ্রুতি বৃহস্পতি;
জ্যোতিষ শাস্ত্র খুঁজেন ব্রজনাথ সরস্বতী;
—লাগিলেন ক্রমেই সে সভার প্রতি সভ্য,
প্রকাশ করিতে স্বীয় স্বীয় যা মন্তব্য।

(১১)

সে যজ্ঞে, সে কর্ম্মে,
সে তর্কে, সে হর্ম্ম্যে,
পণ্ডিতরা মৎস্যবৎ হোয়ে গেলেন ঘর্ম্মে;
কার কথা কে শোনে,
সবাই সভ্য জনে,
শোনান ওজস্বিনী ভাষায় নিজ নিজ মর্ম্মে;
ক্রমেই সে তর্ক হোয়ে উঠ্‌ল চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ আর ঘর হোল গরম।

(১২)

—আমি দেখেছি বত্রিশ বার শান্তিপুরে রাস;
ব্রিষ্টল প্রদর্শনীতে গরু শ' পঞ্চাশ;
'ওয়ারিকে' দু' হাজার কুকুরের মেলা;
মুঙ্গেরে দীনু বাবুর বাড়ী তাস খেলা;
শুনেছি কলিকাতার ট্রামের ঝণ্‌ঝণি;
শ্যামের বাড়ী ছেলেদের চীৎকারের ধ্বনি;
সন্ধ্যাপূজায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর চক;
চৌধুরী ও সান্ন্যালের মিল (Mill) নিয়ে তর্ক;
অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ছিল ভীষণ টঙ্কার;
পড়েছিও রামায়ণে যুদ্ধের বিষয় লঙ্কার;
(কিন্তু) যা দেখেছি, শুনেছি, বা পড়েছি, তা সব,
একত্রেতে জড়ালেও হয় অসম্ভব,
এ'গোল সে ধুন্ধুমারি সে তুমুল রব।

(১৩)

ক্রমে সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে,
কল্লেন ব্যক্ত তথা,
বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকী ঘোর আন্দোলিত স্কন্ধে ;
ক্রমে প্রেমভরে,
সবাই পরস্পরে,
সে অপূর্ব্ব হরিসভায় 'নব হরিধামে'
সম্বোধিতে লাগিলেন বহু ভাল নামে ;
হিন্দু শাস্ত্র ছাড়ি শেষে দিলেন পরস্পরে,
ডারুইনের বংশোৎপত্তির মত ব্যাখ্যা কোরে ;
আরও সম্বন্ধে তাঁদের পুরুষদের আদ্য,
করে দিলেন বন্দোবস্ত ভাল ভাল খাদ্য ;
আরো নূতন উপায়ে,
বিনা ভোজে, ব্যয়ে,
করে দিলেন সুসম্পন্ন তাঁহাদের শ্রাদ্ধ।
পরে সহ ভক্তি,
গাঢ় অনুরক্তি,
করিলেন পরীক্ষা সব মহোদয় ব্যক্তি,
পরস্পরের উদরের বেড় ও শক্তি ;
দেখালেন বাহুবীর্য্য সেই সব আর্য্য,
সবাই যেন অবতীর্ণ এক এক দ্রোণাচার্য্য ;
পরিধেয়ের পশ্চাতের বা সম্মুখের অংশ,
(—কাছা কোঁচা) অনেকেরই হইল ত ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে,
ধোরে অবশেষে,
করে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ ;
(—যদিও তাঁহাদের কেশ করিবারে ছিন্ন,
ছিল না বড় বেশী কিছু এক এক টিকী ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ,
হয়ে গেলে ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য,
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

এ দিকে বাসুকী দেখেন উঠে ঘুম থেকে,
গোটাকতক খুঁটিরও হয়েছে সেথা ভঙ্গ ;
তখন বাসুকী,
দেখেন মেরে উঁকি,
ভয়ঙ্কর আলোড়িত দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গ ;
আরও বঙ্গসমুদ্রে ঘোর উত্তাল তরঙ্গ।
বাসুকী সে ব্যাপার খানা বুঝিলেন যেই,
—তৎক্ষণাৎ—একবারে—বলা কওয়া নেই,
দিয়ে এক পাড়ি,
চড়ে' লেজের গাড়ী,
চলে এলেন সটাং—ইন্দ্র দেবের বাড়ী।
এ দিকে ত শচী (সহ আটাশ সঙ্গিনী,
বাঁধাচ্ছিলেন রতির কাছে মারাত্মক বি'নী,
যেন কালসর্প,
অথবা কন্দর্প
ফুলধনুর ছিলা, কিম্বা নিধু বাবুর টপ্প')
আর শুনছিলেন সুয়ো আর দুয়োরাণীর গল্প,
রতির কাছে ; হাসছিলেন মিটিমিটি অল্প,
ভেবে 'আজ ইন্দ্র হবেন মুগ্ধ ও জব্দ ;'
এমন সময় হোল ঘরে ফোঁস ফোঁস শব্দ।
"—একি—তাইত—বাসুকী যে, হটাৎ যে হেন ?
ব্যাপার খানা কি—আর এ বিষণ্ণ মুখ কেন ?"
বাসুকী জড়িয়ে লেজে শচী দেবীর পায়,
বলিলেন, "রক্ষ মা, আজ রক্ষ বসুধায়,
নইলে সে অবিলম্বে রসাতলে যায় ;
বঙ্গে যত মেলে,
সরস্বতীর ছেলে,
করে মহা তর্ক—আর দেখবেন বাহিরে এলে,
সে তর্ক-তরঙ্গে,
উঠিল যা বঙ্গে,
গ্যাছে ধরা পূর্ব্বকোণে ভয়ঙ্কর হেলে।"
শচী বল্লেন "তাই ত—এ বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
এখন উপায় ? আচ্ছা আগে আসুন পুরন্দর,
যা কর্ত্তব্য করা যাবে কোরে পরামর্শ ;
রক্ষিব পৃথিবী, যাও, হোয়োনা বিমর্ষ।"

(৩)

বাসুকী যান ঘর,
এলেন পুরন্দর,

পাঠালেন ডেকে,
নানা স্থান থেকে,
চন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি ইত্যাদি বিস্তর
দেবগণে; হোল মহা মন্ত্রণা গভীর;
অবশেষে বৈকুণ্ঠেই যাওয়া হল স্থির।

(৪)

খাচ্ছিলেন বিষ্ণুদেব মিঠে মোহনভোগ,
যখন উপস্থিত সেথা হোলেন দেবলোক;
কহিলেন বিষ্ণু শেষে "ওহে মান্যগণ্য,
দেবগণ অকস্মাৎ এ হল্লা কি জন্য?"
কহিলেন প্রণমি ইন্দ্র, "আজ সবে মেলে,
কৈল সভা ভাটপাড়ায় সব সরস্বতীর ছেলে;
সেথা অতি বিষম ও কূট তর্ক হৈল,
'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল',
সে তর্ক তুরন্ত,
হইল দুরন্ত;
হইতেছে এখন মহারণ—বাহুযুদ্ধ,
বুঝি রসাতল যায় পৃথ্বী স্বর্গ শুদ্ধ।
হেন রণ করেনি কেউ—দেব, দানব, যক্ষ;
প্রভো—বারম্বার
হয়ে অবতার
পৃথ্বীরে রক্ষিলে তুমিই, আর একবার রক্ষ।"

বল্লেন বিষ্ণু, "তাই ত! মোটে দশ অবতার
করে গেছেন পণ্ডিতরা, ব্যবস্থা আমার;
তার মধ্যে ন'টী
গিয়াছেও ঘটি';
আছে একটি,—তাও যদি হোয়ে ফেলি আজ,
তার পর বোসে বোসে বেঁচেই বা কি কাজ?
তবে এর একটি সুপরামর্শ আছে,
চল, সবে মিলে যাই ব্রহ্মাদেবের কাছে।"

তখন দেবগণ পড়ে ব্রহ্মাদেবের পায়,
বল্লেন,—"দেব তোমার সৃষ্টি রসাতল যায়।"
শুনিলেন ব্রহ্মাদেব পরে সে বৃত্তান্ত;
কহিলেন, "বিষ্ণু এবং ইন্দ্র, হও শান্ত;"
বলিলেন ডাকি ব্রহ্মা দূতীকে, "অম্বে!
সরস্বতী কে ডাকিয়া আন অবিলম্বে।"

এদিকে ভারতী
মধুর স্বরে অতি
বীণার সুরের সঙ্গে ধোরে অতি মৃদুতান
ভাঁজ্‌ছিলেন ছাদে বসি ইমন কল্যাণ;
শুনে মুখে অম্বার
আজ্ঞা দেব ব্রহ্মার
এলেন তাঁর পাল্কী চড়ি' অতি অবিলম্ব, আর
ভাব্‌তে ভাব্‌তে বুড়ো কেন ডাকে তাই বারম্বার;
সরস্বতী এলে
তাকিয়ায় হেলে
কহিলেন, "ব্রহ্মা শোন সরস্বতী, মেলে
কৈল সভা ভাটপাড়ায় তোমার যত ছেলে;
সেথা হইল ঘোর তর্ক, এখন হোচ্ছে যুদ্ধ;
বুঝি সৃষ্টি রসাতলে যায় সর্ব্বশুদ্ধ;
তুমি যাও, সভাপতি হৃষীকেশের স্কন্ধে,
অর্থাৎ রসনায় বসি, থামাও সেই দ্বন্দ্বে।"

(৫)

তথাস্তু" বলিয়ে চলে গেলেন সরস্বতী
নব হরিধামে—যথা সভা, সভাপতি।
এল এখন মহাতর্কের সময় শেষ হবার;—
হৃষীকেশ কহিলেন দাঁড়িয়ে মাঝে সবার
তুলিয়ে দু' হস্ত
হইয়ে মধ্যস্থ
উচ্চৈঃস্বরে,—পণ্ডিতগণ! হও সব নিরস্ত;
এ তর্কের, এ মহারণের কর এখন ভঙ্গ;
থামাও এ ঘোর বাত্যা, নহে ত এ বঙ্গ,—
বঙ্গ কি ধরণীই
যাইবে এখনই
রসাতলে, থামুক এ ভীষণ তরঙ্গ।"
তখন এ বিশ্ব
পাছে হয় অদৃশ্য
হঠাৎ; সেই পণ্ডিতরা, পাছে প্রলয় ঘটে,—
বলিলেন সব একবাক্যে,—"তাও ত বটে!"
সরস্বতীর পুত্রগণ, পরিশ্রমেও ক্লান্ত,
হইলেন কতকটা স্থির ও শান্ত।
পুনঃ সভাপতি
বল্লেন "এটি অতি
কূট প্রশ্ন, অতএব তর্কে হও ক্ষান্ত;
তোমরা কি, মুনিরাও নহেন অভ্রান্ত;
তোমাদেরও, আমারও বা হোতে পারে ভ্রম;
বিশেষ যখন এটি সমস্যা বিষম;

এ হেন সমস্যা কভু ঘটেনি ক আগে ;
কি বা যোগস্মৃতি,
কি বা রাজনীতি,
কি জ্যোতিষ,—এর কাছে কোথায় সব লাগে?
আমি ভেবে চারিদিক
দেখ্‌ছি দুইই ঠিক,—
কিম্বা দুইয়ের একটি ঠিক ; তা যদি না হয়
নিতান্ত, তা হলে ঠিক কোনটিই নয় ;
এ কথাটি পারি আমি বলিতে নিশ্চয়।
তোমরা এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট অবশ্য,
অতএব ভ্রাতৃগণ নেও সবে নস্য।"
এইরূপ সুমীমাংসা কোরে হৃষীকেশ
সে রাত্রে সভার কাজ করিলেন শেষ।
হইলে প্রশ্নের এই সুন্দর সিদ্ধান্ত
পণ্ডিতরা সম্পূর্ণতঃ হইলেন শান্ত।
গোপাল শিরোমণি তখন সবার মাঝে এসে,—
হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন অবশেষে,
"পণ্ডিতাগ্রগণ্য
সভাপতিই ধন্য,
সভার কৃতজ্ঞতার পাত্র তাঁর ক্লেশের জন্য ;
আরো এ মীমাংসাটি অতীব সুন্দর ;
অতি বৈজ্ঞানিক ও অতি লাভকর।"
সকলেই বলিলেন, "অবশ্য অবশ্য !"
সকলেই ভ্রাতৃভাবে নিলেন শেষে নস্য ;
"আমরা সবাই তুষ্ট" তাঁরা এই কথা বোলে,
সুন্দর মীমাংসাটি নিয়ে এলেন ঘরে চোলে।

'আত্ম-জীবনচরিত'।

(বুস্তাঁ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে প্রজাপালনার্থে বিচার, উদ্যোগ, বিবেচনা, প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মভয় ; ২য় অধ্যায়ে ধনবানের সুখস্বচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বরসমীপে কৃতজ্ঞতা ; ৩য় অধ্যায়ে স্বাভাবিক প্রেম ; ৪র্থ অধ্যায়ে বিনয় ; ৫ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সন্তোষ ; ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞানার্জ্জন ; ৮ম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য জন্য কৃতজ্ঞতা ; ৯ম অধ্যায়ে অনুতাপ ও সৎপথাবলম্বন ; ১০ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনা। গোলেস্তাঁর ন্যায় এই কয়েক অধ্যায়েও গল্প উপলক্ষে বিবিধ সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণীর পাঠোপযোগী ; তথাপি এই দুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উর্দ্দু ভাষাও বালকের বোধগম্য হইত না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও

তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন।

বালকেরা গুরুজনের নিকট যে কিছু উপদেশ পাইত, এবং তাঁহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার দেখিত, তাহাই তাহাদের নীতিশিক্ষার প্রধান পুস্তক হইত। সুতরাং গুরুজনের দৃষ্টান্তের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রের সৃষ্টি ও স্থিতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই কারণেই তৎকালে, যে বালকের গুরু-জন যেরূপ, সে সেইরূপ হইত। কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র প্রেতের ন্যায় দূষণীয় দৃষ্ট হইত। দেবভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী-স্নেহ, অপত্যস্নেহ, প্রতিবাসী ভালবাসা, অতিথিসৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যাকথন, উৎকোচ-গ্রহণ, ইন্দ্রিয়দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষয় সকল তাঁহাদের বিবেচনায় যৎ-সামান্য পাপ বলিয়া বোধ হইত।

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর কিয়দংশ পাঠকরণানন্তর আমি জামেজল কওয়ালিন, মতলুব এবং জোলেখাঁ নামে গদ্য ও পদ্য পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম। একজন সুলেখক তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে যে সকল পত্র লিখিয়া-ছিলেন, প্রথম পুস্তক তৎসমূহের সঙ্কলন। দ্বিতীয় পুস্তক প্রসিদ্ধ আবুয়ল-ফজলের পিতা মুন্সী হাস্‌মিরের কতকগুলি পত্রের সংগ্রহ। পত্রের রচনা-শিক্ষার জন্য প্রথমে এই দুই পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন হইত। তৃতীয় পুস্তক জোলেখাঁতে রাজকন্যা জোলেখাঁর ইউসফ নামে (ইয়াকুবের পুত্র জোসেফ) অদ্বিতীয় সুন্দর পুরুষের প্রেমাভিলাষের উপাখ্যান আছে। নৃপনন্দিনী অষ্টম বর্ষে ইউসফকে স্বপ্নে দেখিয়া পাগলিনী হন। রাজা নিয়োজিত উপায়সমূহ বিফল দেখিয়া শেষে তাঁহার পদে স্বর্ণশৃঙ্খল দেন। ইউসফ পিতার প্রিয়তম হওয়াতে সহোদরেরা হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে কোন ছলে কেনান দেশের এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। তথা হইতে কোন বণিক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিক্রয়ার্থ মিসর নগরে আইসে। তৎকালে জোলেখাঁ মিসরদেশাধি-পতির রাজমন্ত্রী আজিজের পত্নী হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে ইউসফের রূপদর্শনে তাঁহাকে আপনার মনচোর বলিয়া স্থির করেন। এবং বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনেন। তাঁহার সহচরীগণ তদীয় ক্রীতদাসের প্রতি অতি-

কৌশলক্রমে তাহাদিগের কয়েক জনকে এক এক নেবু দিয়া তৎসকল বানাইতে আদেশ দেন। তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তিনি ইউসফকে তথায় আনেন। সহচরীরা তাহার অভূতপূর্ব্ব রূপদর্শনে এককালে মোহিতা হইয়া নেবু কাটিতে আপনাদের হস্ত ক্ষত বিক্ষত করে।

যাহা হউক, জোলেখাঁ ইউসফকে যতই ভাল বাসুন, আর যতই তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হউন, ইউসফের ধর্ম্ম অটল ছিল। রমণী মনোরথপূরণে হতাশ হইয়া তাঁহাকে কোন কৌশলে কারারুদ্ধ করেন। ইউসফ বহু কালের পর নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণপূর্ব্বক কারামুক্ত হইয়া মন্ত্রী আজিজের প্রিয়পাত্র হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মন্ত্রিপদ লাভ করেন। এ দিকে জোলেখাঁ প্রেম-হতাশা হইয়া কালে বৃদ্ধা, অন্ধ এবং ভিখারিণী হন। পরিশেষে কোন অলৌকিক ঘটনায় তিনি যৌবনদশা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ইউসফের ধর্ম্মপত্নী হন।

ক্রমশঃ আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের কায়স্থ শিক্ষককে অনুপযুক্ত দেখিয়া কর্ত্তারা পুনরায় মহম্মদীয় শিক্ষক এক-জনকে নিযুক্ত করেন। ইঁহার গুণাগুণের বিষয় স্মরণ নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বতন ওস্তাদগণ অপেক্ষা ভাল লোক ছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে মধ্যম দাদার বিবাহ হওয়াতে আমার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার ও আমার এক পাঠ ছিল। তিনি পাঠ্য পুস্তকের যে অংশ পড়িতেন, আমিও সেই অংশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম। স্মরণশক্তি তাঁহার যাদৃশ ছিল, আমার তাদৃশ ছিল না। সুতরাং পাঠের অনেকাংশ আমার মনে থাকিত না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতাম বলিয়া ওস্তাদ আমার ভুল বুঝিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরালয়ে গমন করিলে আমার গুণ প্রকাশ হইয়া বিড়ম্বনার সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া আমার মনে বিষম উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। কি উপায়ে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইব, দিবারাত্রি কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে এই স্থির করিলাম যে, পীড়ার ছল না করিলে এই দায় হইতে রক্ষা পাইব না।

তাঁহার সম্ভাবিত গমনের পূর্ব্বে রাত্রিতে আমার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে দংশন-যন্ত্রণা হইতেছে, পিতাকে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলাম। তিনি আমার যন্ত্রণা যথার্থই হইতেছে ভাবিয়া ঘাড় টিপিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার টিপনিতে আমার বেদনা অনুভব হইতে লাগিল, তথাপি যেন যাতনার ন্যূনতা হইতেছে, এই ভাব প্রকাশার্থে "আঃ! আঃ!" করিতে লাগিলাম। রাত্রি অধিক হইলে

পাছে বৈদ্য আসিয়া আমার শরীরের প্রকৃতাবস্থা বুঝিতে পারেন, এই ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যরাজ আসিলেন, এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য হইয়াছে কহিলেন। ভাবিলাম, আজ ত বাঁচিলাম; কল্য এরূপ গেলে আর কোনও চিন্তার বিষয় থাকিবে না। দিবসে অনশনে থাকিলাম। রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ ও শিরঃ-পীড়া ইত্যাদি জ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ হইল। বোধ হয়, প্রগাঢ় চিন্তায় ও অকারণ উপবাসে এই জ্বরের আবির্ভাব হইল। পর দিবস বৈদ্য আসিয়া কহিলেন, স্পষ্ট জ্বর হইয়াছে। লোকের জ্বরত্যাগ হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, আমার জ্বর হওয়ায় সেইরূপ আনন্দ হইল। রোগযন্ত্রণা অনশন ও ঔষধ-সেবন কষ্ট ইহার যে পরিণামফল হইবে, তাহা কিছুই মনে পড়িল না। উপস্থিত বিপদ হইতে যে রক্ষা পাইলাম, এই আনন্দরসে হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল।

তদানীন্তন সাধারণ বৈদ্যদের মনে এই স্থির ছিল যে, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা না হইলে কেহ বৈদ্যকে হাত দেখায় না। সুতরাং কেহ কৃত্রিম অসুস্থ ভাব ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হাত দেখাইলেই তাঁহারা প্রায়ই কহিতেন যে, নাড়ীর কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য হইয়াছে, অদ্য আহার করিও না। বোধ হয়, তাঁহারা ভাবিতেন, একদিন অনাহারে থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি নাড়ীর চাঞ্চল্য না বলিয়া আহার করিতে বলি, আর পরে জ্বর হয়, তবে আমাকে মূর্খ চিকিৎসক কহিবে।

আমাদের বৈদ্যের নাম নসিরাম দত্ত, এবং বাস কৃষ্ণনগর। ইনি এখানে এক জন সুবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও বাটীতে পীড়া না থাকিলেও প্রাই একবার আসিতেন।

সে সময় প্রথম দিবসে জ্বরের কোন ঔষধ দেওয়া হইত না। বিরেচক ঔষ-ধের ব্যবস্থা অতি বিরল ছিল। পাকস্থলীর রস পরিপাকার্থ স্ত্রীলোকেরা ইক্ষুমূল বিল্ববৃক্ষের ত্বক ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্য জল সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাই-তেন। তৎপর দিবস হইতে পাঁচন দেওয়া হইত। যদি ৩।৪ দিবসের মধ্যে ইহাতেও জ্বরত্যাগ না হইত, তবে বৈদ্য কিঞ্চিৎ সামান্য ঔষধ দিতেন। তাহাতেও যদি প্রতীকার না হইত, তবে অষ্টাহ পরে কিঞ্চিৎ বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু পাঁচনের ব্যবস্থা রহিত হইত না। যদি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে রোগের শান্তি না হইত, অথবা অষ্টাহ পরে রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করিত, তবে বিষ প্রয়োগ করা হইত। পীড়ার অবস্থা অনুসারে কখন অষ্টাহমধ্যেও বিষ প্রয়োগ করা হইত। যাবৎ জ্বর থাকিত, তাবৎ ক্ষুধা থাকিলে [illegible]

লাজান্ন, তৎপরে লাজমণ্ড, তৎপরে মুগের ডালের জুস, মিষ্টান্নের মধ্যে বাতাসা ও মিছরি বা চিনি দেওয়া হইত। পানীয়ের মধ্যে কেবল সিদ্ধ জল ছিল এবং তাহাও কখন বিল্বত্বক দিয়া সিদ্ধ করা হইত। ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর না হইলে এরূপ পথ্য বা পানীয়ও দেওয়া হইত না। যে সকল চিকিৎসা আমি দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহারই বর্ণন করিলাম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী সহিত আমাদের বৈদ্যের চিকিৎসার অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। উপবাস ঔষধের পরিমাণ ও পথ্যের নিয়ম উভয় প্রণালীতে একরূপ, কেবল আমাদের পাঁচন বাড়তি ছিল। নানা রোগের নানা প্রকার পাঁচন ব্যবস্থা হইত। পীড়ার ন্যূনাধিক্যতানুসারে দশমূল চতুর্দ্দশ অষ্টাদশ ইত্যাদি নানাবিধ পাঁচনের ব্যবস্থা হইত। বিরেচন আবশ্যক হইলে আরকাদি পাঁচন দেওয়া হইত। চিকিৎসার প্রণালী যেরূপই হউক, তৎকালে অষ্টাহমধ্যে প্রায় জ্বরত্যাগ হইত। কিন্তু পিপাসায় ও ক্ষুধায় যে কষ্ট বোধ হইত, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। পশ্চাল্লিখিত দুইটি বিষয়ে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালীন বৈদ্যচিকিৎসায় রোগীর কি কষ্ট হইত ও কত অনিষ্ট ঘটিত।

প্রায় ৬০ কি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজসংসারে ন্যায়পঞ্চানন নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন। একদা তাঁহার অতি প্রবল জ্বর হইয়া পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তিনি ইচ্ছামত জলপান করিতে না পাইয়া মলত্যাগের ছল করিয়া পায়খানায় যান, এবং সেখানে বসিয়া একটা গর্ত্তের অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর জল এক গাড়ু পান করেন। সে সময় তাঁহার হিতাহিত বা ধর্ম্মজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। আর একটি এমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটে যে, তাহা অদ্যাপি আমার স্মৃতিরূঢ় হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার একটি ভাগিনেয়ের ও একটি ভাগিনেয়ীর এক সময়ে জ্বর হয়। শেষোক্তটির বয়স ৪ কি ৫ বৎসর। সেটি একে দুর্ভাগা কুলীনদুহিতা, তাহার উপর আবার তিন ভগিনীর কনিষ্ঠা। ভাগিনেয় একে কুলীনপুত্র বলিয়া অতি আদরের ধন; তাহার উপর আবার তিন সহোদরের মধ্যে তিনি মাত্র জীবিত। সুতরাং সেইটির প্রতি সকলের অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবল জ্বরতাড়নায় অত্যন্ত তৃষ্ণা হওয়াতে বালিকা ক্রমাগত জল চাহিয়াছিল। কিন্তু শেষরাত্রি বলিয়া কিছুমাত্র জল দেওয়া হয় নাই। প্রভাত হইলেও বৈদ্যের প্রতীক্ষায় জল দেওয়া হইল না। বেলা চারি দণ্ডের সময় বৈদ্য পীতাম্বর কবিরাজ আসিয়া বালক বালিকার নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। বালা যত বারই জল চাহিল, তত বারই ঔষধ দিয়া

জল দিতেছি প্রবোধ দেওয়া হইল। প্রথমে পুত্রকে ঔষধ সেবন করান হইল, তৎপরে কন্যার মুখে ঔষধ দিতে যাইয়া দৃষ্ট হইল যে, তাহার ঔষধসেবনের শক্তি জন্মের মত রহিত হইয়াছে। আমি তৎকালে তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম, এবং বালিকা জল জল বলিতেছে, তাহাও শুনিতেছিলাম। সে সময় আমার বয়স ১৩ কি ১৪ বৎসর। তথাপি তাহার অবস্থা বুঝিবার জন্য তাহার গাত্র স্পর্শ করিলাম এবং নাড়ী দেখিলাম। গাত্রের বিলক্ষণ উত্তাপ আছে, কিন্তু নাড়ী কিছুমাত্র বোধ হইল না। তৎকালে পিতা বা অগ্রজমহাশয় কেহ তথায় ছিলেন না। সুতরাং আমিই তাহাকে লইয়া বাহিরে গমনপূর্ব্বক বোধন বিল্ববৃক্ষতলায় ক্রোড়ে করিয়া বসিলাম। কিন্তু যতক্ষণ তাহার শরীরে উত্তাপ থাকিল, ততক্ষণ আমি তাহাকে ভূমিশায়ী করিতে পারিলাম না। বৈদ্য যখন তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার মৃত্যুর কোন পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই,— এবং তাহার পরেও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবার উপযুক্ত কোন উপদ্রব দেখা যায় নাই। কেবল জল জল যে শব্দ করিতেছিল, তাহাই রহিত হইয়াছিল। আমার বোধ আছে যে, মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব্বেও তাহাকে কিঞ্চিৎ জল দিলে আর এই দুর্ঘটনা হইত না।

ইটি বালিকা না হইয়া যদি বালক হইত, তবে বোধ হয় যে, তাহার পিতা মাতার ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের শোকের সীমা থাকিত না। ধন্য কৌলীন্য! তোমার অত্যাচারে বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশে যে অস্বাভাবিক ও নৃশংস ব্যাপার ঘটিয়াছে ও অদ্যাপিও ঘটিতেছে, তাহা কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্রীয়, কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। এই দুঃখাবহ ঘটনার মূল,—দেশের লোকের বা বৈদ্যের মূর্খতা তত দূর নহে, যত দূর কৌলীন্যের। কারণ, এটি যদি কুলীনবালা না হইয়া কুলীনবালক হইত, তাহা হইলে তাহার যে প্রকার অসহ্য তৃষ্ণা হইয়াছিল, তাহাকেই অগ্রে ঔষধ দিয়া জল দেওয়া হইত।

চিকিৎসার দোষেই হউক, বা পীড়ার গতিক্রমেই হউক, আমার জ্বর ক্রমশঃ ভয়ানক আকার ধারণ করিল। অষ্টাদশ দিবসে আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম, আমার পিতা ও মধ্যম জেষ্ঠতাতমহাশয় আমার শয্যার উভয় পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এবং সজলনয়নে এক দৃষ্টিতে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বেলা ৪ দণ্ড আছে। জেঠামহাশয় পিতাকে কহিলেন যে, "কোন ভয়ের বিষয় নাই; তুমি আহার করগে।" তৎকালে আমার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ নাই। [illegible] দিবসে অন্ন পথ্য পাইলাম। একে অতিশয় দুর্ব্বল ছিলাম,

তাহার উপর জ্বর আটকিয়া গেল সুতরাং আমার পড়া শুনা আপাততঃ স্থগিত থাকিল। এত যে ক্লেশ পাইলাম ও পাইতে থাকিলাম, তথাপি কিছুমাত্র অনুতাপ বা দুঃখ হইল না।

হায়! সে সময় শিক্ষার কি ভয়াবহ বিকৃত প্রণালী ছিল। শিক্ষকের আলয়ে না যাইবার নিমিত্ত যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয় ও ওস্তাদজী, উভয়ই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল, মকৃতবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তক সকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে, অতি নির্দ্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরু জন বিবেচনা করিতেন, এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তাহারা কি জন্য শিক্ষায় বিমুখ থাকিত, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে একবারও চেষ্টা করিতেন না। শুনিয়াছি, গুরুমহাশয়ের ভয়ে এক বালক খর্জ্জুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের কোন কোন পড়ুয়া যাইয়া তাহাকে নামাইবার নিমিত্ত লোষ্ট্র প্রহার করিতে লাগিল। বালক নিরুপায় দেখিয়া অতি কাতর স্বরে কহিল, হে ঈশ্বর! যদি তুমি খেজুরের কাঁটায় আমার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় যাইতে হয় না। যে লেখাপড়ার জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্য্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২।১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত!

ক্রমশঃ।

ভাঙ্গা কাঁচ।

ভাগীরথীতীরে মুক্ত বাতায়নপথে, একটি ভাঙ্গা কেদারায় মাথা রাখিয়া, নরেশচন্দ্র চিন্তামগ্ন। সম্মুখে একটি সঙ্কীর্ণ টেবিলের উপরে খানকতক ইংরাজী নভেল, একটা ভাঙ্গা বাক্স, গোটাকতক বাঙ্গলা-লেখা কাগজ, বাঙ্গলা সংবাদ-

কোণে একটি মান্ধাতার আমলের কেরোসিন-ল্যাম্প জ্বলিতেছে ; দীপালোকে আকৃষ্ট হইয়া গোটাকতক পতঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে।

প্রথম বসন্তারম্ভ ; বোধ হয়, সেই দিনেই প্রথমে দুপুর বেলায় কোকিল মদনক্লান্তকণ্ঠে কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়াছিল ; সন্ধ্যার পরে বসন্তানিল বহিতেছিল। আম্রমুকুল ও কাঁটালের নবাঙ্কুরের মধুর গন্ধে বাতাস আমোদিত।

নরেশের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। মুখে, নয়নকোণে, কপোলপটে অপরিতৃপ্ত যৌবনাবসানের একটা ঘুমন্ত ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল।

আজ কত দিনের কথা নরেশের মনে জাগিতেছিল। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারের ন্যায় কোথা হইতে আবিল স্মৃতির বন্যা আসিয়া তাহার হৃদয় ভাসাইয়া দিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র বাল্য-গৃহ, গৃহের প্রতি ঘর, ঘরের প্রতি জানালা দরজা, প্রাঙ্গণের জাম কাঁঠাল প্রভৃতি গাছগুলি, আর দূরে সেই তমালনীলরেখাঙ্কিত, রক্তিমমেঘরঞ্জিত গগনের সান্ধ্যছবি। একে একে সকলি হৃদয়পটে উদিত হইতেছিল।

আজ তার পর সহসা যৌবনের ও যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় জীবনের কথা মনে পড়িল। একটি একটি করিয়া বন্ধুদের মুখ মনে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—তাহারা আজ জীবনস্রোতে কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!! তার পর, চিরজীবনের, অনুতাপাঙ্কুর সেই মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িল। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বিলাতে গিয়া অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার জন্য Sate Scholarship প্রাপ্ত হইবার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধিকার হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শ অনুসারে তিনি সে বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না। নগেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় পঞ্চম হইয়াছিলেন মাত্র, বৃত্তি আর কেহ গ্রহণ না করাতে তিনি তাহা লুফিয়া লইলেন। বিলাতে অত্যন্ত খ্যাতির সহিত সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ও উচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া আজ তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। আর নরেশ অতি সামান্য বৃত্তিভোগী স্কুলমাষ্টার মাত্র।

কিন্তু ভাগ্যদোষে পদগৌরববিহীন, অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, এ জন্মে তাঁহার কপালে ঘটিল বলিয়াই, নরেশের এই বসন্ত সন্ধ্যায় এ দারুণ মর্ম্মপীড়া হইতেছিল না।

জগতের সকল নয়ন হইতে আড়াল করিয়া, সেই নিভৃত হৃদয়মন্দিরে কার দেবীমূর্ত্তি নরেশ পূজা করিতেছিলেন। যে রূপ লোকমুখে শুনিয়া, শৈশবে শুধু

কাছে পাইয়াও নিজ দোষে হারাইয়াছিল, আজ সেই মায়াময়ী মূর্ত্তি কুসুম-শয়নে শুধু ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। কেন না, সে মানবী এখন পরের রমণী, তাহার চিন্তাতেও নরেশের অধিকার নাই।

নরেশ কেদারা হইতে উঠিয়া জানালায় হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে চন্দ্রকরবিভাসিত বসন্ত-উৎফুল্ল নিশীথের অপূর্ব্ব সুন্দরী মূর্ত্তি। নরেশের নয়ন সে দিকে আকৃষ্ট হইল না। জানালা হইতে চলিয়া আসিয়া,সেই ভাঙ্গা বাক্সটি খুলিয়া একটা কাঁচের ফ্রেমে আঁটা একটি ফোটো বাহির করিলেন। উপরের কাঁচটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ফোটোটা কিছু মলিন হইয়া পড়িয়াছে। ফোটোর তলায় এখনও স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"নরেশ বাবুকে সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল।—চারুলতা।" তার পর নরেশ বাক্স ঘাঁটিয়া একখানি খাতা ও একটা কাগজের তাড়া বাহির করিল। খাতায় কত কি হিজিবিজি, কত কাটাকুটী; কোন যায়গায় এক আধটা সম্পূর্ণ কবিতা। এই সব কবিতা যাহার উদ্দেশে, একদিন সমস্ত জীবন যাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিল, সে আজ কোথায়?

সহসা সম্মুখের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অষ্টাদশবর্ষীয়া এক যুবতী, কিছু স্থূল-কায় শ্যামবর্ণ একটি ছেলে কোলে করিয়া, আর একটির হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন নরেশ সংজ্ঞাশূন্য অনিমিষ লোচনে সেই ছবি ও স্বীয় পুঁথির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু বেশী ক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিতে হইল না। "মিন্‌সের আক্কেল দেখ না, রাত কি হয় নি—না দশটা চাকর রেখেঁ দিয়েচ যে, তোমার জন্যে ভাত নিয়ে বসে থাকব?"

(কিছু নিকটস্থ হইয়া) "আর পোড়া ঐ হিজিবিজি নিয়েই থাক। ঘর সংসারে আগুণ লেগে যাক, ভেকো দু মাস থেকে সরদিতে মরচে, তার খোঁজ নেই।"

এই সময়ে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা আঁচল টানিয়া নাকি সুরে কাঁদিল,—"আয় না মা, বড় খিদে পেয়েচে"। উত্তরে মাতা—"মর পোড়ামুখী, রাক্ষুসীর পেটে যেন কে আগুণ জেলে দিয়েচে" ও এক চপেটাঘাত! নেড়ী সুর ধরিল, ভেকো সমস্বরে তান ছাড়িল।

এই সময়ে নরেশ ফোটোটা সরাইয়া রাখিয়া, উঠিবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কুক্ষণে তাঁহার ভার্য্যার সেটার উপর নজর পড়িল। "বলি দেখি দেখি ওটা আবার কি?" বলিয়া শরৎসুন্দরী ছোঁ মারিয়া পড়িলেন। "কিছু নয়, শুধু

নিতান্ত ক্ষীণাঙ্গী নহেন, তাহা আগেই বলিয়াছি; তাহাতে আবার তিনি ভারাক্রান্তা। তাঁহার সেই সহসা লম্ফের আবেগ প্রথমে সেই কেরোসিন-ল্যাম্পটাকেই সহিতে হইল,—সেটা মেজে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, —নরেশের অনেক তপস্যার ফলে একটা অগ্নিকাণ্ড হইল না। তখন "পোড়ামুখী রাক্ষুসী" বলিয়া নেড়ীর পিঠে ও "পোড়ামুখো ড্যাকরা" বলিয়া ভেকোর পিঠে গুড়ুম গড়াম শব্দে ভাদ্র মাসের তালের মত কিলবৃষ্টি হইতে লাগিল।

নরেশচন্দ্র সেই সমস্ত কাগজ, খাতা, ছবি, অন্ধকারে হস্তগত করিলেন। উন্মুক্ত বাতায়নের কাছে গিয়া সজোরে জাহ্নবীর জলে সে সব নিক্ষেপ করিলেন।

২

যে দিন প্রভাতে নরেশ বাবু সংবাদপত্রে দেখিলেন যে, তাঁহার স্কুলের সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাগ্যদোষে তাঁহারই কর্ম্মস্থানে বদলি হইয়া আসিতেছেন, এবং লোকমুখে শুনিলেন যে, নগেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক আসিতেছেন, সেই দিন স্থির করিলেন, হয় ছুটী লইবেন, নয় কাজে ইস্তফা দিয়া অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা দেখিবেন।

কিন্তু সে সব উচ্চ উদ্যম কিছুই কার্য্যে পরিণত হইল না। শুধু স্বর্ণপুর সহরে তাঁহার রাস্তা চলা ভার হইয়া উঠিল। দূর হইতে গাড়ীর শব্দ শুনিলেই চমকাইয়া উঠিতেন। বাড়ী ছাড়িয়া প্রায় বাহির হইতে চাহিতেন না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিল। সে বৎসর কখন বৃক্ষরাজি নবপল্লবে শোভিত হইল, কবে সে বৈশাখের উদাস পবন উদাস দুপুর বেলায় হু হু করিয়া বহিয়া গেল, কবে নিদাঘশেষে বর্ষার প্রথম মেঘমন্দ্র গগনে ধ্বনিত হইল, কে জানে? —সে বৎসর প্রকৃতির কোন সুখই নরেশের প্রাণে লাগিল না।

যে অধ্যাপনায় নরেশ প্রাণপণে যত্ন করিতেন, সে কাজে আর তাঁহার যত্ন নাই। কালেজের সকলেই বলিত, তিনি শুকাইয়া যাইতেছেন; তাঁর বিমর্ষ ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার ক্লাসের দু' এক জন ছাত্র সত্য সত্যই মনঃক্ষুণ্ণ হইত।

ক্রমে একটা দারুণ তৃষা নরেশের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। যাহার রূপের ও গুণের কথা নগরের সকলের মুখেই শুনিতে পান, যাহাকে সকলেই দেখিতে পায়, তিনি কি দোষ করিয়াছেন যে, সে সুখেও আপনাকে বঞ্চিত করিতেছেন?

সুবর্ণপুরে, জাহ্নবীতীরে একটা মাঠ আছে, মাঠের উপরে অনেকগুলি রাস্তা বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত। নগেন্দ্রনাথ ও চারুলতা তথায় প্রত্যহ প্রভাতে পদব্রজে

খানে প্রত্যহ সকালে বিকালে বেড়াইতে যাইতেন। কিন্তু গত নয় মাস হইতে, সে সুখে তিনি বঞ্চিত। নরেশচন্দ্র স্থির করিলেন, আবার এক দিন তিনি প্রভাতে বেড়াইতে যাইবেন।

একটি ক্ষুদ্র বেত হাতে, নাকে চস্‌মা, একটা সামান্য জামা পরিধানে, আজ নয় মাসের পর নরেশচন্দ্র মাঠের দিকে বাহির হইলেন। প্রথমে খুব দ্রুত পদ-বিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন, যেন কি একটা নির্দ্দিষ্ট কাজের সময় বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রথম গলি পার না হইতে হইতেই নরেশের বেগের স্পষ্ট বিশেষ দেখা গেল; তিনি ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন; ক্রমে আরও আস্তে;—সহসা একটা বড় বাড়ীর গেটে মাথা ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। "আরে দূর ছাই! কেউ ত আর ধরে রাখবে না"—বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিয়া আবার সবেগে চলিতে লাগিলেন। এবারে একেবারে মাঠের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া সহসা তাঁহার মনে পড়িল যে, বড় বেলা হইয়া গিয়াছে, এত বেলায় morning walk করা স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন ক্রমেই ফলজনক হইবে না। আর একটা কথাও মনে হইল, আজ এত বেলা হয়েচে, আজ কখনই দেখা হইবে না, আজ এখান থেকেই ফেরা ভাল, কাল সকালে সকালে আসা যাবে! কিন্তু পা কোন রকমেই ফিরিতে চাহিল না। সহসা নরেশচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, একটা বৃক্ষবীথিখচিত পথের অপর দিক হইতে দুই জন আসিতেছে;—চিনিতে অধিক বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, চারুলতা ও নগেন্দ্রনাথ সেখান হইতে তখনও প্রায় এক শত হাত দূরে, কিন্তু তবুও নরেশ মুহূর্ত্তের জন্য গতিশক্তি হারাইলেন, সমস্ত ধমনী উন্মত্ত করিয়া রক্তস্রোত মুখের ও হৃদয়ের দিকে ধাবিত হইল, কাণে এক অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। এত বাড়াবাড়ি দেখিয়া হয় ত পাঠক হাসিবেন! বেচারা নরেশকে বিধাতা এত অমূল্য মানসিক শক্তি দিয়াছিলেন, যদি সেই সঙ্গে হাসিবার ক্ষমতাটাও দিতেন, তাহা হইলে তাহার হয় ত এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু যে রক্ত মাংস লইয়া বিধাতা Shelley, Keats, চৈতন্য প্রভৃতির মানবহৃদয় নির্ম্মাণ করেন, ভুলক্রমে অনেকটা সেই রক্ত মাংস নরেশের কপালেও পড়িয়াছিল।

কিন্তু এত সব আলোচনার সময় নরেশের ছিল না; তিনি দূর হইতেই, নগেন্দ্রনাথ ও চারুলতাকে দেখিয়া, ভীত মৃগের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

কিন্তু গৃহের দিকে না গিয়া অবাধ্য চরণ কেন যে একটা অন্য রাস্তার দিকে ধাবিত হইল, ও আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীপাকৃষ্ট পতঙ্গবৎ, যে রাস্তায় নগেন্দ্র ও চারুলতা বেড়াইতেছিলেন, নরেশকে সেই দিকে উপস্থিত করিল, তাহা আমি ত বলিতে পারি না;—নরেশ নিজে কিছু জানে কি না, সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে।

তখন নরেশচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই যে দিকে নগেন্দ্র আসিতেছিলেন, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে নরেশ মনে করিতেছিলেন, কি একটা অপূর্ব্ব ঘটনা হইলে তিনি ধরণীগর্ভে লুকাইতে পারেন, কি অন্য প্রকারে তখনও ফিরিয়া পলাইবার অবকাশ পান।

চোক খুলিয়া চাহিবার সাহস নাই। দুই জনে মৃদু মন্দ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল—তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল কি ? নরেশ নয়নে কিছু দেখেন নাই, কিন্তু তবু যেন তাঁহার ব্যাকুল প্রাণ অঙ্গের স্থূল বাধা ভেদ করিয়া দেখিল, হরিণীগঞ্জন, ঘনকৃষ্ণতার, আকাশকোমল দুইটি নয়ন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

নরেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি একটা গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন—এ কি বিস্মৃতি, না তাচ্ছীল্য ? বিস্মৃতি ?—তাহাও কি সম্ভব ? এই চারি বৎসরের মধ্যে ? নরেশ জানিত না, চারি বৎসরের মধ্যে রমণী-হৃদয়ে কি সম্ভব।

কিন্তু নগেন্দ্র ও চারুলতা নরেশকে আদৌ দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

৩

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, যত অন্ধকার দেখাইতেছিল, ততটা বেলা হয় নাই; সারাদিন মেঘ করিয়া ছিল, সায়ংকালে মেঘ আরও ঘনাইয়া আসিল।

সুবর্ণপুরে আসিতে হইলে অপর পার হইতে রেলে আসিয়া নদী পার হইয়া আসিতে হয়। ৫টার গাড়ী আসিল,—শনিবার,—যাত্রী অনেকে আসিল, কিন্তু ঘাটে বড় তুফানের ভয়, তত বেশী নৌকা নাই।

যাত্রীদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পরিচ্ছদে দ্রুতপদে ঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, "সাহেব এ কিস্তি, সাহেব এ কিস্তি!"*

ছিল, নগেন্দ্র সোজা গিয়া সেইটাতে উঠিলেন। দু' এক জন ভদ্রলোক নৌকায় আগে চড়িয়াছিলেন, নগেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া মাঝি ভদ্রলোকদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, "না বাবু; এ নৌকায় হবে না, তোমরা দোসরা নৌকায় যাও, এখানে সাহেব আস্‌বে।" সুবর্ণপুর কলিকাতা হইতে একটু দূর, নগেন্দ্রনাথ সাহেব ও হাকিম, অথবা হাকিম, সেই জন্য সাহেব,—বাবুর দল বিনা বাক্য-ব্যয়ে নাবিয়া গিয়া আর একটা নৌকায় উঠিলেন। প্রায় সব নৌকা ভর্ত্তি, নৌকায় যায়গার অভাবে বাঙ্গালীর কখনও পারে যাওয়া আটকায় না।

এই সময় আর এক জন যাত্রী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। এতক্ষণ নরেশ বাবু পিছনে পড়িয়া যে কি করিতেছিলেন, তিনিই জানেন। প্রায় সব নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল, ভাউলের মাঝি মেড়ুয়াবাদী;—সব কাজেই তাহাদের বিলম্ব; আর পারানি নৌকা,—তাহাদের উদর কখনও পূর্ণ হয় না;—এ দুটো নৌকা তখনও ঘাটে ছিল।

নরেশচন্দ্রের মুখ দেখিয়া নগেন্দ্রের চেনা চেনা বোধ হইল, ঠিক চিনিতে পারিলেন কি না, বলিতে পারি না। নগেন্দ্র মাঝিদের বলিলেন, "এ বাবুকে উঠা লেও"। মাঝিরাও কোন তাঁর কাছে থেকে নিদেন আনাটাক আদায় না করিবে? তখন চেঁচাইল, "এস বাবু! এস, সাএব তোমায় নিতে বল্‌চে।" এ সাদরসম্ভাষণ শুনিয়াও, নরেশ বাবু মজকুর, কিছুমাত্র গলিয়া যাইবার চিহ্ন দেখাইলেন না; আস্তে আস্তে গিয়া তিনি পেরুনি নৌকায় উঠিলেন। নরেশ ভাবিতেছিলেন, এ-ও কি বিস্মৃতি? না, তাঁহার মত দীনের সঙ্গে কথা কহিলে সাহেবের পদমর্য্যাদার লাঘবের সম্ভব?

আরও মসীময় হইয়া গগনে ঘন মেঘ আসিল। আকাশের ঈশান কোণ হইতে মরুতের হুহুঙ্কার আরও সুগম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। সব নৌকাই পাল উঠাইয়া দিল। রীতিমত তুফান আসিবার আগে পার হওয়া লইয়া বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পবনদেবের মতের সঙ্গে তাহা একবারেই মিলিল না।

নৌকাশ্রেণী প্রায় মাঝ গঙ্গায় গিয়াছিল। জোয়ারের ভরা গঙ্গা, বাত্যা-তাড়িত ক্ষিপ্ত বীচিমালা বজ্রবেগে নৌকার গায়ে আহত হইতেছিল। সহসা আকাশের মেঘরাশি ভেদ করিয়া, ধূম্র মেঘবাহনে মরুতদেব গগন হইতে একলম্ফে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। আকাশ, নদী বেলাভূমি, আলোড়িত ধর্ষিত হইয়া সব একাকার হইল।

উপযুক্ত পরিষ্কার বড় পাল, আর ভাউলের মেড়ুয়া মাঝি। তার পর ডুবিল আর একটা লাল-রঙদার পালওয়ালা নৌকা। কেন না, সেটা আমাদের সাবেক পবিত্র ছেঁড়া পালের আর্য্য-প্রথা ছাড়িয়া পাশ্চাত্য বাবুয়ানির অনুকরণ করিতে গিয়াছিল। আর দুই খানা নৌকা,—যাহারা সাবেক প্রথা বজায় রাখিয়া ছেঁড়া পাল তুলিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, তারা কেবল নক্ষত্রবেগে তীরে গিয়া ধাক্কা খাইয়াই বাঁচিয়া গেল। পেরুনির পাল ছিল না, সে দুই চারিটা ধাক্কা খাইয়াই রক্ষা পাইল। যে মুহূর্ত্তে ভাউলে খানা ডুবিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একজন পেরুনি হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নগেন্দ্রনাথ শুধু বুট খুলিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু নরেশ রীতিমত চাদর কোমরে জড়াইয়া আর সব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেশ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন কিসের জন্য, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয় বলিতেন, সম্মুখে পরের চরম বিপদ দেখিলে কোন্ পাষণ্ড আপনার বিপদের কথা স্মরণ রাখে? আমরা সেই উত্তরই গ্রহণ করিব।

তখনও আকাশে আলো আছে; প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে মেঘ উড়িয়া গিয়া আকাশ আরও পরিষ্কার হইল। বজ্রের মত যে বাতাস সহসা আকাশ হইতে নাবিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু গগনাঙ্গণে তাহার দৃপ্ত পদবিক্ষেপমাত্র শ্রুত হইতেছিল।

একটা মস্ত ঢেউয়ের উপর হইতে নরেশ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারা প্রায় মাঝগঙ্গায় পড়িয়াছেন; বোধ হয়, সুবর্ণপুরের কিনারা কিছু দূর হইবে। দেখিলেন, সেই দিকেই ৪।৫টা কালো মাথা ভাসিয়া চলিয়াছে। নয়ন যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা পাইল না। ভাগ্যগুণে বাতাস আর নদীর স্রোত এক দিকেই বহিতেছিল। তাই ক্ষণিকের জন্য তরঙ্গগর্ভে প্রোথিত হইয়া পুনরপি ফেনিল তরঙ্গশিরে উঠিয়া নয়ন মেলিয়া আবার চাহিলেন। যে মাথাগুলি ডাঙ্গার দিকে যাইতেছিল, সকলেরই উলঙ্গ দেহ; বুঝিলেন, তাহারা নৌকার নাবিক,—নিজের প্রাণের মূল্য উত্তমরূপে সমঝিয়াছে। সহসা অন্য দিকে চাহিয়া একটা ঢেউয়ের উপর একটা কোটপরা হাত দেখিলেন। নরেশচন্দ্র স্রোতের দিকে সাঁতরান বন্ধ করিলেন। বিনা আয়াসে শুধু স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সেই হস্তচিহ্নিত ঢেউ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দেখিলেন, নগেন্দ্রনাথ কষ্টে মাথা জলের উপরে ভাসাইয়া রাখিতে পারিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ সন্তরণে বড় পটু নহেন, তার উপরে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত; নিজের পরিচ্ছদের বোঝা হইতে কিয়ৎ-

স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। খুব নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া নরেশ ডাকিলেন, "নগেন!" কিন্তু নরেশ কোনও উত্তর পাইলেন না; দেখিলেন, নগেন ক্রমে ডুবিতেছে। নরেশ ক্ষিপ্রহস্তে পশ্চাৎ হইতে নগেনের কোটের গলা ধরিয়া টানিলেন। আবার উচ্চস্বরে বলিলেন, "আমায় ধরো না, তা হলে দু'জনেই ডুবিব।" সেই স্বভাবতঃ মৃদুস্বভাব, রমণীর ন্যায় লজ্জাশীল ও সঙ্কোচতৎপর যুবকের হৃদয়ে এ দুরন্ত সাহস ও তাঁহার হস্তে এ অসীম বল কোথা হইতে আসিল, কে জানে।

দু' জনে ভাসিয়া চলিল। নরেশ বুঝিলেন, স্রোত কাটাইয়া সাঁতরাইয়া ডেঙ্গার দিকে যাইবার চেষ্টা করা মৃত্যুর কামনামাত্র। আর তিনি জানিতেন, প্রায় আধ মাইল দূরে গঙ্গার মাঝখানে একটা চড়া আছে, ভাসিয়া গিয়া সেখানেও উঠিতে পারিবেন।

নরেশ একবার বাম দিকে, তার পরে ডান দিকে সাঁতরাইয়া ক্রমে প্রায় চড়ার ১০০ হাতের কাছে আসিলেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া আর একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। সম্মুখে একটা ঘুর্ণী স্রোত। নদীর খরস্রোত সহসা সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে বাধা পাইয়া প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইতেছিল। তাহা সন্তরণ করিয়া পার হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। চিন্তার অবকাশ ছিল না। কুসুমের স্বাভাবিক সুবাসের মত নরেশের হৃদয়ে স্বতই মনে হইল, যদি মরি ত দুই জনে এক সঙ্গে মরিব। প্রাণপণ আয়াসের ফলে, কি অপূর্ব্ব দৈব কৃপায়, একটা প্রকাণ্ড ঢেউ দু' জনকে সহসা চড়ার বালির উপরে আছড়াইয়া ফেলিয়া গেল। ঘুর্ণী কাটাইয়া আসিতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগিয়াছিল; সমস্ত সময় নরেশ বজ্রমুষ্টিতে নগেন্দ্রের কোট ধরিয়াছিলেন, এখন সে মুষ্টি খুলিয়া লইবারও শক্তি নাই। দুই জনে শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলেন, তাহা নরেশ জানিতেন না। সহসা আলোকের তীব্র রশ্মি নয়নপাতায় লাগিয়া তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল। দেখিলেন, জলের উপরে ৪।৫ টা কেরোসিনের লণ্ঠনের আলোক প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাদের চোখে লাগিতেছে। নগেনও চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বোধ হয়, আমাদেরই তল্লাসে আস্‌চে।" তাঁহারা দু জনে সমস্বরে হাঁকিলেন। নৌকাগুলা সেই দিকে আসিতে লাগিল,—৩।৪ খানি নৌকা আসিতেছিল।

নৌকা ক্রমে কাছে আসিলে নরেশ এক অপূর্ব্ব ছবি দেখিল। নরেশের

আকাশপটে আলুলায়িতকুন্তলা, অনিমেষবিদ্যুৎপ্রভনয়না, স্ত্রীমূর্ত্তি। তাঁহার আর কিছুই মনে নাই, কখন পুলিসের নৌকা লাগাইবার হুড়াহুড়ি শেষ হইল, আর কখন বিদ্যুৎবেগে চারুবালা স্বামীকে হৃদয়ে তুলিয়া ধরিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "চারু, তোমার নরেশ বাবুকে মনে আছে? তিনিই আমার,—কিন্তু নরেশ বাবু কোথায়?" দূরে একখানা নৌকা যাইতেছিল, একটা কনেষ্টবল বলিল, বাবু তাহাতেই চলিয়া গিয়াছেন।

সেই দিন নিশীথে নরেশের মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা জানি, পরদিন প্রভাতেই নরেশচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

*

আশা করিয়াছিলাম, নরেশ বাবু সেদিন রাত্রে নৈশ আকাশতলে দম্পতীর প্রেমময় পুনর্মিলন স্বচক্ষে দেখিয়া জাহ্নবীর কোমল অঙ্কে শ্রান্ত তনুর শান্তি অন্বেষণ করিবেন। কিন্তু হয় ত ভেকোর কথা, নেড়ীর কথা মনে উদিত হইয়া থাকিবে। জীবনসংগ্রামে ফিরিয়া গেলেন—জীবনের শত কোটী বালুকণার মাঝখানে সে জীবনকণা কোথায় যে হারাইয়া গেল, তাহার সন্ধান কে রাখিবে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বঙ্গ-সাহিত্যের নবোন্নতি।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় আমরা চিন্তাসূত্র-সম্প্রসারণ সম্বন্ধে শ্রীমতী অলিভ্ স্ক্রিনারের মতের কথা বলিয়াছি; বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁহার মতের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া, সম্প্রতি "টাইমসে" যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার কিছু কিছু সারোদ্ধার করিয়া দিলাম। তৎপূর্ব্বে আমরা মিষ্টার দত্তের পুস্তক সম্বন্ধে একটা কথা বলিব,—পুস্তক আমাদের আশানুরূপ হয় নাই; উহাতে এমন অনেক ভ্রম আছে, যাহা আমরা অন্ততঃ মিষ্টার দত্তের নিকট কখনও প্রত্যাশা করি নাই। তদ্ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত লেখকদিগের অনেকের নাম বাদ পড়িয়াছে; পক্ষা-

ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ সমীচীন না হউক,—তাঁহার কল্যাণে সমুদ্রপারে বঙ্গ-সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির বার্ত্তা প্রকাশিত হইল ;—এজন্য তিনি স্বদেশীর ধন্যবাদভাজন।

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের একটা উল্লেখযোগ্য ফল,—দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি। ভারতবাসী প্রতিভাবান লেখকদিগের ইংরাজী ও ফরাসী গ্রন্থের কথা অনেক য়ুরোপীয়ই অবগত

বৃটিশ প্রভাব।

আছেন ; কিন্তু অনেকেই ইহা জানেন না যে, দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির তুলনায়, সে সকল নিতান্তই নগণ্য। দেশীয় ভাষার এই নবোন্নতি ভারতবর্ষের কোনও অংশবিশেষে আবদ্ধ নহে ;—ভারতের যেখানে ভাষা ছিল, সেখানে তাহা উন্নীত হইয়াছে ; যেখানে ভাষা ছিল না, সেখানে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সকল চলিত ভাষা কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই, সে সকলেরও অক্ষর প্রস্তুত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহৃত হইতেছে—যে সকল অসংস্কৃত ভাষা কেবলমাত্র সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইত, সে সকলে এখন গদ্য সাহিত্যের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। অপেক্ষাকৃত সুসংস্কৃত ভাষা সকল প্রাচীন সাহিত্যের ধনাগার হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া, এখন জটিল দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রশ্নের এবং বর্ত্তমান সময়ের ভাব প্রকাশেরও উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে কেবল যে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ ও উত্তরভারতের অপেক্ষাকৃত সভ্য স্থানেই ভাষার এই নবোন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, আসামের সীমান্তস্থিত গিরিশ্রেণী হইতে মধ্যপ্রদেশীয় অধিত্যকার বনানী পর্য্যন্ত বহু প্রদেশে বহু অসভ্য জাতির মধ্যে ইহা লক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত উন্নতিবিষয়ে কোন প্রদেশই বঙ্গদেশকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। পূর্ব্বপ্রচলিত বঙ্গ ভাষায় গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনার অধিক সুবিধাও একটা বিঘ্ন হইয়া

রামমোহন।

দাঁড়াইয়াছিল। বিগত সাত শতাব্দী ধরিয়া নিম্ন বঙ্গের সাহিত্য "কোমলকান্ত" কবিতার কলকাকলিতে পূর্ণ ছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা রাজা রামমোহন রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে প্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তিনি বাঙ্গালা ব্যতীত ইংরাজী, পারসী, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার হিন্দুদিগের পৌত্তলিকধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থে, ভাষা ও ধর্ম্ম, উভয় এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল—তাহার সাক্ষী ব্রাহ্মসমাজ। তাহার পর, তেতাল্লিশ বৎসর রামমোহন এক দিকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারনিবারণে চেষ্টিত ছিলেন—অপর দিকে আবার হিন্দুর একেশ্বরবাদের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দান করেন। তিনিই পার্লেমেণ্টে সতীদাহের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ্ করেন। কবি ক্যাম্পবেল্ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, রোসেনের মত পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের প্রাচ্যদেশসম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বেন্থাম তাঁহাকে মানবজাতির ধর্ম্মে আপনার প্রশংসিত ও প্রিয় সহকারী বলিয়াছিলেন।

এইরূপে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্য এক জন মনীষী পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। এখন ইহা ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনাতেও ব্যবহার করিবার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাগঠন-

বিদ্যাসাগর।

কালে সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে প্রভূত সাহায্য হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন ইংরাজী হইতে বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রভৃতিও গৃহীত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়দেশীয় ভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত দুই জন লোক বঙ্গ ভাষাকে উন্নত করিয়াছেন। একজন বিদ্যার সাগর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়া, বিদ্যাসাগর পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসকরিয়া, স্বহস্তে আহার্য্য পাক করিয়া, অপচুর আহারে জীবনধারণ করিয়া, একবিংশতি

বৎসর বয়সে তিনি প্রাচীন ভারতের বিধান দর্শন, ও কবিতায় সুপণ্ডিত হইয়া, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিপ্রভাবে পণ্ডিতপ্রবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা গদ্যের সাহায্যে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আছে। শিক্ষাবিভাগে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। দেশের সাধারণ জনগণের সহিত তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতি ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশে গভর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করেন, এবং উহা গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে, ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হয়েন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার চেষ্টায় সংস্থাপিত বালক ও বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কলিকাতা নর্ম্মাল্ স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক হন;—দেশে শিক্ষাবিভাগে তাঁহার মত প্রভাব আর কাহারও ছিল না।

এত কাজের মধ্যেও বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষা ভুলেন নাই;—কিন্তু যখন হিন্দু বিধবার দুঃখে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় কাঁদিল, তখনই লোকে বুঝিল, নবোদ্গত বঙ্গভাষার কত ক্ষমতা। প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। সত্য ও ন্যায়ের দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, শাস্ত্রের সাহায্যে করুণার অবতার দেখাইলেন যে, বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত হিন্দু বিধবার চিরবৈধব্য শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুদিগের ক্রোধের আর সীমা রহিল না; গালিপূর্ণ পুস্তিকায় ও সঙ্গীতে তাঁহারা আপনাদিগের ক্রোধের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সকল সঙ্গীত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ও মফঃস্বলে সহরের বাজারে বাজারে গীত হইত। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই সকল আক্রমণের যে গম্ভীর উত্তর দান করেন, তাহাতে কেবল যে তাঁহার আক্রমণকারীরা নিরস্ত হইল, এমন নহে;—বড়লোকেরা অনেকেই তাঁহার পক্ষ লইলেন। তাহার পর বিবাহিতা হিন্দুবিধবাদিগের সন্তানদিগকে আইনতঃ সন্তানের সকল সত্ত্ব প্রদানের জন্য গভর্মেণ্টের নিকট দরখাস্ত করা হইল; তাহার ফল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আইন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া দেন ও সাহিত্যসেবায় মনোযোগ দান করেন। রচনাকৌশলে, করুণ ও কোমল রসে কোনও বাঙ্গলা গ্রন্থই তাঁহার "সীতার বনবাসকে" পরাস্ত করিতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং সংস্কৃত সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া বঙ্গভাষাকে অমূল্যরত্নরাজিবিভূষিতা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, প্রতীচ্য সাহিত্য-সাগর হইতে রত্নরাজি আনিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইংরাজ গভর্মেণ্টের চাকরি করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম "বি. এ."। কিছুদিন সংবাদপত্রসেবা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, উপন্যাসরচনাই তাঁহার প্রতিভার অধিক উপযোগী। বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসরচনার চেষ্টা প্রথমে উপহসিত হইয়াছিল; কিন্তু উদয়োন্মুখ তপনের মত বঙ্কিমের প্রতিভা ধীর গতিতে অন্ধকার উপহাস অবহেলা করিয়া দীপ্ত হইতে লাগিল;—তখন সকলে বুঝিল, বঙ্কিমের সৃষ্টিক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার রোমান্স ও উপন্যাস সকল পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ে বালক, অন্তঃপুরে মহিলা, কর্ম্মক্লান্ত কর্ম্মচারী ও ঘৃণাপ্রিয় পণ্ডিত সকলেই মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসকলের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন,—যেন তাহারা সত্য সত্যই দেহপ্রাণধারী মানব। বাইশ বৎসর কাল বঙ্গসাহিত্য-

বঙ্কিমচন্দ্র।

বিদ্যাসাগরের দয়ায় বহু বিধবা অনশনজন্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, বহু অনাথ শিক্ষা পাইয়াছে। বিদ্যাসাগরের নাম তাঁহার দেশে চিরপ্রিয়—বঙ্কিমের নাম ও প্রতিভাও উদারতার জন্য চিরদিন প্রিয় হইয়া থাকিবে।

টাইম্‌সের লেখক বলেন, তিনি কেবল বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, —কেবল গদ্যে খ্যাতনামা তিন জন লেখকেরই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন না বুঝেন যে, এই নবোন্নতি কেবল বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যেই হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহু যশস্বী কবি ও নাটককারও গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের মধ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্য সাহিত্যের অঙ্গই অধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে চাহেন, যাঁহারা বৃটিশশাসনাধীনে ভারতবাসীদিগের এই উন্নতির বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্তের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। মিষ্টার দত্ত আপনি সাহিত্যপ্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং গদ্য ও পদ্যরচনায় সে বংশের যশ অক্ষত রাখিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় ইংরাজী স্কুল ও কলেজের তিন শত ছাত্রের মধ্যে ইংরাজী পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রমেশচন্দ্রই প্রথম কভিনাণ্টেড্ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করেন।— টাইম্‌সের লেখক যিনিই হউন, তিনি এখানে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ;—তিনি একের স্থানে অন্যকে স্থাপিত করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষান্তে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিভিলিয়ান হইয়া এ দেশে ফিরেন। তাঁহারই সম্বন্ধে বঙ্গকবিগুরু মধুসূদন তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে" লিখিয়াছিলেন,—

অন্যান্য।

"সুরপুরে সশরীরে শূরকুল-পতি
অর্জ্জুন, স্ব কাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী !"

তদ্ভিন্ন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একাকী রমেশচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন নাই ;—মান্যবর বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিষ্টার বিহারীলাল গুপ্তও ঐ বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণের প্রথম সংস্করণের উৎসর্গে ইহার উল্লেখ আছে।

মিষ্টার দত্তের গ্রন্থের প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করা হইয়াছে যে, এক জন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকার ইংরাজী বা অন্য কোনও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া যতই খ্যাতি লাভ করুন না কেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ দেশীয় ভাষায় রচিত কোনও ভাল গ্রন্থের সহিতই তাঁহার বিদেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলকে সমান বলিবেন না। এই সাহিত্যিক দেশহিতৈষিতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই বঙ্গদেশীয় প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারগণ দেশীয় ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন, এবং সেই জন্য এক শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্গে গদ্য সাহিত্য এমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বিদেশীয় সাহিত্যে ইংরাজ-সমালোচকের মনোযোগ দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, চিন্তা-সূত্র-সম্প্রসারণ সম্বন্ধে শ্রীমতী অলিভ স্ক্রিনারের মত অভ্রান্ত।

ভূগোল।

কাশ্মীর ও কাশ্মীরিগণ।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা চিরপ্রসিদ্ধ। সেদিনও ত নামজাদা সার লেপেল্ গ্রিফিন্ বলিয়াছেন যে, ইংরাজ আল্প্‌সের শোভা দেখিতে না গিয়া যদি কাশ্মীর দেখিতে যান, তবে আরও মনোমোহিনী শোভা দেখিতে পান। রাজকার্য্যে নিযুক্ত মিষ্টার লরেন্সের বিবরণ হইতে আমরা কাশ্মীর ও কাশ্মীরিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কাশ্মীর।

সমুদ্র হইতে প্রায় ছয় সহস্র ফিট উচ্চে, গিরিরাজ হিমাচলের উদার বক্ষে শোভাময় কাশ্মীর। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, তিন দিকে সঙ্কটসঙ্কুল গিরিমালা যেন "মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।" দক্ষিণে বৃটিশ রাজ্য ও কাশ্মীরের মধ্যে পর্ব্বত। মধ্যে বড় নদী ঝিলাম—বড়মৌলা হইতে উপত্যকার তৃণমণ্ডিত তট ত্যাগ করিয়া প্রস্তরপূর্ণ পথে পঞ্জাবের অভিমুখে ছুটিয়াছে। উপত্যকার চারি দিকে নানা আকারের বর্ণবৈচিত্র্যবহুল গিরিমালা। দূরে ভীমকান্ত হারামক। ইহার ও অন্যান্য গিরি সম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীই আছে। যে সকল স্থান হইতে হারামক দেখা যায়, সে সকল স্থানে সর্পভয় নাই; তাই লোকে বলে, হারামকের মরকতরাশি সর্পকে বিষহীন করে। যাহারা সর্ব্বদাই বিদ্যুদ্দীপ্তিবহুল মেঘমালা ও মেঘকেতন বাত্যার মধ্যে উপত্যকায় বাস করে, তাহারা কুসংস্কার ও কিম্বদন্তী অধিক ভালবাসে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসই কাশ্মীরের কুসংস্কারের হেতু। পর্ব্বতে বর্ণবৈচিত্র্যের সীমা নাই; প্রত্যূষে গাঢ়পীত গগনচিত্রপটে ভাওলেট গিরিমালার শোভা, আর গিরিচূড়ায় ম্লান কুজ্ঝটিকা। সূর্য্যোদয়ান্তে গিরিসঙ্কটে লোহিত ও নীলের শোভা; তাহার পর পর্ব্বতাঙ্গ নীল, কেবল চূড়ায় শ্বেত বরফের উপর রবিকরের দীপ্তি; আবার সূর্য্যাস্তের পর পর্ব্বতাঙ্গ লোহিত, কেবল চূড়ায় ম্লান হরিত। বৃক্ষবহুল গিরিসঙ্কটে বনমধ্য হইতে কলধৌতপ্রবাহবৎ ফেনিলোচ্ছল কল্লোলিনীকুল বহিয়া আসিতেছে। তন্নিম্নে পল্লিমালা ও শস্যক্ষেত্র। কাশ্মীরে যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আলিঙ্গনবদ্ধ; উভয় স্থানের বৃক্ষলতাই এখানে দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে।

কাশ্মীরের গ্রামসমূহ শোভাময়। প্রত্যেক কুটীরেই উদ্যান আছে;—কুটীরসমীপেই দারুময় গোলা। সারমেয়দল নিদ্রামগ্ন, শিশুগণ রৌদ্রে গড়াইতেছে, তাহাদের জ্যেষ্ঠগণ বন্যপশুরক্ষণে নিযুক্ত। প্রায় সকল গ্রামেই এক একটা স্নানাগার আছে। আর দেখিবার জিনিস বিকশিতকুসুমশোভাময় সমাধিস্থান। তথায় ভয় নাই; অনেক ইংরাজমহিলা পুরুষ অভিভাবক না লইয়া তাম্বুতে বাস করেন। কাশ্মীর কামধেনু; এখানে শিকারী শিকার পাইবেন, কবি সৌন্দর্য্য পাইবেন, চিত্রকর দৃশ্য পাইবেন, ভ্রমণকারী সীমাহীন পর্ব্বতমালা পাইবেন—কানন, পর্ব্বত, তটিনী, কিছুরই অভাব নাই। তবে ব্যস্ত হইয়া সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে ছুটিলে এখানকার শোভা উপভোগ করা যায় না।

ইতিহাস।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কাশ্মীর প্রবলপ্রতাপান্বিত হিন্দু রাজ্য ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারেও ইহার প্রভাব ছিল। দেবমন্দির সকল দেখিলে মনে হয় যে, হিন্দুগণ কল্পনাকৌশলী ছিলেন। তাহার পর, প্রচারবলে বা প্রহারবলে তাঁহারা আপনাদের মহিমামণ্ডিত মন্দির ও শোভাময় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত

এই উপত্যকার শোভা বা ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মোগলগণ যুদ্ধ করিয়া কাশ্মীর জয় করিল। মোগলগণ কাশ্মীর ভালবাসিত, তাই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রান্তরের পাদপফুল আনিয়া, ইহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। লোকে আজিও বিস্মিত ও স্নেহবিগলিত ভাবে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের কথা বলে। মোগলশাসনে কাশ্মীর ভালই ছিল। তাহার পর অত্যাচারী পাঠান আসিল; সুবিধা পাইলেই পাঠান আপনার পিশাচমূর্ত্তি প্রকাশ করে। পাঠানেরা কাশ্মীর ও কাশ্মীরীদের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িয়াছিল। তাহার পর পাঠান তাড়াইয়া শিখের আগমন। মন্দের ভাল হইলেও তাহা একেবারে ভাল নহে। শিখ কাশ্মীরী খুন করিলে তাহার কেবল দুই টাকা জরিমানা হইত। সেকালে প্লীহা ফাটা ছিল কি না, আমরা জানি না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজানুগ্রহে গোলাপ সিং কাশ্মীরের রাজা হয়েন। এই কঠোর শাসনকর্ত্তাকে প্রজাগণ ভয় ও ভক্তি করিত। তখন এই রাজ্য দস্যুদলে পূর্ণ। কঠোর প্রাচ্য দণ্ডবিধি অবলম্বন করিয়া তিনি দেশশাসনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শাস্তিবিধানের একটা দৃষ্টান্ত এখানে প্রদত্ত হইল। অলঙ্কারের লোভে একজন সৈনিক একটি শিশুকে হত্যা করে। গোলাপ সিং তাহাকে সদর রাস্তায় কাজ করিবার শাস্তি দান করেন। কিছু কাল পরে সেই পথে গমনকালে, গোলাপ সিং তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমার সামান্য অপরাধের কি যথেষ্ট শাস্তি হয় নাই?" গোলাপ সিং তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তিনি অদূরে একটা সেতুর উপরি কর্ম্মরত একজন সূত্রধরকে ডাকিয়া কয়েদীর পোষাক খুলাইয়া কালীর চিহ্নে তাহার দেহ চার অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহার পর তিনি সূত্রধরকে তাহার দেহ চার অংশে করাত করিয়া ভাগ করিতে বলিলেন যে, উদ্দেশ্য,—রাজ্যের চার অংশে চার ভাগ প্রেরিত হইলে লোকে বুঝিবে, রাজা শিশুহত্যা সামান্য অপরাধ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার শাসনে ফল ফলিয়াছিল, তথায় অপরাধ অধিক নয়। লোকে অপরাধ করিতে ভয় করে।

ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের নিষ্ঠুরতা, অন্যায় এবং অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য এই কথা প্রকাশ করেন যে, কাশ্মীরীরা মিথ্যাবাদী, আলস্যপরবশ ও অসৎ। কাশ্মীরী কৃষকের দুর্নামের সীমা নাই। লেখককেও কর্ম্মচারীরা বলিয়াছিলেন যে, তাহারা ভালমুখে কথা কহিবার উপযুক্ত নহে—তাহা হইলেই বিদ্রোহবহ্নি বিস্তারিত হইবে। কাশ্মীরীর ভীরু হৃদয়ে সহানুভূতিহীন শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহার ভিন্ন আরও নানা প্রভাব আছে। এখানে প্রকৃতি আপনার যৌবনচাঞ্চল্য প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না—ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নি, কলেরা, দুর্ভিক্ষ আছেই। একটা গ্রাম ধরা যাউক। পট্টান গ্রামে এক শত পঁয়ষট্টি পরিবারের বাস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে সত্তর জন প্রাণত্যাগ করে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলেরায় পঞ্চান্ন জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানবের ও প্রকৃতির দৌরাত্ম্যে মর্ম্মপীড়াগ্রস্ত কাশ্মীরী মানবেরা, প্রকৃতিতে যে কিছু ভাল আছে, এ কথা বিশ্বাস করে না। তাহাদের স্মৃতি দুঃখবহুল, তাহাদের গীত দুঃখের কথায় পূর্ণ। তাহারা একটু ভীরু ও "নারীসুকুমার;"—তাহাদের পোশাকও নারীসুলভ। কার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহারা অলস হইলেও, ইচ্ছা করিলে তাহারা অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারে। অল্পদিন পূর্ব্বে লোকে আপনার শ্রমের ফল পাইত না—তাই এ আলস্য। যে জমীতে চাষ দিবে, সেই ফসল পাইবে, এ নিয়ম ছিল না; বিচারক পণ্ডিতের সমক্ষে কাশ্মীরী মিথ্যা কথা বলিবে; কিন্তু তাহার পল্লিস্থদিগের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলে সে সত্য কথা বলিবে। একটা জাতিকে মিথ্যাবাদী বলা বড় গুরুতর কথা; ছয় বৎসর পল্লিবাসীদের সহিত ব্যবহারের পর লেখক মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন যে, যে তাহাদের মিথ্যাবাদী বলে, সেই নিজে মিথ্যাবাদী;

পাঠক পাদরী পেণ্টিকষ্টের কথা স্মরণ করিবেন। লেখক ওকুস্থলে ভূমিসম্বন্ধীয় অভিযোগ শুনিতেন। কাশ্মীরীরা প্রতিবেশীদের সমক্ষে মিথ্যা কথা বলিতে লজ্জাবোধ করে, আর এক জন একটা মিথ্যা কথা বলিলে তাহার নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগের অবাক চাহনি দেখিয়া বুঝা যায় যে, সে মিথ্যা কথা কহিতেছে। ইহারা আদর্শজাতি নহে, তবে তাহাদের বহু সদ্‌-গুণ আছে—তাহারা বুদ্ধিমান, কৌশলী ও সুরসিক। 'ভূস্বর্গে' য়ুরোপীয়ের বিস্ময়বর্দ্ধক কৃষি-কার্য্য আছে—শ্রীনগরের শিল্পজাত ত জগতকে আশ্চর্য্য করিয়াই রাখিয়াছে। অতি তুচ্ছ কৃষকও তাহার পরিহাসক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহে।

পারিবারিক জীবন।

ইহাদের পারিবারিক জীবন সুন্দর—তাহাদের কোন কুৎসা নাই। আইরিশদিগের ন্যায় তাহারা শিশু ও বৃদ্ধদিগের প্রতি সদয়। কাশ্মীরে ও আয়ারল্যাণ্ডে সাদৃশ্য আছে। দুইই ক্ষুদ্র দেশ এবং উভয়েই প্রবলতর জাতির শাসন হইতে উপকার লাভ সত্ত্বেও উন্নতি বা পরিবর্ত্তন ভালবাসে না। কাশ্মীরী ও আইরিশ, উভয়েই পরিহাসপ্রিয়। আবার উভয়েই খাজানা দিতে নারাজ। ইহারা বড় নম্রপ্রকৃতি—কলহ করিলেও তাহারা গালির উপর উঠে না। শোণিতসন্দর্শন বড় ভীতিজনক; এমন কি, কোন কোন গ্রামে একটা পাখী মারিতে হইলে পুরোহিতকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গালিতে তাহারা সিদ্ধকৌশল। দুই নৌকা হইতে দুই জন রমণীর কলহকোলাহল প্রায়ই শোনা যায়। পুরুষেরা বসিয়া মজা দেখে। সারাদিন তীব্র ভাষায় কলহের পর তারকাদীপ্তিবহুল বিহগবিরাবিত সন্ধ্যায় দুই জনে দুইটা ধামা উল্টাইয়া রাখিয়া নিরস্ত হয়; পরদিন প্রভাতে আবার ধামা তুলিয়া কলহ আরম্ভ করে। কেহ তাহার প্রতি অন্যায় করিয়াছে ভাবিলে, কাশ্মীরী বড় বাগাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা কথায় কথায় বলে, এ কথা সে লণ্ডন পর্য্যন্ত প্রচার করিবে।

অভিযোগ।

পূর্ব্বে কোনও বিস্ময়কর কার্য্য দ্বারা বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইত। তাই অভিযোগকারীরা প্রায়ই বস্ত্রত্যাগ করিয়া গাত্র কর্দ্দমাক্ত করিয়া আইসে। প্রায়ই দেখিবে, যাত্রিদল যাইতেছে—প্রথমে এক জনের গায়ে মাদুরের জামা, তাহার পর এক জনের গলে এক খণ্ড ইষ্টকবিলম্বিত খড়ের রজ্জু; তাহার পর এক জনের মস্তকে প্রজ্জ্বলিত-অঙ্গারপূর্ণ পাত্র, তাহার পর কোনও রমণী কতকগুলি ভগ্ন মৃৎপাত্র বহিতেছে। তাহার নিকট কৃষিকার্য্যের আর মোহিনী শক্তি নাই, এই কথা জানাই-বার জন্য, এক জন লেখকের অশ্বপদতলে লাঙ্গল ফেলিয়া দিয়াছিল। একবার মকদ্দমার সুবিধা হইবে ভাবিয়া, এক জন একটি মৃত শিশুকে লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিয়াছিল যে, তাহার শত্রুদল সমাধিস্থানে তাহার পুত্রকে সমাধিস্থ করিতেও দিতেছে না। একবার প্রবল শীতে এক জন উলঙ্গ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল যে, তাহার পিতৃব্য সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তিনি তাহাকে এক প্রস্থ পুরাতন পোষাক প্রদান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে, এখন সে সাহেবের মত সজ্জিত, সুতরাং তাহার জয়ী হওয়া উচিত। সে গিয়া তাহার পিতৃব্যকে এমন গুরুতর প্রহার করিয়াছিল যে, সে আবার নালিশ করিতে আসিয়াছিল। কাশ্মীরীদের সহিত বিদ্রূপ করাও সহজ নহে!

রাজা ও প্রজা।

কাশ্মীরের রাজা হিন্দু, কিন্তু প্রজারা শতকরা নিরনব্বই জন মুসলমান। রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ। এখানে প্রজায় প্রজায় সদ্ভাব আছে; হিন্দু মুসলমানেও অসদ্ভাব নাই। গোমাংসের কথা শুনাই যায় না—গোহত্যার শাস্তি বড় কঠোর। বোধ হয়, পাঠকগণ অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশেও কোনও কোনও

কাশ্মীরেও যাহা, এখানে তাহাই ;—তাহারা নামে মুসলমান হইলেও বিশ্বাসে হিন্দু। মুসলমান ধর্ম্মের নীরসতায় সকলের মনের তৃপ্তি হয় না। তাই মুসলমানগণ হিন্দু দেব দেবীর পূজাও করিয়া থাকে। তবে বিপদকালে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুসরণ আছেই। আধিদৈবিক বিপৎকালে কাশ্মীরীর বাগাড়ম্বর থাকে না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনগরে কলেরায় প্রতিদিন পাঁচ শত লোক মরিলেও ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইত না। কারণ, এক পণ্ডিতানী পুত্রশোকে ক্রন্দন করিতেছিল; তখন প্রেতাত্মা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, 'রাত্রির পূর্ব্বেই তাহার প্রকৃত দুঃখ আসিবে।' রাত্রির পূর্ব্বেই তাহার পতি ও আর দুই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই আর কেহ কাঁদিতে সাহস করে নাই! কাশ্মীরের জ্যোতিষিগণ প্রসিদ্ধ, এবং সেখানে ভবিষ্যৎবক্তাদিগেরও সম্মান আছে।

ধান্তের কথা ছাড়িয়া ফলের কথা বলিলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, নাতিশীতোষ্ণ স্থানের সকল প্রকার ফলই সহজে কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়। কাশ্মীর ভারতবর্ষের কালিফর্ণিয়া হইতে পারে। তথায় দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অভাব নাই। কীটের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় সম্প্রতি সেখানে আমেরিকান দ্রাক্ষার চাষ হইতেছে। এখানে অতি উপাদেয় মদ্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু রেশমের চাষেই অধিক আশা। পূর্ব্বকালে ডামাস্কস্ প্রভৃতি স্থানে যে ব্যাক্‌ট্রীরিয়ান্ রেশম যাইত, তাহাও বোধ হয় এখানে জন্মিত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পীড়ায় এ ব্যবসায় বন্ধ হয়; এখন ইহা পুনরুজ্জীবিত করা হইতেছে। য়ুরোপের বণিক দেখিবেন, এখানে রেশম-চাষের সকল সুবিধাই আছে। কাশ্মীরে কালিফর্ণিয়ার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কেবল য়ুরোপীয় বণিকের প্রয়োজন। য়ুরোপীয়দিগের কার্পেটের ব্যবসায় লাভজনক হইয়াছে—আর তাহাতে হতভাগ্য শালবয়নকারীরা বাঁচিয়াছে। ফ্রান্স ও জার্ম্মেণির যুদ্ধে কাশ্মীরের জগৎবিখ্যাত শালের ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হয়। কার্পেটের কাজ না পাইলে শালওয়ালারা না খাইয়া মরিত। এখানে সহজেই কাপড়ের কল চলিতে পারে, তাহাতে কাশ্মীর ও মধ্য-এসিয়ায় লজ্জানিবারণ হইতে পারে। স্থানীয় বস্ত্র কলের বস্ত্র অপেক্ষা মজবুৎ এবং তুলনায় অল্পমূল্য। এখানে আঁশবিশিষ্ট গাছের অভাব নাই। শ্রীনগরের লোকেরা পাকা শিল্পী—যে কাজে লাগাও, সিদ্ধ হইবে। কাশ্মীরীরা স্থানীয় বস্ত্রের ন্যায় স্থানীয় লৌহও ভাল বাসে। এখানকার লৌহ নাকি ইস্পাতের মত। অনেকে বলেন, এখানে খনিজের অভাব নাই;—১৮৮২ খৃষ্টাব্দেও একটা মণির খনি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরী সহজে খনি দেখাইতে চাহিবে না; কারণ তাহার বিশ্বাস যে, তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া কাজ করান হইবে। রাজপুরুষদের কৃপায় কাশ্মীরী এখন খনির নামে জ্বলিয়া উঠে।

দ্রব্যাদি।

যাহা হউক, রাজতরঙ্গিণী-লেখকের ন্যায় লেখকও মনে করেন যে, জগতে কোথাও কাশ্মীরের তুলনা নাই।

স্বরবালা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এবার ছুটী ফুরাইবার সাত আট দিন পূর্ব্বেই শরৎ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, পড়া এখন বেশী পড়িয়াছে। পড়ার কথা শুনিয়া বাড়ীতে

খট্‌কা লাগিয়া গেল। এবারে শরৎ যে ক' দিন বাড়ীতে ছিলেন, তাহা যেন অন্যমনস্কের ন্যায় কাটাইয়াছেন। সর্ব্বদাই তিনি যেন কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেন। বাড়ী যেন তাঁহার ভাল লাগিত না। পিতা, পিতৃব্য বা অগ্রজের কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিতে পারিতেন না। মাতার সহিত তেমন প্রাণ খুলিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতেন না। সেই মাছ না খাওয়ার দিন হইতেই শরতের জননী তাঁহার স্বভাবে পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ভবতারণকে তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন, "ছেলের মনে রোগ জন্মেছে।" ভবতারণের প্রকৃতি বড়ই ধীর, তিনি কিছুতেই উদ্বেলিত হইবার লোক নহেন। গৃহিণী পুনঃপুনঃ ঐ কথা বলায় তিনি কহিলেন, "ও কিছু না, বি.এ.-টা পাশ করুক। ছেলের বে দাও, দেখ সব সেরে যাবে।"

ফলতঃ শরতের মনের ব্যারাম কতকটা এই সম্বন্ধেই বটে। বৈশাখ মাসে যে শরৎ বাড়ী আসিয়াছিলেন, অগ্রহায়ণ মাসে সে শরৎ বাড়ী আসেন নাই, ইহা নিশ্চয়। শরতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শরৎ এফ্‌.এ. পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে পড়িয়াছিলেন,—বি.এ. পড়িতে তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় যাইয়া কয়েক মাস মাত্র তিনি সুস্থ ছিলেন; তাহার পর হইতেই তাঁহার অল্প অল্প মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে রোগ উৎকট দাঁড়াইয়াছে। দেশের কিছুই আর শরৎতের ভাল লাগে না। দেশের সমস্ত আচার ব্যবহারই যেন তাঁহার কাছে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, পিতার স্নেহ, মাতার বাৎসল্য, ইহাও যেন আরও মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আর বিবাহ—সে ত জীবনের এক মহাব্রত—তাহাতে পিতা মাতার অধিকার—এ ত বর্ব্বর সমাজে ভিন্ন হইতেই পারে না। শিক্ষিত লোকে কথনই এ প্রথার প্রশ্রয় দিতে পারে না। শরতের মাথায় এইরূপ খেলিতেছিল। শরৎ স্থির করিলেন, দেশে বিবাহ হইতেই পারে না। দেশের বানরীর সহিত আমার মনের মিল হইবে কিরূপে? না আছে শিক্ষা, না জানে কথা কহিতে। লেখাপড়া জেনে মাথায় লাথি মারিলেও সহ্য হয়। নিজে দেখিব, তবে বিবাহ করিব; ইহাতে যিনি চটেন চটুন, তা ব'লে পশুর সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হতে পারি না। মা বাপ ক' দিনের জন্য? স্ত্রী জীবনের সঙ্গিনী।

শরতের এখন এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার রোগ বর্ণনা করিলাম। রোগোৎপত্তির কারণ বলিবার প্রয়োজন আছে কি? শরৎ সহর ঘুরিতেছেন; বক্তৃতা শুনিতেছেন; থিয়েটার দেখিতেছেন। কোথা হইতে

রোগ আসিল, কেমন করিয়া বলিব? এই টুকু বলিতে পারি যে, তাঁহার বাসার এক ঝি শরতের রোগ বাড়াইয়া দিতেছিল। শরৎ এক মেসে থাকেন; সেখানে দশ বারটি ছেলে। একটি মাত্র শরতের দেশের। সেটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম নগেন্দ্র। তিনি ভবতারণের পুরোহিতের ভাগিনেয়। তাহার সমস্ত ব্যয় ভবতারণ বহন করেন। নগেন্দ্রের মুখে শুনা যায়, এই ঝিকে বাসার আর কেহই দেখিতে পারিত না। শরৎ তাহাতে চটিতেন। নগেন্দ্র বড়ই মুখফোঁড়; ঝি বাজারের পয়সা হইতে বড় বেশী চুরি করিত বলিয়া নগেন্দ্রের সহ্য হইত না। তিনি তাহাকে মিষ্টি মিষ্টি দু' চারি কথা শুনাইলে অন্য সকলেই সন্তুষ্ট হইত; শরৎ চটিতেন।

ঝি একদিন বাজার থেকে পটল এনেছে। পয়সা বেশী, পটল অল্প। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "ক' পয়সার পটল ঝি?" ঝি উত্তর করিলে কহিলেন, "এই কটি পটল, তার দাম এই?"

ঝি বলিল, "বাবু পটল কি আজ কাল ছোঁওয়া যায়? সে দিন পর্য্যন্ত দু' টাকা সের বিকিয়েছে। কিছু সস্তা হয়েছে, তাই তোমাদের জন্যে এনেছি?"

ন। তা ঠিক। দেখ ঝি, কলকেতার সহর বলে তুমি পটল পেয়েছ—আমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলে এ সময়ে পটল কিন্‌তে গেলে কেবল পয়সা কটি নেয়; পটল দেয়ই না। এ সেপাই শাস্ত্রীর যায়গা,ত ই তুমি ঐ কটি পেয়েছ।

ঝি মহা চটিয়া গেল।

শরৎ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নগেন্দ্রকে কহিলেন, "এ তোমার কেমন বিদ্রূপ? ঝির সঙ্গে তোমার ও রকম কেন?"

ঝির প্রতি শরতের পক্ষপাত লইয়া মেসে সর্ব্বদাই আন্দোলন চলিত।

ঝির সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়া, সে কিসে শরৎকে বাধ্য করিয়াছে, বলিতেছি। ঝির নাম রুক্মিণী। বাড়ী মেদিনীপুর অঞ্চলে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নহে। ঝি একমাত্র কন্যা লইয়া কলিকাতায় আছে। কন্যাটি ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়ীর কাছে একটি খোলার ঘরে বাস করে। ঝি অবশ্য তপস্বিনী। সে শরৎদের বাসার বাজার-করা ঝি। যাঁহারা কলিকাতার এইরূপ মিশ্রিত বাসায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এমন ঝির পরিচয় অধিক দিবার প্রয়োজন নাই।

ঝি শরৎকে বড়ই খাতির করিত। শরৎ বড়মানুষের ছেলে, ইহা মেসে থাকিলেও বুঝা যাইত। তিনি অবিবাহিত, ঝি ইহা জানে। ঝি চেষ্টায় ছিল,

কলিকাতায় শরতের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া দিবে। অবসর সময় পাইলেই ঝি আসিয়া শরতের কাণে মন্ত্র দিত। বাবা, পরীর মত মেয়ে, পা থেকে মাথা অবধি গয়না দেবে। সোণা দিয়ে ঢেকে দেবে। লেখা পড়ায় পাশ করা মেয়ের চাইতেও ভাল। গাইতে জানে, বাজাতে জানে। এমন কি সাজ্‌বে তোমার সঙ্গে! ঝি প্রায়ই এইরূপ বক্তৃতা করিত।

কলিকাতা সম্বন্ধে শরতের অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না! ঝি মধ্যে মধ্যে দু' একটি বড়লোকের নাম করিত। শরৎ গলিয়া যাইতেন। তিনি ভাবিতেন, ঝি কলিকাতার সমস্ত ভদ্রলোককেই জানে। ফলতঃ, কলিকাতার অধিবাসী ভদ্র-লোকের গৃহ যাহা, ঝির তাহাতে গতিবিধিই ছিল না। কিরূপ স্থানে তাহার যাতায়াত ছিল, শরতের বিবাহেই প্রকাশ পাইবে। শরৎ চেষ্টা করিলে কোনও বুনিয়াদি ঘরে বিবাহ করিতে না পারিতেন, এমন নহে। কিন্তু ঝির মন্ত্রে তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রূপতৃষ্ণা তাঁহার সমধিক প্রবল হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে। বৈকাল বেলায় ভবতারণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্যামাচরণ সহসা কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সে দিন তাঁহার আসিবার কোন কথা ছিল না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই পুত্র পিতার চরণ বন্দনা করিলেন, এবং ভবতারণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কহিলেন, "বাবা, শরৎ এক চিঠি লিখেছে।"

ভবতারণ ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল আছে ত?"

শ্যামাচরণ মনে মনে ভাবিলেন, ধন্য পিতামাতা, সন্তানের মঙ্গলকামনাই তোমাদের ব্রত।

প্রকাশ্যে কহিলেন, "হাঁ আছে ভাল। তার বিবাহ কলিকাতায়। সে নিজেই ঠিক করেছে। এই মাসেই হবে। তাই আমাদের সকলকে যেতে লিখেছে। লজ্জায় বোধ হয় আপনাকে কিছু লিখ্‌তে পারে নি।"

শরতের লজ্জা থাকুক আর নাই থাকুক, লজ্জার কারণ যথেষ্ট ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বি. এ. পাশ না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। বি. এ. পাশ করিবার কিন্তু এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সত্যানুরোধে আমরা পাঠককে এ কথাও জানাইতে বাধ্য যে, শ্যামাচরণ ভ্রাতৃস্নেহের বশে চিঠির ভাব কিঞ্চিৎ গোপন করিয়াছেন। শরৎ নিজে চিঠি

লেখেন নাই। চিঠি লিখিয়াছে সেই নগেন্দ্র, সেই পুরোহিতের ভাগিনেয়। শরৎ এমন কথা বলেন নাই যে, ভবতারণ শ্যামাচরণ না গেলে তাহার বিবাহ বন্ধ থাকিবে। তবে সংবাদ দিয়াছেন মাত্র। নগেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে তিনিই বলিয়াছেন।

ভবতারণ "শরতের বে—নিজেই ঠিক করেছে" এই বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "মেয়ে কার ?"

শ্যা। প্রিয়নাথ মিত্রের। তিনি কলিকাতাতেই কর্ম্ম করেন। তাঁর ঐ একটি মাত্র কন্যা। টাকা শ' দেড়েক মাইনে পান। কলিকাতায় দু'খানি বাড়ী আছে। মেয়েটি পরিষ্কার, ডাগরও বেশ। শরৎ নিজে দেখেছে।

ভ। নিজে দেখেছে বুঝতে পাচ্ছি। কি জান বাবা, মেয়ের বাইরের রূপ বড় দেখ্‌বার জিনিস নয়। লক্ষণ অলক্ষণগুলি দেখাই দরকার। সংসারে স্ত্রী-লোকই লক্ষ্মী, স্ত্রীলোকই অলক্ষ্মী। স্ত্রীলোক ভাল হলে অতি দুঃখের সংসারেও সুখ হয়—আবার মন্দ হলে সোণার সংসারও ছারখারে যায়। বাপ খুড়ো কি অন্য বুড়োরা মেয়ে দেখ্‌বে, এ রীতি কেন ? তাদের অভিজ্ঞতা অনেক, তারা ঠিক দেখ্‌বে বলে। তোমার বে'র সময় আমি কেবল মেয়েটি দেখে আর কিছুই দেখ্‌লাম না। যা'ক—শরৎ ঠিক করে ফেলেছে—জগদীশ্বর তারে সুখী করুন্—আমাদের একবার জিজ্ঞেস কল্লে পার্‌ত।

ভবতারণ এই কথা কয়েকটি যে ভাবে কহিলেন, তাহাতে শ্যামাচরণ বাঙ্-নিষ্পত্তি করা দূরে থাকুক, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিলেন না। শরতের কার্য্যের জন্য যেন তাঁহার লজ্জা এবং ক্ষোভ হইল। তিনি অধো-বদনে রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে ভবতারণ কহিলেন, "বাড়ীর ভিতরে বলিতে গেলেই গোল হবে। প্রেমচাঁদ শুন্‌লেও অমত কর্‌বে। সে ত নাই বাড়ীতে।"

শ্যামাচরণ কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "মার, কাকা বাবুর মত হবে এখন। যাই আমি মাকে ডাকি।"

শ্যামাচরণ বাড়ীর ভিতরে যাইয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভব-তারণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এবং মনে মনে গৃহিণীর নিমিত্ত ঔষধ ঠিক করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী, শ্যামাচরণ এবং ভবতারণ একত্র হইলে, শ্যামাচরণ কোন কথা

গৃ। কোথায় ?

ভ। কলিকাতায়।

গৃ। কলিকাতায় ? কে ঠিক কল্লে ?

গৃহিণীর মুখ রক্তিম হইয়া আসিয়াছে।

ভ। সে নিজেই—

গৃহিণী পাছে কিছু বলিববার অবকাশ পান, এই ভাবিয়া ভবতারণ এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—

"সেই ঠিক করুক আর যেই করুক, এতে তোমার মত দিতেই হচ্ছে—শুভ কর্ম্ম—তুমি যদি একটি নিশ্বাস ফেল—তা'তেও ছেলের অমঙ্গল হতে পারে। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যিনি ঘরে আস্‌ছেন্, তিনি সুখী হ'ন্।"

"ছেলের অমঙ্গল" কথাটি যেন বিদ্যুদ্বেগে গৃহিণীর শিরায় শিরায় প্রবেশ করিল। সহসা তাঁহার মূর্ত্তিতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি মত দিয়েছ ?"

ভ। না দিয়ে কি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি ?

গৃ। তা আমিও দিলাম। মেয়েটি কেমন ?

ভ। মেয়ে সুন্দরী।

গৃ। ঘর কেমন ?

ভ। ভ।-ই হবে বোধ হয়। শ্যামাচরণকে কল্‌কাতায় পাঠাচ্ছি, একবার সব দেখে শুনে আস্‌বার জন্যে।

গৃ। কলিকাতায় বে করা ওর ইচ্ছে, আমি তা আগে থেকেই জানি, ওতে আর বাধা দিয়ে কি করিব ?

গৃহিণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভবতারণ শ্যামাচরণকে কহিলেন, "আচ্ছা তারা কি বলে ঠিক কল্লে বে ? এক বার ত খোঁজও কল্লে না, ছেলের দেশ কোথায়, বাড়ী ঘর দোর আছে কি না ? শরৎ যেন তোমার ভাই। মনে কর, যদি আমাদের রামা খান্‌সামার ভাই কলিকাতায় পড়ত, তারা তাকেও মেয়ে দিতে পারিত।

শ্যা। আজ কাল জাতি কুলই লেখা পড়া।

ইহার পর দিনেই শ্যামাচরণ কলিকাতায় গেলেন। সেখানে দেখিয়া আসিলেন, ভাবী ভ্রাতৃবধূর রূপ আর প্রিয়নাথের ভদ্রতা। বস্তুতঃ এতদুভয়ই যথেষ্ট ছিল। প্রিয়নাথ যে কুলীন কায়স্থ, ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ রহিল না। কন্যার

মাতুলকুল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ কোন প্রশ্নই করেন নাই। আর নিকট প্রতিবেশীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিতেন যে, প্রিয়নাথ মিত্রের স্ত্রীই অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বামীস্বরূপা। শ্যামাচরণ একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া এ সব তত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন কেমন করিয়া? তিনি বাড়ী ফিরিয়া ভবতারণকে যাহা বলিলেন, ভবতারণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। বিবাহ স্থির হইয়াছে। আমোদ উৎসবের ত্রুটি রহিল না। ভৃত্য এবং দরিদ্রকে বস্ত্রদান প্রভৃতি রীতিমত হইল। প্রেমচাঁদের মাতা শ্যামাচরণকে কখনও ঘটক, কখনও কুটুম্ব সাজাইয়া, যথেষ্ট আমোদ করিলেন। কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। সুরবালাকে আনিবার জন্য নৌকা প্রেরিত হইল। শ্যামাচরণের স্ত্রী এবং প্রেমচাঁদের জননী ব্যতীত বাড়ীর সকলেই কলিকাতায় যাইবেন, স্থির হইয়া গেল। ফলতঃ, শরতের বিবাহের পূর্ব্বে কলিকাতায় কন্যাকর্ত্তার বাড়ী অপেক্ষা বাজিৎপুরে আমোদকোলাহল অনেক অধিক হইল। ক্রমশঃ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "রাজগৃহ" একটি সুপাঠ্য সজ্ঞিপ্ত প্রবন্ধ। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে রাজগৃহ পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান। মহাভারত ও পুরাণে রাজগৃহের উল্লেখ আছে। ফাহিয়ান ও হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং মহাবংশে রাজগৃহের ইতিহাস পাওয়া যায়। * * * বহুকাল পর্য্যন্ত মগধের রাজধানী ছিল বলিয়া, ইহার নাম রাজগৃহ হইয়াছিল। * * * মহাভারতের মতে উপরিচর বসু রাজগৃহের জঙ্গল কাটিয়া যজ্ঞ করিয়া এখানে একটি নগর স্থাপন করেন। রামায়ণেও এ কথার উল্লেখ আছে। * * * তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। বসু-প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ গিরিব্রজের বহির্ভাগে উভয় দিকে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। জরাসন্ধের সিংহাসন এই রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্যসিংহের জীবিতকালে পাটলি গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়। মিথিলার ব্রিজিদিগের প্রাদুর্ভাব সঙ্কুচিত করিতে গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে পাটলি গ্রামে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদয়াশ্ব রাজগৃহ হইতে রাজধানী তুলিয়া আনিয়া পাটলিপুত্রে স্থাপিত করেন। তদবধি রাজগৃহের পতিত দশার প্রারম্ভ। ব্রড্‌লি সাহেব অনুমান করেন, বিহারের নিকটবর্ত্তী কুশাগ্রপুর রাজগৃহের পূর্ব্বে মগধের রাজধানী ছিল। কনিংহাম বলেন, কুশাগ্রপুর রাজগৃহের নামান্তরমাত্র। শাক্যসিংহের প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে বিম্বসর রাজগৃহের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাত-শত্রুও রাজগৃহে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ উদয়াশ্বকে অজাতশত্রুর পৌত্র এবং মহাবংশপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উদয় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

"বৈভার গিরির দক্ষিণ পৃষ্ঠে প্রাচীন শতপর্ণী গুহা। এইখানে বুদ্ধদেবের তিরোধানের

তিব্বতীয় গ্রন্থে ইহার নাম ন্যগ্রোধ গুহা। হুয়েন্থসাঙ বলেন, ইহা বৈভারের উত্তর পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিল। বৃষভ পাণ্ডব বা রত্নকূটের পার্শ্বে পিপ্পল গুহা অবস্থিত ছিল। জোজনশ্রুতে বুদ্ধদেব এইখানে নির্জ্জনে বসিয়া সমাধিগত হইতেন। ইহা শতপর্ণী গুহার আধ ক্রোশ পূর্ব্বে। ইহার উপর আজকাল একটি ক্ষুদ্র জৈন মন্দির দেখা যায়। বিপুলগিরির শিরোদেশে একটি বৃহৎ চৈত্যের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাভারতে ইহাকেই চৈত্যক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গৃধ্রকূট ও ঋষিগিরির উপর অনেকগুলি জৈন মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

"রাজগৃহের উষ্ণপ্রস্রবণের কথা প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সরস্বতী নদীর উভয় কূলে অবস্থিত। কতকগুলি বৈভার গিরির পূর্ব্বপাদে, অন্যগুলি বিপুল গিরির পশ্চিম পাদে অবস্থিত। বৈভারের উষ্ণপ্রস্রবণের নাম গঙ্গা-যমুনা, অনন্তঋষি, সপ্তঋষি, ব্রহ্মকুণ্ড, কাশ্যপঋষি, ব্যাসকুণ্ড ও মার্কণ্ডকুণ্ড। বিপুলগিরির উষ্ণপ্রস্রবণের নাম সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, চন্দ্রমাকুণ্ড, রামকুণ্ড ও শৃঙ্গীঋষিকুণ্ড। শৃঙ্গীঋষিকুণ্ডকে মুসলমানেরা মকদুমকুণ্ড নাম দিয়া আপনাদের করিয়া লইয়াছে। ইহার পার্শ্বে চিল্লাসা নামে এক পীরের সমাধিস্তম্ভ অবস্থিত আছে। এই পীর প্রথমে আহীরজাতীয় হিন্দু ছিলেন, তখন নাম ছিল চিলোয়া—মুসলমান হইয়া চিল্লাসা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রস্রবণের মধ্যে সপ্ত-ঋষি প্রস্রবণের জল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ। প্রাচীন রাজগৃহ বা পুরাণ রাজগিরির আড়াই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বিখ্যাত গৃধ্রকূট। এখন ইহার নাম শৈলগিরি। বর্ত্তমান রাজগৃহের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল। অজাত-শত্রুর পিতা শ্রেণীক বিম্বসর নূতন রাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই "নূতন" রাজগৃহ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

"সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্থসাঙ্গ ভারতপর্য্যটনে আগমন করেন, তিনি আসিয়া রাজগৃহ ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পান। সেই ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে এখন কোথাও কোথাও পতিত আছে। কিন্তু অধিকাংশই হিন্দু, জৈন ও মুসলমানের ধর্ম্মালয় বা দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এখন আর সে স্তূপদৃষ্টে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির নির্দ্দেশের উপায় নাই।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "ধর্ম্মানুষ্ঠান" চিন্তাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "কদম্ব-সুন্দরী" একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য কবিতা। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের 'সৌর জগতের গতি' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা', এই দুটি উল্লেখযোগ্য।

পুনর্ম্মিলন।

এত দিন পরে পুন কবিরে তোমার
মনে কি পড়িল প্রিয়ে? জাগিল পরাণে
সেই শান্ত স্নেহরণ নিশীথ শিথানে?
সেই পরাজয়ে জয় নিত্য দু'জনার?
এই মর্ত্ত্য-লোকে তাই এলে কি আবার,
বহিয়া সে সুকোমল কমল-বয়ানে
সে নম্র নয়ন-যুগ?—প্রেম-অভিমানে
সেই সে করুণ আভা আঁখির মাঝার?
এলে যদি, প্রিয়তমে, আর এ জীবনে
জীবন থাকিতে আমি দিব না ছাড়িয়া।
বন্দী তুমি এই বার; অরুণ চরণে
অক্ষয় হৃদয়-ডুরী দিলাম বাঁধিয়া।
ছিলে সংসারের পথে সংসার-সঙ্গিনী,
আজি হতে হ'লে মোর "মর্ম্মের গৃহিণী।"

৫ই শ্রাবণ; ১৩০২।

৭ম ভাগ। ১৩০৩ ; শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্., শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্.
শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়,
শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি. এ., স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়,
শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ., শ্রীমতী সরোজ-
কুমারী দেবী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী

কলিকাতা ;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০৩।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

মেডিকেল কলেজ হইতে ইংরেজিতে পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত।

৭৫।১ নং বিডন ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

চারিটী মহৌষধ।

যাঁহারা বহু দিনাবধি নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পাইতেছেন, ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া হার মানিয়াছেন, রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এবং জীবনে হতাশ ও বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন একবার মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধ কয়টী তাচ্ছীল্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

বাধক-বিজয়।

অনেকের বিশ্বাস বাধক রোগ জীবনের সঙ্গী, কোনও ক্রমেই আরোগ্য হয় না; কিন্তু আমার এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অবশ্যই তিরোহিত হইবে। বিষম বেদনা ও যন্ত্রণা এবং হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাধক-রোগ এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য তিন পুরিয়া ১।০, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

জরায়ু-কল্যাণ।

জরায়ুর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা ও বেদনা, নাড়ীর বিকৃততা, আভ্যন্তরিক প্রদাহ ইত্যাদি অসুস্থতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই ভয়ানক এবং অপরিসীম যন্ত্রণাপ্রদ। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে জরায়ু ও নাড়ী ঘটিত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ও পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ২ ঔন্স শিশির মূল্য ৫॥০ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রদর-চিন্তামণি।

এই পরম উপকারী ঔষধ সেবনে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং দাহ, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট সকল প্রকার প্রদর-রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১।০, প্যাকিং ।৵০, আনা ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ক্ষত-নিসূদন তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে খোষ, পাঁচড়া, ফোড়া, কাউর, ঘুর-ঘুরে, নালী ঘা, নারাঙ্গা, পশ্চিমে ধসা, সর্ব্বপ্রকার দূষিত ঘা এবং জন্তুর দংশনজাত ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে। ঘা যত দিনের পুরাতন ও যত পচা হউক না কেন এই তৈল ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে উপকার হইবে এবং কিছু দিনের মধ্যে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। মূল্য এক ঔন্স শিশি ১৲ টাকা, প্যাকিং ৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

গৌরাঙ্গের পাঠদ্দশা।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল এবং শিক্ষার প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও দেখিতে পাই না। তিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন, ইহা জানা যায়। বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে—

"ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ"

বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্থানান্তরে প্রকাশ পাইবে যে, তিনি "কলাপ ব্যাকরণ" পড়াইতেন। যাঁহারা সংস্কৃত পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্ত "কলাপ ব্যাকরণ" কি পদার্থ, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক। জনশ্রুতি এই যে, এক মূর্খ রাজা এক দিন স্ত্রীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতে গিয়াছিলেন। ক্রীড়াকালে পীড়া পাইয়া এক রমণী বলিয়া উঠিলেন, "রাজন্! মোদকং দেহি।" রাজা তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ লাড়ু আনাইয়া রমণীকে উপহার দিলে, তিনি হাস্যমুখী হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! এ কি?" রাজা কহিলেন, "তুমি যে এই মাত্র মোদক চাহিলে?" রমণী কহিলেন, "হায়! হায়! আমি 'মোদকং দেহি' বলিয়া গায়ে জল দিতে বারণ করিয়াছিলাম।" রাজা পত্নীর সম্মুখে ব্যাকরণমূর্খ প্রতিপন্ন হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সভাপণ্ডিত শর্ব্ববর্ম্মা আচার্য্যকে বলিলেন, আপনি আমার জন্ত সরল সংক্ষিপ্ত স্বল্পায়াস-সাধ্য একখানি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিউন। শর্ব্ববর্ম্মা মহা ভাবিত হইলেন। ব্যাকরণের গোড়াতেই পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে, সরল বর্ণবিন্যাসের স্থলে এক বিকটাকার "হযবরট্‌লণ্" ব্যাপার আবির্ভূত হইয়াছে। "হযবরল" শুনিয়াই সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি চমকিয়া যায়। রাজাকে কিরূপে সেই "হযবরল" বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবেন, আচার্য্য তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। নিজের বুদ্ধিতে কোনও প্রতীকার না পাইয়া অবশেষে অভীষ্ট দেবতা স্কন্দকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেবসেনানী অবশ্য কিছু উচ্চদরের দেবতা—সাধকের সম্মুখে সশরীরে হাজির হওয়া হয় ত কিছু লাঘব বলিয়া মনে করেন—অথবা পাণিনি মহোদয়ের গাম্ভীর্য্য তাঁহারও বুদ্ধির অতীত—যে কারণেই হউক, ব্যাকুল আচার্য্য তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার ধ্যাননিমীলিত নেত্র দেখিতে পাইল যে, স্কন্দবাহন ময়ূর "সি-সি-সি" শব্দ করিয়া উড়িয়া

যাইতেছে। তখন তিনি "পাইয়াছি!" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ঐ শব্দকেই আপন গ্রন্থের আত্মক্ষরস্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ।"

এই সূত্র রচনা করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণপাঠের জন্য "হযবরট্লণ্" ইত্যাদি বিকৃত বর্ণবিন্যাস অনাবশ্যক। ছেলেরা পাঠশালে গুরুমহাশয়ের নিকট "অ আ ই ঈ" যে পড়িয়া আসিয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। কলাপী অর্থাৎ ময়ূরের কলাপ বা লেজের শব্দ হইতে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই ইহার নাম কলাপ ব্যাকরণ। ইহার আর এক নাম কাতন্ত্র, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গ্রন্থ। কা=ঈষৎ বা ক্ষুদ্র+তন্ত্র=গ্রন্থ। যাহারা দুর্ব্বোধ জটিল বহুবিস্তীর্ণ পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণগ্রন্থ না পড়িয়া অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকরণশাস্ত্র মোটামুটি শিখিতে চায়, তাহাদের জন্য এই ব্যাকরণ রচিত। যত দূর জানা যায়, তাহাতে গৌরাঙ্গ গুরুর টোলে এই ব্যাকরণমাত্র পড়িয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত হইয়া তাহাই পড়াইতেন। মুসলমান রাজত্বকালে ক্রমশঃই প্রাচীন শাস্ত্র সকলের অনুশীলন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। বেদপাঠ উঠিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্ত্তে নবীন সংগ্রহগ্রন্থ সকলের অধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদ্রূপ, প্রাচীন ব্যাকরণ সকলের পরিবর্ত্তে সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ সকল রচিত হইয়াছিল। আর লোকের তেমন সময়, তেমন যত্ন, তেমন অধ্যবসায় ছিল না। কাজেই বঙ্গদেশে ও নবদ্বীপে পাণিনির জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। স্থানে স্থানে দুরূহ ও বিস্তীর্ণ প্রাচীন ব্যাকরণ সকলের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট ব্যাকরণ প্রচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যায়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,—হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ,—পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে এবং যশোহর ও উড়িষ্যার কতক স্থানে কলাপ ব্যাকরণেরই চর্চ্চা সমধিক। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, গৌরাঙ্গের সময়ের অবস্থাও এইরূপ ছিল। নবদ্বীপের প্রচলিত ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ অপেক্ষা কলাপ ব্যাকরণ সরল। এ দিকে গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং গুরু গঙ্গাদাস, উভয়েই শ্রীহট্টের অধিবাসী। সুতরাং তাঁহারা কলাপেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু, সেকালের পণ্ডিতগণের বিদ্যা এমনি সঙ্কীর্ণ ছিল যে, যে মুগ্ধবোধ জানে, সে কলাপ জানে না, যে কলাপ জানে, সে মুগ্ধবোধ জানে না। যাঁহার যাহা পড়া আছে, তিনি তাহাই পড়াই-

তেন। নবদ্বীপেও গঙ্গাদাস যে কলাপ পড়াইতেন, তাহাতে কলাপ পর্য্যন্তই তাঁহার বিদ্যা, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষ দেখা যায় যে, তাঁহার টোলে বিষয়ী লোকের ছেলেরা এবং ব্যবসায়ী বৈদ্যের ছেলেরা ব্যাকরণ শিখিত। ইহারা কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাকরণ পড়িয়াই কেহ বিষয়কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে—কেহ বা বৈদ্যশাস্ত্রপাঠে ব্যাপৃত হইবে, এইরূপ কামনা করিত। অতএব বহুবিস্তৃত ব্যাকরণ না পড়িয়া তাহারা ক্ষুদ্র কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়াই গঙ্গাদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিত।

টীকাকারদের দৌরাত্ম্যে এই সরল শিশুশিক্ষার উপযোগী ব্যাকরণও বিপুল কায় এবং নানাবিধ ন্যায়ের বিচারে স্ফীতকলেবর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, দুর্গসিংহ নামে এক ব্যক্তি একটি বৃত্তি রচনা করিয়া যোজনা করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর টীকার পাঁজী ইত্যাদি নামে অশেষ টিপ্পনী দেখা দিয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত; শব্দখণ্ড ও অনুমানখণ্ড। শব্দখণ্ডের সহিত ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহাতে কলাপের ন্যায়রসিক টীকাকার মহাশয়গণ টীকাতে অনেক স্থলে "ধান ভান্‌তে শীবের গীতের" ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ, পাঠের সময় কেহ বা টীকা ছাড়িয়াও পড়িয়া যান। আর সটীক পড়িলে এই টীকা লইয়া অনেক ফাঁকি চলে, এবং ফাঁকির খণ্ডনস্থাপন ও স্থাপনখণ্ডনে, অধ্যাপক ও শিষ্যেরা আপন আপন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেন। শুনা যায়, গৌরাঙ্গ ফাঁকিতে বড় নিপুণ হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের পঠদ্দশার যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, নিমাই এক জন শ্রুতিধর ছাত্র ছিলেন।

"যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন। সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥"

এমন কি, গুরুকৃত ব্যাখ্যারও তিনি খণ্ডন করিতেন। আবার গুরু না পারিলে, নিজেই তাহার স্থাপন করিতেন। তাঁহার দাম্ভিকতার ইয়ত্তা ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকেও তিনি সর্ব্বদা চালনা করিতেন, এবং দম্ভের সহিত আপনার নিকট পাঠ চাহিতে বলিতেন।

পাঠদ্দশাতেও নিমাইএর চপল ও উদ্ধত স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রতিদিন পাঠান্তে মধ্যাহ্নে সমবয়স্ক পড়ুয়াদের সহিত তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন, এবং মারামারি গালাগালি ও জলফেলাফেলি করিতেন। তাঁহাদের হুড়াহুড়িতে গঙ্গার ঘাটের জল কাদা ও বালিময় হইয়া যাইত। স্ত্রীলোকগণ জল তুলিতে এবং ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা স্নানাহ্নিক করিতে অসমর্থ হইত। এক

ঘাটেই যে এই কাণ্ড হইত, তাহা নহে; নিমাই ঘাটে ঘাটে এইরূপ কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেন। স্নানের সময়েও ফাঁকি লইয়া কলহ হইত। সন্তরণেও তিনি বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি, সাঁতার দিয়া ভাগীরথীর এ পার হইতে ও পারে যাইতে পারিতেন।

ফলতঃ দুরন্ত হইলেও নিমাই পাঠে অমনোযোগী ছিলেন না। বাটীতে তিনি সর্ব্বদা পাঠ চাহিতেন, এবং কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইলে, নিজে টিপ্পনী লিখিতে ব্যাপৃত হইতেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু বালকের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। তাহার আকৃতি যেমন মধুর, বুদ্ধি তেমনই তীক্ষ্ণ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার আচরণ ও ব্যবহার বড় বিচিত্র দেখা যাইত।

এক এক সময়ে এক একটা বান ধরিয়া নিমাই উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তখন মিশ্রের মনে ভয় হইত, পুত্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া কোনও ডাকিনী বা দানব তাহার উপর ভর করিয়াছে। বৃন্দাবনদাস লেখেন :—

"এই মত মিশ্রচন্দ্র দেখিয়া পুত্ররে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আহ্লাদসাগরে॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গের লাবণ্য অনুপাম।
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে॥
ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে।
ভয় বলে পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ স্থানে॥
মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সভার।
পুত্র প্রতি শুভ দৃষ্টি করিবে আমার॥
যে তোমার চরণ কখন স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণহীন হয়ে পাপস্থান।
তথায় ডাকিনী ভূত প্রেত অধিষ্ঠান॥"

* * * *

এই স্থলেই চৈতন্যের ভাবী উন্মাদের লক্ষণ সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতেছে। বৃন্দাবন দাস ততটা খুলিয়া লেখেন নাই, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের আশঙ্কার কারণ উত্তরোত্তর ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। পিতার জীবদ্দশাতেই গৌরাঙ্গ সময়ে সময়ে যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তখন তাঁহাকে সহজ মনুষ্য বলিয়া মনে হইত না। ফলতঃ, রোগের অঙ্কুরমাত্র তখন দেখা দিয়াছিল, এবং তদ্দর্শনে জগন্নাথের মনে ডাকিনী বা দানবে পুত্রের উপর বা বল করে, এইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।

এক্ষণেও আমাদের মধ্যে দানব ও ডাকিনীতে বিশ্বাস যে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নয়। এখনও অনেক লোককে ভূতে পায়, কিন্তু সে সময় ও এ সময়ের প্রভেদ এই যে, এক্ষণকার শিক্ষিত লোকের মধ্যে তাদৃশ বিশ্বাস বিরল; সে সময় শিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা গণ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও তাদৃশ

বিশ্বাস সমধিক বদ্ধমূল ছিল। এমন কি, নিমাইয়ের পিতারও তাদৃশ বিশ্বাস প্রবল ছিল। এক্ষণকার শিক্ষিত সমাজের ন্যায় তখনকার শিক্ষিত সমাজেও মনুষ্যের দেহে দেবতার আবির্ভাব বা ভূতের প্রকোপ হওয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। ভূত প্রেতের প্রকোপ হইলে মনুষ্য গোঁ গোঁ করে, বা অজ্ঞান হয়, বা প্রলাপ বকে, বা লোককে মারিতে ধরিতে যায়। দেবতার আবির্ভাব হইলেও গোঁ গোঁ করে, অজ্ঞান হয়, প্রলাপ বকে; তবে সে প্রলাপ দৈববাণী বলিয়া সমাদৃত হয়। ইহাকে আজিও ভাষা কথায় "দেবতার ভার" হওয়া বলে। নিমাই মাঝে মাঝে ক্রোধে অধীর হইয়া জ্ঞানশূন্য হইতেন, এবং নানাপ্রকার উৎপাত করিতেন। তখন তাঁহাকে ডাকিনী পাইয়াছে বলিয়া, তাঁহার পিতার ভয় হইত। পরে যখন তিনি উন্মত্ত অবস্থায় আপনাকে "রাধা" বা "কৃষ্ণ" বা "বরাহ" বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেন, তখন লোকে তাঁহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করিত।

বৃন্দাবন দাস কেবল সংক্ষেপে মিশ্রের আশঙ্কার উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নিমাইএর কিরূপ ব্যবহারে তাঁহার ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা লেখেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর পর এক দিন নিমাই মাতার সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবন দাস তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে পড়িবার সময়েই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইল, শচীদেবী বিধবা হইলেন, এবং পুত্রের ভরণপোষণের ভার তাঁহার উপর পড়িল। জগন্নাথের দারিদ্র্যের কথা যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যে কিছু সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিরূপে শচী সংসার চালাইতে লাগিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। ঐ সময়ে নিমাইএর বয়স কত, তাহাও প্রকাশ নাই। তবে তিনি ব্যাকরণের ফাঁকি করিতে পারেন, এবং স্থাপনের খণ্ডন ও খণ্ডনের স্থাপন করিতে পারেন; অতএব তখন তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, বুঝা যায়। তবে তখনও তাঁহার পাঠাবস্থার শেষ হয় নাই। বিধবা হইয়াও শচী পুত্রমুখ দেখিয়া বুক বাঁধিলেন, এবং স্বামিশোক ভুলিয়া পুত্রের হিতচিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

"পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্রসেবা বই আর কার্য্য নাই॥
দণ্ডেক না দেখি যদি আই গৌরচন্দ্র॥
মূর্চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ।
হেন মতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে॥
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভব সুখে।
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ॥
আজ্ঞা যেন মহেশ্বরের বিলাস।

কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর।
ঘর দ্বার সকল ভাঙ্গেন সেই ক্ষণে॥
আপনার অপচার তাহা নাহি জানে।
তথাপিও শচী যে চাহেন সেই ক্ষণে॥
নানা যত্ন দেন পুত্রস্নেহের কারণে।
এক দিন প্রভু যাইলেন গঙ্গাস্থানে॥
তৈল আমলকী চাহিলেন মায়ের স্থানে।
দিব্য মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে॥
গঙ্গাস্নান করিতেছে বিষ্ণু পূজিবারে।
জননী কহেন বাপ শুন মন দিয়া॥
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনি গিয়া।
আনি গিয়া সেই মাত্র শুনিল বচন॥
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন।
এক্ষণে যাইবা তুমি মালা আনিবারে॥
এত বলি প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস॥
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ।
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে॥
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে।
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম॥
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান।
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ।
তণ্ডুল কাপাস ধান্য লোন বড়ি মুগ্ধ॥
যতেক আছিল শিখা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষ গৃহ প্রতি হইলা ক্রোধাবেশ॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন জন নাহি যে নিষেধ কেহ করে॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষ বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে বাড়ি মারে দোহাতিয়া॥
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষ পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥
গৃহের একান্তে আই সশঙ্কিত হইয়া।
মহাভয়ে আছিলাম হেন লুকাইয়া॥
ধর্ম্মসংস্থাপন প্রভু ধর্ম্ম সনাতন।
জননীরে হস্ত নাই তোলেন কখন॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষ আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিল ক্রোধ মনে॥
শ্রীকনক অঙ্গ হইল বালুকাবেষ্টিত।
কত ক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া॥
স্থির হইয়া রহিলেক শয়ন করিয়া।
* * প্রভু করেন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥
কতক্ষণে শচী দেবী মালা আনাইয়া।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিল মাতা গিয়া॥
উঠ উঠ বাবা মোর হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় নিয়া বিষ্ণু পূজা কর॥"

ইত্যাদি

বিবেচনা হয়, পিতা বর্ত্তমানেও নিমাইএর এইরূপ অবস্থা মধ্যে মধ্যে ঘটিত; এবং তদ্দর্শনেই দানব বা ডাকিনীতে পুত্রের উপর বল করিয়াছে বলিয়া পিতা মাতা ভয় পাইতেন।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত নিমাইএর উন্মাদ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। উন্মাদ অবস্থা এরূপ বিচিত্র যে, পণ্ডিতেরা অদ্যাপি ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। অনেক মনুষ্য কেবল সময়ে সময়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়, অন্য সময়ে সহজপ্রকৃতিস্থ থাকে। অনেকে বা বিষয়বিশেষে উন্মাদের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রবল মনের আবেগ উপস্থিত হইলে, সহজ মনুষ্যকেও উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। যাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি সকল অতীব তেজস্বিনী, অথবা প্রবৃত্তিবিশেষ অতীব প্রবল, তাহাদিগকে ক্রতং আবেগময়ী

প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখা যায়। নিমাইএর অকারণ অথবা সামান্য কারণে ক্রোধ জন্মিলেও কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিত, এবং তিনি কিরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইতেন, তাহা উপরে দেখা গেল। পরে অন্যান্য মনোবৃত্তি সকল তাঁহার বিবেককে কিরূপ অভিভূত করিত, তাহা যথাক্রমে দৃষ্ট হইবে।

পিতার মৃত্যুর পরেও কিছু কাল গৌরাঙ্গ গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। একখানা সরল ব্যাকরণ পড়িতেও সে সময়ে অনেক সময় আবশ্যক হইত। অধ্যাপক অনেক সময়েই আপন জীবিকার অর্জ্জনে ব্যস্ত থাকিতেন। তাহাতে অধিকাংশ সময়ই অনধ্যায়ে যাইত। অল্পপাঠী ছাত্রদিগকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্রদের মুখাপেক্ষী হইতে হইত। ইহাতে পাঠ বড় অল্পপরিমাণে অগ্রসর হইত, এবং অনর্থক সময় নষ্ট হইত। বিশেষতঃ ব্যাকরণপাঠের প্রণালীও যেরূপ ছিল, তাহাতে পাঁজী টীকা আদি সহিত পড়িলে আরও সময়ের আবশ্যক হইত। ব্যাকরণী পণ্ডিতেরা অহঙ্কারের সহিত বলিতেন যে, কুশাগ্রবুদ্ধি লোকও যাবজ্জীবন অনুশীলন করিয়া শব্দাম্বুধির পারগামী হইতে পারে না। ইহাতে তাঁহাদের শাস্ত্রের মহিমা যথেষ্ট প্রকাশ পায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু অস্মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের বিবেচনায় যাবজ্জীন কেবল ব্যাকরণ পড়িয়া কাটাইলে জীবনটা যেন জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা শ্লোক, দুই চারিটা অলঙ্কারশাস্ত্রের রসিকতা, বা ন্যায়শাস্ত্রের গত অভ্যাস করিলেও যে সময়ের সমুচিত মূল্য পাওয়া গেল, তাহাও অঙ্গীকার করা যায় না। নিমাই এইরূপে ব্যাকরণসূত্রের উদাহরণস্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্লোক যে না শিখিয়াছিলেন, অথবা অলঙ্কার বা ন্যায়ের দুই চারিটা কথা যে না শিখিয়াছিলেন, তাহা নয়। তবে গঙ্গাদাসের টোলে তাঁহার অধিকাংশ সময় যে কেবল ব্যাকরণের অনুশীলনেই যাপিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট। তিনি বেদশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র ও তৎকালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে কিঞ্চিন্মাত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন নাই। উত্তরকালে তিনি তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন,—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাষাতে কাব্য রচনা করিয়া যান। তাঁহাদিগকে বুঝিতে আর টোলে যাইতে হয় না। জয়দেবের সংস্কৃত অতি সরল, এবং তিনিও আধুনিক গ্রন্থকার। প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের প্রতি গৌরাঙ্গের অনুরাগ বা

নবদ্বীপে মুকুন্দসঞ্জয় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে এক বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। এই স্থানেই গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাকরণ পড়াইতেন, এবং ইহাই চৈতন্তের বিস্তাবিলাসের স্থান বলিয়া লিখিত আছে। মুকুন্দের পুরুষোত্তম নামে একটি সন্তান ছিল; সেও এই টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত। মুকুন্দ দত্ত এবং মুরারি গুপ্ত নামে দুই জন বৈদ্যও এই টোলে ব্যাকরণ পড়িত। এই দুই জনই নিমাই অপেক্ষা উচ্চপাঠী ছিল। নিমাই কিছু দিন এই টোলে অধ্যয়ন করিয়া প্রবীণ হইলে, সদর্পে অন্যান্য ছাত্রগণকে আপনার নিকট পাঠ চাহিতে বলিতেন। টোলে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা পাঠ চাহিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই এরূপ অহঙ্কারী এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সুবুদ্ধি ছিলেন যে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকেও আপনার নিকট পাঠ চাহিতে বলিতেন, এবং যে তাঁহার কথা না শুনিত, তাহাকে গালাগালি দিতেন ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ষোড়শ বৎসর। তিনি সভামধ্যে যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র বন্ধন করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিয়া প্রধান ছাত্রের ন্যায় অহঙ্কারের সহিত অন্যান্য ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেন,—

"——ইথে আছে কোন বড় জন। আপনে চিন্তায় পুঁথি প্রবোধ আপন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন। অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়॥
সন্ধিকার্য্য না জানিয়া কোন কোন জন॥ যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়।"

প্রথম প্রথম নিমাইয়ের ঈদৃশ অহঙ্কারবাক্য মুরারি গুপ্তের অসহ্য হইত। তিনি নিমাইয়ের নিকট পাঠচিন্তা করিতেন না। তাহাতে উভয়ে মধ্যে মধ্যে বড় মিষ্ট বাদানুবাদ হইত।

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি॥
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দৃঢ়॥ মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। ঘরে যাও তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া॥"

এইরূপ বিদ্রূপ করিলে মুরারি ও গৌরাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের বাদানুবাদ আরম্ভ হইত। অবশেষে নিমাইয়ের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে মুরারি চমৎকৃত হইলেন। সহজে কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেন না; তাহাতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং উভয়েই উভয়কে সম্মান করিয়া চলিতেন। ফলতঃ, নিমাইয়ের অহঙ্কারের পরিসীমা ছিল না। ছাত্রগণের কথা দূরে থাকুক, তিনি অধ্যাপকদিগকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করিতেন না। মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া তিনি যখন খণ্ডনস্থাপন ও স্থাপনখণ্ডনে ব্যাপৃত হইতেন—

"তখন। কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥ হেন জন দেখি ফাঁকি ঢুযুক আমার।
প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য নাহিক যাহার। তবে জানি ভট্টমিশ্র পদবী তাহার॥"

এইরূপে গঙ্গাদাসের টোলের প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে, গৌরাঙ্গ ক্রমশঃ উক্ত টোলের ব্যাকরণের অধ্যাপক হইয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গাদাস অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন, নিমাই তদীয় আসন পরিগ্রহ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রতিনিধি অধ্যাপকস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ, সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত গঙ্গাদাসের প্রতিনিধির স্বরূপই তিনি তদীয় টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন ও পড়াইতেন। তিনি নিজে কোনও স্বাধীন টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তৎকালের নিয়মানুসারে তিনি যুগপৎ ছাত্র ও শিক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মীরজাফর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ!"

যে সকল অতি বিচক্ষণ হিন্দু মুসলমান সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য কলিকাতার ইংরাজদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া গোপনে গোপনে মোগল-সিংহাসনের ভিত্তিমূল নির্ম্মূল করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই-রূপ ধারণা ছিল যে, সিরাজদ্দৌলাই সকল অনর্থের মূল;— যে কোনও উপায়ে হউক, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলেই আবার রামরাজ্যের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং তাঁহারা কেহই আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিলেন না; প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হইয়াও নানা সঙ্কেতে যে সকল সদুপদেশ বিতরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও কর্ণপাত করিলেন না! উদ্দেশ্যসাধনের তীব্র তাড়নায় জ্ঞানান্ধ হইয়া মীরজাফরকে নবাব নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মীরজাফরের বহুবৎসরের গুপ্ত পাপসংকল্প জাগরিত হইয়া উঠিল। একদিন যে সিংহাসনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চাহিয়া প্রবীণ নরপতি নবাব আলিবর্দ্দীর ভয়ে কোন রূপে

বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকেই সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন, মীরজাফরের সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি তখন বালির বাঁধের মত প্রবল তরঙ্গসংঘর্ষে কোথায় ভাসিয়া গেল! কথা স্থির হইবামাত্র সকলকেই নিতান্ত তাড়াতাড়ি কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হইতে হইল; ধীরভাবে সকল কথা বিচার করিবার জন্য কেহই কালক্ষয় করিতে সম্মত হইলেন না! সুতরাং সুচতুর ইংরাজ সওদাগর যাহা চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া তাহাতেই "তথাস্তু" বলিয়া সন্ধিপত্র সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।* একদিন এই সন্ধিপত্র কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, একদিন এই সন্ধিপত্রের প্রত্যেক কথা অক্ষরে অক্ষরে দেশের লোকের শাসনক্ষমতা মন্দীভূত করিবে, একদিন বিজয়োন্মত্ত হৃদয়ে বৃটিশ বণিক বীরপ্রতাপে বাহুবিস্তার করিয়া মোগলের গৌরব-পতাকা উৎখাত করিয়া ফেলিবে;—তাঁহারা কেহই হয় ত এত দূর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বোধ হয়, সকলেই ভাবিয়াছিলেন, যাহা হইবার হইয়া যাউক, তাহার পর আমরা ত সকলেই রহিলাম,—তখন দেখিয়া লইব!

যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, কিন্তু দেখিয়া লইবার আর অবসর ঘটিল না। পলাশির যুদ্ধাবসানে জগৎশেঠের মন্ত্রভবনে ইংরাজসেনাপতি কর্ণেল-ক্লাইব যখন বীরোচিত দৃঢ়তার সহিত সন্ধিপত্রের অঙ্গীকারপালনের জন্য সকলকেই আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন সেই গুপ্ত সন্ধিপত্রের প্রকাশ্য ফলাফল সকলের চক্ষেই দিবালোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিল!

সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই সন্ধিসূত্রে কেবল যে সিরাজদ্দৌলারই সর্ব্বনাশ হইল, তাহা নহে; ইহার ছত্রে ছত্রে যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার প্রবল পীড়নে সমগ্র মুসলমান-শক্তি ধূলিপরিণত হইবার সূত্রপাত হইল!

মুসলমান সেনা বাহুবলে সিন্ধু সন্তরণ করিয়া তরবারি হস্তে ভারতবর্ষের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া নিরুদ্বেগে বহুশত বৎসর এ দেশের অন্নজলে আত্মোদর পরিপোষণ করিতে করিতে অবশেষে সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসী বলিয়াই জগতের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আজ সকলেই চাহিয়া দেখিলেন যে, কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে, লেখনীসাহায্যে, বিদেশের নগণ্য বণিক-

* The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything; the Nawab-expectant could refuse nothing. There was not even a shadow of deliberation; for there was no time to

সমিতি সেই সুখের রাজসিংহাসন পণ্যবীথিকার ক্ষণভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার অধিকার লাভ করিল!

যে সন্ধিসূত্রে মুসলমানের সর্ব্বনাশ, ইংরাজের স্বর্গবাস, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপঃ—

আড্‌মিরাল ও কর্ণেল ক্লাইব, গবর্ণর ড্রেক এবং
ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের সহিত সন্ধিপত্র। *

সম্রাট
আলমগীরের ভৃত্য
মীর
মহম্মদ জাফর খাঁ
বাহাদুর।

১। নবাব সিরাজদ্দৌলা মন্‌সুরোল্‌ মোল্‌ক্‌শাহ কুলীখাঁ বাহাদুর হায়বৎজঙ্গের সহিত শান্তির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আমিও তাহা পালন করিতে স্বীকার করিলাম।

২। কি ভারতবর্ষের লোক, কি ইউরোপের লোক, যাহারা ইংরাজ-শত্রু, তাহাদিগকেই আমরা শত্রু বলিয়া গণ্য করিব।

৩। সমুদায় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গদেশের মধ্যে ফরাসিদিগের যে সকল কুঠি ও সম্পত্তি আছে, এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও যাহা থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইবে;—এই তিন প্রদেশের মধ্যে আমি কদাচ ফরাসিদিগকে বাস করিতে দিব না।

৪। নবাব কলিকাতা অধিকার ও নগরলুণ্ঠন করায় ইংরাজ কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে, এবং সেনাপোষণ করিতে গিয়া তাঁহাদের যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবার জন্য আমি এক কোটী টাকা প্রদান করিব।

৫। কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসীদিগের সম্পত্তিলুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলাম।

৬। কলিকাতাস্থ হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য লোকের যে সকল ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে।

৭। কলিকাতাস্থ আরমানী অধিবাসীদিগের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য সাত লক্ষ টাকা প্রদান করিব। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি কলিকাতাবাসিগণ কে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন, আড্‌মিরাল ও কর্ণেল ক্লাইব এবং কৌন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

---

* A treaty was then produced, which Meer Jaffier swore on the Koran, to observe, and added, in his own hand-writing, the words :—"I swear

৮। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ খাতের মধ্যে জমিদারদিগের অধিকারে যে সকল স্থান আছে, এবং ঐ খাতের বাহিরে ৬০০ গজ পর্য্যন্ত যত স্থান থাকে, তাহা ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব।

৯। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্‌পি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ইংরাজ কোম্পানীর জমীদারীভুক্ত হইবে, এবং ঐ সকল স্থানের রাজকর্ম্মচারিগণ ইংরাজের শাসনাধীন হইবেন। অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায় ইংরাজেরাও রাজকর প্রদান করিবেন।

১০। আমি যখনই ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিব, তখনই তাহার সমস্ত ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে।

১১। হুগলীর দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে কোন স্থানেই আমি নূতন কোন রাজদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

১২। তিন সুবার রাজকার্য্যে আমি প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র উপরি-উক্ত সমুদায় টাকা যথাধর্ম্ম সম্প্রদান করিব।

ইতি তারিখ আলমগীর রাজত্বের ৪র্থ বৎসর ১৫ রমজান ইংরাজী ১৭৫৭ হিজরী ১১৭০।

পুনশ্চ।

১৩। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উপরি-উক্ত সমুদায় অঙ্গীকৃত বিষয় বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিতে এবং শপথ পূর্ব্বক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করায়, মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরাও ঈশ্বর ও ধর্ম্মপুস্তক লইয়া শপথ করিতেছি যে, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা রাজ্য জয় করিবার জন্য আমাদের সমুদায় সেনাবল তাঁহাকে সহায়তা করিবে; এবং যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই আমরা যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতে ক্রটি করিব না; কিন্তু মীরজাফর খাঁ নবাব হইবামাত্র এই সকল নিয়মাবলী যথাযথ পালন করিতে বাধ্য হইবেন ইতি।

ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন যে, এই সন্ধিসূত্রে সত্য সত্যই তাঁহাদের সম্মুখে অনন্তরত্নসমন্বিত কুবেরভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। তাই তাঁহারা রূপোন্মাদবিমুগ্ধচিত্ত পতঙ্গবৎ সমরানলশিখায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে সেই কুবেরভাণ্ডার যখন সত্য সত্যই উন্মুক্ত হইল, তখন তাহার যৎসামান্য ধনরত্ন গণনা করিয়া ইংরাজ বণিক নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন! ধনরক্ষকদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, মীরজাফরের উপর কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া, পুনঃপুনঃ "দেহি দেহি" রবে

সকলকে প্রকম্পিত করিয়াও যখন অঙ্গীকৃত অর্থ সংগৃহীত হইল না, তখন ইংরাজ সেনাপতি বুঝিলেন যে, অর্থলোভে ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কলঙ্ক উপার্জ্জন করাই সার হইল! * তিনি তখন সুপ্তোত্থিত বনশার্দ্দূলের ন্যায় ক্রোধকম্পিতকলেবরে মীরজাফরের দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন;—হতভাগ্য মীরজাফর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কৃতাপরাধ বর্ব্বরের ন্যায় ধরাতলে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিলেন!

আর সে দিন নাই! যাঁহারা নবাব আলীবর্দ্দীর সম্মুখে সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবেশন করিতেন, যাঁহারা অপরিণতবয়স্ক সিরাজ-দ্দৌলার নিকটেও উমাচরণ বা জগৎ শেঠের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া ভয়ে ভয়ে পদসঞ্চালন করিতেন, যাঁহারা সেদিনও মুরশিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে একাকী গমনাগমন করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেন,—আজ বিধাতার কৃপায় তাঁহারাই রাজমুকুট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ করিয়া, সশস্ত্র সগর্ব্ব সঙ্গীন-সহায় শত শত ইংরাজ সেনার অধিনায়ক হইয়া, রাজপ্রাসাদে সগৌরবে উপবেশন করিয়াছেন! মীরজাফরের কি সাধ্য যে, তাঁহাদের মুখের উপর সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন? ইচ্ছা থাকিলেও সেরূপ কার্য্যে কে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিবে? সুতরাং সকলে মিলিয়া করুণ ক্রন্দনে ক্লাইবের মন-স্তুষ্টিসম্পাদনের জন্য বিবিধ বিধানে স্তুতিস্তবন আরম্ভ করিলেন!

ইতিহাসলেখক জেম্‌স্ মিল্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষের অধিপতি-দিগকে সর্ব্বদাই যে সকল বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, রাজকোষের অর্থশূন্য-তাই তাহার মূল কারণ। এই দারিদ্র্যদোষ মীরজাফরের নিকট পাষাণ হই-তেও গুরুভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী যেরূপ দানশীল-তার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, এবং বর্গীর হাঙ্গামা নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রায় প্রতিবর্ষেই যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইত, তাহাতে তিনি সিরাজদ্দৌলার জন্য বিশেষ কোনও অর্থসংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সিরাজদ্দৌলাও রাজকোষের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।" এরূপ ক্ষেত্রে মীরজাফর ইংরাজদিগকে এত অধিক টাকা

* In manufacturing the terms of the confederacy, the grand concern of the English appeared to be money.—Mill's History of British India, vol. III. 185.

প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন কেন? কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তৎকালে মীরজাফর মনে করিয়াছিলেন যে, যাহারা নবাবের পদাশ্রিত বণিক হইয়া কেবলমাত্র উৎকোচলোভে রাজবিদ্রোহিদলে যোগদান করিতে সম্মত হইতেছে, যদি বিদ্রোহিদলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তখন তাহাদিগকে যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইংরাজেরা যে সময় পাইয়া কড়ায় গণ্ডায় সন্ধিপত্রে অঙ্গীকৃত অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিবার জন্য নিতান্ত নির্ম্মম হৃদয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, হয় ত এতটা মীরজাফর খাঁ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখন কিন্তু সকল কথাই বিশ্বাস করিতে হইল! তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ সেনাপতিদিগকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া সন্ধিপত্রের কথা চাপা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; যখন তাহাতেও কোনও ফল ফলিল না, তখন মীরজাফর গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন।

অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, আর কেন? এখন ত কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন এই জন কতক রাজবিদ্রোহী অর্থলোলুপ ইংরাজ ভিখারীকে বাহুবলে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কি? কিন্তু মীরজাফরের কর্ম্মদোষে সে পথও অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রাজধানীতে শুভাগমন করিবার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত দেখিয়া অনেক গণ্য মান্য নাগরিক সসৈন্যে ধনরত্ন লইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন; যাঁহারা তখনও রাজধানীতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মীরজাফরকে চিনিতেন; সুতরাং সকলেই ইংরাজের পক্ষাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন; বহুকাল বেতন না পাইয়া, নবাব-সেনা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল লুণ্ঠনলোভে তাহারা কোনরূপে এতদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এখন শুভদিন সমুপস্থিত, তথাপি তাহারা বেতন পাইল না বলিয়া, সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহিসেনাদলবেষ্টিত ইংরাজসঙ্গীণসুরক্ষিত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর কাহার নিকট উৎসাহ পাইয়া আশ্রয়দাতা ইংরাজবণিককে অসন্তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইবেন? মনের ভাব যাহাই হউক, ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া মীরজাফরকে নীরবে সকল গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল, এবং অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে শান্ত করিবার আয়োজন করিতে হইল।

কর্ণেল ক্লাইব বৃটিশ-বণিকের সৌভাগ্য-কেতু। প্রতিভায়, কার্য্যদক্ষতায়, অসমসাহসে তিনি এ দেশের ইতিহাসে আত্মগৌরব চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়া-

১৭৬০০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ২৩০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক স্বর্ণপাত, চারি সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার এবং দুটিমাত্র ছোট ছোট সিন্দুকপূর্ণ মণিমুক্তা ভিন্ন আর কোনও ধনরত্ন বাহির হইল না, তখন তাহাতেই আপাততঃ সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষা-ভাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

কে কিরূপ ভাগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে অনেক বাদ প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মহাসভা তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে অনুসন্ধানসমিতির গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিবার সময়ে সেনাপতি ক্লাইব মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন সন্ধিপত্রের বিষয় স্থির হইয়া গেল, তখন ইংরাজদরবারের গুপ্তসমিতির সদস্য বীচার সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, কোম্পানীই কেবল লাভবান হইবেন কেন? সেনাদল এবং গুপ্তসমিতির সদস্যদিগেরও পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ওয়াট্‌স্ সাহেবকে এ কথা লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু ওয়াট্‌স্ ইহার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লাইব তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না; কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, কাহাকেও রিক্তহস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হইবে না। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, কে কত টাকা পাইবেন, তখন তিনিও ভাবিয়াছিলেন যে, পুরস্কারের মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দরবারের অবশিষ্ট সদস্যদিগকেও কিছু কিছু দিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করায়, নৌসেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেব অংশ চাহিতে লাগিলেন। দুই চারি জন সদস্য ইহাতে সম্মত হইলেও অধিকাংশ লোকে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ত আর কোম্পানীর সঙ্গে কর্ম্মচারীদিগের কোনরূপ ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ছিল না, সুতরাং একজন স্বাধীন নরপতির নিকট পুরস্কার গ্রহণ করা তাঁহার বিবেচনায় গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। আর গর্হিত হইলেই বা মহাসভার সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ? তাঁহার অন্নদাতা কোম্পানী বাহাদুর আপত্তি করিলে বরং শোভা পাইত। কিন্তু তাঁহারা, আপত্তি করা দূরে থাকুক, সাহ্লাদে এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রীযুক্ত বীচার সাহেব যেরূপ হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই লক্ষা-ভাগ-ব্যাপারে সকলেই যথাযোগ্য অংশলাভ করিয়া ধন্য হইলেন, এবং কোম্পানী বাহাদুর আপাততঃ সন্ধিপ্রাপ্য অর্দ্ধাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া অপরার্দ্ধ পরিশোধ

করিবার জন্য মীরজাফরকে তিন বৎসরের অবসর দান করায়, নবীন নরপতির দোদুল্যমান রাজমুকুট কিছু দিনের জন্য কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইবার অবসর লাভ করিল! *

সেনাপতি ক্লাইব মহামতি পলাশির যুদ্ধাবসানে গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রে ২৫শে জুন কলিকাতার ইংরাজমণ্ডলী এই দেবদুর্ল্লভ বিজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। গত বৎসর জুন মাসের শেষে ইংরাজ যেমন অবসাদগ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে এ বৎসর অভাবনীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনে এবং পুরস্কারলাভের আশাতীত সম্ভাবনায়, সকলেই উন্মত্তের মত রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইলেন; সকলের মুখেই এক কথা, সকলের হৃদয়েই এক আনন্দোচ্ছ্বাস! সে উচ্ছ্বাসে শত্রু মিত্র কলহ বিবাদ বিস্মৃত হইয়া সত্য সত্যই মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন! †

---

* শ্রীযুক্ত বীচার সাহেব যে হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে যিনি যত পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা এইরূপ; যথা:—

Mr. Drake … …	Rs. 280,000	Rs. 280,000.
Col. Clive		
as a member	Rs. 280,000	
as a commander	Rs. 200,000	Rs. 2080,000.
as a donation	Rs. 1600,000	
Mr. Watts		
as a member	Rs. 240,000	
as a donation	Rs. 800,000	Rs. 1040,000
Major Kilpatrik		
as an officer	Rs. 240,000	
as a donation	Rs. 300,000	Rs. 540,000
Mr. Maringham	Rs. 240,000	
,, Beecher	Rs. 240,000	Rs. 480,000
Six members of Council 1 lakh each		Rs. 600,000
Mr. Walsh … …	Rs. 500,000	
,, Scrafton … …	Rs. 200,000	
,, Lushington …	Rs. 50,000	Rs. 850,000
,, Cap. Grant …	Rs. 100,000	
Army and Navy …	£ 600,000	

† The comparison of the prosperity of this day with the calamities in which the colony was overwhelmed at this very season in the preceding year; in a word, this sudden reverse and profusion of good fortune *intoxicated* the steadiest minds, and hurried every one into the excesses of intemperate joy; even envy and hatred forgot their energies, and were reconciled, at least for a while, to familiarity and good will.—Orme, vol.

কলিকাতার ইংরাজ-দরবার আর কালবিলম্ব না করিয়া একখানি ত্বরিত-গতি জাহাজ সাজাইয়া মহাসমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিলাতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন! এ দিকে সেনাপতি ক্লাইবের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে মুরশিদাবাদ রাজভাণ্ডারের ধনরত্ন সাত শত সিন্ধুকে বোঝাই হইয়া এক শত খানি সুসজ্জিত তরণীসংযোগে বৃটিশ বিজয়বৈজয়ন্তী সুবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্যামোদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিশব্দিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল, এবং তথা হইতে ইংরাজ-বন্ধু রাজরাজেন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুরের সেনাদলপরিচালিত হইয়া যথাকালে কলিকাতার ইংরাজ-বন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন হইল! *

ইতিহাসে এরূপ অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্ত্তনের কথা আর কোনও দেশে কেহ শুনিয়াছেন কি না, জানি না। ইংরাজেরাও বলিয়া থাকেন যে, এই উপলক্ষে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই সেরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছে! †

২৬শে জুলাই খেলাত-বিতরণের সমারোহে মুরশিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল। কর্ণেল ক্লাইব সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই;—সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ একটি সুসজ্জিত হস্তী, দুইটি আস্তরণাবৃত ঘোটক, সুবর্ণখচিত রাজপরিচ্ছদ ও শিরপেঁচ এবং মণিমুক্তাহীরকাদি-জড়িত উষ্ণীষচূড়া উপহার পাইয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং যেখানে যত রণপতাকা ছিল, তাহাতে রণতরণী সুসজ্জিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ কামানধ্বনি করিতে করিতে জল স্থল বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন! অতঃপর মীরজাফরের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয় কে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাই ইংরাজ বাঙ্গালীর সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ বাঙ্গালীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য মীরজাফরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তাঁহার অধিকতর আহ্লাদের কথা এই যে, দেশের লোকে সকলেই মীরজা-

---

* Orme, vol. II. 187—188.

† Few events in history have created a greater revulsion of feeling than the victory at Plassey. The people of Calcutta had been depressed, not only by the capture of the Factory, but by the utter loss of all their worldly goods. But now the disgrace was forgotten in the triumph; the poverty was forgotten at the sight of the treasure.—Early Records of British India, p. 261.

ফরের রাজ্যলাভে আনন্দলাভ করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেছে; সিরাজদ্দৌলা এরূপ ভাবে জনসাধারণের শুভকামনা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই!" * এ দিকে সেনাপতি ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাই; যে গুণে আত্মরাজ্যের পাত্রমিত্র-দিগের বিশ্বাস এবং স্নেহমমতা আকর্ষণ করা সম্ভব, সে গুণের একেবারেই অত্যন্তাভাব! তাঁহার শাসনে এই কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ অরাজক হইয়া উঠিয়াছে; চারি দিকে বিদ্রোহশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; আমরা নবাবের নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতেছে, কেবল সেই জন্যই মীর-জাফর কায়ক্লেশে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন!" †

যাঁহারা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র ফলভাক্, তাঁহাদের নিকট এইরূপ সমাদর লাভ করিয়া মীরজাফর "নবাব-সুজা-উল্-মোল্ক্-হাসামো-দ্দৌলা-মীরমহম্মদ-জাফর-আলি-খাঁ বাহাদুর-মহবৎজঙ্গ" নাম ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আত্মকার্য্যের পরিণামচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন! ‡

---

* Ive's Journal.

† Mirza Jaffier Beg, whom you have done me the honor to depute to me, has delivered me your letter, and other marks of friendship, with which yon have been pleased to favor me. He has also satisfied my desire, in giving me an ample account of your health and prosperity. But what pleases me beyond expression, is, to hear that all men rejoice in them; and, while they acknowledge you are worthy of them, pray for their continuance. This is a satisfaction your predecessor never knew; and which while it gives the most sublime pleasure to a mind generous like yours, promises happiness to yourself, and a quiet succession to your son.—Letter from Admiral Charles Watson, Commander of the fleet belonging to the most puissant king of Great Britain, irrestible in battle.

‡ In laying open the state of this Government, I am concerned to mention that the present Nabob is a Prince of little capacity, and not at all blessed with the talent of gaining the love and confidence of his principal officers. His mismanagement threw the country into great confusion in the space of a few months, and might have proved of fatal consequence to himself but for our known attachment to him.—Clive's letter to the Court of Directors, 23 December, 1757, para. 2.

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

মশক-সমাচার।

নিদাঘের বায়ুহীন রাত্রে মশকদংশনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ঘর্ম্মসিক্ত শয্যায় লুটাইয়া, আশু মশককুলনিধানের একটি সদুপায় আবিষ্কারের জন্য যখন বিশেষ চিন্তিত,—তখন মশকের ক্ষুদ্রপক্ষান্দোলনজাত সকরুণ বিলাপধ্বনি, হতভাগ্য নিদ্রালুর নির্ম্মম হৃদয় কিছুতেই সেই কঠোর দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। করুণা-উদ্রেকের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, শেষে বরং চপেটাঘাতেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত মানবের কর্ণমূলের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকরুণ স্বরে দয়া ভিক্ষা করা অপরাধী মশকের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয় বটে;—কিন্তু অর্থিপক্ষীয় কোনও ব্যক্তিকে, নিদ্রাবিঘ্নকারী মশকের অনুকূলে উকীল হইয়া, তাহাদের নির্ম্মম ব্যবসায়ের সমর্থনে যুক্তিবর্ষণ করিতে দেখিলে, ব্যাপারটা কিছু হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি "মান্দ্রাজ মেল" নামক পত্রে, পুরুষমশককুলের মুখপাত্র হইয়া, এক লেখক (অবশ্যই লেখিকা ন'ন) রক্তশোষণব্যাপারে পুংমশকগণের নিরীহতা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বলেন,—উন্নত মনুষ্যসমাজে রুধির-শোষণ কাজটা যেমন স্ত্রীজাতির মধ্যেই আবদ্ধ দেখা যায়, হীন মশকসমাজেও এই নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। পুরুষ মশক, তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সমাজের খুঁটিনাটি সকল কর্ত্তব্যগুলি নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন করে, এবং স্ত্রী মশকগুলি কেবল নানা কৌশলে জীবগণের বিশ্রামে বাধা উৎপাদন করিয়া, রক্তশোষণাদি নিষ্ঠুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—স্ত্রী-মশকগুলি আকণ্ঠ রক্তপান করিয়া, কোনও স্রোতোহীন জলাশয়ের নিকট নির্জ্জন ছায়ায় পাঁচ ছয় দিবস বিশ্রাম করে; পরে জলাশয়ের স্থির জলে ডিম্ব প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন ইহাদের মৃতদেহ জলে ভাসিতে থাকে। যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত ডিম্বগুলি ফুটিলে, তাহা হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলমস্তক কীট উৎপন্ন হয়;—বহুদিনরক্ষিত অনাবৃত জলে এই মশক-কীট প্রায় সচরাচর দেখা যায়। জন্মিবামাত্রই কীটগুলি অতি চঞ্চলভাবে জলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই অবস্থায় ইহাদের আহারেচ্ছা এত অধিক থাকে যে, তাহাদের মাতার প্রাণহীন শরীর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াও তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। রেশম-কীটের ন্যায়, এই কীটদের গাত্রাবরণ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়;—এই পরিত্যক্ত গাত্রাবরণও তাহাদের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় না। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে, কীটাবরণের মধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষযুক্ত মশক উৎপন্ন হয়, এবং যথাকালে উক্ত আবরণ ভেদ করিয়া, পূর্ণাবয়ব মশক বহির্গত হয়। বাহির হইয়াই মশকগণ উড়িতে পারে না; প্রথমতঃ স্ব স্ব গাত্রাবরণের উপর বসিয়া, শরীর শুষ্ক ও পক্ষদ্বয় উড্ডয়ন-ক্ষম করিয়া, তাহার পর ইহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। স্ত্রীমশকগুলিকে প্রথম হইতেই তাহাদের শোণিত-পিপাসাপরিতৃপ্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে দেখা যায়;—শয়নকক্ষের নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বিশ্রামাভিলাষীর অশান্তি-উৎপাদন, প্রথম হইতেই ইহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

যদিও স্ত্রীমশকগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আজীবন অশান্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু "মান্দ্রাজ মেলের" পূর্ব্বোক্ত লেখক সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে, ইহাদের জীবনে জীবের অশেষকল্যাণকর একটি কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। বিধাতার রাজ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ

সকল পদার্থই যে সৃষ্টিসংরক্ষণে তৎপর,—লেখক এই অতি প্রাচীন বাক্যের সত্যতা, মশকের
সাহায্যে সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন
জীবশরীরে কতকগুলি পীড়ার বীজ প্রবেশিত করিলে প্রাণিগণ ঐ সকল পীড়ার আক্রান্ত
হইতে পারে না, এবং ক্বচিৎ আক্রান্ত হইলেও পীড়া সাংঘাতিক হয় না।—আজ কাল বসন্ত,
জলাতঙ্ক প্রভৃতি অনেক রোগের আশঙ্কা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিবারিত হইতেছে; তন্মধ্যে
বসন্তনিবারণের জন্য, গো-বীজের টীকাপ্রদানপদ্ধতির সহিত পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই পরি-
চিত আছেন। আজ কাল ফ্রান্স প্রভৃতি বিজ্ঞানপ্রধান দেশে, এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক
বলিতেছেন,—গোবীজ-টীকা দ্বারা যেমন বসন্তের আশঙ্কা থাকে না, সেই প্রকার যে কোন
রোগ-বীজ জীবশরীরে প্রবেশিত করিলে, সেই রোগ দ্বারা জীবের কোনও অনিষ্টসংঘটনের
সম্ভাবনা থাকে না। মশকপক্ষাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত লেখক বলেন, এই অশান্তিকর ক্ষুদ্র জীবগণ,
নানা রোগের বীজ প্রতিদিন অজ্ঞাতভাবে আমাদের দেহে প্রবেশিত করিয়া, ঐ সকল সাংঘা-
তিক রোগের অনিষ্টকারিতা দূর করিতেছে। মানুষ কি কৃতঘ্ন ও নির্দ্দয়! জীবকল্যাণাকাঙ্ক্ষী
মশকগণের এই মহৎ মঙ্গলব্রতের অনুষ্ঠানকালে, তাহাদের ক্ষুদ্র হুলের স্পর্শটি পর্য্যন্ত মানুষ
সহ্য করিতে পারে না,—পক্ষান্তরে এই নিঃস্বার্থ সদনুষ্ঠানের পুরস্কারস্বরূপ চপেটাঘাতের
ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র জীব দ্বারা বিধাতার সৃষ্টিরক্ষার যে বিশেষ
সহায়তা হইতেছে, তাহাতে আর লেখকের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।—মশকগণ রোগীদিগের
রক্তশোষণ করিয়া, পরে সুস্থ ব্যক্তির রুধির পান করিতে আরম্ভ করিলে, রোগীর শরীরস্থ
ব্যাধিবীজের কিয়দংশ সুস্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। লেখক বলেন,—যে সকল মশক পূর্ব্বে কোন
ব্যক্তির শোণিত পান করে নাই, তাহাদের দ্বারাও এই কার্য্য সাধিত হয়; কারণ, মশকগণ
শৈশবাবস্থায় তাহাদের মাতার মৃতদেহভক্ষণকালে, মাতার উদরস্থ রক্তের সহিত, তাহাতে
মিশ্রিত ব্যাধিবীজও ভক্ষণ করে;—ইহারই ফলে, প্রত্যেক মশকই এক একটি রোগনাশক
যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে, এবং পূর্ণাবস্থ হইয়া যাহাকে দংশন করে, তাহাকে আর কিছু দিনের
জন্য ব্যাধির ভাবনা ভাবিতে হয় না। এ দেশে কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি নূতন আসিলে শীঘ্রই
তাঁহাকে স্থানীয় ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, এবং অনেক সময় আক্রমণের ফল
বড় সাংঘাতিক হইয়া থাকে।—কিন্তু অপর পক্ষে, স্থানীয় লোক বেশ নির্ব্বিবাদে ব্যাধি-
নির্লিপ্ত হইয়া বেড়াইতে থাকেন। লেখক অনুমান করেন, এই বিসদৃশ ব্যাপারটা মশকা-
দির ন্যায় রক্তপায়ী কীটের কীর্ত্তি। ইহারা প্রতি রাত্রেই দংশন করিয়া স্থানীয় ব্যাধিবীজ,
স্থায়ী অধিবাসিগণের শরীরে এত অধিক প্রবেশ করাইয়া দেয় যে, সেই সেই রোগে স্থানীয়
লোকগণকে আর ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় না; কিন্তু নবাগত ব্যক্তি শীঘ্রই সেই সকল ব্যাধি
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। লেখক মহাশয় যাহাই বলুন,—আমাদের দেশে বৎসরে প্রায়
আট মাস লোকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, এবং রাত্রে (অনেক সময় দিবসেও) মশকের
অভাব বড় অনুভব করা যায় না,—তবে মশকদষ্ট ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পীড়াগ্রস্ত কেন?—ইহার
উত্তরে তিনি কি বলেন?

ইন্দ্রিয়-জ্ঞান।

জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবই অল্লাধিকপরিমাণে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন;—ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা
জীব কি প্রকারে জ্ঞানসম্পন্ন হয়,—শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক দিন হইতে এই প্রশ্নের
আলোচনা করিতেছেন। আলোচনার সুফল অবশ্যই পাওয়া গিয়াছে,—কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
... ব্যাপারগুলি "জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ" ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া

কোন্ প্রক্রিয়াতে জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহা আজও আমূল জানা যায় নাই। অনেক পরীক্ষা ও গবেষণায় পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন,—জীবগণের মস্তিষ্ক জ্ঞানমাত্রেরই কেন্দ্র; মস্তিষ্ক বিকল হইলে, সুস্থ ও অতিসবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না;—দর্শনজ্ঞানের উৎপাদনের জন্য যে প্রকার অবিকৃত চক্ষু আবশ্যক, সুস্থ মস্তিষ্কও ঠিক সেই প্রকার প্রয়োজনীয়; কিন্তু কি অদ্ভুত উপায়ে বায়ুসঞ্চালিত পুষ্পরেণু এবং অতিসূক্ষ্ম আলোক ও বায়ুর স্পন্দনগুলি, যথাক্রমে নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইয়া, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রবণের জ্ঞান উৎপাদন করে, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহা আজও সম্যক নির্ণীত হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দর্শন বা কোনও শব্দের শ্রবণজনিত জ্ঞান যে সকল সময়ই একই থাকিবে, এ কথা আজও কেহ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন নাই। আমার চক্ষে যে পদার্থটি হরিত বর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা যে অপরের নিকট নীলাভ বা অপর কোনও সদৃশ বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? "বর্ণান্ধতা" ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনুষ্যেতর জীবের কথা ত স্বতন্ত্র,—তাহারা কোন্ বর্ণের পদার্থ কি প্রকার দেখে, এবং কোন্ ঘ্রাণ কি প্রকার অনুভব করে,—তাহার নির্ণয়ে পণ্ডিত মূর্খ উভয়েই সমান। তবে কতকগুলি জীবের ইন্দ্রিয়গঠনের ঐক্য দেখিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, মানুষ ও অপর জীবগণের জ্ঞানজননকার্য্য একই প্রকারে সম্পন্ন হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের জ্ঞানের স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে কোনও মতই প্রকাশ করা যায় না।

চক্ষু একটি সুগঠিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।—এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—বৈজ্ঞানিকগণ চক্ষুকে একটি সুব্যবস্থিত যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় এত অসম্পূর্ণ যে, কোনও যন্ত্রবিক্রেতা তদ্রূপ দোষসম্পন্ন অন্য কোনও যন্ত্র তাঁহার নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে, তিনি কোন ক্রমেই তাহা ক্রয় করিতেন না। দার্শনিকবরের এই বাক্য তাঁহার অতিবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যবাহুল্যের পরিচায়ক কি না, জানি না।—তবে জীবশরীরের ক্ষুদ্রতম অংশটি পর্য্যন্ত যে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের মূল সত্যের অনুসারে নির্ম্মিত, এবং তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়ার পরীক্ষা দ্বারা আজও যে দার্শনিক অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেছেন, তাহাতে আর মত-দ্বৈধ নাই। বোধ হয়, পাঠক পাঠিকাগণ জানেন, এক খণ্ড স্থূলমধ্য পরকলা কোনও পদার্থের সম্মুখে রাখিয়া কাচের অপর পার্শ্বে একটি পর্দ্দা রাখিলে, ইহার উপরে পরকলার সম্মুখস্থ পদার্থের একটি ছবি পড়ে, এবং উক্ত পদার্থ হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে কাচখানি রাখিলে, ছবিটি স্পষ্ট ও নিখুঁৎ হইতে দেখা যায়। প্রাণীদিগের চক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার এক একখানি পরকলা আছে, এবং তাহার পশ্চাতে স্নায়ু-মণ্ডিত এক একখানি কালো পর্দ্দাও আছে; এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে। বাহ্য পদার্থের আলোক প্রথমতঃ চক্ষুর উপরিস্থ ক্ষুদ্র পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত পরকলার উপর পতিত হয়, এবং পরে পদার্থের স্পষ্ট প্রতিকৃতি কালো পর্দ্দার উপর উৎপাদন করে। ফোটোগ্রাফারেরা তাহাদের ক্যামেরার মধ্যে যে উপায়ে বাহ্য বস্তুর ছবি পাতিত করে, চক্ষু দ্বারাও ঠিক সেই উপায়ে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ পর্দ্দার উপর ছবি উৎপন্ন হয়। ফোটোগ্রাফারেরা ছবি তুলিবার প্রতিকৃতিটি স্পষ্ট করিবার জন্য যন্ত্রসংলগ্ন পরকলাখানি অগ্র পশ্চাৎ ঠিক স্থানে রাখে; চক্ষুর পরকলা কিন্তু সেই প্রকারে সরাইতে হয় না,—দর্শনীয় বস্তুর দূরত্বানুসারে, দর্শক, চক্ষুঃস্থ পরকলার আকার অজ্ঞাতসারে এরূপ পরিবর্ত্তিত করে যে, ইহা স্বস্থানে থাকিয়াই কৃষ্ণ পর্দ্দার উপর দর্শনীয় বস্তুর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকেই সচরাচর ক্ষীণদৃষ্টি হইতে দেখা যায়, এবং এই দোষসম্পন্ন চক্ষু দ্বারা বাহ্য বস্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিতে হইলে, কৃত্রিম পরকলা অর্থাৎ চ ব্যবহার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। চক্ষুর মধ্যস্থ স্নায়ুময় কৃষ্ণ পর্দার উপর বাহ্য বস্তুর ছ. উৎপন্ন হইলে কি প্রকারে দর্শনজ্ঞান হয়, শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ আজও তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তবে পর্দা-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক দ্বারা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নাসিকাও এক প্রকার যন্ত্রস্থানীয়, কিন্তু ইহার গঠন, চক্ষুর ন্যায় তত জটিল নয়। নাসিকার মধ্যে অর্থাৎ ফুস্‌ফুসে বায়ুপ্রবেশের পথে, জালের ন্যায় এক প্রকার সচ্ছিদ্র আবরণ বিস্তৃত থাকে; প্রাণিগণ শ্বাসগ্রহণকালে বায়ুর সহিত বাহ্য পদার্থের যে সকল সূক্ষ্মকণা টানিয়া লয়, সেগুলি পূর্ব্বোক্ত আবরণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে। আবরণটি স্বভাবতঃই এক প্রকার রসে সিক্ত থাকে, এ জন্য তাহাতে কোন পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ একবার সংলগ্ন হইলে, সহজে স্খলিত হয় না। ঘ্রাণযুক্ত কোনও বহিঃস্থ পদার্থের অণু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবরণসংলগ্ন হইলে, তাহারা আবরণস্থ স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করে;—এই উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক দ্বারা ঘ্রাণজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু কোন্ প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ ও স্নায়ুমণ্ডলীর সংযোগে ঘ্রাণজ্ঞান উৎপন্ন হইল, দার্শনিকগণ তাহার নিরূপণে আজও কৃতকার্য্য হন নাই। জীবগণের শ্রবণজ্ঞানও, কর্ণস্থ স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থলচর প্রাণিগণের কর্ণ-রন্ধ্র এক প্রকার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে, এবং ইহার সর্ব্বাংশ এক প্রকার রোমশ ও স্নায়ু-মণ্ডিত সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত দৃষ্ট হয়। বহির্ভাগে কোনও শব্দ হইলে, সন্নিহিত বায়ু কম্পিত হইয়া, কর্ণকুহরস্থ তরল পদার্থটিকে আন্দোলিত করে, এবং এই আন্দোলনস্রোত আবরণসংলগ্ন দৃঢ় কেশগুলিকে কম্পিত করিয়া শ্রবণ-জ্ঞান উৎপন্ন করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, চক্ষু ও নাসিকায় স্নায়ুমণ্ডিত আবরণে যে কার্য্য সম্পন্ন করে, কর্ণ-রন্ধ্রস্থ কেশগুলি দ্বারা সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববর্ণিত প্রধান ইন্দ্রিয়জ্ঞানত্রয়ের প্রত্যেকেরই উৎপত্তির জন্য মস্তিষ্কের অস্তিত্ব সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু কি প্রকারে মস্তিষ্ক ও জ্ঞানজননক্ষম কেশ দ্বারা শ্রবণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ ব্যাপারের মীমাংসায়, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই—"তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।"

রাসায়নিক আবিষ্কার।

আজ কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, "আকাশ তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ" সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণায় আশাতিরিক্ত ফল-লাভ করিয়া, সমগ্র বিজ্ঞানজগতের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। প্রধান প্রধান বৈদেশিক বিজ্ঞান-সমাজগুলি জগদীশ বাবুকে নানা সম্মানে ভূষিত করিতেছেন; আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অগ্রণী সার উইলিয়ম টমসন্, পরপদানত বঙ্গসন্তানের গবেষণায় মৌলিকত্ব দেখিয়া, সবিস্ময়ে জগদীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এ সম্মান পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালী জাতির বড় অল্প আদরের নয়। জগতের ক্ষণজন্মা দুই একটি সৌভাগ্যশালী পুরুষই এ সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকেন। জগদীশ বাবুর গবেষণার ফল জগতে প্রচারিত হইতে না হইতে, প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী, পারদমূলক এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রফুল্ল বাবু কিছু দিন হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। এ জন্য

.ইট ব্যতীত সকল যৌগিকেরই অস্তিত্ব দেখিয়া, নাইট্রাইটের অভাব রাসায়নিক .মর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল। নাইট্রাইট সম্বন্ধে, আচার্য্য রস্কো, লেমার, ওয়াট্ প্রভৃতি রসায়নবিদ্‌গণের মত জানিবার ইচ্ছায়, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাহাতে নাইট্রাইটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথাই খুঁজিয়া পান নাই। এই ঘটনার কিছু দিন পরে, এক দিবস পারদে নাইট্রিক এসিড সংযুক্ত করিয়া, মারকিউরস্ নাইট্রেট্ নামক যৌগিকটি উৎপন্ন করিতে গিয়া, পারদে এক প্রকার দানাদার পীতাভ পদার্থ দেখিয়া, প্রফুল্ল বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত পদার্থদ্বয়ের সংযোগে উল্লিখিত পীতাভ পদার্থের উৎপত্তির কথা রসায়নশাস্ত্রের কোনও অংশে উল্লিখিত দেখিতে না পাইয়া, উৎপন্ন পদার্থটি তাঁহার অনুমিত যৌগিক ভিন্ন অপর কিছুই নয় বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। পরে পদার্থটি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিবার পর, উহা মারকিউরস্ নাইট্রাইট্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রফুল্ল বাবু, কঠোর শ্রমসাধ্য রাসায়নিক গবেষণায় যে সফলকাম হইয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের কথা। শুনিতেছি, ইনি এখন পারদমূলক অপর যৌগিকগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের প্রকৃতিনিরূপণার্থ কিছুকাল নিযুক্ত থাকিবেন। এই অসামান্য কার্য্যে নিশ্চয়ই তাঁহার কার্য্যক্ষম জীবনের অধিকাংশই ব্যয়িত হইবে,—কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত যৌগিক এবং অপর গবেষণার জন্য যে প্রফুল্ল বাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই আবিষ্কারের বিবরণ, সম্প্রতি আসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিবরণ পাঠ করিয়া আধুনিক রসায়নবিদ্‌গণের নেতা, স্বনামখ্যাত ভিক্টর মেয়র, প্রফুল্ল বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

অন্ধ।

১

বিবাহের পর মোহিনীমোহন যখন দেখিল যে, তাহার পত্নী কিরণময়ী রূপসীও নহে বিদুষীও নহে, তখন তাহার মনস্তাপের আর সীমা রহিল না। কল্পনা-প্রিয় মোহিনীমোহন বিবাহের পূর্ব্বেই বহুবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহার পত্নীর একটা আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু প্রভাতের আলোকে কুহেলিকার মত যখন সে আদর্শ অপসৃত হইয়া গেল, তখন সে আপনার দশনদষ্ট ভুজঙ্গের মত আপনার আক্ষেপে আপনি যাতনা পাইতে লাগিল। সে কিছুতেই এ সামান্য কথাটা বুঝিল না যে, কুলীনের বড় বা একমাত্র পুত্রের "কুলরাখা" বলিয়া একটা প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকায়, তাহার বিবাহ-ব্যাপার বড় সহজ নহে; যে সে ঘরে তাহার বিবাহ হয় না। সে পত্নীর যে

আদর্শ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে তাহার পত্নী তাহার গৃহে হইবে, সাংসারিক কার্য্যে মন্ত্রী হইবে, এবং কাব্যালোচনায় সখী হইবে। আদর্শ যখন বিকৃত হইল, তখন কিরণময়ীর প্রতি তাহার ভালবাসার উদ্রেক না হইয়া কেবল ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। অধিকন্তু তাহার বিধবা জননী তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

কিরণময়ী পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, জানিবার জন্য তাহার সমবয়স্কারা যখন তাহাকে ঘিরিয়া বসিল, তখন সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না; কারণ, মোহিনীমোহন পত্নীর সহিত বড় একটা কথাও কহে নাই। তাহার কথার ভাবে সত্য কথাটা অনুমান করিয়া প্রাচীনারা মোহিনীমোহনের লজ্জাধিক্যের প্রচুর প্রশংসা করিলেন; এবং তাঁহাদিগের এত শিখান পড়ান বৃথা হইল দেখিয়া নবীনারা তাহার যথেষ্ট নিন্দা করিলেন। নবীনাদিগের কথার ভাবে কিরণময়ী বুঝিল যে, সাধারণতঃ স্বামীর নিকট স্ত্রী যেরূপ ব্যবহার পায়, সে তাহার স্বামীর নিকট সেরূপ ব্যবহার পায় নাই। স্ত্রীলোকের একটা বিশেষত্ব আছে—স্বামীর উপেক্ষা কোনও স্ত্রী ভুলে না।

২

মোহিনীমোহনের সংসারে লোক অল্প,—বিধবা জননী আর সে। জননী বার বার বধূকে আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের ভয়ে তাহা করিতে পারিলেন না; কারণ পুত্র বলিয়াছিল যে, তিনি বধূকে গৃহে আনিলে সে সাগর পার হইয়া লঙ্কারও ওদিকে যাইবে; তাহা হইলে জাতিও থাকিবে না ধর্ম্মও থাকিবে না।

এদিকে যে সংসারে অধিক লোক নাই, সে সংসারে শ্বশ্রূ কেন যে পুত্রবধূকে লইয়া যাইবার নামও করেন না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কিরণের পিতা মাতা কিছু চিন্তিত হইলেন—ভাবিলেন, জামাতার বুঝি মেয়েকে মনে ধরে নাই।

এই সময় মোহিনীমোহনের মাতৃষসা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ভগিনীর গৃহে আসিয়া বধূ দেখিতে চাহিলেন। মা সে কথা মোহিনীমোহনকে জানাইলে সে বুঝিল যে, ঘরের কথা পরের কানে যাওয়া উচিত নহে, সুতরাং সে একদিনের জন্য কিরণকে আনিতে অনুমতি দিল। মা দুই দিনের জন্য কিরণকে আনিলেন। ছয় মাস পরে কিরণ আবার স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্ত্রীকে

"তখন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বুঝুক আমার।
তবে জানি ভটমিশ্র পদবী তাহার॥"

এইরূপে গঙ্গাদাসের টোলের প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে, গৌরাঙ্গ ক্রমশঃ উক্ত টোলের ব্যাকরণের অধ্যাপক হইয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গাদাস অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন, নিমাই তদীয় আসন পরিগ্রহ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রতিনিধি অধ্যাপকস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ, সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত গঙ্গাদাসের প্রতিনিধির স্বরূপই তিনি তদীয় টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন ও পড়াইতেন। তিনি নিজে কোনও স্বাধীন টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তৎকালের নিয়মানুসারে তিনি যুগপৎ ছাত্র ও শিক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মীরজাফর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ!"

যে সকল অতি বিচক্ষণ হিন্দু মুসলমান সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য কলিকাতার ইংরাজদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া গোপনে গোপনে মোগল-সিংহাসনের ভিত্তিমূল নির্ম্মূল করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই-রূপ ধারণা ছিল যে, সিরাজদ্দৌলাই সকল অনর্থের মূল;— যে কোনও উপায়ে হউক, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলেই আবার রামরাজ্যের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং তাঁহারা কেহই আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিলেন না; প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হইয়াও নানা সঙ্কেতে যে সকল সদুপদেশ বিতরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও কর্ণপাত করিলেন না! উদ্দেশ্যসাধনের তীব্র তাড়নায় জ্ঞানান্ধ হইয়া মীরজাফরকে নবাব নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মীরজাফরের বহুবৎসরের গুপ্ত পাপসংকল্প জাগরিত হইয়া উঠিল। একদিন যে সিংহাসনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চাহিয়া প্রবীণ নরপতি নবাব আলিবর্দ্দীর ভয়ে কোন রূপে

বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকেই সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন, মীরজাফরের সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি তখন বালির বাঁধের মত প্রবল তরঙ্গসংঘর্ষে কোথায় ভাসিয়া গেল! কথা স্থির হইবামাত্র সকলকেই নিতান্ত তাড়াতাড়ি কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হইতে হইল; ধীরভাবে সকল কথা বিচার করিবার জন্য কেহই কালক্ষয় করিতে সম্মত হইলেন না! সুতরাং সুচতুর ইংরাজ সওদাগর যাহা চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া তাহাতেই "তথাস্তু" বলিয়া সন্ধিপত্র সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।* একদিন এই সন্ধিপত্র কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, একদিন এই সন্ধিপত্রের প্রত্যেক কথা অক্ষরে অক্ষরে দেশের লোকের শাসনক্ষমতা মন্দীভূত করিবে, একদিন বিজয়োন্মত্ত হৃদয়ে বৃটিশ বণিক বীরপ্রতাপে বাহুবিস্তার করিয়া মোগলের গৌরব-পতাকা উৎখাত করিয়া ফেলিবে;—তাঁহারা কেহই হয় ত এত দূর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বোধ হয়, সকলেই ভাবিয়াছিলেন, যাহা হইবার হইয়া যাউক, তাহার পর আমরা ত সকলেই রহিলাম,—তখন দেখিয়া লইব!

যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, কিন্তু দেখিয়া লইবার আর অবসর ঘটিল না। পলাশির যুদ্ধাবসানে জগৎশেঠের মন্ত্রভবনে ইংরাজসেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব যখন বীরোচিত দৃঢ়তার সহিত সন্ধিপত্রের অঙ্গীকারপালনের জন্য সকলকেই আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন সেই গুপ্ত সন্ধিপত্রের প্রকাশ্য ফলাফল সকলের চক্ষেই দিবালোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিল!

সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই সন্ধিসূত্রে কেবল যে সিরাজদ্দৌলারই সর্ব্বনাশ হইল, তাহা নহে; ইহার ছত্রে ছত্রে যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার প্রবল পীড়নে সমগ্র মুসলমান-শক্তি ধূলিপরিণত হইবার সূত্রপাত হইল!

মুসলমান সেনা বাহুবলে সিন্ধু সন্তরণ করিয়া তরবারি হস্তে ভারতবর্ষের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া নিরুদ্বেগে বহুশত বৎসর এ দেশের অন্নজলে আত্মোদর পরিপোষণ করিতে করিতে অবশেষে সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসী বলিয়াই জগতের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আজ সকলেই চাহিয়া দেখিলেন যে, কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে, লেখনীসাহায্যে, বিদেশের নগণ্য বণিক-

---

* The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything; the Nawab-expectant could refuse nothing.

সমিতি সেই সুখের রাজসিংহাসন পণ্যবীথিকার ক্ষণভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার অধিকার লাভ করিল!

যে সন্ধিসূত্রে মুসলমানের সর্ব্বনাশ, ইংরাজের স্বর্গবাস, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপঃ—

সম্রাট
আলমগীরের ভৃত্য
মীর
মহম্মদ জাফর খাঁ
বাহাদুর।

আড্মিরাল ও কর্ণেল ক্লাইব, গবর্ণর ড্রেক এবং ওয়াট্স্ সাহেবের সহিত সন্ধিপত্র। *

১। নবাব সিরাজদ্দৌলা মনসুরোল্ মোল্‌ক্‌শাহ কুলীখাঁ বাহাদুর হায়বৎজঙ্গের সহিত শান্তির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আমিও তাহা পালন করিতে স্বীকার করিলাম।

২। কি ভারতবর্ষের লোক, কি ইউরোপের লোক, যাহারা ইংরাজ-শত্রু, তাহাদিগকেই আমরা শত্রু বলিয়া গণ্য করিব।

৩। সমুদায় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গদেশের মধ্যে ফরাসিদিগের যে সকল কুঠি ও সম্পত্তি আছে, এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও যাহা থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইবে;—এই তিন প্রদেশের মধ্যে আমি কদাচ ফরাসিদিগকে বাস করিতে দিব না।

৪। নবাব কলিকাতা অধিকার ও নগরলুণ্ঠন করায় ইংরাজ কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে, এবং সেনাপোষণ করিতে গিয়া তাঁহাদের যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবার জন্য আমি এক কোটী টাকা প্রদান করিব।

৫। কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসীদিগের সম্পত্তিলুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলাম।

৬। কলিকাতাস্থ হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য লোকের যে সকল ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে।

৭। কলিকাতাস্থ আরমানী অধিবাসীদিগের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য সাত লক্ষ টাকা প্রদান করিব। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি কলিকাতাবাসিগণ কে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন, আড্মিরাল ও কর্ণেল ক্লাইব এবং কৌন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

---

* A treaty was then produced, which Meer Jaffier swore on the Koran, to observe, and added, in his own hand-writing, the words :—"I swear by God and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty while I have life."— Thornton's History of British Emp

৮। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ খাতের মধ্যে জমিদারদিগের অধিকারে যে সকল স্থান আছে, এবং ঐ খাতের বাহিরে ৬০০ গজ পর্য্যন্ত যত স্থান থাকে, তাহা ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব।

৯। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্‌পি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ইংরাজ কোম্পানীর জমীদারীভুক্ত হইবে, এবং ঐ সকল স্থানের রাজকর্ম্মচারিগণ ইংরাজের শাসনাধীন হইবেন। অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায় ইংরাজেরাও রাজকর প্রদান করিবেন।

১০। আমি যখনই ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিব, তখনই তাহার সমস্ত ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে।

১১। হুগলীর দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে কোন স্থানেই আমি নূতন কোন রাজদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

১২। তিন সুবার রাজকার্য্যে আমি প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র উপরি-উক্ত সমুদায় টাকা যথাধর্ম্ম সম্প্রদান করিব।

ইতি তারিখ আলমগীর রাজত্বের ৪র্থ বৎসর ১৫ রমজান ইংরাজী ১৭৫৭ হিজরী ১১৭০।

পুনশ্চ।

১৩। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উপরি-উক্ত সমুদায় অঙ্গীকৃত বিষয় বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিতে এবং শপথ পূর্ব্বক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করায়, মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরাও ঈশ্বর ও ধর্ম্মপুস্তক লইয়া শপথ করিতেছি যে, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা রাজ্য জয় করিবার জন্য আমাদের সমুদায় সেনাবল তাঁহাকে সহায়তা করিবে; এবং যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই আমরা যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতে ক্রটি করিব না; কিন্তু মীরজাফর খাঁ নবাব হইবামাত্র এই সকল নিয়মাবলী যথাযথ পালন করিতে বাধ্য হইবেন ইতি।

ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন যে, এই সন্ধিসূত্রে সত্য সত্যই তাঁহাদের সম্মুখে অনন্তরত্নসমন্বিত কুবেরভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। তাই তাঁহারা রূপোন্মাদবিমুগ্ধচিত্ত পতঙ্গবৎ সমরানলশিখায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে সেই কুবেরভাণ্ডার যখন সত্য সত্যই উন্মুক্ত হইল, তখন তাহার যৎসামান্য ধনরত্ন গণনা করিয়া ইংরাজ বণিক নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন! ধনরক্ষকদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, মীরজাফরের উপর কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া, পুনঃপুনঃ "দেহি দেহি" রবে

সকলকে প্রকম্পিত করিয়াও যখন অঙ্গীকৃত অর্থ সংগৃহীত হইল না, তখন ইংরাজ সেনাপতি বুঝিলেন যে, অর্থলোভে ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কলঙ্ক উপার্জ্জন করাই সার হইল! * তিনি তখন সুপ্তোত্থিত বনশার্দ্দুলের ন্যায় ক্রোধকম্পিতকলেবরে মীরজাফরের দিকে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন;—হতভাগ্য মীরজাফর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কৃতাপরাধ বর্ব্বরের ন্যায় ধরাতলে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিলেন!

আর সে দিন নাই! যাঁহারা নবাব আলীবর্দ্দীর সম্মুখে সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবেশন করিতেন, যাঁহারা অপরিণতবয়স্ক সিরাজ-দ্দৌলার নিকটেও উমাচরণ বা জগৎ শেঠের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া ভয়ে ভয়ে পদসঞ্চালন করিতেন, যাঁহারা সেদিনও মুরশিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে একাকী গমনাগমন করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেন,—আজ বিধাতার কৃপায় তাঁহারাই রাজমুকুট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ করিয়া, সশস্ত্র সগর্ব্ব সঙ্গীন-সহায় শত শত ইংরাজ সেনার অধিনায়ক হইয়া, রাজপ্রাসাদে সগৌরবে উপবেশন করিয়াছেন! মীরজাফরের কি সাধ্য যে, তাঁহাদের মুখের উপর সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন? ইচ্ছা থাকিলেও সেরূপ কার্য্যে কে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিবে? সুতরাং সকলে মিলিয়া করুণ ক্রন্দনে ক্লাইবের মন-স্তুষ্টিসম্পাদনের জন্য বিবিধ বিধানে স্তুতিস্তবন আরম্ভ করিলেন!

ইতিহাসলেখক জেম্‌স্‌ মিল্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষের অধিপতি-দিগকে সর্ব্বদাই যে সকল বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, রাজকোষের অর্থশূন্য-তাই তাহার মূল কারণ। এই দারিদ্র্যদোষ মীরজাফরের নিকট পাষাণ হই-তেও গুরুভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী যেরূপ দানশীল-তার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, এবং বর্গীর হাঙ্গামা নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রায় প্রতিবর্ষেই যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইত, তাহাতে তিনি সিরাজদ্দৌলার জন্য বিশেষ কোনও অর্থসংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সিরাজদ্দৌলাও রাজকোষের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।" এরূপ ক্ষেত্রে মীরজাফর ইংরাজদিগকে এত অধিক টাকা

---

* In manufacturing the terms of the confederacy, the grand concern

প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন কেন? কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তৎকালে মীরজাফর মনে করিয়াছিলেন যে, যাহারা নবাবের পদাশ্রিত বণিক হইয়া কেবলমাত্র উৎকোচলোভে রাজবিদ্রোহিদলে যোগদান করিতে সম্মত হইতেছে, যদি বিদ্রোহিদলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তখন তাহাদিগকে যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইংরাজেরা যে সময় পাইয়া কড়ায় গণ্ডায় সন্ধিপত্রে অঙ্গীকৃত অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিবার জন্য নিতান্ত নির্ম্মম হৃদয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, হয় ত এতটা মীরজাফর খাঁ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখন কিন্তু সকল কথাই বিশ্বাস করিতে হইল! তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ সেনাপতিদিগকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া সন্ধিপত্রের কথা চাপা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; যখন তাহাতেও কোনও ফল ফলিল না, তখন মীরজাফর গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন।

অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, আর কেন? এখন ত কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন এই জন কতক রাজবিদ্রোহী অর্থলোলুপ ইংরাজ ভিখারীকে বাহুবলে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কি? কিন্তু মীরজাফরের কর্ম্মদোষে সে পথও অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রাজধানীতে শুভাগমন করিবার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত দেখিয়া অনেক গণ্য মান্য নাগরিক সসৈন্যে ধনরত্ন লইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন; যাঁহারা তখনও রাজধানীতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মীরজাফরকে চিনিতেন; সুতরাং সকলেই ইংরাজের পক্ষাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন; বহুকাল বেতন না পাইয়া, নবাব-সেনা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল লুণ্ঠনলোভে তাহারা কোনরূপে এতদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এখন শুভদিন সমুপস্থিত, তথাপি তাহারা বেতন পাইল না বলিয়া, সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহিসেনাদলবেষ্টিত ইংরাজসঙ্গীণসুরক্ষিত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর কাহার নিকট উৎসাহ পাইয়া আশ্রয়দাতা ইংরাজবণিককে অসন্তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইবেন? মনের ভাব যাহাই হউক, ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া মীরজাফরকে নীরবে সকল গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল, এবং অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে শান্ত করিবার আয়োজন করিতে হইল।

কর্ণেল ক্লাইব বৃটিশ-বণিকের সৌভাগ্য-কেতু। প্রতিভায়, কার্য্যদক্ষতায়, অসমসাহসে তিনি এ দেশের ইতিহাসে আত্মগৌরব চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়া-

১৭৬০০০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ২৩০০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক স্বর্ণপাত, চারি সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার এবং দুটিমাত্র ছোট ছোট সিন্দুকপূর্ণ মণিমুক্তা ভিন্ন আর কোনও ধনরত্ন বাহির হইল না, তখন তাহাতেই আপাততঃ সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষা-ভাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

কে কিরূপ ভাগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে অনেক বাদ প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মহাসভা তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে অনুসন্ধানসমিতির গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিবার সময়ে সেনাপতি ক্লাইব মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন সন্ধিপত্রের বিষয় স্থির হইয়া গেল, তখন ইংরাজদরবারের গুপ্তসমিতির সদস্য বীচার সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, কোম্পানীই কেবল লাভবান হইবেন কেন? সেনাদল এবং গুপ্তসমিতির সদস্যদিগেরও পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ওয়াট্‌স্ সাহেবকে এ কথা লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু ওয়াট্‌স্ ইহার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লাইব তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না; কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, কাহাকেও রিক্তহস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হইবে না। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, কে কত টাকা পাইবেন, তখন তিনিও ভাবিয়াছিলেন যে, পুরস্কারের মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দরবারের অবশিষ্ট সদস্যদিগকেও কিছু কিছু দিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করায়, নৌসেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেব অংশ চাহিতে লাগিলেন। দুই চারি জন সদস্য ইহাতে সম্মত হইলেও অধিকাংশ লোকে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ত আর কোম্পানীর সঙ্গে কর্ম্ম-চারীদিগের কোনরূপ ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ছিল না, সুতরাং একজন স্বাধীন নরপতির নিকট পুরস্কার গ্রহণ করা তাঁহার বিবেচনায় গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। আর গর্হিত হইলেই বা মহাসভার সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ? তাঁহার অন্ন-দাতা কোম্পানী বাহাদুর আপত্তি করিলে বরং শোভা পাইত। কিন্তু তাঁহারা, আপত্তি করা দূরে থাকুক, সাহ্লাদে এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রীযুক্ত বীচার সাহেব যেরূপ হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই লক্ষা-ভাগ-ব্যাপারে সকলেই যথাযোগ্য অংশলাভ করিয়া ধন্য হইলেন, এবং কোম্পানী বাহাদুর আপাততঃ সন্ধিপ্রাপ্য অর্দ্ধাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া অপরার্দ্ধ পরিশোধ

* Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons

করিবার জন্য মীরজাফরকে তিন বৎসরের অবসর দান করায়, নবীন নরপতির দোদুল্যমান রাজমুকুট কিছু দিনের জন্য কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইবার অবসর লাভ করিল! *

সেনাপতি ক্লাইব মহামতি পলাশির যুদ্ধাবসানে গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রে ২৫শে জুন কলিকাতার ইংরাজমণ্ডলী এই দেবদুর্ল্লভ বিজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। গত বৎসর জুন মাসের শেষে ইংরাজ যেমন অবসাদগ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে এ বৎসর অভাবনীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনে এবং পুরস্কারলাভের আশাতীত সম্ভাবনায়, সকলেই উন্মত্তের মত রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইলেন; সকলের মুখেই এক কথা, সকলের হৃদয়েই এক আনন্দোচ্ছ্বাস! সে উচ্ছ্বাসে শত্রু মিত্র কলহ বিবাদ বিস্মৃত হইয়া সত্য সত্যই মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন! †

* শ্রীযুক্ত বীচার সাহেব যে হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে যিনি যত পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা এইরূপ; যথা:—

Mr. Drake	Rs.	280,000	Rs. 280,000.
Col. Clive			
as a member	Rs.	280,000	
as a commander	Rs.	200,000	Rs. 2080,000.
as a donation	Rs.	1600,000	
Mr. Watts			
as a member	Rs.	240,000	Rs. 1040,000
as a donation	Rs.	800,000	
Major Kilpatrik			
as an officer	Rs.	240,000	Rs. 540,000
as a donation	Rs.	300,000	
Mr. Maringham	Rs.	240,000	Rs. 480,000
,, Beecher	Rs.	240,000	
Six members of Council 1 lakh each			Rs. 600,000
Mr. Walsh	Rs.	500,000	
,, Scrafton	Rs.	200,000	
,, Lushington ...	Rs.	50,000	Rs. 850,000
,, Cap. Grant ...	Rs.	100,000	
Army and Navy ...	£	600,000	

† The comparison of the prosperity of this day with the calamities in which the colony was overwhelmed at this very season in the preceding year; in a word, this sudden reverse and profusion of good fortune *intoxicated* the steadiest minds, and hurried every one into the excesses of intemperate joy; even envy and hatred forgot their energies, and were reconciled, at least for a while, to familiarity and good will.—Orme, vol. II. 187.

কলিকাতার ইংরাজ-দরবার আর কালবিলম্ব না করিয়া একখানি ত্বরিত-গতি জাহাজ সাজাইয়া মহাসমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিলাতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন! এ দিকে সেনাপতি ক্লাইবের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে মুরশিদাবাদ রাজভাণ্ডারের ধনরত্ন সাত শত সিন্দুকে বোঝাই হইয়া এক শত খানি সুসজ্জিত তরণীসংযোগে বৃটিশ বিজয়বৈজয়ন্তী সুবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্যামোদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিশব্দিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল, এবং তথা হইতে ইংরাজ-বন্ধু রাজরাজেন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুরের সেনাদলপরিচালিত হইয়া যথাকালে কলিকাতার ইংরাজ-বন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন হইল! *

ইতিহাসে এরূপ অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্ত্তনের কথা আর কোনও দেশে কেহ শুনিয়াছেন কি না, জানি না। ইংরাজেরাও বলিয়া থাকেন যে, এই উপলক্ষে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই সেরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছে! †

২৬শে জুলাই খেলাত-বিতরণের সমারোহে মুরশিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল। কর্ণেল ক্লাইব সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই ;—সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ একটি সুসজ্জিত হস্তী, দুইটি আস্তরণাবৃত ঘোটক, স্বর্ণখচিত রাজপরিচ্ছদ ও শিরপেঁচ এবং মণিমুক্তাহীরকাদি-জড়িত উষ্ণীষচূড়া উপহার পাইয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং যেখানে যত রণপতাকা ছিল, তাহাতে রণতরণী সুসজ্জিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ কামানধ্বনি করিতে করিতে জল স্থল বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন! অতঃপর মীরজাফরের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয় কে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাই ইংরাজ বাঙ্গালীর সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ বাঙ্গালীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য মীরজাফরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তাঁহার অধিকতর আহ্লাদের কথা এই যে, দেশের লোকে সকলেই মীরজা-

---

* Orme, vol. II. 187—188.

† Few events in history have created a greater revulsion of feeling than the victory at Plassey. The people of Calcutta had been depressed, not only by the capture of the Factory, but by the utter loss of all their worldly goods. But now the disgrace was forgotten in the triumph ; the poverty was forgotten at the sight of the treasure.—Early Records of

ফরের রাজ্যলাভে আনন্দলাভ করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেছে; সিরাজদ্দৌলা এরূপ ভাবে জনসাধারণের শুভকামনা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই!" * এ দিকে সেনাপতি ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাই; যে গুণে আত্মরাজ্যের পাত্রমিত্র-দিগের বিশ্বাস এবং স্নেহমমতা আকর্ষণ করা সম্ভব, সে গুণের একেবারেই অত্যন্তাভাব! তাঁহার শাসনে এই কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ অরাজক হইয়া উঠিয়াছে; চারি দিকে বিদ্রোহশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; আমরা নবাবের নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতেছে, কেবল সেই জন্যই মীর-জাফর কায়ক্লেশে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন!" †

যাঁহারা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র ফলভাক্, তাঁহাদের নিকট এইরূপ সমাদর লাভ করিয়া মীরজাফর "নবাব-সুজা-উল্-মোল্‌ক্-হাসামো-দ্দৌলা-মীরমহম্মদ-জাফর-আলি-খাঁ বাহাদুর-মহবৎজঙ্গ" নাম ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আত্মকার্য্যের পরিণামচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন! ‡

---

* Ive's Journal.

† Mirza Jaffier Beg, whom you have done me the honor to depute to me, has delivered me your letter, and other marks of friendship, with which yon have been pleased to favor me. He has also satisfied my desire, in giving me an ample account of your health and prosperity. But what pleases me beyond expression, is, to hear that all men rejoice in them; and, while they acknowledge you are worthy of them, pray for their continuance. This is a satisfaction your predecessor never knew; and which while it gives the most sublime pleasure to a mind generous like yours, promises happiness to yourself, and a quiet succession to your son.—Letter from Admiral Charles Watson, Commander of the fleet belonging to the most puissant king of Great Britain, irrestible in battle.

‡ In laying open the state of this Government, I am concerned to mention that the present Nabob is a Prince of little capacity, and not at all blessed with the talent of gaining the love and confidence of his principal officers. His mismanagement threw the country into great confusion in the space of a few months, and might have proved of fatal consequence to himself but for our known attachment to him.—Clive's letter to the Court of Directors, 23 December, 1757, para. 2.

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

মশক-সমাচার।

নিদাঘের বায়ুহীন রাত্রে মশকদংশনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ঘর্ম্মসিক্ত শয্যায় লুটাইয়া, আশু মশককুলনিধানের একটি সদুপায় আবিষ্কারের জন্য যখন বিশেষ চিন্তিত,—তখন মশকের ক্ষুদ্রপক্ষান্দোলনজাত সকরুণ বিলাপধ্বনি, হতভাগ্য নিদ্রালুর নির্ম্মম হৃদয় কিছুতেই সেই কঠোর দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। করুণা-উদ্রেকের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, শেষে বরং চপেটাঘাতেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত মানবের কর্ণ-মূলের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকরুণ স্বরে দয়া ভিক্ষা করা অপরাধী মশকের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয় বটে;—কিন্তু অর্থিপক্ষীয় কোনও ব্যক্তিকে, নিদ্রাবিঘ্নকারী মশকের অনুকূলে উকীল হইয়া, তাহাদের নির্ম্মম ব্যবসায়ের সমর্থনে যুক্তিবর্ষণ করিতে দেখিলে, ব্যাপারটা কিছু হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি "মান্দ্রাজ মেল" নামক পত্রে, পুরুষমশককুলের মুখপাত্র হইয়া, এক লেখক (অবশ্যই লেখিকা ন'ন) রক্ত-শোষণব্যাপারে পুংমশকগণের নিরীহতা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বলেন,—উন্নত মনুষ্যসমাজে রুধির-শোষণ কাজটা যেমন স্ত্রীজাতির মধ্যেই আবদ্ধ দেখা যায়, হীন মশকসমাজেও এই নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। পুরুষ মশক, তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সমাজের খুঁটিনাটি সকল কর্ত্তব্যগুলি নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন করে, এবং স্ত্রী মশকগুলি কেবল নানা কৌশলে জীবগণের বিশ্রামে বাধা উৎপাদন করিয়া, রক্তশোষণাদি নিষ্ঠুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—স্ত্রী-মশকগুলি আকণ্ঠ রক্তপান করিয়া, কোনও স্রোতোহীন জলাশয়ের নিকট নির্জ্জন ছায়ায় পাঁচ ছয় দিবস বিশ্রাম করে; পরে জলাশয়ের স্থির জলে ডিম্ব প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন ইহাদের মৃতদেহ জলে ভাসিতে থাকে। যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত ডিম্বগুলি ফুটিলে, তাহা হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলমস্তক কীট উৎপন্ন হয়;—বহুদিনরক্ষিত অনাবৃত জলে এই মশক-কীট প্রায় সচরাচর দেখা যায়। জন্মিবা-মাত্রই কীটগুলি অতি চঞ্চলভাবে জলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই অবস্থায় ইহা-দের আহারেচ্ছা এত অধিক থাকে যে, তাহাদের মাতার প্রাণহীন শরীর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াও তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। রেশম-কীটের ন্যায়, এই কীটদের গাত্রাবরণ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়;—এই পরিত্যক্ত গাত্রাবরণও তাহাদের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় না। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে, কীটাবরণের মধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষযুক্ত মশক উৎপন্ন হয়, এবং যথাকালে উক্ত আবরণ ভেদ করিয়া, পূর্ণাবয়ব মশক বহির্গত হয়। বাহির হইয়াই মশকগণ উড়িতে পারে না; প্রথমতঃ স্ব স্ব গাত্রাবরণের উপর বসিয়া, শরীর শুষ্ক ও পক্ষদ্বয় উড্ডয়ন-ক্ষম করিয়া, তাহার পর ইহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। স্ত্রীমশকগুলিকে প্রথম হইতেই তাহাদের শোণিত-পিপাসাপরিতৃপ্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে দেখা যায়;—শয়নকক্ষের নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বিশ্রামাভিলাষীর অশান্তি-উৎপাদন, প্রথম হইতেই ইহা-দের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

যদিও স্ত্রীমশকগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আজীবন অশান্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু "মান্দ্রাজ মেলের" পূর্ব্বোক্ত লেখক সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে, ইহাদের জীবনে জীবের অশেষকল্যাণকর একটি কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন।

সকল পদার্থই যে সৃষ্টিসংরক্ষণে তৎপর,—লেখক এই অতি প্রাচীন বাক্যের সত্যতা, ম সাহায্যে সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আ জীবশরীরে কতকগুলি পীড়ার বীজ প্রবেশিত করিলে প্রাণিগণ ঐ সকল পীড়ায় আক্র হইতে পারে না, এবং ক্বচিৎ আক্রান্ত হইলেও পীড়া সাংঘাতিক হয় না।—আজ কাল বসন্ত জলাতঙ্ক প্রভৃতি অনেক রোগের আশঙ্কা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিবারিত হইতেছে; তন্মধ্যে বসন্তনিবারণের জন্য, গো-বীজের টীকাপ্রদানপদ্ধতির সহিত পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই প' চিত আছেন। আজ কাল ফ্রান্স প্রভৃতি বিজ্ঞানপ্রধান দেশে, এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞা বলিতেছেন,—গোবীজ-টীকা দ্বারা যেমন বসন্তের আশঙ্কা থাকে না, সেই প্রকার যে কোন রোগ-বীজ জীবশরীরে প্রবেশিত করিলে, সেই রোগ দ্বারা জীবের কোনও অনিষ্টসংঘটনের সম্ভাবনা থাকে না। মশকপক্ষাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত লেখক বলেন, এই অশান্তিকর ক্ষুদ্র জীবগণ, নানা রোগের বীজ প্রতিদিন অজ্ঞাতভাবে আমাদের দেহে প্রবেশিত করিয়া, ঐ সকল সাংঘাতিক রোগের অনিষ্টকারিতা দূর করিতেছে। মানুষ কি কৃতঘ্ন ও নির্দ্দয়! জীবকল্যাণাকাঙ্ক্ষী মশকগণের এই মহৎ মঙ্গলব্রতের অনুষ্ঠানকালে, তাহাদের ক্ষুদ্র হুলের স্পর্শটি পর্য্যন্ত মানুষ সহ্য করিতে পারে না,—পক্ষান্তরে এই নিঃস্বার্থ সদনুষ্ঠানের পুরস্কারস্বরূপ চপেটাঘাতের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র জীব দ্বারা বিধাতার সৃষ্টিরক্ষার যে বিশেষ সহায়তা হইতেছে, তাহাতে আর লেখকের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।—মশকগণ রোগীদিগের রক্তশোষণ করিয়া, পরে সুস্থ ব্যক্তির রুধির পান করিতে আরম্ভ করিলে, রোগীর শরীরস্থ ব্যাধিবীজের কিয়দংশ সুস্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। লেখক বলেন,—যে সকল মশক পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির শোণিত পান করে নাই, তাহাদের দ্বারাও এই কার্য্য সাধিত হয়; কারণ, মশকগণ শৈশবাবস্থায় তাহাদের মাতার মৃতদেহভক্ষণকালে, মাতার উদরস্থ রক্তের সহিত, তাহাতে মিশ্রিত ব্যাধিবীজও ভক্ষণ করে;—ইহারই ফলে, প্রত্যেক মশকই এক একটি রোগনাশক যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে, এবং পূর্ণাবস্থ হইয়া যাহাকে দংশন করে, তাহাকে আর কিছু দিনের জন্য ব্যাধির ভাবনা ভাবিতে হয় না। এ দেশে কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি নূতন আসিলে শীঘ্রই তাঁহাকে স্থানীয় ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, এবং অনেক সময় আক্রমণের ফল বড় সাংঘাতিক হইয়া থাকে।—কিন্তু অপর পক্ষে, স্থানীয় লোক বেশ নির্ব্বিবাদে ব্যাধি-নির্লিপ্ত হইয়া বেড়াইতে থাকেন। লেখক অনুমান করেন, এই বিসদৃশ ব্যাপারটা মশকাদির ন্যায় রক্তপায়ী কীটের কীর্ত্তি। ইহারা প্রতি রাত্রেই দংশন করিয়া স্থানীয় ব্যাধিবীজ, স্থায়ী অধিবাসিগণের শরীরে এত অধিক প্রবেশ করাইয়া দেয় যে, সেই সেই রোগে স্থানীয় লোকগণকে আর ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় না; কিন্তু নবাগত ব্যক্তি শীঘ্রই সেই সকল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। লেখক মহাশয় যাহাই বলুন,—আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় আট মাস লোকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, এবং রাত্রে (অনেক সময় দিবসেও) মশকের অভাব বড় অনুভব করা যায় না,—তবে মশকদষ্ট ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পীড়াগ্রস্ত কেন?—ইহার উত্তরে তিনি কি বলেন?

ইন্দ্রিয়-জ্ঞান।

জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবই অল্পাধিকপরিমাণে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন;—ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জীব কি প্রকারে জ্ঞানসম্পন্ন হয়,—শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক দিন হইতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিতেছেন। আলোচনার সুফল অবশ্যই পাওয়া গিয়াছে,—কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিক ব্যাপারগুলি "জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ" ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া

তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইতে বলিয়া মোহিনীমোহন এক বন্ধুগৃহে সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল। আহারান্তে নিশ্চিন্ত মনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সে দেখিল যে, মশারীর মধ্য হইতে আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী তাহাকে প্রণাম করিল, তখন জননীর উপর তাহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। দিদির শিক্ষামত তাহার পত্নী যখন তাহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে কেবল "মন্দ নহে" বলিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। রাগে মোহিনীমোহন গর্ গর্ করিতে লাগিল।

তাহার পরদিবস শ্বাশুড়ীর একটু অসুখ দেখিয়া কিরণ আপনা হইতে বলিল, "মা, যে কয় দিন তোমার অসুখ না সারে, সে কয় দিন আমি কেন কাছে থাকি না!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "মা, তোমারই ত সংসার —আমার কি অসাধ যে তোমায় এখানে রাখি! মোহিনীর তা ইচ্ছা নয়। এই দুই দিন রেখেছি, তাই ভয়ে মরিতেছি। আজ কাল ছেলেরা কি কারো কথা শুনে যে বুঝাইব! রূপগুণ নহিলে তারা বৌ দেখিতেই চায় না। তা মা, তুমি এবার বাপের বাড়ী গিয়ে একটু পড়া শুনা করিয়ো।" রূপের কথা বলিয়া আর ফল নাই—শ্বাশুড়ী কেবল গুণের কথাই ভাল করিয়া বলিলেন। কিরণ বুঝিল, কেন তাহার স্বামী তাহার উপর বিরক্ত। সেই দিন রাত্রে কিরণ স্বামীকে বলিল, "তুমি আমার কাছে রাখিয়া পড়াও না কেন!" মোহিনীমোহন বলিল, "আমার সময় নাই। তুমি কবে বাপের বাড়ী যাইবে?" "কাল যাইব" বলিয়া কিরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তাহার পর দিন কিরণ পিত্রালয়ে গেল, আর তাহাকে এক দিনের স্থানে দুই দিন দুই রাত্রি গৃহে রাখায় পুত্রের ক্রোধে মোহিনীমোহনের মাতা উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময় মোহিনীমোহন সাবালক হইল। তাহার পিতার উইলের ট্রষ্টিরা তাহাকে তাহার আয়ব্যয় বুঝাইয়া দিলে সে দেখিল যে, অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাকে ভাবিতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষায় দুই বার অকৃতকার্য্য হইয়া সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল; এবার কলেজ ছাড়িয়া সেই রাগের শোধ লইল। পরিচিতেরা বলিলেন, "বার বার তিন বার দেখিলে হইত না?" সে জানিত যে, একবার চেষ্টা করিলেও যে ফল হইবে, শতবার চেষ্টা করিলেও সেই ফল হইবার সম্ভাবনা। যাহার এক বিষয়ে ঝোঁক অত্যন্ত

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া মোহিনীমোহন সাহিত্যচর্চ্চায় মনোযোগ দিল। সেক্সপিয়ার, বায়রণ, শেলী, টেনিসনের গ্রন্থাবলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

মোহিনীমোহন বিদ্যালয় ত্যাগ করিল; কিন্তু যশস্বী হইবার বাসনা তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। আপনার প্রতিভার উপর তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল; সে জানিত, চেষ্টা করিলে সাহিত্যের পথে সে যশস্বী হইতে পারিবে। মোহিনীমোহন লেখক হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভাশালী লেখকের কথনও স্থানাভাব হইতে পারে না। উদয়োন্মুখ তপনের করের মত মোহিনী-মোহনের যশ ধীরে ধীরে দীপ্ত হইতে লাগিল।

৩

ম্লান যূথিকার মত বিষাদিতা কিরণ যখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে সুখী মনে করিল; কারণ, এবার তাহার মন হইতে একটা গুরুতর সংশয় দূর হইয়াছিল—সে বুঝিয়া আসিয়াছিল, যে পতির প্রেম সকল রমণী আপনার প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করে, কেন সে প্রেম সে পায় নাই। ঘসিয়া মাজিয়া রূপ হয় না—কিন্তু চেষ্টা করিলে বিদ্যাশিক্ষা ত হইতে পারে! আবার রূপের মোহ অপেক্ষা গুণের আকর্ষণ কত অধিক?

পিত্রালয়ে আসিয়া কিরণ বাপের কাছে জিদ ধরিল যে, তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতে হইবে। একদিন তিরস্কারের ফলে তিনি যে অভিমানিনী দুহিতাকে গত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও পুস্তক হাতে করাইতে পারেন নাই, সহসা তাহার এ বিদ্যার্জ্জনস্পৃহা দেখিয়া তাহার পিতা কিছু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কিরণের পড়া আরম্ভ হইলে তিনি আরও আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার হাত হইতে পুস্তক নামে না; সে ছয় মাসে যাহা শিখিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, কিরণ দুই মাসে তাহা শিখিল। তাহার পর ক্রমেই সে দুরূহ গ্রন্থ সকল শেষ করিতে লাগিল। কিরণ ভাবিত, স্বামীর প্রেম না পাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তাই নববিকশিত-প্রেম-মাধুরীময়ী কিরণ সেই প্রেমলাভের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল।

৪

সাহিত্যের একটা আকর্ষণ আছে; সেই আকর্ষণে সে সাহিত্য-সেবককে আকৃষ্ট করে;—তাহার পর আপনার মোহরসে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে।

করে, তাহার পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা সহজ নহে। সাহিত্যের নেশা মোহিনীমোহনকে বিভোর করিয়া তুলিল।

এ দিকে মাসের পর মাস যাইতে লাগিল; মার শত অনুরোধ সত্ত্বেও মোহিনীমোহন কিরণকে তাহার গৃহে আনিতে স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে একদিন মা যখন বলিলেন, "বাবা, আমার বয়স ত ক্রমেই বাড়িতেছে, আমি আর পারিয়া উঠি না। বৌমাকে আনিলে আমারও ত কিছু শ্রম লাঘব হয়! বিবাহ করিয়াছিস্, ফেলিয়া দিতে ত পারিবি না। আর তা'র বাপ মাই বা চিরকাল তোর স্ত্রীর ভার বহিয়া মরিবে কেন?" তখন মোহিনীমোহন ভাবিল যে, পত্নীর ভার বহিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেই বাধ্য; তদ্ভিন্ন তাহার প্রেম বা যত্নে তাহার পত্নীর অধিকার নাই সত্য, কিন্তু তাহার গৃহকর্ম্ম করিবার তাহার অধিকার আছে; যে স্ত্রী স্বামীর কার্য্যে সহকারিণী নহে, সে স্বামীর দাসী ব্যতীত আর কি?

এক বৎসর পরে কিরণ স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সে মনে মনে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মত এতটুকুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সে সংসারিক নানা কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া অতি সহজেই শ্বাশুড়ীর স্নেহশীল হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল।

এবার পতিগৃহে আসিয়া প্রথমেই কিরণের ইচ্ছা হইয়াছিল, স্বামীকে একবার বলিবে যে, সে লেখাপড়া শিখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইয়াছিল—ছিঃ, তাহার স্বামীর বিদ্যার তুলনায় তাহার বিদ্যা! কোন্ লজ্জায় সে কথা তাঁহাকে বলিবে! কিরণ সে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া স্বামীকে বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী—তুমি আমাকে পড়াও না কেন?" নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে মোহিনীমোহন উত্তর দিল, "আমার সময় নাই।" সে রাত্রে মোহিনীমোহন ঘুমাইল, আর কিরণ কাঁদিতে লাগিল।

পর দিবস হইতে কিরণ দিবাভাগে আহারান্তে শ্বাশুড়ী ঘুমাইলে, আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িত। আসিবার সময় পুস্তকগুলি বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া আসিত; কেহ জানিত না যে, সে পড়ে। একটু বুঝিতে শিখিলে যাহার ইচ্ছা থাকে, সে চেষ্টা করিয়া আপনিও অগ্রসর হইতে লাগিল তাহার কুরূপা ও বিদ্যাহীনা পত্নী যে তাহার প্রেমলাভের আশায় এত চেষ্টা

—আপনার কার্য্যে ব্যস্ত মোহিনীমোহনের মনে এ কথা একবারও উদিত হইল না।

সংসার চলিতে লাগিল; যে সংসারে স্বামী স্ত্রীর প্রেমে মালিন্য আছে, সে সংসার যেমন চলে, তেমনই চলিতে লাগিল। সে সংসারের সমস্ত শরীরে, সকল শিরা উপশিরায় মিথ্যা প্রবাহিত হয়। সে সংসারে অসুখী পত্নী শত প্রকারে সুখীর ভান করিয়া, লোককে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহার সুখের সীমা নাই; সে সংসারে পত্নীর সামান্য কষ্টে তাহার দশ গুণ কষ্ট ও চিন্তা দেখাইয়া পতি লোককে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, তাঁহাদিগের পতিপত্নীর প্রেমে কোথাও এতটুকু মালিন্য নাই। উভয়েরই চেষ্টা হয়,—আর কেহ প্রকৃত কথা জানিতে না পারে। আন্তরিকতাহীন বাক্যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের কথা কহেন—কেহ কাহারও কোনও দোষ দেখিতে পান না। অথচ, দুই জনেরই অসুখের অবধি থাকে না। প্রেমের উৎস হৃদয়ে—মুখে নহে। সেই জন্য যে সংসারে পতিপত্নীর প্রেমে মালিন্য আছে, সে সংসার মিথ্যায় পূর্ণ।

মোহিনীমোহনের সংসারও সেইরূপে চলিতে লাগিল। আপনার গর্ব্ব-শিখরে আরোহণ করিয়া মোহিনীমোহন পত্নীকে নিতান্তই নগণ্য—নিজের নিতান্তই অযোগ্য দেখিতে লাগিল। পুরুষ এমনই গর্ব্বান্ধই বটে!

৫

এই সময় এক আকস্মিক বিপৎপাত হইল। কিরণের পতিগৃহে আসিবার কয় মাস পরে মোহিনীমোহনের বসন্ত রোগ হইল। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কিরণের পিতা একবার কিরণকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। মোহিনীমোহনের মাতার তাহাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু কিরণ কিছুতেই যাইতে চাহিল না। শাশুড়ী বলিলেন, "ছোঁয়াচে রোগ—ভয় করে; যে কয় দিন না সারে, তুমি বাপের বাড়ী থাকিয়া আইস। শুশ্রূষা আমি করিব।" কিরণ মনে মনে ভাবিল—তুমি তোমার পুত্রের শুশ্রূষা করিয়া জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পার, আর আমিই কি আমার স্বামীর সেবা করিয়া জীবন দিতে পারি না? সে প্রকাশ্যে বলিল, "মা, এই সময় কি আমায় তাড়াইয়া দিবে? আমি এখন বাপের বাড়ী যাইব না।" অগত্যা শাশুড়ী সম্মত হইলেন।

কিরণ কাহারও বারণ শুনিল না, রোগীর সেবা করিতে লাগিল। যাতনায় কাতর হইয়া মোহিনীমোহন যখন তাহার ক্ষতপূর্ণ হস্তে শুশ্রূষাকারিণী পত্নীর

বারিধির মত বিত্রস্ত হইয়া উঠিত। আনন্দে, আশঙ্কায় সে কাঁদিয়া ফেলিত। বিরামবিহীন হইয়া সে স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। সে যে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে পাইল, ইহাতেই সে অসীম আনন্দ অনুভব করিল।

মোহিনীমোহন যখন ক্রমে ক্রমে সারিয়া উঠিতে লাগিল, তখন কিরণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। রোগী যখন এক এক বার জিজ্ঞাসা করিত,—"তুমি কে?" তখন আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। কিন্তু তাহার নাম শুনিলেই যখন বিষাদে নৈরাশ্যে মোহিনীমোহনের মুখ অন্ধকার হইত, তখন আপনারও অজ্ঞাতে তাহার চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিত।

ক্রমে ক্রমে মোহিনীমোহন সারিয়া উঠিল। বসন্ত তাহার জীবন রাখিয়া গেল; কিন্তু তাহার দৃষ্টি লইয়া গেল। মোহিনীমোহন অন্ধ হইয়া রহিল।

৬

যশ!—কথাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র কথাটিতে যত আকর্ষণ, যত উন্মাদকতা আছে,—পাপেও তত আকর্ষণ নাই, মদ্যেও তত উন্মাদকতা নাই। যে একবার যশোদেবীর কৃপাদৃষ্টি পাইয়াছে, সে তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া কিছুতেই জীবনধারণ করিতে চাহে না; সে যশ হারাইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিবে।

অন্ধ হইয়া মোহিনীমোহন সেই যশ হারাইতে বসিল। অন্ধের পক্ষে সাহিত্যসেবায় নানা অসুবিধা। যাহাকে সকল কার্য্যের জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার নির্ভর যদি তাহাকে আপনার না ভাবে, তবে তাহাকে সকল বিষয়েই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভৃত্যের কাজ কোনও কালেই মনঃপূত হয় না। অন্ধ আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া সাধারণতঃ খিট্‌খিটে হইয়া উঠে;—তাহাতে আবার অন্ধত্ব যখন যশোলাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার দুঃখ ও কষ্টের আর সীমা থাকে না।

অন্ধ হইয়া মোহিনীমোহন দেখিল যে, সে আপনি লিখিতেও পারে না; কালি, কলম, কাগজ সব পাইলেও স্থান নির্ণয় করিয়া লিখিতে না পারিয়া সে কলম ফেলিয়া দিত, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিত।

দিন দিন মোহিনীমোহন জীবন যন্ত্রণাকর বোধ করিতে লাগিল। এখান হইতে ওখানে যাইতে হইলে সাত বার ভৃত্যকে ডাকিতে হয়;—একটা জিনিস চাহিলে তাহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়! কিন্তু এ সকলে মোহিনীমোহন তত ব্যথিত না হইল, সাহিত্যসেবার পক্ষে অসুবিধা দেখিয়া সে তত

ব্যথিত হইল। শেষ ক্রোধে, অভিমানে, বিরক্তিতে সে স্থির করিল,—এ জীবনের বোঝা আর বহিয়া কাজ নাই। সে ভাবিল, আত্মহত্যা করিয়া সকল যাতনা ঘুচাইবে।

মরণসঙ্কল্প করিবার পর মোহিনীমোহন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; বক্ষে বিষধর রাখিয়া কি কেহ স্থির থাকিতে পারে! সে সর্ব্বদাই মরিবার সুবিধা খুঁজিত।

তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া কিরণ ভীতা হইল। স্ত্রী যেমন করিয়া স্বামীর সকল খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে, স্বামী স্ত্রীর সকল খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করে না। তাহার পর একদিন পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, ভৃত্যকে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া নিষ্ফল আক্রোশে মোহিনীমোহন বলিতেছে, "পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শত গুণে শ্রেয়ঃ।" শুনিয়া কিরণের শিরায় শিরায় রক্তস্রোত যেন শীতল হইয়া গেল—হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কিরণ কাঁদিতে লাগিল।

সেইদিন হইতে যখন তখন স্বামীর কক্ষদ্বারে গিয়া কিরণ দেখিয়া আসিত, তাহার স্বামী কি করিতেছে। শ্বাশুড়ী গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃতা থাকিতেন; কিরণের কার্য্য কেহ লক্ষ্য করিত না। কিরণ এত সতর্ক হইয়া এমন ধীরপদে গমনাগমন করিত যে, অন্ধজনসুলভ তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি সত্ত্বেও মোহিনীমোহন তাহার পত্নীর গমনাগমনের কিছুই জানিতে পারিত না।

মোহিনীমোহন দিন দিন বড় রাগী হইয়া উঠিতে লাগিল,—সামান্য কারণেই সে ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল। কিরণও সময়ে সময়ে তাহার তিরস্কার ভোগ করিত; তাহাতে কিরণের স্বামিসেবায় একদিনও একটু অবহেলা হয় নাই।

এইরূপে মোহিনীমোহন ক্রমেই অধিক চঞ্চল হইতে লাগিল—আর কিরণ ক্রমেই অধিক সতর্ক হইতে লাগিল।

৭

এমনই করিয়া মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। প্রথম বৈশাখে একদিন সারাদিন গুমটের পর সন্ধ্যাকালে বড় মেঘ উঠিল,—সন্ধ্যার পরেই মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হইল। বহুদিন পরে আপনাদের রুদ্ধশক্তি মুক্ত করিয়া জলদগণ বড় মাতামাতি করিতে লাগিল; সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার গগনে ঘনঘন বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে লাগিল—যেন সীমা হইতে সীমান্তরে ঝটিকার তীব্র হাস্যোচ্ছাস আকাশের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া অনন্তে মিশাইয়া

যাইতে লাগিল; হুহু করিয়া পবন গর্জ্জন করিতে লাগিল; বজ্রনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। শূন্য কক্ষে বসিয়া মোহিনীমোহন ভাবিল, এমন সুযোগ আর শীঘ্র হইবে না,—এই সময় যদি বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়ি—তবে এখন কেহ তাহা জানিতেও পারিবে না। উঠিয়া হাত বাড়াইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে দ্বারে গেল; দ্বার মুক্তই ছিল—সে বারান্দায় গেল, রেলিং ধরিল—লাফাইয়া পড়িবে। বৃষ্টিবিন্দু তাহার দৃষ্টিহীন নয়নে ও বদনে আঘাত করিতে লাগিল।

সহসা বিদ্যুৎ চমকিল;—এমন সময় কে আসিয়া পতনোন্মুখ মোহিনীমোহনকে ধরিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কাহার বাহুপাশবদ্ধ হইয়া মোহিনীমোহন পিছাইয়া আসিল। কম্পিতস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" কাঁদিতে কাঁদিতে আগন্তুক বলিল, "কিরণ।" তীব্রতম ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে মোহিনীমোহন বলিল, "তুমি জীবনে আমার সর্ব্বসুখের অন্তরায় হইয়াছ,—আজ আমার মরণেরও তুমি অন্তরায় হইতে আসিয়াছ?"

স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষে আসিয়া কিরণ অঞ্চলে স্বামীর সিক্ত কেশরাশি মুছাইয়া দিল। মোহিনীমোহন রাগে ফুলিতে লাগিল।

৮

কাঁদিতে কাঁদিতে কিরণ স্বামীকে বলিল, "কেন তুমি জীবন ত্যাগ করিবে?" মোহিনীমোহন বলিল, "আমার যশোহীন, সুখহীন এ জীবনের বোঝা আর বহিতে পারি না।" কিরণ বলিল, "কি হইলে তোমার যশ থাকে, সুখ থাকে?" তাহার স্বামী বলিল, "সাহিত্যসেবা করিয়া আমি যশ পাইয়াছি, সুখও পাইয়াছি।" কিরণ বলিল, "সাহিত্যসেবা কর না কেন?" ক্রুদ্ধস্বরে তাহার স্বামী বলিল, "অন্ধ কেমন করিয়া সাহিত্যসেবা করিবে? আজ তুমিও কি আমাকে অন্ধ পাইয়া উপহাস করিতে আসিলে?" কিরণ এত দিন যাহা বলিতে পারে নাই, আজ তাহাই বলিল;—বলিল, "একবার কি দেখিবে, যদি আমি তোমার কোনও সাহায্য করিতে পারি?" কিরণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধস্বর ত্যাগ করিয়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া মোহিনীমোহন বলিল, "তুমি সাহায্য করিবে! কি করিবে?" কিরণ বলিল, "দেখিব, তুমি যাহা বলিবে, তাহা যদি লিখিতে পারি; তুমি যাহা পড়িতে বলিবে, তাহা যদি পড়িতে পারি। আমার একটা অনুরোধ কি রাখিবে না? তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আর কখনও কিছু চাহে নাই।" মোহিনীমোহন বলিল, "ভাল।" ...

কূলে দাঁড়াইয়া মোহিনীমোহন দেখিল, সে জীবনে কখন তাহার পত্নীর দিকে ফিরিয়া চাহে নাই ; মরণকালে তাহার একটা সামান্য অনুরোধ রাখিলে যদি সে সুখী হয়, হানি কি ?

এত অল্পে যে সুখী হয়—সে মুখ আঁধার করিয়া আছে,—ভাবিয়া কি কেহ সুখে মরিতে পারে ? জগতের হাটে যখন দোকান পাট গুটাইতে হয়, তখন কাহাকেও মনঃকষ্ট দিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। আর জীবন যদি কেবল সুখের না হয়, তবে যত দুঃখের বলি, তত দুঃখেরও নহে। আশা চিরদিন মানবজীবন সুখময় করিয়া রাখে।

* * * * *

পরদিন মোহিনীমোহন পত্নীকে একখানা পুস্তক হইতে খানিকটা পড়িতে বলিল ; কিরণ অনায়াসে পড়িয়া গেল। তাহার পর সে যাহা বলিতে লাগিল, কিরণকে তাহা লিখিতে বলিল ;—কিরণ লিখিতে লাগিল ; কিরণ যখন তাহা পড়িয়া শুনাইল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া মোহিনীমোহন বলিল, "কই কিরণ, আমি ত পূর্ব্বে ইহার কিছুই জানিতাম না !" এই প্রথম মোহিনীমোহন পত্নীকে নাম ধরিয়া ডাকিল ; আনন্দে কিরণের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যদি তোমার হৃদয়ে একটু স্থান পাই, সেই আশায় আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি। তোমার ভালবাসা পাইবার জন্য কি আমি এতটুকুও করিতে পারি না ?"

মোহিনীমোহনের বোধ হইল যে, প্রভাতে যে বিহগকাকলি শুনিয়া গোলাপ বিকশিত হয়,—তাহার পত্নীর কণ্ঠস্বর তাহার অপেক্ষাও মধুর। সে পত্নীকে কাছে আসিতে বলিল। জীবনে প্রথম পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীমোহন বলিল, "কিরণ, আমি অন্ধ না হইলে এত সুখ পাইতাম না।" কিরণের গণ্ডে গোলাপ ফুটিয়া মিশাইয়া গেল,—স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে অন্ধের জীবনে স্রোত ফিরিল। কিরণ সত্য সত্যই তাহার স্বামীর গৃহে গৃহিণী, সাংসারিক কার্য্যে মন্ত্রী এবং কাব্যালোচনায় সখী হইল। মোহিনীমোহন পূর্ব্বে যে সুখ পায় নাই, এখন তাহা পাইল ; সে, আলোকে যে আনন্দ পায় নাই, অন্ধকারে সেই আনন্দ লাভ করিল ; প্রেমালোকে তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইল। তখন তাহার যশ বা সুখ কিছুরই অভাব রহিল না।

জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ দূত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসিলে, যে সকল ইংরাজ ভারতীয় মোগল সম্রাটগণের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সার্ টমাস্ রোর নাম অগ্রগণ্য হইবার যোগ্য।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে, এসেক্সের লো লেটন নামক নগরে রোর জন্ম হয়; তিনি অক্সফোর্ডের অন্তর্গত ম্যাগ্‌ডালেন কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সার্ উপাধি লাভ করেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, রো একবার আমেরিকায় গিয়াছিলেন। দৌত্যকার্য্যে সার টমাস্ রো কূট রাজনীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহাকে ভদ্রব্যবহারের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং তিনি ললিত কলা ও বিদ্যার যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতেন। তদানীন্তন অন্যান্য রাজদূতগণ রাজসভায় অত্যন্ত চাটুকারিতার পরিচয় দিতেন, কিন্তু রো সাহেব এ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়ালগণের বাণিজ্যে সাহায্যপ্রদানের জন্য মোগল সম্রাটের সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি স্থাপিত হয়, কোম্পানীর পক্ষের দুই এক জনের চেষ্টায় বা যত্নে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। হকিন্স্, ক্যানিং, কেরিজ্ এবং এড্‌ওয়ার্ডস্ প্রভৃতি কোম্পানীর অনেক দূতকে এ জন্য নিষ্ফল প্রয়াসে সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা কেহই রো সাহেবের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। সন্দিগ্ধ এবং উদ্বিগ্নহৃদয়ে বহু বৎসর অতিবাহিত করিবার পর রোর এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। সার টমাস্ রো সুরাটে উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা এবং দেশীয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; রো সংকল্প করিলেন, সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সময় অন্যান্য রাজদূত ও সভাসদ্বর্গের ন্যায় অবনতদেহে সেখানে প্রবেশ করিবেন না।

সার টমাস্ রো স্ববর্ণিত ইতিহাসে মোগলরাজসভায় তাঁহার প্রথম উপস্থিতির কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—"আমি দরবারের সন্নিকটস্থ হইবামাত্র এক জন লোক আমাকে জ্ঞাপন করিল যে, রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে মস্তক অনাবৃত করিয়া ভূমি পর্য্যন্ত নত করিতে হইবে। আমি ইহাতে অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভামধ্যে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে রেলিং দেওয়া একটা স্থান, উপরে উঠিবার তিনটি

সোপান; এখানে আসিয়া আমি সম্মান প্রকাশ করিলাম, আমার সঙ্গী মহাশয় দেহ নত করিলেন। তাহার পর আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। নগরের সমস্ত প্রধান লোক সেখানে ক্রীতদাসের ন্যায় করযোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, আমি সম্রাটের ঠিক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম; তিনি তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন না, আমাকে আসনপ্রদান করিবারও অনুমতি হইল না।"

সুরাট হইতে সার টমাস্ ও তাঁহার সহযোগী বহরমপুরে যাত্রা করেন; তথায় সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র পার্ব্বিজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখানে তিনি সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। এক শত অশ্বারোহী সৈন্য দুই পাশে সারি দিয়া প্রাসাদের সম্মুখের পথে দণ্ডায়মান ছিল; সেই সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর জেম্‌সের দূত সদলবলে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সাহজাদা পার্ব্বিজ এই সময়ে গুপ্ত দরবারে এক সমুচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন; সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ও ওমরাহবর্গ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। এক জন দ্বিভাষীর সাহায্যে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

সম্রাটপুত্রের উপবেশনের স্থানটি বহুমূল্য কারুকার্য্যশোভিত বসনখণ্ডে আবৃত, কক্ষে স্থূল ও সুকোমল গালিচা বিস্তৃত। সার্ টমাস্ যে সকল উপহারদ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সাহজাদা সাগ্রহে সে গুলি পরীক্ষা করিলেন। এই সকল উপহারদ্রব্যের মধ্যে একপ্রকার তীব্র সুরা ছিল; পার্ব্বিজ এই সুরা পান করিয়া এমন উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, শীঘ্র দরবার ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতে হইল।

বহরমপুর দর্শন করিয়া সার টমাস্ আজমীর যাত্রা করিলেন। এই সময়ে আজমীরে বাদসাহের দরবার হইতেছিল। অক্টোবর মাসে শীত ঋতুর প্রারম্ভে প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সার্ টমাস্ রো এবং তাঁহার সহচরবর্গ প্রীতিলাভ করিলেন। রাজস্থানের বিভিন্ন গিরিসঙ্কট ও অধিত্যকাশ্রেণী দেখিয়া পূর্ব্বপরিচিত আমেরিকার পার্ব্বত্য দৃশ্যসমূহ তাঁহার নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। এই সময়ে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল; সার্ টমাস্ রো দীর্ঘ পথপর্য্যটনের পর আজমীরে উপস্থিত হইলেন; সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না।

সম্রাট যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত এই বৈদেশিক রাজদূতের অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে নুরজাহানের নাম ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতে-

ছিল। রো সাহেব লিখিয়াছেন, কি রূপলাবণ্যে, কি শিক্ষা ও রুচির নৈপুণ্যে, নূরজাহান তখন ভারতের অদ্বিতীয়া রমণী; তিনি কবিতা লিখিতে পারিতেন, এবং পারস্য ভাষাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত; তিনি সর্ব্ববিধ উন্নতির পক্ষপাতিনী ছিলেন; তাঁহার সুরুচিগুণে সম্রাটের রাজসভার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এবং অর্থের অপব্যয়ে তাঁহার স্পৃহা না থাকাতে, ব্যয়বাহুল্যের অনেক হ্রাস হইয়াছিল। নূরজাহানের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে জাহাঙ্গীরের অনেক দুর্দ্দান্ত শত্রুও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক জ্ঞানে তিনি সম্রাটের যোগ্য মহিষী ছিলেন। নূরজাহান আমরণ সম্রাটের অত্যন্ত অনুরাগিণী ছিলেন। মৃত্যুর পর নূরজাহানের অনুরোধেই লাহোরে তাঁহাকে স্বামীর সমাধিপার্শ্বে সমাহিত করা হয়;—মর্ম্মরময় তাজমহল এখনও তাঁহারই স্মৃতিচিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং এই মহামূল্যমণিমাণিক্যখচিত শুভ্রমার্ব্বেলকিরীটী তাজ, হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে রাজেন্দ্রের ন্যায় শত শত বৎসর ধরিয়া অপূর্ব্ব গৌরবে পৃথিবীর বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যেখানে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মৃত দেহ সমাহিত হইবার কথা ছিল, তাঁহারা সেখানে সমাহিত হন নাই।

সম্রাট সার্ টমাস্ কর্ত্তৃক আনীত উপহার দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই। উপহারের প্রত্যেক সামগ্রী তিনি বালকোচিত কৌতূহলসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেবল কয়েকটি বিলাতী কুকুর (mastiff) দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন;—সম্রাটের প্রাসাদে এমন সুন্দর কুকুর একটিও ছিল না। এতদ্ভিন্ন, একখানি বিলাতী গাড়ী পাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অতঃপর এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। সার্ টমাস্ কর্ত্তৃক আনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহারসামগ্রীর মধ্যে ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছোট ছবি ছিল; সম্রাটকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে, এই ছবিখানিতে এরূপ কোনও বিশেষত্ব ছিল না। অন্যান্য দ্রব্যস্তূপের মধ্যে এখানি এক পাশে ফেলিয়া রাখিলেই সার্ টমাস্ বোধ হয় ভাল করিতেন; কিন্তু সম্রাটের রুচি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই হউক, আর সম্রাটের কৌতূহলের আতি-

এই ছবিখানি টানিয়া বাহির করিলেন। এই চিত্রে, রূপবতী ভিনস দেবী একটা দৈত্যের নাসিকা ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ চিত্রিত ছিল। বিষয়টি সামান্য, কিন্তু সম্রাট ইহাতেই বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইলেন। মনে করিলেন, এই বৈদেশিক দূত তাঁহাকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই এই ছবি লইয়া আসিয়াছে। সম্রাট সিদ্ধান্ত করিলেন, চিত্রাঙ্কিত দৈত্য স্বয়ং তিনি, এবং যে রমণীমূর্ত্তি দৈত্যের নাসাকর্ষণ করিতেছে, সে রূপবতী নুরজাহান ভিন্ন আর কেহ নহে। সম্রাট আরও স্থির করিলেন যে, এই চিত্রে যদি তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর প্রতি কটাক্ষ না থাকে, তাহা হইলেও, ইহাতে তাঁহার প্রজা ও সভাসদ্‌বৃন্দের প্রতি যে কটাক্ষ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিত্রাঙ্কিত দৈত্য কৃষ্ণবর্ণ, অতএব সম্রাটের সহজেই বিশ্বাস হইল, এই দৈত্য তাঁহার প্রজাসমষ্টির প্রতিকৃতি, এবং রমণী তাহার নাসিকা ধারণ করিয়া চালিত করিতেছে, ইহার মর্ম্ম এই যে, ভারতের রমণীগণ বর্ব্বর পুরুষগুলিকে এইরূপে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়, তাহাদের কোনও প্রকার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রকাশের ক্ষমতা নাই। সম্রাটের ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি সার টমাসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, এইরূপ চিত্র আনিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কঠোর স্বরে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সার টমাসের সঙ্গে একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন, সম্রাট তাঁহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু এই চিত্রের মধ্যে কি গোপন অভিপ্রায় গুপ্ত থাকিতে পারে, তাঁহারা কেহই তাহা বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে নীরব দেখিয়া সম্রাট সক্রোধে বলিলেন, যে দ্রব্যের মর্ম্ম তাঁহারা স্বয়ং বুঝিতে অক্ষম, সে দ্রব্য তাঁহার জন্য লইয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল?

যাহা হউক, যখন সম্রাটের কোনও সভাসদ এই চিত্র হইতে কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিল না, তখন তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, এবং সার টমাস সে দিনের মত বিদায়গ্রহণের অনুমতি পাইলেন। কিন্তু সম্রাটের মনে তখন পর্য্যন্তও সন্দেহ ছিল; এই চিত্রের মধ্যে বাস্তবিকই কোনও গোপন উদ্দেশ্য নাই, বা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা চিত্রিত হয় নাই, সার টমাস এ কথা অবশেষে অতি আগ্রহভরে প্রকাশ করিলে, সম্রাটের মনোমালিন্য বিদূরিত হইল।

সম্রাটের হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। একদিন প্রাসাদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল; তিনি নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাট মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সার টমাস বুঝিলেন, সুরা যত উগ্র হয়, ততই তাহা সম্রাটের প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি সম্রাটের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন যে, যদি এই চপলচিত্ত সম্রাটকে কখনও বশীভূত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বহুমূল্য সুতীব্র মদ্য উপহার দিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্রাটের জন্য মদ্য পাঠাইবার অনুরোধ ছিল; এখানে আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"মদ্য ভিন্ন আর কোনও জিনিসের এখানে সম্মান দেখিলাম না। সম্রাট এবং শাহজাদাগণ লোহিত মদ্যের যেমন ভক্ত, এমন আর কেহই নহে; সুরাটের শাসনকর্ত্তা এই মদ্য কয়েক বোতল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সম্রাট তদবধি আরও অধিকপরিমাণে এই মদ্যের উমেদার আছেন; বোধ করি, চারি পাঁচ পিপা এই মদ্য পাইলে সম্রাট চীপসাইডের মহামূল্য রত্নাদির অপেক্ষা তাহার অধিক সমাদর করিবেন।"

বাস্তবিকই সম্রাট সার টমাসের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি বিগত নয় বৎসর কাল প্রত্যহ প্রচুরপরিমাণে দুই বার চোয়ান অতি উগ্র স্পিরিট পান করিয়া আসিতেছেন; এই মদ্য তিনি দিবসে চৌদ্দ পেয়ালা এবং রাত্রে ছয় পেয়ালা পান করিতেন। সার টমাসের মতে, তাঁহার অহোরাত্রের পানীয় মদ্যের পরিমাণ ছয় সেরের কম নহে। কিন্তু সম্রাট কেবলমাত্র মদ্যপান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; মদ্য ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ উৎকট মাদকদ্রব্যসেবনেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সার টমাস রো বিবেচনা করেন যে, হোমারের বর্ণনানুসারে নেপেন্থি যেমন প্রাচীন গ্রীকগণের নিকট, প্লিনির নির্দ্দেশানুসারে একামেনিস এবং পোটোম্যাণ্টিস যেমন প্রাচীন রোমক জাতির নিকট, ওফিউসিয়া যেমন ইথিওপিয়ানদিগের নিকট, অহিফেন যেমন চীন জাতির নিকট, মুকামোর যেমন কামস্কটকার অসভ্য অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় মাদক, ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট, অগণিত মনুষ্যের অদৃষ্টের একমাত্র পরিচালক দিল্লীশ্বরের নিকট ধুতুরা সেইরূপ প্রীতিকর মাদক বলিয়া পরিগণিত হইত। নগরবাসিগণও সম্রাটের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ

এই ধুতুরা যেরূপ শরীর ও মনকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিত, অন্য কোনও দেশের কোনও মাদক দ্রব্যে তত দূর অনিষ্ট সংঘটিত হইত না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সার টমাস সম্রাটের পানসভায় প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন। এখানে সাধারণতঃ সম্রাটের অনুগৃহীত ওমরাহবর্গেরই প্রবেশাধিকার ছিল; এবং তাঁহারা মদ্যপানে পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এক কথায়, এই সভায় রীতিমত পানযুদ্ধ চলিত! এখানে আলিকাণ্ট মদ্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চলন ছিল; কিন্তু সার টমাসের মতে সম্রাট্ স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র মদ্য পান করিতেন।

মদ্যপান করিয়া সম্রাট কখনও রোদন করিতেন, কখনও কখনও অট্ট হাস্য করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন; কিন্তু পরদিন যদি তাঁহার কোনও সহ-পায়ী তাঁহাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ দুই তিন সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন; সম্রাটের সন্নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে সময়ে সময়ে এই জন্য কশাঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইত। এই চাবুকের অগ্রভাগে চারি গাছি দড়ি লাগান থাকিত, দড়ির অগ্রভাগে লৌহখণ্ড সন্নিবদ্ধ, একটিমাত্র আঘাতে অঙ্গের চারি স্থান কাটিয়া যাইত। এক এক জনের পৃষ্ঠদেশে এক শত ত্রিশ ঘা পর্য্যন্ত চাবুকের আঘাত হইত; আঘাতে সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সম্রাটের সম্মুখ হইতে বাহিরে আনা হইত। এই বিষম আঘাত সহ্য করিতে না পারায় সার টমাস এক ব্যক্তিকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ বীভৎস কাণ্ড প্রায়ই সংঘটিত হইত।

পরিণাম এইরূপ ভয়ানক হইলেও, সম্রাটের প্রধান সভাসদ্‌বর্গ প্রতি রাত্রে তাঁহাকে মদ্যপানে উৎসাহিত করিতেন। এই সকল ওমরাহ সম্রাটের ন্যায় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন; নগরপ্রান্তস্থ উপাসনালয়ে তাঁহারা প্রত্যহ পাঁচ বার যথানিয়মে নমাজ করিতেন; কোরাণ পুরুষকে যে পরিমাণে রমণী-গ্রহণে অধিকার দিয়াছে, কোরাণের সেই আদেশ তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন; কিন্তু সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজিবামাত্র তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত; তখন সেই ধার্ম্মিকগণ সম্রাটের নৈশ প্রমোদমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কোরাণের নিষেধ সত্ত্বেও সুরাপানে যোগ দিতেন।

সার টমাস রো তাঁহাদের দেশের বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সম্রাটের নিকট

দুই একবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট সে বিষয়ে আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে তাঁহার আশা পূর্ণ হয়। মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহারা অনেক টাকা প্রাপ্ত হন, এবং ব্রোচে একটি কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করেন।

দিল্লীশ্বরের অতুল রাজমহিমা ও তদীয় রাজসভার বিপুল ঐশ্বর্য্যে সার টমাস অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহের স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত প্রচণ্ড প্রতাপে তিনি অধিকতর অভিভূত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট মনের বল থাকিলেও, তিনি অনেক সময় তাঁহার অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন; এই প্রাচ্য রাজধানীতে স্বেচ্ছাচারের যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং মিথ্যা তোষামোদের যেরূপ উচ্চরব শ্রুত হইত, অন্যত্র তাহা একান্ত বিরল ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জাহাঙ্গীর শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, প্রজার উপর ক্ষমতাবিস্তার করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম; রাজার উপর আইনের কোনও হাত নাই, রাজার ইচ্ছা কখনও শৃঙ্খলিত হইবার নহে, এবং রাজমহিমার পদতলে অন্যান্য সকল বিষয়ই উৎসর্গীকৃত হইবার যোগ্য। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজা, প্রজার সমস্ত স্বত্ব পদদলিত করিতে পারেন, তাহাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার, স্বেচ্ছানুসারে তাহাদের উৎপীড়িত করিবার, তাহাদিগের মস্তকে অজস্রধারায় সমস্ত অপমান অত্যাচার বর্ষণ করিবার, তাহাদিগকে লৌহদণ্ডে শাসন করিবার, তাঁহার অধিকার আছে। প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার এবং স্বাধীনতা যেন রাজার ক্রীড়ণকমাত্র। তাই আকবরের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগের অশ্রুস্রোত প্রবাহিত করিয়া, ক্ষুদ্র পাপ হইতে গভীর পাপের মহাপঙ্কে ডুবিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া এই নগরের সম্পদ ও সমারোহদর্শনে সার্ টমাস অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। যত দিন তিনি এই নগরে ছিলেন, তত দিন তিনি তাহার বৈচিত্র্য ও নগরের হর্ম্ম্যশ্রেণীর ভাস্করনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দিল্লীর সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন; যমুনার পশ্চিমতীরবর্ত্তী এই প্রাসাদের পরিধি এক মাইলেরও অধিক ছিল। কি উপাদান, কি ভাস্করনৈপুণ্য, সকল বিষয়েই উহা উইণ্ডসর

প্রাসাদ অপেক্ষা তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। গভীর খাতে এই প্রাসাদ পরিবেষ্টিত, এবং খাতের উভয় পার্শ্ব লোহিত প্রস্তরে বাঁধান। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ত্রিশ ফিট উচ্চ, সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর, তাহার মধ্যে মধ্যে কামান বসাইবার স্থান; প্রাচীরশিখরে গোলন্দাজ এবং তীরন্দাজ প্রহরিগণ পদচারণ করিত। এমন সুপরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সুশোভিত রাজপথ, সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে ছিল কি না সন্দেহ। উন্নত দুর্গগড় হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, পদতলে যমুনার পঙ্কিল জলপ্রবাহ দৃষ্টি-গোচর হইত, এবং নগরের দিকে চাহিলে দেখা যাইত, শত শত অনতিদীর্ঘ মিনার, মস্‌জিদের গম্বুজ এবং সৌধশিখরে সুবিস্তীর্ণ নগর সমাচ্ছন্ন। বহু দূরে গিরিরাজি হরিৎবর্ণ বিকাশ করিত; স্থানে স্থানে অরণ্য, সেই সকল অরণ্যে সম্রাটের শিকারের জন্য বিবিধপ্রকার মৃগ প্রতিপালিত হইত। মিনার ও চূড়ামুকুটিত এই পরমশ্রীসম্পন্ন প্রাচ্য রাজধানী উন্মুক্ত আকাশতলে একখানি সুরম্য চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। নদীর পশ্চিম কূলে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে সমুন্নত দুর্গ আপনার বিরাট গাম্ভীর্য্যে ও স্বমহিমায় বিরাজ করিত।

নগরের বক্ষে আলিবর্দ্দান খাঁর নিখাত খাল যমুনা পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। হিমালয়প্রদেশস্থ নির্ঝরশ্রেণী হইতে এই খালের জল সরবরাহ হইত; ইহার দৈর্ঘ্য এক শত বিশ মাইল অপেক্ষাও অধিক ছিল।

দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে রাজসভার জন্য একটি বৃহৎ হল; ইহা তুষারধবল মার্ব্বেলে মণ্ডিত, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর, নানাবর্ণে চিত্রিত, ফলপুষ্প-শোভিত লতা-পাতা-কাটা;—এই সকল লতা, পাতা, ফল, ফুল বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখোদিত, সমুজ্জ্বল এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে খচিত।

সুন্দর সুন্দর সুরঞ্জিত স্তম্ভের উপর বিবিধ আকারের ছাদ। নিশীথে এই সকল কক্ষে মোমের বাতি জ্বলিয়া স্নিগ্ধ রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিত, এবং যখন বসরাই গোলাপের সুগন্ধ আতরে, ও অন্যান্য মনোমদ গন্ধদ্রব্যের সৌরভে নৈশ বায়ুপ্রবাহ সৌরভস্নিগ্ধ হইয়া উঠিত, যখন দলে দলে সুন্দরী নর্ত্তকীগণের অবিশ্রান্ত নৃত্যলীলায়, কোমল কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে, কর্ম্মহীন বিলাসশোভন রাত্রি মনোরম সুখস্বপ্নের ন্যায় অনায়াসে কাটিয়া যাইত, যখন চন্দনকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত বর্ত্তিকা ও মৃদুগন্ধময় কাশ্মীরী তৃণপুঞ্জে বিরচিত অগ্নিশলাকাসমূহ গৃহের বিভিন্ন অংশে সংস্থাপিত রৌপ্যময় আধারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সুগন্ধময়

বিলাসতরঙ্গপ্রবাহিত এই সুদৃশ্য হর্ম্যগুলি অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বিভ্রমপূর্ণ বিলাসস্বপ্ন !

দরবারগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে ভূতলশায়িনী ব্যাঘ্রমূর্ত্তির উপর একটি উচ্চ মার্ব্বেল বেদী, তাহার উপর একখানি সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সিংহাসনের উপর একটি ময়ূর, এই ময়ূরের ওষ্ঠ হীরকে নির্ম্মিত, তাহার বক্ষের পালক এবং পুচ্ছ বিবিধ বর্ণের মহামূল্য মাণিক্যে অলঙ্কৃত ; সিংহাসনের সমীপদেশে সম্রাট-পুত্রদিগের জন্য স্বর্ণময় কারুকার্য্যভূষিত আসন, এবং তাহার পরই প্রধান প্রধান ওমরাহদিগের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট গালিচা।

এই সকল গালিচার সম্মুখভাগে মুন্সিগণ নতজানু ভাবে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের সম্মুখে লিখিবার সমস্ত উপকরণ সজ্জিত থাকিত।

স্তম্ভশ্রেণীর অন্তরালে বিচিত্রবর্ণ রেশমী পরদা বিলম্বিত থাকিত, এবং এই সকল পরদার পাশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ওমরাহবর্গের ও অস্ত্রধারী সৈনিকগণের আসন ছিল। তাঁহাদের মণিরত্নশোভিত বৃহৎ পাগড়ী ও শিরস্ত্রাণ কোরাণের বচনখোদিত মার্ব্বেলস্তম্ভের সানুদেশে বিচিত্র শোভার বিকাশ করিত ; তাহার পরই তাম্রবর্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি আমলাগণ দলে দলে উপবিষ্ট থাকিত ; সম্রাট সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা নীরবে সম্মানসহকারে 'সেলাম'-রাশি বর্ষণ করিত।

একজন আফগান সম্রাটের বিজয়পতাকা-দণ্ড ধারণ করিয়া থাকিত। এই ব্যক্তি সম্রাটের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন ছিল। তাহার বর্ণ পরিপুষ্ট জলপায়ের মত, নাসিকা দীর্ঘ এবং সুগঠিত, চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল। শ্মশ্রু ও গুম্ফ ঘনকৃষ্ণ ও অত্যন্ত প্রচুর। তাহার শারীরিক গঠন ও সুব্যক্ত মাংসপেশী যথেষ্ট দৈহিক বলের পরিচয় প্রদান করিলেও, তাহার দেহে সহজ সুন্দর কার্য্যতৎপরতার অভাব অনুভূত হইত। সে আবাল্য মরু প্রদেশে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সুতরাং এখন রাজসভায় আসন লাভ করিলেও, এবং বৃহৎ-পাগড়ীমণ্ডিত, চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে সজ্জিত সভাসদ্‌গণের মধ্যে মোগল দরবারে উপবিষ্ট থাকিলেও, তাহার শ্লথবিন্যস্ত পরিচ্ছদ তাহার বাল্যের মরুচারিত্বভাব প্রকাশ করিত। তাহার পাগড়ী উজ্জ্বল নীল ছিটে রচিত, তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ-সূত্রের বিন্যাস ; এই পাগড়ী সে আরব জাতির অভ্যস্ত কেতায় পরিধান করিত—বন্ধন ঢিলা এবং কিছুমাত্র জমকালো নহে।

ঢিলা আচকানের আস্তিন পরিসরে অত্যন্ত বেশী, এবং পায়জামাও অসাধারণ ঢিলা। কিন্তু তাহা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্কন্ধদেশে এক-খানি সুচিকণ লোহিত শাল, হস্তে রৌপ্যনির্ম্মিত-হাতলবিশিষ্ট আফগানী ছোরা। হিন্দু ও মুসলমান সভাসদ্‌বর্গের সহিত তুলনায়, তাহার অবয়ব সমুন্নত এবং গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। কিন্তু তাহার ভাবহীন মুখমণ্ডল ও প্রকাণ্ড দেহায়তনে তাহার স্বাভাবিক সরলতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, এই আফগান তাঁহার স্বর্ণসূত্রগ্রথিত রাজপতাকা সিংহাসনের সন্নিকটে বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সার টমাস এই আফগান পতাকাধারীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের চিরশত্রু, দিল্লীশ্বরের প্রধান ওমরাহ মকরীব খাঁ এবং উজীর আসক খাঁকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; ইংরাজ দূতের প্রত্যেক প্রার্থনায় তাঁহারা আপত্তি করিলেও, অধিকাংশ স্থলেই সহজে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইত। বুদ্ধি-কৌশল ও গভীর অধ্যবসায়বলেই সার টমাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল; অবশেষে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে ফর্ম্মানলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরের নামে একখানি বিশেষ শিষ্টাচার-পূর্ণ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

সার টমাস সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার ও শিবিরের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট এবং মনোহর। ইহাতে তাঁহার নিজের কথাও অনেক আছে; এবং সাধারণের সঙ্গে একত্র তিনি কিরূপে সমস্ত দিন অতি-বাহিত করিতেন; প্রভাতে একটি মুক্ত বাতায়নপথে উপস্থিত হইলে দলে দলে লোক তাঁহাকে কিরূপ আগ্রহসহকারে দেখিতে আসিত; মধ্যাহ্নে সেই বাতায়নপথে কেমন পশুযুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতেন; অপরাহ্নে তিনি দরবারসভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে দেখিতেন; সায়ংকালে গোসলখানায় বয়স্যগণের সহিত অভ্যস্ত খোসগল্পে কিরূপে তাঁহার সময়াতিপাত হইত; তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী, তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া কিরূপে তিনি তাহা সাধারণের কৌতূহলনিবারণের জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেন; সম্রাটের তৌলদিনে সম্রাট কিরূপ সমারোহে প্রথমে রৌপ্যমুদ্রায়, পরে স্বর্ণমুদ্রা ও মণি মাণিক্যে, সর্ব্বশেষে পট্ট-বস্ত্র, মশলা, শস্য, বিবিধ প্রকার মাংস, মাখম প্রভৃতিতে তৌল হইতেন;

বিতরিত হইত,—এই সকল বিষয়ের অতি কৌতুকপূর্ণ কাহিনী তিনি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সার্ টমাস্ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় চারি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রবাসকালে তিনি অনেকগুলি অতি মূল্যবান বহু পুরাতন হস্তলিপিসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন;—তন্মধ্যে বাইবেলের "নূতন প্রকরণ" উল্লেখযোগ্য; তাঁহার সংগৃহীত আরও কতকগুলি হস্তলিপি বোড্লিয়ান লাইব্রেরীতে আজও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সার টমাস দিল্লীশ্বরের সহিত যে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহাতে ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদিগের সংস্থিতি সুদৃঢ় হইয়াছিল, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কুঠী স্থাপন করিবার এবং ভারতের যে কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ও সুরাটে, বাণিজ্য করিবার অধিকার, ইংরেজগণ এই সন্ধি অনুসারেই লাভ করেন। সার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বরের দূতরূপে দিল্লীর সম্রাটসভায় প্রেরিত না হইলে, ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইংরেজ জাতির আরও কত কাল লাগিত, কে বলিবে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সুরবালা।

অষ্টম অধ্যায়।

জেলা চব্বিশ পরগণার কোন পল্লীগ্রামে প্রিয়নাথ বাবুর আদি বাড়ী। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কেদারনাথের কাল হইয়াছে। কেদারনাথ কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন। প্রিয়নাথকে তিনিই লেখাপড়া শিখান, এবং কলিকাতায় তাঁহার বিবাহ দেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইঁহাদের স্থায়ী বাসভবন ছিল না। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পরে প্রিয়নাথ স্ত্রীর পরামর্শে সহরে বাড়ী করিয়াছেন। কেদারনাথের বিধবা সহধর্ম্মিণী পল্লীগ্রামস্থ সেই সাবেক বাড়ীতেই আছেন। তাঁহার তিনটি কন্যা। তাহারা সকলেই পাত্রস্থ হইয়াছে। স্ত্রীর সাক্ষাতে প্রিয়নাথ তাহাদের কাহারও নাম মুখে আনেন না। কিন্তু আমরা জানি, তিনি স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে কেবল তাহাদের সংবাদ লন, তাহাই নহে। প্রয়োজনমত অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন। এ ছাড়া ছুটীর সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে দেশে যান। বিধবা ভ্রাতৃবধূ ইহাতেই দেবরকে কত আশীর্ব্বাদ

কলিকাতার বাড়ীতে প্রিয়নাথের স্ত্রী এবং কন্যা আর তাঁহার দেশের একটি দরিদ্রা প্রৌঢ়া রমণী আছেন। রন্ধনাদি কার্য্য ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইনি দূরসম্পর্কে প্রিয়নাথের পিশি। আপনার গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন তিনি প্রিয়নাথ বাবুর নিকট আর কিছুই পান না। গৃহিণী কিন্তু তাঁহাকে বেতনভুক্ পাচিকার ন্যায় ভাবেন, এবং স্বামীর অসাক্ষাতে সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি বেশ কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রিয়নাথ তাঁহাকে রীতিমত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। অনাথা রমণী ইহাতেই সন্তুষ্ট। বধূর দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রিয়নাথকে জানান তিনি কখনও আবশ্যক বোধ করেন না। প্রিয়নাথের সাক্ষাতে কপট হইলেও গৃহিণী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম দেখাইয়া থাকেন।

ফলতঃ প্রিয়নাথ এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রকৃতি প্রায় বিপরীত হইলেও উভয়ে যেন একরূপ মিটমাট হইয়া গিয়াছে। প্রিয়নাথ স্ত্রীর কথা খুব শুনেন; কিন্তু এমন বিষয়ে নহে, যাহাতে তাঁহাকে আপন কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতে হয়। স্ত্রীও তাঁহাকে বাধা দিতে ভয় করেন, এবং যাহাতে তাঁহার কথা টিকিবে না, এমন কাজে কথাই কহেন না। একবার প্রিয়নাথবাবুর ভ্রাতৃবধূর একখানি চিঠি তাঁহার স্ত্রীর হাতে পড়ে। ঐ পত্রে অর্থসাহায্য প্রার্থনা ছিল। গৃহিণী তাহাতে বড়ই কুপিতা হন, এবং স্বামীকে কহেন, "দেশের যা কিছু সব লুটে খাচ্ছেন, আবার এখান থেকে টাকা।" প্রিয়নাথ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং রূক্ষভাবে স্ত্রীকে স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিয়াছিলেন, "টাকা আমি আনি। যাহাকে যাহা দিতে হয়, আমি জানি। ইহাতে কথা কহিলে ভাল হইবে না।" ইহার পর গৃহিণী স্বর ছোট করিলেন, এবং মুখ ভারি করিয়া কহিলেন, "তা, টাকা তোমার বই কি? যাকে ইচ্ছা তাকে দিবে, আমার কথা কি?" এই বলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। প্রিয়নাথ এ ভারি মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন না, বা যত দূর সাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। তাই তিনি তদবধি বাড়ীর যা' কিছু সাহায্য করেন, গৃহিণীর অজ্ঞাতে। প্রিয়নাথপত্নী না বুঝিতে পারেন, এমন নহে; কিন্তু তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝেন না, জানিয়াও জানেন না।

এ দিকে কলিকাতার বাসায় গৃহিণীর প্রভুত্ব অসীম। প্রিয়নাথ কিছুতেই হাত দেন না। যা করেন গৃহিণী। পিশির প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হয়, পরোক্ষে ইহা জানিতে পারিলেও প্রিয়নাথ ঘাঁটাইয়া কথা তোলা অপ্রীতিকর মনে করেন, এবং যত দূর সম্ভব, আপনার সদ্ব্যবহারে বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন।

অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়ে অর্থাৎ জিনিষপত্র কেনা বেচা বা চাকর চাকরাণী বহাল্ বর্‌তরফ্ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণীর হুকুম চূড়ান্ত। প্রিয়নাথ তদ্বিরুদ্ধে কখনও একটি আপিল গ্রাহ্য করেন নাই!

স্থূল কথা এই যে, প্রিয়নাথ স্বভাবতঃ ভালমানুষ। কলহ বা সংঘর্ষণ তিনি ভাল বাসেন না। এবং যত দূর সাধ্য, স্ত্রীর বিরক্তি-উৎপাদনে বিরত থাকেন। স্ত্রী তাঁহার দেশে যাইতে অনিচ্ছুক। প্রিয়নাথও অগ্রজের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় ব্যতীত তাঁহাকে আর কখনও সে অনুরোধ করেন নাই। কাজ কি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইয়া? আবশ্যক হইলেই তিনি নিজে যাইতেন। প্রিয়নাথ যাহাই করেন, তাহা তাঁহার নিজের স্বভাবের গুণে, বা অনৈক্যপরিহারার্থ। গৃহিণীর যে ভালমানুষী; সে কেবল কারে পড়িয়া অথবা স্বামীর ভয়ে।

এ অবস্থায় একমাত্র কন্যার বিবাহ কে দিবে? বলা বাহুল্য যে, প্রিয়-নাথের স্ত্রীর ইচ্ছাই এ সম্বন্ধে বলবতী। জন্মাবধি কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া একমাত্র মাতার শিক্ষানুবর্ত্তিনী হইয়া চলায় কন্যাটিতে মাতৃদোষ সম্পূর্ণ অর্শিয়াছিল। পিতৃকুলের সম্পর্ক ছিল কেবল নামটিতে। কেদার-নাথের তিন কন্যার নাম যথাক্রমে সত্যবতী, গুণবতী ও পুণ্যবতী। প্রিয়-নাথের স্ত্রী অসামান্য উদারতা দেখাইয়া "বতীর" মিলে কন্যার নাম রাখিয়াছেন রূপবতী। গৃহিণী স্বামীকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, তোমার তিন ভাইজির বিবাহ তুমি দিয়াছ। আমার কন্যার বিবাহ আমি দিব। প্রিয়নাথের ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিবার কারণ ছিল না।

গৃহিণীর বরাবর ইচ্ছা, তিনি সহরের একটি ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। পাড়াগেঁয়ের নামে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার ভাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আজকাল পাড়াগেঁয়ে ছেলেই ভাল। তাদের পয়সার খাঁকৃতি কম, আর ছেলেও প্রায় খারাপ হয় না। এ কথা প্রিয়নাথ বলিলে গৃহিণী নাক সিট্‌কাইতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন ভাই বলিয়াছেন, তখন ইহার মূল্য আছে। এই গুণবান ভ্রাতার সহিত পাঠকের পরে পরিচয় হইবে। ভাইএর কথা শুনিবার পর যে দিন এক ঘটকী আসিয়া শরতের কথা বলিল, গৃহিণী সেই দিনই প্রায় অর্দ্ধেক মত দিয়া ফেলিলেন। তার পর, শরৎকে বাড়ীতে আনা হইয়াছে। তিন চারি দিন শরৎ আসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। রূপবতীকে দেখান হইয়াছে। শরতের স্বভাব এবং

তাহার লেখাপড়ার বিষয় শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া গৃহিণী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতিমধ্যে যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সপ্তাহে দু তিন বার শরতের বাসায় লোক যায়।—কখন ভাবী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রস্তুত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া—কখনও বা রূপবতীর হাতের বোনা শরতের পায়ের এক যোড়া মোজা লইয়া। শরৎ মনে করিতেছেন, এ বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া যাইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব। কথা সামান্য—কিন্তু মর্ম্মভেদী অতিশয়।

প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীতে শরৎ যে দিন প্রথম জলযোগ করেন, সেই দিন প্রিয়নাথের স্ত্রী মাছভাজার সুন্দর কচুরি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শরৎ চিনিতে না পারিয়া উহাতে এক কামড় দিয়াই আর স্পর্শ করিলেন না। গৃহিণী ঝিকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, কচুরি খাচ্ছেন না কেন? শরৎ মাথা হেঁট করিয়া উত্তর দিলেন, আমি মাছ খাই না।

"ওমা সে কি গো! সাত নয় পাঁচ নয়, আমার এক রূপবতী, চিরকাল বরের পাতে ভাত খাবে। মাছ খাবে না, সে কি কথা গা?" বলিয়া রূপবতীর জননী কিঞ্চিৎ দূরে চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মিহি সুরে শরতের শ্রুতিতে এতটা করুণ রস ঢালিয়া দিলেন যে, তাহা শ্রবণবিবর দিয়া আসিয়া শরতের হৃদয় একবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। না ফেলিবেই কেন? নিম্ন দিকেই জল যায়। ঘোষবংশের সুপুত্র ভাবিলেন, যা, এই অল্প কথার জন্যেই বা সব মাটী হয়। একবারমাত্র চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং অচিরে সেই মাছ-ভাজাময় কচুরিরাশি প্রায় সমস্ত উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

শরৎ! খুব খাও। চারি দিকে চাহিবার প্রয়োজন কি? ভবতারণ ঘোষের গৃহিণী—সেই দশ যোজন দূরে বাজিৎপুরেই আছেন। সেখানে এ সংবাদ কে লইয়া যাইবে?

নবম অধ্যায়।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর গৃহে কন্যার জন্ম পিতার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিয়া পরিগণিত। কন্যার জন্ম কোনও কালেই কোনও জাতির কাছে তেমন সুখের বিষয় ছিল না। প্রবাদ আছে যে, কোনও এক মুসলমান সম্রাটের এক কন্যা হইলে, অন্তঃপুর হইতে সভামধ্যে যেমন তাঁহার নিকট সংবাদ

দেন। সমাগত সভাসদদিগের এক জন ইহার কারণজিজ্ঞাসু হইলে, সম্রাট কহিলেন, অদ্য হইতে এমন এক জন লোকের কথা ভাবিতে হইল, যাহার কাছে এই শিরস্ত্রাণ নত করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, তিনি ভাবী জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে এখনও কন্যা-সম্প্রদানের সময় "বরায় অর্চ্চিতায়" এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। গোমূর্খায় হইলেও মন্ত্র যেমন তেমনই থাকিবে। এই অর্চ্চনা ঘুচাইবার জন্যই সেদিন পর্য্যন্ত—পঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কন্যাহননপ্রথা প্রচলিত ছিল। অধুনা রাজবিধির বলে এ পাপপ্রথা তিরোহিত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু এখন কার্য্যতঃ কন্যাহনন সম্ভবপর না হইলেও, অনেকে মনে মনে দুহিতার মৃত্যু-কামনা করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়। যাঁহাদের আর্থিক সচ্ছলতা নাই, অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু তাঁহারা অনেক সময়ে মঙ্গলের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। আজি কালি একটি কন্যার বিবাহে যে রজতরাশি ব্যয়িত হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্থলে তাহার ওজন কন্যার ওজন অপেক্ষা অধিক। এমন অবস্থায় লোকে অবিবাহিত কন্যার মৃত্যুকামনা করিবে না কেন?

আমাদের কোন বন্ধু মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে এক সামান্য চাকরি করিয়া কথঞ্চিৎ আপনার এবং পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বন্ধুর গায়ের রঙ্গটি কিঞ্চিৎ মলিন। বন্ধু বলিয়াই কিঞ্চিৎ বলিলাম। অন্য কাহারও হাতে সে বর্ণের বর্ণনার ভার পড়িলে তিনি বলিতেন যে, অমা-নিশার অন্ধকারে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে বস্ত্র অথবা বাক্য ব্যতীত বন্ধুর অস্তিত্ব অনুমত হওয়া অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে তাঁহার গৃহিণীও জলধরের জগদম্বা বটেন। দম্পতি একত্র দণ্ডায়মান থাকিলে উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করা দর্শনেন্দ্রিয়ের পক্ষে বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠে! এ হেন সাধু সংমিশ্রণে প্রথমতঃ দুইটি কন্যার উৎপত্তি হয়। দুহিতৃদ্বয় বর্ণবিষয়ে পিতা মাতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্রও উন্নতিলাভ করে নাই। যখন প্রথমার বয়স পাঁচ বৎসর এবং দ্বিতীয়া কেবল দুই বৎসরের, সেই সময়ে সহসা বিসূচিকা রোগে তাহারা দুই ভগ্নী অকালে প্রাণত্যাগ করে।

বন্ধু তাস খেলা বড় ভাল বাসেন। এ ক্রীড়ানৈপুণ্য তাঁহার বিলক্ষণ আছে, কিন্তু ভাগ্য এমনই যে, জয় তাঁহার পক্ষে প্রায়ই ঘটে না, খেলিবার ইচ্ছা কিন্তু বড়ই প্রবলা। খেলিবার নিমিত্ত তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান, এবং

কন্যাদ্বয়ের মৃত্যুর পর সপ্তাহমাত্র অতীত হইয়াছে। বন্ধু তাস খেলিতে বসিয়াছেন। সেদিন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব জিত হইল। বলা বাহুল্য, খেলায় জিতিলে অন্যের যে আমোদ হয়, তাঁহার তদপেক্ষা শতগুণ অধিক; কেন না, শত দিনে এক দিনও তিনি এ আমোদ উপভোগ করিতে পান কি না সন্দেহ! পূর্ব্বোক্ত দিনের শেষ জিতের পর খেলা ভঙ্গ হইলে বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রকারে জয়গর্ব্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন, এবং সেই সময়ে বিপক্ষ পক্ষকে উদ্দেশ করিয়া অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমার সঙ্গে খেলায় জিৎবে আজ? আজ বল্‌তে কাল আমার দু দুটো পাথুরে মেয়ে ওলাউঠা এক দিনে পার করে দিয়েছে, বুঝতে পাচ্ছ না কপাল?"

বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, ইহা পরিহাস নহে, মনের আবেগে প্রাণের কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই সে কালো কন্যা দুটিকে পাত্রস্থ করিতে হইলে বন্ধুর পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত।

এ ত গেল দরিদ্রের কথা। যাহাদের অর্থের সচ্ছলতা নাই, তাহাদের কথা। যাহাদের ধন আছে, তাহাদেরই বা কি? সর্ব্বাংশে সমান বর কটি মিলে? বেশ লেখাপড়া জানা দেখিয়া একটি ছেলেকে একটি কন্যা দিলাম। তাহার লেখা-পড়া লেখাপড়াই রহিল। পুরস্কার যাহা হইয়াছে বিবাহের সময়ে। দাসত্ব তাহার ঘুচিল না। কন্যা চিরদিন কষ্টে কাটাইল। এইবার মনে করিলাম, দ্বিতীয়া কন্যাকে এমন কাহারও হাতে দিব, যাহার পৈত্রিক কিছু বিভব আছে; তাহাই দেওয়া হইল। মূর্খ জামাতা ঘোর অবিবেকী! কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার চরিত্র কলুষিত হইল; অল্পদিনেই পিতৃসম্পত্তি সমস্ত গেল। দুঃস্বভাব দরিদ্রতায় মিশিল। কন্যার দুঃখের আর সীমা রহিল না। এবার ভাবিলাম, তৃতীয়া কন্যাকে এমন দেখিয়া দিব যে, জামাতার বয়স হইয়াছে, চরিত্র পরীক্ষিত হইবার সময় গিয়াছে, অথচ কিছু কিছু উপার্জ্জনও আছে। সহজেই এমন এক দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বর মিলিল। কিন্তু সপত্নীপুত্রের পীড়ন কন্যার পক্ষে অসহ্য হইল, অথবা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বিষহ, তাহাই ঘটিল; অল্প দিনেই কন্যার বৈধব্য উপস্থিত হইল। এ ত সমস্তই জামাতাকে লইয়া। এ ছাড়া কন্যার শাশুড়ীর কর্কশ স্বভাব, শ্বশুরের অভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি পিতা মাতার অসুখের ক্ষুদ্র হেতু এত আছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজকালের বাজারে কন্যার পিতা বন্দকী তমঃস্মকের খাতক। বৈবাহিক তার মহাজন। তাই বলিতে

পাঠক এই সুদীর্ঘ পূর্ব্বাভাষের অর্থ অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন। ভবতারণের একমাত্র কন্যা সুরবালার কপালে সুখ নাই। শ্বশুরালয়ে যাইয়া অবধি একদিনের নিমিত্ত তিনি স্বামীর আদর পান নাই। পিতা মাতার আদরের ধন সুরবালা স্বামিগৃহে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন।

সুরবালা এখন আর সে সুরবালা নাই। শ্বশুরালয়ে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শরৎ তাহার চুল সমান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সুরবালা অনেক স্ত্রীলোকের চুল বাঁধিয়া দেন। সুরবালা নিজে একটি সংসার চালাইতেছেন। কিরূপে সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, পরের অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।

সেদিনকার মেয়ে সুরবালা আজি গৃহিণী! এ অভিজ্ঞতা তাঁহার কোথা হইতে আসিল? পিত্রালয়ে তাঁহাকে এক দিনের জন্যেও সংসারের ভার বহিতে হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ কর্ম্ম তিনি সময়ে সময়ে অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই সাংসারিক জ্ঞান জন্মে কি? বঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে যাঁহারা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে দিন কন্যা পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরভবনে গমন করে, সেই দিনই তাহার জীবনে দশান্তর উপস্থিত হয়। এক ঘটনাতেই যেন তাহার বুদ্ধি এবং কার্য্যক্ষমতার বিকাশ হইয়া পড়ে। কাল যাহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছে, আজ তাহার গৃহিণীপনা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পিতৃগৃহে থাকিতে থাকিতেই বুদ্ধিমতী বালিকা তাহার শিক্ষা সমাধা করিয়া লয়। বালক অপেক্ষা বালিকার অনুকরণপ্রবৃত্তি অধিক প্রবল। মাতা যাহা করিতেছেন, কন্যা নিবিষ্ট মনে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে। জ্ঞান হইবামাত্রই সে আপনার মানসরাজ্যে এক কাল্পনিক সংসার সৃজন করিয়া লয়, এবং মনে মনে সর্ব্বদা সেই সংসারের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে। পরিচয় দিবার নিমিত্ত অবশ্য "বি.এ." "এম্.এ."র মত পরীক্ষা নাই, সুতরাং সে আভ্যন্তরিক উন্নতি কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। কোন নূতন গৃহ প্রস্তুত হইবার সময়ে যেমন তাহার উপরিভাগ খড় কুটা ইট্ কাট প্রভৃতি আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত থাকে, কন্যার সাংসারিক অভিজ্ঞতাও পিতৃভবনে তেমনি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহে। এখানে সেই আবর্জ্জনা পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির আদর। আবর্জ্জনা ফেলিয়া দাও, শ্বশুরগৃহে দেখিবে পরিষ্কার নূতন ঘর। অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আমরা এমন কন্যার কথা বলিতেছি, যাঁহার জননী সংসারবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং গৃহকর্ম্মে

সর্ব্বদা অভ্যস্ত। বঙ্গের পল্লীগ্রামে বাঙ্গালীর গৃহে এখনও এমন জননী অনেক আছেন। ভবতারণের গৃহিণী ত এ শ্রেণীর এক আদর্শ মহিলা। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, তিনি সুরবালাকে শরতের পা ধুইবার জল আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঘোষগৃহে দাস দাসী নাই, এমন নহে। কিন্তু অগ্রজের পাদপ্রক্ষালন কিম্বা একটু জল আনয়ন অনুজার পক্ষে অবমাননার কথা নহে। বস্তুতঃ, বঙ্গমহিলার গৃহকর্ম্ম কি ঘৃণার চক্ষে দেখিবার জিনিষ? যাঁহারা বলেন, হিন্দু-গৃহে রমণীরা কেবল দাসীর ন্যায় পুরুষের সেবা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিতে পারি না। গৃহিণী স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া পতি পুত্র অতিথি প্রভৃতিকে স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন, অথবা ভ্রাতা মধ্যাহ্ন-আহারে বসিয়াছেন, গ্রীষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত তাঁহার শরীরে স্বেদ ঝরিতেছে, ভগ্নী স্বেদাপনোদন জন্য নিকটে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন,—এ দৃশ্য কি উপহসিত হইবার সামগ্রী? অথচ দাসদাসীপরিবেষ্টিত হিন্দু গৃহেও ইহা দেখিতে পাইবে। বঙ্গের মধ্যবিদ্‌গৃহে পাচক ব্রাহ্মণের প্রচলন অধিক দিন হয় নাই! কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের অধিকাংশ স্থলেই রন্ধননৈপুণ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে এ ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

বস্তুতঃ, বঙ্গললনা রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিয়াও পূজিতা ভিন্ন পদদলিতা নহেন। রমণীই ত আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? পুরুষকে সর্ব্বদা কঠোর সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; নারী তাহার কোমলতর অংশ লইয়া ব্যাপৃত। পুরুষ বাহির হইতে মাথামোটে বোঝা আনিয়া দিবে; রমণী তাহা গুছাইবেন, সাজাইবেন, ব্যয় করিবেন, সঞ্চয় রাখিবেন। বাহিরের পরিশ্রম যাহা কিছু, পুরুষ করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা রমণীর নিকট চাহেন কেবল তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, পীড়ায় শুশ্রূষা, বিষাদে সান্ত্বনা। এ সেবা যে স্বর্গীয় সুখে সমাবৃত! কে না জানে হিন্দুর দান, ধ্যান ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি পুরুষ অপেক্ষা রমণী কর্তৃক অধিক সম্পাদিত হয়? নারীর প্রতি পুরুষের ভক্তি শ্রদ্ধাও ইহা অপেক্ষা কোনও সমাজে অধিক আছে কি? গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হউক, আপনাকে বিষম বন্ধন অথবা দারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হউক, সে গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু তাঁহার গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ললনার কেশাগ্র স্পর্শমাত্র করিলেই মৃতদেহে বল আসিবে। রমণীই ত তাহার সম্মানের আধার, সে আধারে আঘাত করিলে আর রক্ষা নাই। গৃহদেবতার অঙ্গস্পর্শ বা অবমাননা হইলে

নির্জীব বাঙ্গালী এখনও নরশোণিতপাতে উদ্যত হইয়া থাকে। "নারীহত্যা মহাপাপ" ইহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা, ঘোর মূর্খ অথবা অবিবেকী না হইলে নারীর গাত্রে কেহই হাত তুলিবে না। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, এ সম্বন্ধে নারী গোব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং ঐ দ্বন্দের প্রথমের সহিত তাহার সমতা হওয়াই ঠিক। কিন্তু যেখানে রমণী পূজিতা, দেবগণ তথায় বাস করেন, * আর্য্যদিগের এ কথার বোধ হয় কোনও কদর্থই হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

আত্ম-জীবনচরিত।

আমি ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলে সৌভাগ্যক্রমে আমার মাতুল মহাশয় আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পারস্য ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, ও শিক্ষাপ্রণালী সুচারুরূপে জানিতেন। তাঁহার উপদেশপ্রভাবে আমার শারীরিক ও মানসিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। আমি বাল্যা-বধি প্রায় প্রতি বৎসরের কার্ত্তিক মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতাম। তিনি আমার আহারের নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং যেরূপে পাঠে আমার মনোনিবেশ হয়, তাহার যত্ন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে আমার সুস্থ ও সবল শরীর হইল, এবং পাঠেও বিলক্ষণ মন লাগিল। তিনিও গ্রন্থের অর্থ উর্দ্দু ভাষায় অভ্যাস করাইতেন, কিন্তু অগ্রে তাহা বঙ্গভাষায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় এক-খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়া মধ্যম দাদাকে ও আমাকে পড়িতে বলিতেন; বস্তুতঃ সে পুস্তকে আমার কোন অধিকার হইত না, মধ্যম দাদার নিকটেই তাহা থাকিত। মাতুল মহাশয় আমার এই অসুগম দেখিয়া দুই একখানি পুস্তক লিখিয়া দিতেন। কিছু কালের মধ্যে আমি বিশেষ শ্রম ও যত্নপূর্ব্বক লিখিতে অভ্যাস করিয়া নিজেই পাঠ্যপুস্তক সকল নকল করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বিশেষ ফললাভ হইল। লিখন পঠন উভয়ই আমার আয়ত্ত হইল।

মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগির, সেকন্দরনামা, এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত

* যত্র নার্য্যো হি পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

হইলে, ক্রমশঃ বাহারদানেশ, আল্লাসি জহুরি, আসফি উর্‌ফি জাহির, হাফেজ এবং মোনশব, এই কয়েক খানি গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত করেন। যে সময় দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্রপৌত্রদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য-অধিকারের জন্য যুদ্ধ হয়, সেই সময় আজিমস্থানের পক্ষীয় একজন আমীর আপন আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লেখেন, তাহারই কতকগুলি পত্রের সঙ্কলনে ইয়ার মহম্মদ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহাতে ঐ যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়, কিন্তু পাঠকগণ শুদ্ধ পত্রের রচনা শিক্ষার নিমিত্ত ইহা পাঠ করিতেন। আওরঙ্গজেব যে সকল পত্র স্বীয় পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনকে লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি লিপি একত্র করিয়া, এক জন সম্রাটের পূর্ব্ব নামে এই আলমগির গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল পত্রে সম্রাটের চরিত্রের ও হৃদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এ পুস্তকও রচনাশিক্ষার জন্য পঠিত হইত। সেকন্দরনামা পদ্যকাব্য। ইহা বীররসে পরিপূর্ণ। পারস্য সম্রাট দারার সহিত সেকন্দরের যে যুদ্ধ ও সন্ধি হয়, তাহা অত্যুজ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকর্ত্তা তাহাতে যথেষ্ট কাব্যশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রচয়িতার নাম সওনানা নেজামি। অন্যান্য ভাষার বীরকাব্য পাঠে যের উপকার ও আনন্দ লাভ হয়, ইহাতেও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে। মিজ.ন আরব্য ভাষার ব্যাকরণের প্রথম ভাগ।

বাহারদানেশ বৃহৎ গদ্য কাব্য। একটি মূল উপন্যাসে বহু শাখা উপন্যাস যোজনা করিয়া আরব্য উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূলোপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন রাজপুত্র এক তুতী পক্ষীর বাচনিক অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক রাজকন্যার কথা শ্রবণে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হন। রাজা প্রথমতঃ সদুপদেশ দ্বারা পুত্রের প্রেমরোগের শান্তিকরণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের যত্ন বিফল হইলে রাজকুমারকে নারীজাতির অসতীত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নিন্দনীয় চরিত্রের উপাখ্যান শুনাইতে তাঁহার বয়স্যদিগকে আদেশ দেন। কিছুতেই উপকার না হওয়াতে, পরিশেষে রাজা উক্ত রাজকুমারীর পিতাকে রাজনন্দিনীর সহিত রাজপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্র লেখেন। ইহাও নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশেষে রাজতনয় সন্ন্যাসীর বেশে দেশত্যাগী হন। উপরি-উক্ত তুতী মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিল। এই পক্ষীর মন্ত্রণানুসারে বহুদিনের পর কোন সিন্ধুতটস্থ নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক তাপসের কুটীরে উপনীত হন। তথায় একটি সারস

পক্ষী ছিল। সে রাজপুত্রের দুঃখের বিবরণ শুনিয়া, কোন বিষয়ের আদ্যন্ত না জানিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অনেকগুলি উপাখ্যান বলে। যাহা হউক, বহু অলৌকিক ঘটনার পর রাজনন্দন রাজনন্দিনীর সমীপস্থ হন, এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া রাজকুমারীর সহিত বাটী প্রত্যাগমন করেন। মূল গল্প ও সারসবর্ণিত গল্পনিচয় যেমন সুন্দর, নারীনিন্দার কাহিনীগুলি তেমনি জঘন্য। শেষোক্ত গল্পের ন্যায় অশ্লীল গল্প এই ভাষায় বা অন্য কোনও ভাষার গ্রন্থে আছে কি না, সন্দেহস্থল। ইহা বালকের পাঠ্যপুস্তক হওয়ার যোগ্য কোন মতেই নয়।

আল্লাসি গ্রন্থে তিন অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে সম্রাট আকবর ভিন্নদেশীয় কয়েক রাজাকে আপনার সংসারের বিবরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মন্ত্রীদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খানি সঙ্কলিত আছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবওল ফজলের অনেক গুলি পত্র আছে; তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয় লিখিত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত পত্রের মধ্যে আকবর যে দুই খানি তুরাণ দেশাধিপতিকে লেখেন, তাহাতে প্রকাশ আছে যে, শেষোক্ত অধিপতি প্রথমোক্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনি বিধর্ম্মী হইয়াছেন, অতএব আপনার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই।" আকবর ইহার উত্তর এই লেখেন যে, "আপনি আমার বিধর্ম্মী হওয়ার কথা যাহা আমার শত্রুর নিকট শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক; লোকে কি না বলিয়া থাকে, তাহারা যখন ঈশ্বরকে জন্মবিশিষ্ট বলিয়াছে এবং মহম্মদকে কুহকী বলিয়াছে, তখন আমাকে নাস্তিক বলিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, যাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধির ছায়ামাত্র পড়িয়াছে, তাহাদের যে কথা প্রত্যয় হইবার নয়, তাহা আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস্য জ্ঞান হওয়া অতীব আক্ষেপের ও আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি হিন্দুদিগের মন্দির সকল মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছি, এবং যেখানে পৌত্তলিকদের শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, সেখানে মুসলমানদিগের নোমাজের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করাইয়াছি।"

অন্য মুসলমান রাজাদের কোপের ভয়ে অথবা তাহাদের সন্তোষের জন্য আকবর যাহাই লিখুন, তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাহা উপরি-উক্ত পত্রে কৈফিয়ৎ স্বরূপ হওয়াতে বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

অশ্রদ্ধা ছিল না, তাহাও জানা গিয়াছে। তবে এমন হইতে পারে যে, তাঁহার কোন ধর্ম্মই ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী না থাকাতেই, এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। যদি তাঁহার অধস্তন সমস্ত পুরুষেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথগামী হইতেন, তবে আর তাঁহার বংশের এরূপ অবস্থা হইত না। আওরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মনিপীড়নই তাঁহার বংশের অধঃপাতের মূলস্থাপন হইয়াছিল।

অল্লাসি গ্রন্থ পাঠের পর জহুরি ও তোগরা নামে যে দুইখানি পুস্তক পাঠ করি, তাহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। এই দুইখানি গদ্য কাব্য এবং এই দুইয়ের একখানিতে কাশ্মীরের শোভার অনেক বর্ণনা আছে, এইমাত্র স্মৃতিরূঢ় হয়। এই পুস্তক পাঠেই আমি কাশ্মীর-দর্শনের জন্য উৎসুক হই; ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

আসফি উরফি জহির এবং হাফেজ পদ্য গ্রন্থ। ইহাকে খণ্ডকাব্য বা গাথা বলা যাইতে পারে। কারণ, এই সকল গ্রন্থের, বিশেষতঃ আসফি ও হাফেজের অনেক কবিতা সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী সংস্কৃত বাঙ্গলা বা ইংরেজী ভাষায় দৃষ্ট হয় না। এ সকল গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দুই হইতে সপ্তদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত কবিতা সচরাচর দেখা যায়। বোধ হয়, এ জন্য কোন পদ্ধতি নাই। আর প্রত্যেক অধ্যায়ে এইরূপ অনেক পরিচ্ছেদ, বোধ হয়, ইহাও কোন নিয়মবদ্ধ নহে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম কবিতার দুই চরণের শেষে যে শব্দ থাকে, তাহা বাঙ্গলা ভাষার মিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের ন্যায় পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতার বা তাহার পরবর্ত্তী কবিতার উভয় চরণের শেষে আর ঐরূপ ঐক্য থাকে না। কেবল প্রথম কবিতার শেষ শব্দের সহিত মিল থাকে; আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষ কবিতায় আমাদের পূর্ব্বতন কবিগণের প্রথামত কবির নামের ভণিতা দেওয়া হয়; এবং এইরূপ কতকগুলি পরিচ্ছেদে এক এক অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

আর বাঙ্গলা যেমন সর্ব্বপ্রথম শব্দের আদিতে ক অক্ষর আরম্ভ করিয়া ক্ষ অক্ষরে শেষ হয়, সেইরূপ ইহার প্রথম অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের সকল কবিতার শেষে, এই ভাষায় যে শব্দের শেষে আন্তক্ষর অনেক থাকে, তাহাই দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের সকল কবিতার অন্তিমে যে শব্দের শেষ "বে" অক্ষরে হয়, তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল অক্ষরের কবিতা হইলে গ্রন্থ শেষ হয়।

এইরূপ গ্রন্থের এক কবিতার ভাবের সহিত দ্বিতীয় বা তাহার পরবর্ত্তী কোন কবিতার সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক কবিতারই স্বতন্ত্র ভাব। আর একটি দেখা যায় যে, এইরূপ সকল গ্রন্থের কবিতায় প্রেমভাব ভিন্ন প্রায় ভক্তিভাব নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থে যেমন ঈশ্বরকে কখন মাতৃসম্বোধন কখন পিতৃসম্বোধন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রণালীর গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। প্রেম-বিহ্বল নায়ক স্বীয় প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর প্রতি যেরূপ প্রেম প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সকল স্থানেই ঈশ্বর প্রণয়িনী বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন।

বোধ হয়, মুসলমানদিগের মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন গুরুজনের প্রতি যিনি যত দূরই ভক্তি প্রকাশ করুন, কিন্তু রমণীপ্রেমে তিনি যত দূর মজিবেন, গুরুজনের ভক্তিতে তত দূর কখনই মজি-বেন না; আর প্রেমের জন্য লোক যে প্রকার পাগল হয়, ভক্তির জন্য সে প্রকার হয় না।

মনশব গ্রন্থ সেখ সাদির কৃত আরব্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগ। পারস্য ভাষার কোন ব্যাকরণ পূর্ব্বে এ প্রদেশে প্রচলিত ছিল না। এ ভাষা এতই সহজ যে, তাহা পড়িবারও বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বিনা ব্যাকরণে লেখা-পড়া চলিত। যাঁহার এ বিদ্যায় বুৎপত্তিলাভের ইচ্ছা হইত, তিনি আরব্য ব্যাকরণ পড়িতেন। আমাদের পাঠারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন সাহেবের আদেশানুসারে চাহার গোলজার নামে একখানি পারস্য ব্যাকরণ প্রস্তুত হয়।

মাতুল মহাশয়ের আরও কয়েক জন ছাত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র লাহিড়ীর সহিত আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্য জন্মে। যদিও তৎকালে আমাদের সম্পত্তির অবনতি হইতেছিল, তথাপি কর্ত্তারা অন্নদানে কাতর হইতেন না। আমরা পূর্ব্বাহ্নে বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত মাতুল-সন্নিধানে পড়িতাম। তাহার পর আমি ও আর এক জন ছাত্র রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করিতাম ও তদনন্তর পূজার কোঠাতেই শয়ন করিতাম। বৃহস্পতিবারে ও শুক্রবারে নূতন পাঠ হইত না। বৃহস্পতিবারের বৈকাল হইতে শুক্রবারের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত পাঠ এককালে নিষিদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি-বারের বৈকালে প্রায়ই আমরা কৃষ্ণনগরে আসিতাম। ক্রমশঃ।

দুটি কবিতা।

ভাগবত।

কি শুভ সাধনা-ফলে জীবন-বিপিনে
শুনিলে স্বপনে হেন বাঁশরী-লহরী,
দ্বাপরের দ্বৈপায়ন কবি? অবতরি
প্রেম-যমুনার জলে, কোন্ পুণ্য দিনে,
আনিলে এ নীলোৎপল সংসার-পুলিনে
নৃত্যে বিহারিলা যাহে ব্রজের শ্রীহরি?
কামের কলুষ-পাশ কেমনে পাশরি'
হেরিলে এ রাসরঙ্গ রসের গহীনে?
যে দিন প্রথম তুমি তপোবনবাসে
গাহিলে এ মহাগীত, কি বঙ্কিম ঠামে,
কি দিব্য উজ্জ্বল-নীল নয়ন-বিলাসে,
বৈকুণ্ঠ-বিহারী তব শোভিলা নয়নে?
কি মোহন হাসিখানি হাসিয়া আননে
বৈকুণ্ঠ-সুন্দরী তাঁর বিরাজিলা বামে?

শোকগীতি।

আমি শুনিনু স্বপনে,—
"কোল খালি বল কার
কোল খালি বল কার
স্মৃতির হিন্দোলা'পরে শুয়ে আছে অকাতরে
আহা ও যে কোল-ভরা খোকা সুকুমার!"
আমারি ত কোল খালি
কোন কুসুমের ডালি
কে আনিয়া দেবে দাও কোলেতে আমার!
সে দিনো না নববর্ষে *
জগৎ জাগিল হর্ষে
কত বাঁশী, কত গান বহে চারিধার;—
কত না সে ফুল ফল
শোভা করে ধরাতল;
আমার নয়নে জ্যোতি হইল আঁধার।

নববর্ষে গাও গান,
কিন্তুরে আমার প্রাণ
সহসা যে শক্তি-হীন,—হয়েছে অসাড়।
সে দিনো পূর্ণিমা-আলো
সকলে বেসেছে ভালো,
আমারি নয়ন-তলে মরণ-আঁধার!
খুলে যায় স্মৃতি-দ্বার।
খোকা মোর সুকুমার
ছিন্ন কুসুমের মত কোলেতে আমার।
সে নয়ন ঢল ঢল
মুদে কেন আসে বল
রঙ্গিমা হারাল কেন অধর তাহার?

নয় সে ত বহুদিন, সেদিনের কথা,—
সোণালী উষার ঘোর
আছিল নয়নে মোর
জগৎ হরষময় নাহি কোনো ব্যথা।
নব বর্ষে নব গীতি,
কত হর্ষ, কত প্রীতি
বহে যেত হৃদয়ের কূলেতে আমার;—
যেন লতা ফুলে ফলে
ছিল আহা তরু-মূলে
সহসা ঝটিকা শোভা হরিল তাহার।

কোল খালি কারে বল শুনি আরবার—
সে কোল ভরাতে পারে
কে আছে সে ধরা'পরে?
আমি জানি শক্তি তাহা নাহি বিধাতার।
খুলিলে স্মৃতির দ্বার
কত শূন্য মাঝে তার?
নববর্ষে কোল খালি—কে ভরাবে আর?
এমনি সে বর্ষ নব
সেই তিথি সেই সব
কোথা সেই কোল-ভরা খোকাটি আমার?

---

* ১লা বৈশাখ পূর্ণিমার দিন আমাদের নব বর্ষে আমার জীবনবসন্তের প্রথম মুকুল "অরুণ" ফুল ঝরিয়া গেছে।

মনে পড়ে খুলিলে সে স্মৃতির দুয়ার—
কচি প্রাণ গেছে চলে,
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
জন-প্রাণি-হীন সেই কক্ষের মাঝার।
নিদ্রা বলে হল মনে
শয্যা পরে সযতনে
শোয়াইয়া স্তন-দুগ্ধ দিই মুখে তার।
জানি না এ ধরাতলে
কারে সবে মৃত্যু বলে,
কি অধর শান্তি আছে মাঝেতে তাহার!

তার পর কোল খালি হলো রে আমার!
বাহুর বন্ধন ছিঁড়ি
লয়ে সবে যায় কাড়ি
কে শোনে ক্রন্দন কবে সে দিন আবার?

তার পর গেল চলে,—
ক্রমে ক্রমে আঁখিজলে
মুছিলাম, বাঁধিলাম হৃদয় আমার।—
একেলা শুইয়া ছাতে
সেই পূর্ণিমার রাতে
চমকি লইতে কোলে চাই বার বার!

খুলে কাজ নাই মোর স্মৃতির দুয়ার;—
এক বার, দুই বার,
ক্রমে ক্রমে তিনবার
কোল খালি, সেই শূন্য কে ভরাবে আর?
বিস্মৃতির শান্তি-জলে
ধুয়ে ফেলি মর্ম্মতলে,
সাধ হয়—নব বর্ষে জাগিব আবার,—
আহা তা হবার নয়,
শক্তি-হীন সমুদয়,—
মরণ-তৃষায় ভরা হৃদয় আমার।

সহযোগী সাহিত্য।

উপাখ্যান।

আখ্‌তার।

জুন মাসের "নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরী" পত্রে শ্রীমতী কর্ণেলিয়া সোরাবজী একটি গল্প লিখিয়াছেন। আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"আখ্‌তার ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। অল্প বয়সে প্রেমশঙ্কর বণিকের অপোগণ্ড পুত্র নীলকণ্ঠের সঙ্গে তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। বিবাহের মন্ত্রপাঠ, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলেও, আখ্‌তার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত। তাহার স্বামী কিন্তু বাড়ীতে ছিল না। নীলকণ্ঠ শৈশবেই তাহার পিতা প্রেমশঙ্করের সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া বিষয়-কর্ম্ম শিখিতে গিয়াছিল। অনেক কাল তাহাদের কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাড়ীতে কেবল আখ্‌তার আর তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ী রুক্মা।

"মন্ত্রপাঠের অপেক্ষায় মেয়েদের বয়স বসিয়া থাকে না। আখ্‌তার বড় হইতে লাগিল। তাহার অঙ্গে অঙ্গে একে একে যৌবনের যাবদীয় ফুলই ফুটিয়া উঠিল। আখ্‌তার অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়া দাঁড়াইল। তখন কত লোকে কত কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ নিন্দা করে, কেহ গালি দেয়, কেহ বা কোনও শুভকর্ম্মোপলক্ষে তাহাকে কাছে আসিতে দেখি-য়াই তাড়াইয়া দেয়। আখ্‌তারের মত মন্দ কপাল আর কার? এক দিন শাশুড়ী রুক্মাই তাহাকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিল। দেশের রাজা ফতেসিংহ রাস্তা দিয়া বিবাহ করিতে

যাইতেছিলেন। বিবাহের বড় ঘটা। রুগ্না বৃদ্ধা,—তবু বর দেখিবার লোভ সামলাইতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে আখ্‌তারকেও আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—'তুই অভাগী আবার বিয়ে দেখ্‌বি কি? তোকে ত বিধবা বল্লেই হয়। শুভ কার্য্যে অমঙ্গল করিস্ নে।'

"হায়! অভাগিনী আখ্‌তার! সে যে সব কাজেই অমঙ্গল, তাহা সে জানিত। তাহার প্রিয়তমা সখী বিদ্যা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় পাছে আখ্‌তারকে দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে সেদিন তাহাকে ঘরের বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার কেমন বাদ! বিদ্যা জল আনিতে যাইবার সময় আখ্‌তারকে দৈবাৎ দেখিতে পাইল। সেদিন আর তাহাদের যাওয়াই হইল না। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ শাশুড়ীর মুখে কথাগুলা শুনিয়া তাহার অভিমান ও ক্রোধের সীমা রহিল না। সে অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই ত! যে বিকট কালো বিড়ালটা কমলার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, আখ্‌তার কি তারই মত কেবল অমঙ্গলের আধার?

"আখ্‌তার বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কেন লোকে একটা বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিল? বালক বোধ হয় এত দিনে বড় হইয়াছে। তবে আখ্‌তারের কাছে আসিল না কেন? রুগ্নার ছেলে নীলকণ্ঠ আখ্‌তারের কাছে আসিল না, ইহাতে আখ্‌তারের অপরাধ কি? সে ভাবিয়া ভাবিয়া একটা উপায় ঠিক করিল। আজ গণেশচতুর্থী। সকলেই গণেশের পূজা দিতেছে। ছোট ছোট মেয়েরা ভাল বর পাইবার প্রার্থনা করিতেছে। আর যাহাদের এ জন্মে ভাল জুটিয়া উঠে নাই, তাহারা পরজন্মে তাহার আশা করিতেছে। আখ্‌তারও গণদেবের পূজা দিবে, আর একটি মনের মত বর মাগিয়া লইবে। গণদেব কি তাহার দুঃখের কথা শুনিবেন না? পূজা দিতে গিয়া সে রাজা ফতেসিংহের বিবাহ-যাত্রাটাও দেখিয়া আসিবে। কেউ ত তাহাকে চিনিতে পারিবে না। সে ত বিধবা নহে। বিধবার কোনও চিহ্নই তাহার ছিল না। তাহার হাতে রুলি ছিল, মাথায় এক মাথা চুল ছিল। তাহা হইতে কাহারও অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি?

"আখ্‌তার কিঞ্চিৎ পূজা-উপচার লইয়া গণেশের পূজা করিতে গেল। গণদেব যে তাহার একটা উপায় করিয়া দিবেন, ইহাতে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। কিন্তু ঠাকুরকে সব কথা খুলিয়া বলিবার পূর্ব্বেই বিবাহের যাত্রীরা মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। মন্দিরের বাহির হইয়া পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই বিবাহের ব্যাপারটা আগে বলি।

"রাজস্থানের রাজা ফতেসিংহ উপরি উপরি চারিটি বিবাহ করিয়াছেন। সন্তান কাহারও হয় নাই। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে চারিটিকেই শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছেন। রাজার সন্তান হইল না দেখিয়া রাজার মায়ের চোখে ঘুম নাই। ফতেসিংহের পর সিংহাসনে কে বসিবে? রাজার ছোট ভাই হরি নিতান্ত দুরাত্মা। সে সিংহাসনে বসিলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে। ভাবিয়া ভাবিয়া রাজার মা দৈবজ্ঞের আশ্রয় লইলেন। একটা শুভ দিন দেখিয়া তিনি তীর্থ করিবার মানসে মথুরায় যাত্রা করিলেন।

"মথুরার পাণ্ডারা রাজমাতার উপহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন, 'রাজবাটী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে, সমুদ্রতীরে গণদেবের মন্দিরের অতি সন্নিকটে একটা বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। সেখানে আর কোন গাছ নাই। বৃক্ষটিতে অজস্র ফুল ফোটে। ফুলগুলি বড় সুন্দর। বিবাহের মত আড়ম্বর করিয়া গিয়া তোমার ছেলের সহিত বৃক্ষটির বি দিও। ইহাতে কুগ্রহের শান্তি হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের পরিণয়সংস্কারের যে প্রথা ক

তাহার যেন কোনওরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই উপদেশ মত কাজ করিলে কৃষ্ণ অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।' পাণ্ডাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, বলা যায় না। কিন্তু বাস্তবিকই কৃষ্ণ এই উপলক্ষে রাজা ফতেসিংহের উপর সদয় হইলেন।

"রাজমাতা বাড়ী আসিয়া পাণ্ডাদের উপদেশপালনে কালবিলম্ব করিলেন না। ফতেসিংহ সেই অসংখ্যকুসুমরাশিপরিবেষ্টিত বৃক্ষটিকে বিবাহ করিয়া সত্বরই আবার রাজধানীর উদ্দেশে ফিরিলেন। ফুলের মালা গলায় দিয়া, পীত হস্তীর উপর চড়িয়া, বরসাজে রাজা ফতেসিংহ ঘরে ফিরিতেছেন। প্রথমে লোকে এই উৎকট কাণ্ড দেখিয়া কতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু রাজার প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ও রাজমাতার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া অবশেষে সকলেই নিরস্ত হইয়া গেল। সে দেশে এমন উৎসব আর কখনও হয় নাই। কিন্তু কই? দেবতার কৃপার ত কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

"পথের ধারে দাঁড়াইয়া দুঃখিনী আখ্‌তার রাজার দিব্যকান্তি দেখিতেছিল। কি সুন্দর! এই ত দেবতা! লোকে ফতেসিংহকে ছাড়িয়া গণদেবের পূজা করে কেন?

"একজন মশালধারী আখ্‌তারকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই চিনিল। সে বলিল, 'আরে তুই অমঙ্গল,—বিধবারও বেশী,—তুই এখানে কি করিতেছিস্? তুই কি রাজার অমঙ্গল করিবি?' আখ্‌তার ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একবারে হাতীটার পায়ের কাছে গিয়া পড়িল। হায়! হাতীটা বুঝি এখনই তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া ফেলিল। অভাগীকে কে বাঁচাইবে? কিন্তু আশ্চর্য্য! 'ভিখু' ত তাহাকে মরিয়া ফেলিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে শুঁড়ে তুলিয়া সেই নবযৌবনপরিমণ্ডিতা সুন্দরী আখ্‌তারকে একবারে রাজার কোলের উপর বসাইয়া দিল! রাজা কি অপ্রসন্ন হইলেন? কে বলিবে? তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। আখ্‌তার রাজার কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণেই হউক, রাজা আখ্‌তারকে কোল হইতে নামাইলেন না। তাহাকে লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

"রাজমাতা বলিলেন, 'দেবতারা তোমার পাত্রী মিলাইয়া দিয়াছেন।' রাজা বলিলেন, 'আখ্‌তার আমারই।' আখ্‌তার মনে মনে বলিল, 'গণদেব আমার মনের কথা কেমন করিয়া শুনিলেন।'

"অতঃপর রাজবাটীতে যে আর একটা বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল, তাহা আর তোমাদিগকে বলিতে হইবে না। অবশ্য, বর্ত্তমান বিবাহে বণিকপুত্র নীলকণ্ঠরূপ যে একটা অন্তরায় ছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহার বিহিত প্রতিবিধান করা হইল। নন্দকুমারের জালিয়াতির মকদ্দমার কথা কে না জানে? নীলকণ্ঠও সেই জালে জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু কিসে কি হইল, তাহা কেহই জানে না।

"ভগবান আখ্‌তারের অদৃষ্টে রাজরাণীর কথাটা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সুখ লিখেন নাই। নীলকণ্ঠের মা রুক্মা উপযুক্ত বৌ হারাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে ফতেসিংহের উপর বিষম প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করিল। রুক্মা এক গোঁসাইজীর ঘরে গিয়া কি করিয়া আসিল, কে জানে। কিন্তু সেই দিন হইতে তাহার জীবনে একটা বিষম পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সে মাথায় ছাই ভস্ম মাখে, বাম হাতটা সর্ব্বদা উঁচু করিয়া রাখে, কখনও নামায় না। এ পর্য্যন্ত উহা উঁচু হইয়াই আছে। উহা এখন শুষ্ক, কঠিন, যেন অসাড়। ইহা কি রুক্মার প্রতিশোধের উপর দেবতার প্রতিশোধ?

"রাজার ছোট ভাই রুক্মার সঙ্গে যোগ দিল। রুক্মা এখন প্রকৃত পাগলিনী; রাজার ভাই হরিও বিদ্বেষবশে উন্মত্তবৎ। উভয়ে বসিয়া নির্জনে পরামর্শ করে, রাজার সর্ব্বনাশের সন্ধান দেখে। অবশেষে একদিন তাহারা বহুকালের চেষ্টা সফল করিল। আখ্‌তার ও ফতেসিংহের

দুই বৎসর-বয়স্ক সুকুমার শিশুটি কোথায় হারাইয়া গেল। বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে আর পাওয়া গেল না।

"শোকে রাজা জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। হরির প্ররোচনায় এক সাধু আসিয়া রাজাকে পরামর্শ দিল, 'তুমি মানুষ হইয়া এই দুঃখময় জগতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিবে, ইহা দেবতাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারা তোমার শিশুটিকে অপহরণ করিয়া সেই ইচ্ছারই পরিচয় দিলেন। তুমি এখন সংসারত্যাগী সাধুর বেশ ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।' রাজা ফতেসিংহ কপটের কথায় ভুলিয়া তাহাই করিলেন। একদা গভীর নিশীথে নিদ্রিতা প্রণয়িনীর মুখচুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, 'বিদায়, প্রেয়সী! এ পর্য্যন্ত জগতের ভিতর তোমাকেই সর্ব্বার্থসার করিয়া ভাল বাসিয়াছি। আজি হইতে আমার সকলেই সমান। এ ভাবের যদি ব্যতিক্রম করি, তবে আমার আত্মার যেন সদ্গতি না হয়। এইবার শেষ বিদায়!' এই বলিয়া রাজা ফতেসিংহ রাজসিংহাসন ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন। লোকে বলে, তিনি এখনও সুদূর পর্ব্বতের অন্তরালে গভীর গুহামধ্যে বাস করিতেছেন। তীর্থযাত্রিগণ দেশদেশান্তর ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আইসে।

"অভাগিনী আখ্‌তারের কি হইল? রাজার গৃহত্যাগের অল্পদিন পরেই রাজপ্রাসাদে তাহারও আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। গ্রামবাসীরা বলে, দেবতাগণ তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র করিয়া রাখিয়াছেন। গণেশচতুর্থীর নিশিতে নগরস্থ সর্ব্বোচ্চ দুর্গচূড়ার উপর তাহার সুন্দর কান্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

"পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে নির্ঝরমুখরিত এক সুন্দর গুহা আছে। স্থানটি মুকুল পল্লবে সর্ব্বদাই পরম রমণীয়। গাছের মধ্যে কেবল তুলসী আর সুগন্ধি ফুলের গাছ। সেইখানে শুভ্রসুকোমলপট্টবস্ত্রপরিহিতা এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যহ সন্ধ্যাসমাগমে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দীপহস্তে গুহাসম্মুখস্থ এক প্রস্তরখণ্ডসমীপে কোথা হইতে আসিয়া উপনীত হয়, দীপটি প্রস্তরের উপর রাখিয়া সমস্ত রাত্রি ঊর্দ্ধনেত্রে কাহারও শুভোদ্দেশে কোন্ দেবতার আরাধনায় অতিবাহিত করে; প্রভাত হইলে আবার কোথায় চলিয়া যায়।

"ফতেসিংহ মরণান্তে ইন্দ্র হইতেও উচ্চাসন লাভ করিবেন, ইহা নিশ্চিত। কারণ, ইন্দ্রের ত আখ্‌তার নাই।

* * * * * *

"বহু কালের পর আখ্‌তার সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইল। কিন্তু যে প্রেম সন্ন্যাসী এখন সর্ব্বভূতে বিলাইয়া দিয়াছেন। আখ্‌তার আর তাহার অংশভাগিনী হইতে চাহিল না। ধন্য আখ্‌তার! ধন্য তোমার প্রেম!"

সাহিত্য।

নূতন লেখকগণের প্রতি উপদেশ।

কোনও কার্য্যে ব্রতী হইবার সময় সে কার্য্যের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ উপকারপ্রদ হইবার সম্ভাবনা। সেই হেতু নবীন গ্রন্থকারদিগের জন্য আমরা "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্রে প্রকাশিত মিষ্টার ফসেটের রচিত নবীন গ্রন্থকারদিগের প্রতি উপদেশের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

নবীন লেখকের প্রতি প্রথম উপদেশ,—অবশ্য আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিও, কাহারও অনুকরণ করিও না। বঙ্গ-সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে বলিয়াছেন—"কাহারও অনুকরণ করিও না।"—কলেজে পড়িবার সময় লেখক পারিতোষিক-প্রাপ্তির আশায় একটা কবিতা লেখেন; পরীক্ষক যখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রচনায় বড় টেনিসনের গন্ধ, তখন তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন; কারণ মৌলিক কবিতার রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, জগতে অতিঅল্পসংখ্যক মৌলিক লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা সকলেই এক বা একাধিক লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তথাপি, নবীন লেখকের পক্ষে সমসাময়িক কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের অনুকরণ করা বড়ই বিপজ্জনক। তিনি বহু সুলেখককে শিক্ষাগুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচনাপ্রণালীর প্রতিধ্বনি যেন ভক্তের কর্ণে সর্ব্বদা ধ্বনিত না হয়। তাঁহার যেন মনে থাকে, স্বাতন্ত্র্য নহিলে সাফল্য আসিবে না। সাহিত্যের যে কোনও বিভাগে খ্যাতিভাজন হইতে হইলে, তিনি যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন যে, তাঁহার রচনা শিল্প-কুসুমকুন্তলা ও স্বাতন্ত্র্য-গর্ব্বমণ্ডিতা হওয়া আবশ্যক। মনে করা যাউক, নবীন লেখকের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তিনি ভাল কবিতা লিখিতে পারেন, তবে একখানা কাব্য রচনা করিবার পর তিনি যেন ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহার কাব্যরচনার প্রণালীতে, বা ভাবে, বা ভাষায় কোনও কাব্যের অনুকরণ আছে কি না। যদি তাহা কাহারও অনুসরণ হয়, তবে সে কাব্য পোড়াইয়া ফেলাই বিধি। তাহার পর সেই কাব্যের ভাব লইয়া আবার কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত। দ্বিতীয়বার প্রয়াসে যদি তিনি দেখেন যে, অপরের মত না লিখিলে তাহা ভাল লাগে না, তবে যেন তিনি বুঝেন যে, সেটা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। নবীন লেখক দেখিতে পাইবেন, অপরের ভাব তাঁহার রচনায় আসিয়া পড়িতেছে; তাহা নিজের বলিয়া চালাইতে চেষ্টা না করিয়া, তিনি যতই মৌলিক রচনায় মনোযোগ দিবেন, তাঁহার রচনা পাঠকের নিকট ততই আদৃত হইবে।

মৌলিকতা।

নবীন লেখক সর্ব্বপ্রথমে দেখিবেন, সাহিত্যের কোন্ বিভাগে তাঁহার পারদর্শিতা অধিক। ইহা কিরূপে স্থির হইবে? যে বিষয় লিখিয়া লেখক আপনি আনন্দানুভব করেন, অবশ্য সেই বিষয়েই তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা। যাহা লিখিয়া লেখকের সন্তোষ জন্মে না, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরও সন্তোষ জন্মিবে না। যাহা পাঠ করিয়া পাঠক আনন্দানুভব করেন, তাহা লিখিতে লেখকের অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইয়াছিল। যখন ভাবোদ্রেক হইবে, তখন লিখিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা উচিত নহে। যখন শরীর ও মন ভাল থাকে, তখন ভাবোদ্রেক হওয়াই ত স্বাভাবিক! শরীর ও মনে বড় নিকট সম্বন্ধ। একের অসুস্থতায় অপর অসুস্থ হইয়া পড়ে। একের অপব্যয়ে অপর ফলভোগ করে। অধিক রাত্রি জাগরণ ও উত্তেজকপ্রয়োগ বড়ই অমঙ্গলপ্রদ। লেখক যখন গভীর নিশায় নিদ্রা না গিয়া কফি বা ঐরূপ আর কিছু সেবন করিয়া আপনার নিদ্রালসনয়ন নিদ্রাহীন করিয়া লিখিতে বসেন, তখন তাঁহার ধারণা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। কাজেই রচনাও ভাল হয় না। অতএব, সাহিত্য-পথেও "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

শরীর ও মন।

লেখক বলেন, নবীন লেখকগণ নোটবুক রাখিবেন। প্রতিদিন তাহাতে কিছু কিছু লিখিবেন। যাহা লিখিবেন, তাহা খোলসা করিয়া লেখাই ভাল। তাঁহার মনে যে চিন্তা, যে কল্পনা, যে ভাব, যে সন্দেহ উদিত হইবে, তাহাই তিনি নোটবুকে টুকিয়া রাখিবেন। নবীন লেখকদিগের

নোট-বুক।

নহে। হয় ত সে সকল কেবল প্রজাপতির মত ;—তাহা হইলেও তাহাদের ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেই সকল আরম্ভ হইতে ভবিষ্যতে অতি গুরুতর চিন্তা প্রসূত হইতে পারে।

সমালোচক ও প্রকাশকের নিকট যাঁহার খাতির আছে, সেরূপ কোনও সুপ্রথিত লেখকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নবীন লেখকের পক্ষে সমীচীন নহে। ইহাতে প্রায়ই হতাশ হইতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই নবীন লেখকের গ্রন্থ প্রবীণ লেখকের এত ভাল লাগে না যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। আবার তিনি যদি চলনসই গোচের প্রশংসাপত্র দান করেন, তবে নবীন লেখক বড় অসন্তুষ্ট হয়েন। নবীন লেখকগণ এইরূপ অত্যন্ত অধিক প্রশংসার প্রত্যাশা করেন বলিয়াই, অনেক প্রবীণ লেখক নবীন লেখকদিগকে কোনরূপ প্রশংসাপত্র দান করেন না। কিন্তু সেই প্রবীণ লেখকের প্রভাবই বা কতটুকু ? তাঁহার নিজের লেখা সম্বন্ধে সমালোচক ও সম্পাদকগণ যে খাতির করেন, তাঁহার সুপারিসে আর এক জনকে তাঁহারা সে খাতির করিবেন কেন ? তবে যদি কোনও প্রবীণ লেখক কোনও নবীন লেখকের রচনা পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

মুরুব্বি ধরা।

লেখক বলিতেছেন, নবীন গ্রন্থকার যেন লোকের প্রশংসাপ্রাপ্তির জন্য অধিক উৎসুক না হয়েন। যশোলাভবাসনা মনীষী পুরুষদিগের ব্যাধিবিশেষ। যদি আপনার রচনায় আপনার অসামান্য সুখ জন্মে, তবে তাহাও সহস্র সহস্র লোকের বাহবা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়। যশে লেখকের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। যশোলাভ করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যশোলাভের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করাই নবীন লেখকের উচিত। যশ আপনি আসে, সে স্বতন্ত্র কথা; চেষ্টা করিয়া যশ পাইবার বাসনা ভাল নহে। অনেক সময় অনুপযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্যেই যশোলাভ ঘটে, উপযুক্ত ব্যক্তি যশ পান না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"

যশ।

বিবিধ।

ইন্দ্রজাল।

ইন্দ্রজালসম্বন্ধীয় নানা অদ্ভুত কথা এ দেশে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি "বর্ডারল্যাণ্ড" পত্রে সূক্ষ্মদেহের রহস্য, ইচ্ছাশক্তিরহস্য, ভারতবর্ষীয় ফকিরদিগের ক্ষমতা প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য। লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার কল্পনাশক্তি নাই, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত "সত্য" ঘটনা সকল কবির কল্পনাকেও পরাভূত করে। নিম্নে কয়টির সারসংগ্রহ প্রদত্ত হইল।

প্রথমেই লর্ড লিটন কর্ত্তৃক লেখকের দীক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। লেখক তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবেন স্থির হইলে,—তিনি বলিলেন, "আজি হইতে তৃতীয় নিশীথে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" নির্দ্ধারিত দিবস সন্ধ্যাকালে আহারান্তে লেখক কক্ষে বসিয়া চুরট টানিতে লাগিলেন, এবং তিনি আসিবেন জানিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; কিন্তু লিটন আসিলেন না। তিনি যে পুস্তক খানা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, পরিশেষে সেখানা হইতে দৃষ্টি

সূক্ষ্মদেহ।

ক্রমে তাহা পরিপুষ্ট হইতে লাগিল—ক্রমে তাহা লিটনেরই মত দেখাইতে লাগিল—তাহার পর বোধ হইল, যেন সত্যই লিটন বসিয়া আছেন। লেখক শেক্‌হ্যাণ্ডের জন্য হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র ছায়াময়ী মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। লেখক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন, এমন সময় শুনিলেন, কানের কাছে লিটন বলিলেন, "আইস।" তাঁহার নিশ্বাসস্পর্শও অনুভূত হইল; কিন্তু লেখক ফিরিয়া দেখেন, কেহ নাই। তাড়াতাড়ি হ্যাট ও কোট লইয়া লেখক বাহির হইলেন—লিটন যে হোটেলে থাকিতেন, সে হোটেলে যাইতে হইলে যেখানে মোড় ফিরিতে হয়, সেখানে যাইয়া শুনিলেন, "সোজা চল।"—কিছু দূর গিয়া লিটনের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, "রাস্তার এ ধারে আইস।" রাস্তা পার হইয়া যেখানে গিয়া লেখক লিটনের সাক্ষাৎ পাইলেন, সেখানে লিটনের যাইবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সেখানে হর্ম্ম্যতলে লাল চক্ দিয়া একটা পঞ্চভুজ অঙ্কিত করিয়া তাহারই মধ্যস্থলে দণ্ডহস্তে লিটন দাঁড়াইয়া! সেইখানে লেখকের দীক্ষা হয়।

সিমলা শৈলে মিষ্টার জেকব এই যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এক দিন তাঁহার বাটীতে লেখকের নিমন্ত্রণ হয়;—সেখানে একজন সেনাপতিরও নিমন্ত্রণ ছিল। সেনাপতি আহারান্তে

যষ্টি হইতে বৃক্ষ।

চুরট টানিতে টানিতে মিষ্টার জেকবকে দু একটা "ভেক্কি" দেখাইতে বলিলেন। ভেক্কি কথাটা জেকবের যেন ভাল লাগিল না,—কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইয়া একজন চাকরকে সাহেবদের সব যষ্টিগুলা আনিতে বলিলেন। একখানা মোটা দ্রাক্ষালতার রূপা-বাঁধান যষ্টি বাছিয়া লইয়া জেকব বলিলেন, "এখানা কাহার?" সেখানা সেনাপতির। যেরূপ কাচপাত্রে লালমাছ রাখা হয়, সেইরূপ একটা পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া, তন্মধ্যে লাঠিখানা ধরিয়া জেকব বিড় বিড় করিতে লাগিলেন। ছড়ির গাঁটটা নিম্নে ছিল,—তাহা হইতে শিকড় বাহির হইয়া পাত্রটি পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার কয় মিনিট পরেই ছড়ি ফাটার শব্দ হইতে লাগিল, আর ছড়ির উপরিভাগ হইতে শাখা বাহির হইতে লাগিল;—সকলের সম্মুখে ঐ সকল শাখা পত্রপুষ্পমণ্ডিত হইয়া গেল, এবং তাহার পরেই ফুল হইতে ফল ফলিল। দশ মিনিটের মধ্যে ছড়ি হইতে ফলভারাবনতা দ্রাক্ষালতা উৎপন্ন হইল। একটা চাকর সেটাকে ঘুরাইয়া লইয়া গেল, এবং অতিথিরা ফল লইয়া যাইতে লাগিলেন। যদি এটা ভেক্কি হয়, এই সন্দেহ করিয়া পর দিবসও আঙ্গুর থাকে কি না দেখিবেন বলিয়া, লেখক কতকগুলা পকেটস্থ করিলেন। তাহার পর দ্রাক্ষালতাটা টেবিলের উপর রাখিয়া কাপড় চাপা দেওয়া হইল। কয় মিনিট পরে সেনাপতির যেমন ছড়ি তেমনই পাওয়া গেল।

এইরূপ আরও কয়টা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিবার পর সকলে গমনোদ্যোগ করিলেন। জেকব লেখকের সহিত কথা কহিতে চাহিলে,—দুই জনে বারান্দায় আসিলেন। জেকব বলিলেন,

গৃহে।

"আচ্ছা—তোমাকে একটা কাণ্ড দেখাইব।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "চক্ষু বুজিয়া মনে কর যে, তুমি তোমার বাঙ্গলোয় তোমার শয়নকক্ষে আছ।" লেখক তাহাই করিলেন;—তাহার পর জেকব বলিলেন, "চাহিয়া দেখ।" দুই সেকেণ্ডে,—প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সত্যই আপনার শয়নকক্ষে উপস্থিত। জেকব বলিলেন, "আবার চক্ষু মুদিত কর—তোমায় তোমার বন্ধুদের কাছে লইয়া যাই।" লেখক ভাবিলেন, যদি ইহা সত্য সত্যই ভেক্কি হয়, তবে তিনি না যাইতে চাহিলেই সব ধরা পড়িবে; লেখক যাইতে অসম্মত হইলে, জেকব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি

লেখক শয়নকক্ষ হইতে আসিয়া, যেখানে তাঁহার দুই বন্ধু ছিলেন, সেখানে হাজির হইলেন। তাঁহারা সহসা তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইলেন। তখন তিনি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার—তিনি বলিলেন, "কই, আঙ্গুর দেখি।" পকেট হইতে সেগুলা বাহির করিয়া লেখক তাঁহাকে দিলেন। তিনি সেগুলা দেখিলেন। আঘ্রাণ লইলেন,—শেষ আহার করিয়া বলিলেন যে, সেগুলা সত্যই ইংলিশ্ আঙ্গুর। তিনি সেগুলা শেষ করিতে বসিলেন। আর এক বন্ধু বলিলেন, "গাড়ী কই?" তখন তিনি একজন চাকরকে আস্তাবলে যাইয়া জেকব সাহেবের বাঙ্গালায় একজন সহিস পাঠাইতে বলিলেন। সহিস আসিয়া খবর দিল, গাড়ী আস্তাবলে হাজির। তিন বন্ধুতে পরস্পরের দিকে চাহিলেন—শেষে যাইয়া দেখেন, সত্যই বটে!

শেষ কথা।

ইহা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় কি!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "দশহরা গঙ্গাপূজা" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত একটি পল্লী-চিত্র। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দীনেন্দ্র বাবু দশহরা উৎসবের গ্রাম্য কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পল্লীচিত্রগুলি ক্রমে ক্রমে 'একঘেয়ে' ও মলিন হইয়া পড়িতেছে। বিচিত্র বর্ণরাগ ও বিশিষ্ট জীবনচিহ্নে মণ্ডিত না হইলে এরূপ চিত্র কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "প্রত্যাবর্ত্তন" সুখপাঠ্য;—কিন্তু এখনও জমে নাই। শ্রী— "সুরাপান" প্রবন্ধে সুরাপান সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখকের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। "হত্যা" শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প।—গল্পটির আখ্যান-বস্তু মন্দ নহে;—কিন্তু লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হিমালয়-দর্শনে" কবিতাটি বেশ হইয়াছে। ইহাতে কবিত্ব ও বিদ্রূপ, উভয়ের একত্র সমাবেশ আছে;—উভয় অংশই উজ্জ্বল,— অথচ পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে গ্রথিত। কবিতাটির আরম্ভে যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, তাহাতে লেখকের যথেষ্ট ক্ষমতা ও গুণপণা প্রকাশিত হইয়াছে। "সিরাজদ্দৌলা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র এবার "অন্ধকূপ-হত্যার" আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে অক্ষয় বাবু যথেষ্ট গবেষণা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "স্বরলিপির" গানটি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ। "কাহাকে" এখনও চলিতেছে। আমাদের সাহিত্য-রঙ্গভূমির একজন পুরাতন অভিনেতা "মেঘনাদ শত্রু, এম. এ." এই ছদ্ম ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ও "দগ্ধ কচু" ডালি লইয়া ভারতীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন।—লেখক আর যাহার কাছে আত্মগোপন করুন, আমরা তাঁহাকে চিনিয়াছি। যদিও "দগ্ধ কচু" Sweet Nothing, কিন্তু ভাষা সুমিষ্ট ও উজ্জ্বল;—রসিকতায় রস আছে,—ঝাহারও আছে;—কিন্তু কিছু অধিক মাত্রায়।—যদিও ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা মেঘান্তরিত খোদ মেঘনাথই বলিতে পারেন;—তবু এই আদ্যন্তহীন উদ্দেশ্যশূন্য রহস্য-রসে পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন। "দগ্ধ কচুর" সুদীর্ঘ টিপ্পনী দেখিয়া, প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি" মনে পড়ে। চিরপ্রিয় মেঘনাদ 'মিত্র'। (আপনাকে 'শত্রু' করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।) আপনার গদ্য-রচনাও সুন্দর,—আমি আপনার রহস্যভূষণা ভাষার অভিনন্দন করি।

গ। ১৩০৩; ভাদ্র ও আশ্বিন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্., শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ., শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ., শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র বি. এল্., শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এ., শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ., বি. এল্., শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, এম্. এ., শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রশেখর কর, এম্. এ., শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ., শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীউমাশশী দেবী, শ্রীলজ্জাবতী বসু, শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দেবী, শ্রীসরোজকুমারী দেবী ও সম্পাদক।

৭

সূচী

কলিকাতা;
...বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
...জপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
...ও
...লেন; সাহিত্য যন্ত্রে
...কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

...এই সংখ্যার মূল্য ॥০ আট আনা।

ত্রিদিব-বিজয়

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রণীত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত, পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিখি

রসভাবপূর্ণ নূতন কাব্য।

ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। দেখিলে বিলাতী বোধ

মূল্য

ভাল বাঁধা, স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা—২৲ দুই টাকা।

কাগজের মলাট ... ১৷৹ দেড় টাকা।

উভয় পুস্তকে কেবল মলাটের প্রভেদ। ছাপা ও কাগজ উভয়ের সম

আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

রন্ধনবিষয়ক নূতন পুস্তক।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।

৬, নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

মাধবিকা।

(নূতন কবিতা পুস্তক)

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে প্রকাশিত।

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

চিত্রা। নূতন কাব্য গ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু

ইহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বর্ত্তমান

সমস্ত প্রধান প্রধ

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

ঋগ্বেদ ১।১৪০—১৬৪ সূক্ত।

১। দীর্ঘতমা ঋষি কোন প্রদেশে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। তাঁহার পিতার নাম উচথ্য, মাতার না[ম] মমতা দেবী।

২। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া বলিতেছেন :—

"হে মনোরথের পূর্ণকর্ত্তা, শত্রুগণের বিনাশকর্ত্তা, নিবাসস্থানের দানকর্ত্তা, সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শব্দকর্ত্তা, জ্যোতির্ম্ময়, অসীমজ্ঞানসম্পন্ন, অভীষ্ট দেবতাদ্বয়! তোমরা পূজিত হইয়া আমাদিগকে ইষ্ট বস্তু প্রদান কর। অনিন্দনীয় রক্ষা দ্বারা তোমরা আমাদিগকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ—তাই উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা অদ্য তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করে। যজমানের মন-স্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াই তোমরা বিচরণ কর। যজ্ঞবেদীতে তোমরা যে অনুগ্রহবুদ্ধি ধারণ কর, তাহার উপযুক্ত পূজা কে বা তোমাদিগকে দিতে পারে? হে নিবাস-দাতৃদ্বয় আমাদিগকে ক্ষীরপূর্ণ গাভী সকল দাও। তোমাদের পারণকুশল রথ তৌগ্ররাজার জন্য সমুদ্রের মধ্যে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমাদের শক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রাজা কূলে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাই, হে অশ্বিদ্বয়! বীরপুরুষ ধাবমান অশ্বে আরোহণ করিয়া যেমন অজ্রমে গমন করে, তেমনি বেগে তোমাদের রক্ষাশক্তির শরণাপন্ন হইতে কামনা করি। এই স্তব যেন উচথ্যপুত্রকে রক্ষা করে; এই অহোরাত্রিরূপী পক্ষিদ্বয় যেন আমার সার দোহন করিয়া না লয়। তোমাদের এই যজমান যখন বদ্ধ হইয়া মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইবে, তখন উপর্য্যুপরি দশ স্তবকে সজ্জিত কাষ্ঠরাশি যেন আমাকে আত্মাতে দগ্ধ না করে। দাসেরা যখন দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া আমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, স্বয়ং ত্রৈতন দাস যখন অস্ত্রের দ্বারা আমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়াছিল, বক্ষঃস্থল এবং স্কন্ধদ্বয়েও অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল,—তখন মাতার ন্যায় অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া নদীগণ আমাকে নিমগ্ন করেন নাই। দশম যুগ অতীত না হইতে হইতেই মমতার পুত্র দীর্ঘতমা জীর্ণ হইয়াছেন। জল সকলের গন্তব্য প্রবণপ্রদেশের অভিমুখে যে ঔপনিবেশিকেরা গমন (১) করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের সারথির ন্যায় 'ব্রহ্মা' (পুরোহিত) হইয়াছেন।"—ঋগ্বেদ ১।১৫৮

৩। প্রবাদ এইরূপ যে, দীর্ঘতমা জন্মান্ধ ছিলেন; তাঁহার গর্ভদাসেরা

(১) মূলে আছে, "অপামর্থং যতীনাম্" সায়ণ ইহার বিবিধ অর্থ করিয়াছেন, যথাঃ—(ক) অর্থং পুরুষৈরর্থ্যমানং কর্ম্ম ফলং স্বর্গাদিকং যতীনাং প্রাপ্নুবতীনাং অপাং অপ্‌কার্য্যানাং প্রজানাং। (খ) যদ্বা অপাং অপসাং কর্ম্মণাং অর্থং প্রয়োজনং যতীনাং তাসাং প্রজানাং। এই দুইটির একটিও মনোরম নহে। ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৯ম ঋকেও "অর্থং" শব্দ নদীজল সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় সায়ণই অর্থ করিয়াছেন,—"অর্থং গন্তব্যং প্রবণপ্রদেশং"। ইহাই সমীচীন অর্থ। ফলতঃ, সায়ণভাষ্য কেবল সায়ণের তত্ত্বাবধারণে অনেক পণ্ডিতের রচিত বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের টীকাকার যে অর্থ দিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই অনুবাদ করিয়াছি। "যতীনাং" ইহার পরে "বিশাং" উহ্য করিতে হইবে। বিশ্ শব্দের প্রকৃত মৌলিক অর্থ—ঔপনিবেশিকগণ।

চিরকাল অন্ধ প্রভুর সেবা করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া তিনি অগ্নি হইতে অক্ষত দেহে উত্তীর্ণ হইলে, পুনর্ব্বার তাহারা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া জলে নিক্ষেপ করে। তাহা হইতেও তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে ত্রৈতন নামে এক গর্ভদাস অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করে, এবং স্কন্ধ এবং বক্ষঃস্থলও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রবাদ অসার গল্পমাত্র।

৪। দীর্ঘতমা যে জন্মান্ধ ছিলেন, তাহাও বোধ হয় তাঁহার দীর্ঘতমা নামের সার্থকতাসম্পাদনের জন্যই কল্পিত হইয়া থাকিবে। "দীর্ঘং তমো যস্য অসৌ দীর্ঘতমা।" যিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অন্ধকারের মধ্যে বাস করেন, তাঁহাকে দীর্ঘতমা বলা যায়। ইহাতে নানা অর্থ সম্ভব। নাম শুনিয়াই তাঁহাকে জন্মান্ধ নিশ্চয় করা যায় না। এক স্থানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে অন্ধ বলিয়া গিয়াছেন দেখা যায় (১।১৪৭।৩) কিন্তু সে স্থলেও অন্ধ শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকাসমর্থ এই অর্থই প্রকাশ করে বিবেচনা হয়।

৫। তাঁহার স্তবে গর্ভদাসেরও উল্লেখ নাই, কেবল দাসগণের এবং ত্রৈতন নামক জনৈক দাসের উল্লেখমাত্র আছে। ত্রৈতন দাস যে তাঁহার শরীর হইতে মস্তক কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়াছিল, তাহাও প্রকাশ নাই।

৬। কিন্তু দীর্ঘতমার নিজের বর্ণনায় জানা যায় যে, ত্রৈতন নামক এক দাস অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ এবং স্কন্ধদেশ ও বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল, এবং অন্যান্য দাসগণ তদবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই ঘোরতর বিপদ হইতেও তিনি কোনও প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। দেব দেবীর অস্তিত্বে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল। নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ মাতার ন্যায় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, নিমগ্ন হইতে দেন নাই;—তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৭। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ের পাঠক যদি সেই অতীতের বিচিত্র চিত্র সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের সমক্ষে আফ্রিকা মহাদেশে এক্ষণে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই হইবে। মিঃ সিসিল্ রোডস্, ডাক্তার জ্যামিসন প্রভৃতি একালের ইংরেজগণকে তদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণের,—এখনকার রোডেসিয়াকে তৎকালীন আর্য্যাবর্ত্তের,—ইদানীন্তন ম্যাটাবিলিগণকে তদানীন্তন দাসগণের অনুরূপ

বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ম্যাটাবিলিগণ যেমন ইংরেজদের সমকক্ষ না হইয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত নহে, দাসেরাও তদ্রূপ আর্য্যগণের সহিত অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হইয়াও ম্যাটাবিলিগণ যেমন গিরিগুহা বা গহন বন আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, এবং সময়ে সময়ে দুই এক জন ইংরেজ সেনা ও সেনাপতির প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতেছে, প্রাচীন দাসেরাও তদ্রূপ দীর্ঘতমার অশ্বারোহী যজমানগণের সম্মুখে যুদ্ধে স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়াও, বন ও গিরিগুহা হইতে তাহাদের উপর উৎপাত করিতে ক্ষান্ত হইত না। এক্ষণে যেমন স্বদেশে বংশবৃদ্ধি হেতু স্থানাভাব ও অন্নকষ্টবশতঃ ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা দেশ বিদেশে বিস্তীর্ণ হইতেছেন, দীর্ঘতমার যজমানগণকেও অশ্বিদ্বয় তদ্রূপ "অনিন্দনীয় রক্ষার দ্বারা বিস্তীর্ণ করায়",(১)—তাঁহারা একালের হিন্দুস্থান, সেকালের দাসস্থান প্রদেশে দলে দলে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন। দাসস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া গোহিরণ্যাদি ধন সঞ্চয় করাই তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্য ছিল। যে সকল বিশ্ (বৈশ্য) গণের সহিত দীর্ঘতমা দাসস্থান ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে "অপামর্থং যতীনাং" বলিয়া বর্ণনা করায় স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, তাঁহারা কোনও নদীর তীরে তদীয় স্রোতের অভিমুখে জনপদ সকল স্থাপন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। দীর্ঘতমা এই ঔপনিবেশিকগণের একজন "ব্রহ্মা" বা পুরোহিত ছিলেন। ব্রহ্মা বা পুরোহিতেরা তৎকালীন সমাজ-রথের সারথিস্বরূপ ছিলেন; সারথি যেমন রথীকে লইয়া অগ্রসর হয়, তাঁহারাও তদ্রূপ ঔপনিবেশিকগণের পরিচালকস্বরূপ ছিলেন। সুতরাং দীর্ঘতমার উপর যে আদিম দাসেরা জাতক্রোধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অবস্থায় তিনি ত্রৈতনদাসের হস্তে নিপতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাই তদীয় মনোহর সূক্তে [illegible]

৮। দীর্ঘতমার জীবনবৃত্তান্তঘটিত যে সূক্তটি আমরা অনুবাদ [illegible] অদ্য পাঠকগণের সমক্ষে ধারণ করিলাম, ইহাতে তদানীন্তন প্রাচীন সমাজের অতিবিশ্বস্ত এবং হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা সর্ব্ব-

---

১। "প্রযৎ সস্রাথে অকবাভিরূতী"—মূল। "যস্মাৎ চ অকবাভিঃ অকুৎসিতৈঃ উতিভিঃ রক্ষণৈঃ প্রসস্রাথে প্রসারয়থঃ" সায়ণ।—অশ্বিদ্বয় আপনাদের রক্ষার দ্বারা [illegible]

প্রথমেই দেখিতে পাইব যে, ঋষির চারি দিকে অবিশ্রান্ত যুদ্ধকোলাহল। তিনি অশ্বিদ্বয়কে কি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, দেখ!

"হে শত্রুগণের বিনাশকর্ত্তা, হে সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শব্দকর্ত্তা, অভীষ্ট দেবতাদ্বয়!"

বৈশ্যেরা তখন চারি দিকে জনপদস্থাপনের জন্য নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে ব্যাপৃত। তাই বারম্বার ঋষি দেবতাকে বলিতেছেন,—

"হে নিবাসস্থানের দানকর্ত্তা!"

ইহাই যুদ্ধকোলাহলের কারণ। তাঁহারা বসবাসের জন্য পৃথিবীতে নূতন স্থানের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন;—কিন্তু যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত, তথায় একজাতীয় কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ ক্রূরপ্রকৃতি মনুষ্যের বাস। তাহারা আর্য্যগণকে দেখিলেই প্রাণে বধ করে। তজ্জন্য সেই কৃষ্ণত্বক্ মনুষ্যগণকে তাঁহারা "দাস" অর্থাৎ ক্ষয়কারী এই উপাধি প্রদান করেন। সেই আদিম ক্ষয়কারিগণ কিরূপে ধীরে ধীরে আধুনিক নিরীহ শান্তিপ্রিয় কর্ষণকারী প্রকৃতিপুঞ্জে পরিণত হইয়াছে—যখন ইহা চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তখন দীর্ঘতমার যজমানগণের দ্বারা বিধাতা আপনার কি এক মহান উদ্দেশ্য সাধন করাইয়া লইয়াছেন, তাহা অনুভব করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

৯। দীর্ঘতমার অনুচর বিশ্-মহোদয়গণ সকলেই বীরপুরুষ। এখনকার ইংরেজদের ন্যায় তাঁহারা অজ্ম-প্রিয় (১) ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মহান কুতূহলের সহিত আজি-ধাবন (২) করিতেন। দীর্ঘতমা অতিশীঘ্র অশ্বিদ্বয়ের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়া যখন উপমা খুঁজিতেছেন, তখন সহজেই আজিধাবনের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি বলিয়া বসিলেন, "হে অশ্বিদ্বয়! বীরপুরুষ ধাবমান অশ্বে আরোহণ করিয়া যেমন অজ্মে গমন করে, তেমনি বেগে তোমাদের রক্ষাশক্তির শরণাপন্ন হইতে কামনা করি।" এই বীরপুরুষেরা যখন রথারোহণ ও অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নদী সকলের গন্তব্য প্রবণ প্রদেশের অভিমুখে নূতন নূতন জনপদস্থাপনের উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়েই উচথ্যের ঔরসে মমতা দেবীর গর্ভে মহামহিম দীর্ঘতমা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে আমি দীর্ঘতমাকে একজন অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া বিবেচনা করি।

(১) Horse-race বা ঘোড়দৌড়কে ঋষিরা অজ্ম বলিতেন।

১০। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"দশমযুগ অতীত না হইতে হইতেই মমতার পুত্র দীর্ঘতমা জীর্ণ হইয়াছেন!"

আধুনিক পাঠকগণ "যুগ" শব্দ শুনিয়া মনে করিবেন না যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির ন্যায় সুদীর্ঘ দশটা যুগ ব্যাপিয়া জীবিত থাকিয়াও যৌবন হারাইয়াছেন বলিয়া ঋষি আক্ষেপ করিতেছেন। ৩৬৬ অহোরাত্রে এক সৌরবৎসর ধরিয়া, পাঁচ সৌরবৎসরে তখন এক "যুগ" পরিগণিত হইত। ১৮৩০ দিনে (অহোরাত্রে) এবং ১৮৬০ তিথিতে পঞ্চসংবৎসরময় যুগ (১) পরিগণিত হইত। সুতরাং ঋষির তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমেই তিনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বোধ হয়, ত্রৈতন দাসের অস্ত্রাঘাতেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি অন্ধ ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে সে অন্ধতাও বোধ হয় সেই অস্ত্রাঘাতেরই ফল।

১১। এখন অশ্বিদ্বয়ের নিকট আমাদের এই অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ এবং অসময়ে জরাজীর্ণ চক্ষুহীন ঋষির প্রার্থনা কি, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। এখনও তাঁহার ধনের আশার নিবৃত্তি হয় নাই। যে প্রাজ্ঞব্যক্তিরা মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, বিস্‌মার্ক ও লি-হুং-চাঙের ন্যায় আপনাদিগকে অজর ও অমর বিবেচনায় অর্থচিন্তা করেন,—দীর্ঘতমা তাঁহাদের ন্যায় একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার যজমানেরা কিসে উত্তরোত্তর সমধিক পরিমাণে প্রচুরধনধান্যসম্পন্ন হইবে, সে চিন্তা জীর্ণ দশাতেও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। দেবতাদের অনুগ্রহে তাঁহার যজমানগণের বংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে; আমাদিগকে যখন এত বাড়াইয়াছ, তখন আরও ধন দাও বলিয়া ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন। গোপশুই তৎকালের প্রধান সম্পত্তি; তাহাই তখনকার টাকা মোহর; তখনকার কারবারে তাহা বিনিময়-সাধন ছিল। তাই ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—

"হে নিবাসদাতৃদ্বয়! আমাদিগকে 'ক্ষীরপূর্ণ গাভী' সকল দেও!"

১২। বৈদিক ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য এবং মাহাত্ম্য এই যে, ইহাতে যেমন মনুষ্য-জীবনে সুখসমৃদ্ধির হেতুভূত অর্থের প্রতি অবজ্ঞা নাই, এবং বিচিত্র ভোগা-গার সংসারের প্রতি অযথা বৈরাগ্য নাই, তদ্রূপ দেহরূপ মাংসপিণ্ডের মধ্যে

---

(১) এই যুগের প্রথম বৎসরের নাম "সম্বৎসর"; দ্বিতীয় বৎসরের নাম; "পরিবৎসর"; তৃতীয়ের নাম "ইদাবৎসর"; চতুর্থের নাম "অনুবৎসর"; পঞ্চম বা শেষ বৎসর— "ইদ্বৎসর"।

যে আমাদের এক অবিনশ্বর অনাদি অনন্ত আত্মা আছে, তাহারও বিস্মৃতি নাই। আমরা ঋষির মুখে ধনের প্রার্থনা শুনিলাম, তাঁহার প্রাণে ইহজীবনের সুখসমৃদ্ধির আশা দেখিলাম; এখন ভাবী জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কি বক্তব্য আছে, তাহা শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞেরা যেমন এক দিকে 'অজরামরবৎ' অর্থ চিন্তা করেন, অপর দিকে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' বলিয়াও তেমনি তাঁহাদের পূর্ণ প্রতীতির অসদ্ভাব দেখা যায় না। দীর্ঘতমা অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া আপনার শক্তিহ্রাস অনুভব করিতেছেন;—গাভীর সমুদায় দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলে সে যেমন অসার পশুতে পরিণত হয়, ঋষির অনুভব হইতেছে, তিনিও তেমনি দিন দিন অসার হইয়া পড়িতেছেন। অহোরাত্রি নামক দুইটা কিম্ভূতকিমাকার পক্ষী উড়িয়া যাইতে যাইতে যেন তাঁহার প্রাণস্বরূপা গাভীর সমুদায় দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়া যাইতেছে;—তিনি মনের তেজ, হৃদয়ের শক্তি একবারে হারাইতে বসিয়াছেন; তখন তিনি দেবতার শরণাপন্ন হইয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন;—

"এই স্তব যেন উচথ্যপুত্রকে রক্ষা করে। হে অশ্বিদ্বয়! এই অহোরাত্রিরূপী পক্ষিদ্বয় যেন একবারে আমার সমুদায় সার দোহন করিয়া না লয়। তোমাদের এই যজমান যখন বদ্ধ হইয়া মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইবে, তখন উপর্য্যুপরি দশ স্তবকে সজ্জিত কাষ্ঠরাশি যেন আমাকে আত্মাতে দগ্ধ না করে।"

এরূপ মনোহর কাতরোক্তি আমি আর কোনও মহাত্মার রচনায় শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চিতাগ্নিতে শরীর ত দগ্ধ হইবেই হইবে—কিন্তু তাহা আমাকে দেহে দগ্ধ করুক—আত্মায় যেন দগ্ধ না করে,—ইহাই আমাদের ঋষির দেবতার নিকট শেষ প্রার্থনা।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

---

(১) "যদ্বাং বদ্ধঃ * * খাদতি ক্ষ্মাং" মূল। যখন তোমাদের এই যজমান বদ্ধ হইয়া মাটি খাইবে; অর্থাৎ, শ্মশানভূমিতে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোরতর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, তিনি এত শুভ্র ও নির্ম্মল ও আমরা এত কলুষকলঙ্কে কলঙ্কিত যে, আমাদের পক্ষে তাঁহার নামগ্রহণ তাঁহার স্মৃতির অবমাননা না হইলেও, আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক্ পরিষ্কারভাবে জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশির লড়াইএর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্ম্মপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব মিথ্যাচারী সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে sacrilege নামে একটা শব্দ আছে; আমাদের কর্ত্তৃক তাঁহার যশোগান অনেকের মতে একটা sacrilege। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা সেই মহাপুরুষের স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতাত্মা যদি ঘৃণার সহিত ও অবজ্ঞার

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার অনধিকারের কথা আসে বলিয়া প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। রামনামগ্রহণে রত্নাকরের অধিকার ছিল না; গ্রহণকালেও তাহার অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যবোধে তৎকালে তিনি শুকপক্ষীর সমস্থলীয় ছিলেন। তথাপি রামনামের মাহাত্ম্যগুণে রত্নাকরও উদ্ধারলাভ করেন। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদেরও অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়া হয় ত অসম্ভব। তথাপি এই সাংবৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের পুঞ্জীভূত কলঙ্করাশি ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এবং ধীরে আমাদিগকে উদ্ধারের পথে লইয়া যাইবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। উপাসিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; উপাসক আত্মোন্নতিবিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠানসাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতাত্মার প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও, আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মনুষ্যত্বকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া এক ভয়ানক ধৃষ্টতা হইয়া দাঁড়ায়। মেকলে আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, সেই চিত্রপটে দৃষ্টিপাত করিয়া এ স্থলে অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। সেই চিত্রপটে কলঙ্কের কালো কালো রেখাগুলা, বিজাতিবিদ্বেষ ও কবিকল্পনা, এই দুই তুলির সাহায্যে স্থানে অস্থানে বিন্যস্ত হইয়া গভীর কৃষ্ণবর্ণে পটখানাকে একেবারে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার এ বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনীপাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার স্বজাতিগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন আধুনিক আংলোইণ্ডিয়ান মেকলের পদানুসরণ

হয়েন, তাঁহাকে মশলা ও রঙ, বিশেষতঃ মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখকগণ প্রচুরপরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ ও স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের লাবরেটরি গুলিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতরূপ গ্রন্থগুলি বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে জাতীয়ত্ব ও বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র বিশীর্ণ ও বিকৃত কলেবর ধারণ করে। এই চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে একমাত্র বিদ্যাসাগরের বিরাট মুর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় অভ্রংলিহ শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই গগনভেদী উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে গেলে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। এবং বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজ কাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজগণের শুভাগমনের পর হইতে চারি দিকে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অবশ্য অতি প্রাচীন কালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দু রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা স্বীকার করেন; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাব সত্ত্বেও এ কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক যতক্ষণ ইচ্ছা চালান যাইতে পারে। কিন্তু সেদিন-

ইংরাজ বাহাদুর আমাদের সামাজিক জীবনটাকে সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন; এবং তাঁহাদের দেশ হইতে আমদানি রাজনৈতিক ব্রাণ্ডি ও কুইনাইন যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সমাজশরীরে বলাধান ও নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবনসঞ্চারের কয়েকটা বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ,—আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া আমাদের বৃদ্ধ পিতামহগণের উপাস্য দেবগণ যত দূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মনুষ্যজীবনের ছোট বড় উৎকট সমস্যাগুলার, অথবা নবীনচন্দ্রের হাতে সামাজিক অভিব্যক্তির সূত্র গুলির আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ,—আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রয়াস ও নূতন ডিমক্রাসির অঙ্কুরোদ্গম। আমাদের কংগ্রেস্ ও কন্ফারেন্স ও মুদ্রাযন্ত্র ও রাজনৈতিক আলোচনা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই পরিণামশুভদ নূতন অশান্তির উৎপত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা নিরতিশয় দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও মোসলমানি আমল অপেক্ষাও এখন আমাদের অবস্থা ভাল, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজের আগমনসহকারে কলির প্রকোপ সহসা এত দূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর আয়ুঃকাল একবারে পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের রাজনৈতিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিয়া নিউটন-প্রণীত গতির নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আমার এই বক্তব্যে মূল প্রস্তাবের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

কতকটা রাজানুগ্রহে ও কতকটা চেষ্টার ফলে আমরা গবর্মেণ্টের নিকট যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকু পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের কত দূর লাভ হইয়াছে, হিসাব করা বড় সহজ নহে। স্বায়ত্তশাসন শব্দে যদি আত্মনির্ভর বুঝায়, এবং পরের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজের কাজ নিজে সম্পাদন বুঝায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান স্বায়ত্তশাসনের সার্থকতা লইয়া বড় গোলযোগ ঘটে। আহারনিদ্রাদি কতিপয় নিত্য-অনুষ্ঠেয় ব্যাপার সমাধানের জন্য যদি রাজার আদেশের ও রাজার সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে রাজা নিতান্ত সুবুদ্ধির মত বিনা আপত্তিতে অনুমতি ও মুক্তহস্তে সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, সেই অনুমতি ও সাহায্য জীবনের বোঝা আরও ভারী করিয়া তোলে। আমাদের মুসলমান রাজারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, এইরূপ ইতিহাসে শোনা যায়; কিন্তু আফিমে এবং বেগমে তাঁহাদের সময়ের এতটা অধিকৃত রাখিত যে, আমরা কি খাই এবং কি পরি, এই সকল তত্ত্বনিরূপণের জন্য তাঁহাদের অবকাশ মিলিত না। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের রান্নার ম তরকারীর পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে একটা যথাযথ সেন্সসের জন্য গবর্মেণ্ট ফরমাইস করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তিনী বলিয়াই বোধ হয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পর্জ্জন্যদেব বঙ্গদেশের উপর প্রতিবৎসর সমান অনুগ্রহ করেন না। ঠিক্ যে কলির প্রকোপেই পর্জ্জন্যদেবের এই অকৃপার কারণ, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। সেকালেও কখন কখন এইরূপ দৈবানুগ্রহের অভাব ঘটিত, ও আমরা তখন অগত্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোদালি ধরিয়া ভূগর্ভ হইতে জল তুলিয়া পিপাসানিবারণের ব্যবস্থা করিতাম। সম্প্রতি কোদালি ধরিবার আদেশের জন্য আমাদিগকে কমিশনার সাহেবদের আদেশের অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এবং ঘটনাক্রমে যদি মিউনিসিপালিটীর ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে জল তোলাইবার ক্ষমতা না থাকে, তবে স্বায়ত্তশাসন আইনে তদনুযায়ী একটা ধারা বসাইবার জন্য আমাদিগকে বিস্তর আন্দোলন করিতে হয়। দুর্ভাগ্য এই যে, পিপাসার মাত্রা একটু অধিক হইলেই প্রাণ-পাখীটা দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এবং এই প্রাকৃতিক নিয়ম কাউন্সিলের অধিবেশনের অপেক্ষা করে না।

২ ইংরাজের সুশাসনে আমরা নিতান্তই আদুরে ছেলে হইয়া পড়ি-য়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পালঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন পরম আয়েশের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়স্ক লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সেই শিশুকেই আবার কিছু দিন মধ্যে সেই বয়স্কের স্থান গ্রহণ করিয়া সংসার-সংগ্রামে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গবর্মেণ্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদেরও আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না। এবং আমাদের স্বচ্ছন্দ-তার অণুমাত্র অভাব ঘটিলেই, সেই শৈশবসুলভ সুন্দর সুশ্রাব্য সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনিটি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ-আকর্ষণে প্রয়াসী হইতেছি।

বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র ও পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না। বিনা সংগ্রামে ও বিনা রক্তপাতে কেবল শান্তির সুখাসনে শয়ান হইয়া কোন জাতি প্রকৃত জীবন লাভ করিতে প[illegible] এরূপ বিশ্বাস বোধ হয় ইতিহাসবিরুদ্ধ। আমা-দের ইতিহাসে এমন দিন ছিল, যখন ঠগে ও বর্গীতে ও পিণ্ডারীতে আমাদের জীবনযাত্রা ব্যাপার অহোরাত্র পর্য্যাকুল ও ভীতিবিহ্বল করিয়া রাখিত। যে দিন ঠগ ও বর্গী ও পিণ্ডারীর দৌরাত্ম্য হইতে নিস্তার পাইবার জন্য স্বয়ং পুরুষকার-প্রদর্শন অনাবশ্যক ভাবিয়া অপরকে আমরা আহ্বান করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের পরকালের আশা বোধ হয় একবারে নষ্ট হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাই যে আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড-হীনতার একটা প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। অবশ্য এই মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের নমনীয়তাটা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্রসংশোধনের প্রস্তাব করি; এবং এই চরিত্র-সংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্রসংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্র-সংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিস? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিলিকা

যেন ইচ্ছামাত্রেই ও চেষ্টামাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরত্বে পরিণত করিবে! ডারুইন-বাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মত ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে! ইচ্ছামাত্রেই চরিত্রশোধন ঘটে না; এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইলে, আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্মগ্লানির কতকটা ওজর ও কৈফিয়ত মিলিতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র, কেন না, আমাদের বর্ত্তমান রাজ-নৈতিক অবস্থাতে আমাদের ক্ষুদ্র না হইলে উপায় নাই। আমরা ক্ষুদ্র না হইলে, বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ঠিক এমনটি হইত না। কতকটা আমাদের নিজের দোষ; ও কতকটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ। আমরা যে দরজা হইতে অনাথ ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দিয়া সাহেবদর্শনরূপ পুণ্যলাভের পাণ্ডা-স্থলীয় চাপরাশীর জন্য আধুলি সঞ্চয় করিয়া রাখি, সাহেবের ভোজে সুপারিস করিয়া চাঁদা দি, আর দেশের কোন কাজের জন্য বন্ধু দেখা করিতে আসিলে, হাঁড়ি মাথায় ঘরের কোণে লুকাইয়া দিগ্‌গজের অবস্থা প্রাপ্ত হই, রাস্তার লোককে বিভীষিকা দেখাইবার জন্য সাহেব সাজি, আর ইংরাজের বুটরেণু গ্রহণ করিতে গিয়া প্লীহা ফাটাই, ইহার সমস্তটাই যে আমাদের কর্ম্মফলে ঘটিতেছে, এমন বলা যায় না; কতকটা যেন এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়-মের অবশ্যম্ভাবিতায় ঘটিতেছে, যাহার উপর আমাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে। আমাদের সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙ্গালার

নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দম্যতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যে জাতি কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া পরকে দুই ঘা দিতে জানে ও পরের নিকট দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে, ও সেই দুধে আবার হজমের ভয়ে মাখন তুলিয়া জল চিনি মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধগুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ, মলিন ও হীন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনটাকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বিজয়ী বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম ও দুরতিক্রম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলাকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন উদাহরণ প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক

পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীকে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তুটার চিড়িয়াখানায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সমগ্র বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন; চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের নিভৃত টোলখানিতে "সহর্ণের্ঘঃ"র তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক্ এমনি না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত ও বিদ্রাবিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্বটা এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি অবজ্ঞার সহিত এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। ইংরাজ চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি স্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, ইংরাজের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল।

ইংরাজদের সঙ্গে কোনরূপ কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের বাস্তবিকই কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু কুটুম্বিতার বিবিধ প্রকারভেদ আছে। প্রতাপ রায়ের বিশ্বস্ত ভৃত্য রামচরণ ইণ্ডিলমিণ্ডিলের প্রতি যে কুটুম্বিতা সম্বন্ধ

সম্বন্ধই কুটুম্বিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইংরাজজাতি এই সামাজিক কুটুম্বিতার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অদ্যাপি শিখিয়াছেন কি না, ঠিক জানি না। তবে মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখা যায়, কোন কোন ইংরাজ হাকিম আসামীর সহিত অথবা তাহার উকীল বাবুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ নৈমিত্তিক ভাবে স্থাপন করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। যদি বস্তুতই ইংরাজ জাতির সামাজিক রুচির এইরূপ উন্নতি ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদের সামাজিক রসনা এই মধুর রসের উপভোগক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী বলিয়া আমরা আনন্দপ্রকাশের সভা ডাকিতে পারি!

ইংরাজের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও ইংরাজের আচার-গ্রহণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক্ তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি আনুরক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান একটা উৎকট দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া রাস্তা চলিতেন, এই দর্প ঠিক্ সেই দর্প। এই হিসাবে দেখিলে সেই আরশুলাভোজন ব্যাপারের সহিত এই চটিজুতা গ্রহণ ব্যাপারেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

আচারবিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ দূরের কথা; বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানুষ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। এই মৌলিক প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি। তিনি সাধারণ বাঙ্গালী হইতে যেমন পৃথক্ ছিলেন, তাঁহার চরিত্র ইউরোপীয়ের চরিত্র হইতেও তেমনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

ইউরোপীয়ের পৌরুষ গুণ যতই প্রশংসনীয় হউক না, তাহাকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব দিতে আমরা বড়ই নারাজ। ইউরোপীয়ের ঘরের কথা আমরা ঠিক জানি না বটে; কিন্তু বাহিরে ইউরোপীয় [illegible]

অন্যান্য দুর্ভাগ্য জীবের কাছে যে মূর্ত্তিতে দেখা দেন, তাহা অতি ভয়ানক। তাঁহার বুট জোড়াটা বড় সুন্দর, কিন্তু সেই বুট জোড়ার সহিত আমাদের প্লীহার সম্বন্ধ মনে করিলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। কি যে একটা স্বার্থপরতা আপনাকে ও আপনার স্বজাতিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনুষ্যভাবকে কমঠ-কঠোর বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট পরের জীবনের ও পরের স্বার্থের মূল্য নাই। করুণানামক মনোবৃত্তির সহিত তাঁহার পরিচয় আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। আপন ঘরের ভিতর হয় ত তিনি ঠিক আমাদেরই মত কাঁদিতে পারেন; কিন্তু পরের জন্য তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুজল কখন ক্ষরিয়াছে কি না, তাহা ইতিহাসে লেখে না। যদি কখন কোন ইউরোপীয় ইউরোপের চতুঃসীমার বাহিরে আসিয়া পরের জন্য দুই বিন্দু অশ্রুকণা ফেলিয়া থাকেন, তাহার পরক্ষণেই সেই ভূমিগত অশ্রুকণা হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা উঠিয়া সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে সবান্ধবে দগ্ধ করিয়াছে। ইংরাজের মধ্যে যে করুণহৃদয় সদাশয় ব্যক্তি বিরল, এমন আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি ও দুর্ভাগ্য সেই জাতি, যাহার উপর সেই করুণার বারি ঘটনাক্রমে সিঞ্চিত হইয়াছে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণদিবসে কোন একটা জাতির নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলে কতকটা মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়, স্বীকার করি। কিন্তু নিতান্তই যখন পাশ্চাত্য প্রকৃতির সহিত বিদ্যাসাগরের প্রকৃতির তুলনার কথাটা উঠিয়াছে, তখন দু কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। বিশেষতঃ আমাদের সহিত তাঁহাদের যেরূপ সম্বন্ধ; তৃষাতুর চাতকের মত নিদাঘের মধ্যাহ্ন ব্যাপিয়া দুই ফোঁটা করুণাবারির প্রত্যাশায় চীৎকারের পর তাঁহাদের নিকট আমরা যেরূপ পুরস্কার পাই, তাহাতে মনের আবেগে দুই কথা বাহির হওয়াই আমাদের অবস্থার পক্ষে ও আমাদের প্রকৃতির পক্ষে সঙ্গত। হাউয়ার্ড এবং দামিয়েন, নাইটিংগেল ও কার্পেণ্টার, হেয়ার ও হিউমের দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতেও ইংরাজের প্রতি আমাদের ভয় ভিন্ন প্রীতির উদ্রেক সম্ভবে না।

পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ফিলান্থ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা নাম লোকহিতৈষণা। তাঁহাদের এই লোকহিতৈষণাটা কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমগ্র মানবজগৎ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত। এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। পলিটিকাল ইকনমির নিকট ও বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব

ও নীতিতত্ত্বের নিকট সার্টিফিকেট পাইয়া এই যে লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ.স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তথাপি যেন এই পাশ্চাত্য ফিলান্‌থ্রপির সম্মুখীন হইতে আমাদের প্রাণটা কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। শাদা চামড়ার প্রেমের অভ্যন্তরেও যেন কি একটা অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কের কারণ বর্ত্তমান আছে। ইংরাজের ধাতুর ভিতর এমনি কি একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, সেই স্ফূর্ত্তি যেন আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয়, এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে এই লোকহিতৈষণা ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। আগে তোমার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিব, পরে আপন প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিয়া সেই আগুন হইতে তোমাকে রক্ষা করিব; সঙ্কল্পটা অনেক স্থলে যেন এইরূপ। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনরূপ পদার্থকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দেয়; এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন স্বার্থেরই কি একটা প্রকারভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। ইংরাজ যখন নিঃস্বার্থভাবে পরের কাজ করে, তখনও মনে হয়, এ ব্যক্তির নিতান্তই অন্য কোন কাজ জুটে নাই। পরের উপকার তাহার উদ্দেশ্য নহে; আপনার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্‌থ্রপিষ্ট বলিলে গালি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, এবং এই মৌলিক বিভেদই তাঁহার চরিত্রকে পাশ্চাত্য চরিত্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের, বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর

সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে, ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও বিচার বিদ্যাসাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন্ ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিতলেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না; আমি সেই ফর্দ্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত। স্পর্দ্ধার বিষয় যে, এই হতভাগ্য দেশে অতি প্রাচীনকালে সেই উচ্চতর নীতির উদ্ভব হইয়াছিল; এবং আহ্লাদের বিষয় যে, ইউরোপীয় ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি ক্রমশঃ তাহার মাহাত্ম্য বুঝিবার পথে অগ্রসর হইতেছে।

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে যথার্থ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলিয়া পড়ে। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আজ কাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে! একটা অকর্ম্মণ্য অলস কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয়, এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়াপ্রকাশ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আজিকালিকার অনেক শাস্ত্রে লিখিয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়াপ্রকাশ ব্যাপার কত দিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থূল হিসাবে ধরা পড়ে না; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্ম্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বন

করিয়া সহস্র গির্জ্জাঘর ও সহস্র কারাগার ও সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্ম্মাধিকরণ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের জীবনসমরের উৎকটতার লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, এই যুগযুগান্তরব্যাপী মনুষ্যের সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিষ্ফলতা। মনুষ্যচরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনরূপ লাঘব হইবে না। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ ক্ষতিলাভগণনার বা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাব নিকাশ জমাখরচ আন্দোলনের পর কর্ত্তব্যনির্ণয় একরূপ ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের প্রতি ধাবমান হওয়া আর এক রকম স্বতন্ত্র ব্যাপার। একটা আহারের চেষ্টায় দৌড়ান, আর একটা প্রাণভয়ে দৌড়ান। এই শেষোক্ত স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিটা প্রকৃতির সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে প্রকৃতি হইতে আর তফাত করিয়া লওয়া চলে না; তফাত করিতে গেলে সমগ্র প্রকৃতিটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয় ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ বাহবা ও প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীরবিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে, শারীর বিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের

কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয় ত রাজশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবেক না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনুষ্যসমাজ কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ করিবে; এবং কারাগার ও গির্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্রশালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদবিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মনুষ্যপ্রকৃতির এই চিত্র অন্ততঃ এক সম্প্রদায় মনুষ্যের নিকট অঙ্কিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই ধর্ম্ম আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের আবিষ্কৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম; এবং প্রতীচ্য দেশে এই নিষ্কাম ধর্ম্মের গৌরব যেমনই হউক, আমাদের এই পুরাতন প্রাচ্য দেশে এই ধর্ম্মই চিরকাল গৌরবের আসন অধিকৃত রাখিয়াছে। এবং যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য মানবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মহিমান্বিত নিষ্কামধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত বাসনালেশবিরহিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রভেদ; এবং এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা বোধ করি এই বঙ্গদেশেই সম্ভবে। অন্ততঃ ভারতভূমির চতুঃসীমার বাহিরে তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না, এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র এই বাক্য স্বীকৃত হইয়াছে কি না জানি না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কতকটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিচরিত্র মনে আসে। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষি মনুষ্যত্বের একটা অদ্ভুত গোছের আদর্শ। দুনিয়াতে ইহার তুলনা নাই। ঋষি-

চরিত্রের উল্লেখমাত্রেই যদি কুরুক্ষেত্রের দুর্ব্বাসার মূর্ত্তিই আমার শ্রোতৃবর্গের মনে আসে, তাহাতে দোষ দিতে পারি না। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির কল্যাণে ঋষিচরিত্রের কুলিশকঠোর ভাবটা আগেই কল্পনার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। উহার কুসুমকোমল অংশটা হয় ত অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিতে হয়। একটি ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার রামায়ণপাঠ সম্প্রতি সাঙ্গ করিয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামসংবলিত চিত্রপট দেখিয়া বলিয়াছিল, "বাবা, ইনি কি খুব রাগী ?" বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন শুনিয়া পিতা মহাশয়কে উত্তর দিবার পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ হইতে হইয়াছিল। বস্তুতই মহর্ষিনামের সহিত একটা উগ্র কঠোর মূর্ত্তির কল্পনা একবারে জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু যখন মনে করা যায়, ঋষিনামধেয় মনুষ্যসম্প্রদায় জ্ঞানের চর্চ্চা ও লোকের হিত, জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সংসারের ঐশ্বর্য্য সম্পদকে অবজ্ঞার সহিত ত্যাগ করিয়া জীবন যাপন করিতেন, তখন এই কঠোর মাহাত্ম্যের উপর প্রীতির ও প্রেমের কোমল আস্তরণ জড়াইয়া একটা অপূর্ব্ব সম্মিলন মনশ্চক্ষে উপস্থিত হয়। প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঋষিগণ যে রক্তমাংসের শরীরধারী মনুষ্য ছিলেন, এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাও যে দোষে গুণে মানুষ ছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইতে বলিতেছি না। কথাটা হইতেছে একটা ideal বা আদর্শ লইয়া। পৌরাণিক উপাখ্যান ও ইতিহাস ও কাব্য, সকলে মিলিয়া যে একটা প্রাচীন ঋষিচরিত্রের ideal বা আদর্শ আমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, আমি সেই আদর্শেরই উল্লেখ করিতেছি, এবং আমার বিশ্বাস যে, তেমন গৌরবময়, তেমন মহিমান্বিত আদর্শ অন্য দেশের কাব্যে বা ইতিহাসে নিতান্তই দুর্লভ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও রক্তমাংসের শরীরধারী মনুষ্য ছিলেন, এবং ঐতিহাসিক শরীরী বিদ্যাসাগরকে মনুষ্যলক্ষণবর্জ্জিত করিতে প্রয়াস পাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। অনুসন্ধান করিলে ঐতিহাসিক বিদ্যাসাগরেও অনেক দোষ মিলিতে পারে; কিন্তু এরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদিগকে যে একটা আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ আমরা সম্মুখে রাখিয়া আপন আপন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনসাধনে বিনিয়োগ করিতে পারি। তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে যে আদর্শটা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহার সহিত আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য আছে। এবং এই সম্বন্ধ ধরিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরকে আমাদেরই বলিয়া সংসারের নিকট অকুতোভয়ে পরিচয় দিব।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা ভয়ানক অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। সীতার বনবাসের নায়কের সহিত বিদ্যাসাগরের কোন আত্মীয় সম্বন্ধ ছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমান; ভ্রাতা অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বৈরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের বিশেষ অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছীল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি পারিতেন না। জগতের দুঃখদর্শনে তাঁহার অটল হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ু-প্রবাহে দ্রুম সানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমানই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

বিদ্যার সাগরকে লোকে দয়ার সাগর বলিত; এবং সংসারের সংখ্যাতীত

তৃষ্ণাতুর নরনারীর জন্য বিদ্যার সাগরের অপেক্ষা দয়ার সাগরেরই বোধ হয় জগতে আবশ্যকতা অধিক। জগতের মধ্যে মৃত্যু এবং দুঃখ এই দুইটার মত প্রকাণ্ড সত্য পদার্থ আর তৃতীয় নাই। এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ভীতিবিহ্বল মনুষ্যহৃদয় মৃত্যুর হাত এবং দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য বিবিধ উপায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছে। কি কারণে জানি না, এই ভারতভূমিতে মৃত্যুর হাত এবং দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য মানবাত্মা যেন বিশেষরূপে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই পরিত্রাণের উপায় আবিষ্কারে সহস্র লোকের ধীশক্তি সহস্রধা নিযুক্ত হইয়াছিল। অনেকে অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—সর্ব্বত্র ফললাভ হইয়াছে কি না, জানি না। কেহ জ্ঞানের মার্গ, কেহ বৈরাগ্যের মার্গ, কেহ কর্ম্মের মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ববিলোপের জন্য শাক্যকুমার ভগবান্ সিদ্ধার্থ যে দিন ব্যথিতহৃদয়ে উন্মত্তের মত বাহির হইয়াছিলেন, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে সেই একদিন। ভারতের ইতিবৃত্তে, অথবা পৃথিবীরই ইতিবৃত্তে সেই মহাভিনিষ্ক্রমণদিবসের মত পুণ্য দিন বোধ করি আসে নাই। সেই সংসারবিরক্ত রাজকুমার বুদ্ধত্বলাভের পর যে নির্ব্বাণমার্গ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদপেক্ষা প্রশস্ততর মার্গ আর কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই বৈরাগীর রাজা যে বৈরাগ্য ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন সেই বৈরাগ্যের অভিপ্রায় নহে। সেই মহতী শিক্ষার ফলে বৈরাগ্য কর্ম্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেই বৈরাগ্যমার্গের ও কর্ম্মমার্গের পথিক ছিলেন। কেহ যেন মনে না ভাবেন, আমি বিদ্যাসাগরকে বৌদ্ধ বা আধুনিক ফ্যাশনানুযায়ী বুদ্ধধ্বজী সম্প্রদায়ের মধ্যে টানিয়া আনিতেছি। স্বকীয় ধর্ম্ম ও স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার সাজিতে তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি পরের জন্য বেত খাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার জীবন লইয়া কথা; তাঁহার সাম্প্রদায়িকত্ব লইয়া কথা নহে। তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্য্যশাস্ত্রসম্মত ও বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত ও মানবশাস্ত্রসম্মত সনাতন ধর্ম্মমার্গ। দারাসুত পরিবার ত্যাগ করিয়া লোকালয় হইতে পলায়ন সেই সাধুসম্মত ধর্ম্মের উপদেশ নহে। সংসারের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দুঃখের সহিত সম্মুখ-সমরই সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উপদেশ।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল,

তাঁহার জীবনীলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে জগৎ সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্বটা এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সেণ্টলরেন্স ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার মালিক কিরূপ করুণা প্রকাশ ও মঙ্গল সাধন করিলেন, এক নিশ্বাসে তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন, দয়ার সাগরের বুদ্ধি তত দূর তীক্ষ্ণতালাভ করে নাই। বস্তুতই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্য-সমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন অপর সাধারণ বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর এক জন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মার্জ্জনার ভিখারী হইবার প্রার্থনায় অধিকারী। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। তাঁহার অনুষ্ঠিত অপরাপর সৎকর্ম্ম তিনি ইহার সহিত তুলিত করিতেন না। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধার রূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি তাহার শাসন-বহির্ভূত নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন

সহিতেন না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণার মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতা মাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা ইংরাজি নীতিশাস্ত্র হইতে মরাল কারেজ নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে ইউরোপীয়ের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি-পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, পাশ্চাত্য ভূমিতে যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ইংরাজ জাতিকে কোন দোষ দিতে চাহি না; তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের মরাল কারেজ সমুদ্রপারে আসিয়া কি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে, দেখিলে তাঁহারাই হয় ত চমকিয়া উঠেন। ইংরাজ বড় ভাল লোক; কিন্তু আমাদের গ্রহদোষে তাঁহাদের আনীত অনেক জিনিষই আমাদের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আবহাওয়ারই দোষ। তাঁহারা আমাদের জন্য যে সকল বাচ্চা পাঠান, তাঁহারা আসিবামাত্র কিরূপে বিগড়িয়া যান। তাঁহাদের প্রেরিত কোন দ্রব্যই আমরা হজম করিতে পারি না। তাঁহাদের বুট আমাদের হজম হয় না; সেবনমাত্র প্লীহা ফাটে; তাঁহাদের ব্রাণ্ডি-সেবনমাত্রে আমাদের যকৃৎ ফুলে। তাঁহাদের আনীতা সরস্বতীও আমাদের দেশে পদার্পণমাত্র বন্ধ্যা হইলেন। তাঁহাদের রপ্তানি মরাল

কারেজও এখানকার বায়ুর গুণে আমাদের হজম হইল না। আরও দুঃখের বিষয় যে, ইংরাজি শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বয়স কালে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপ পড়িয়া ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবীশ বালকগণের উপর ইহার প্রকোপ বড় ভয়ানক। অনেক স্থানেই আমাদের বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্টকেও সময়ে সময়ে ইহার প্রশমনের চেষ্টা পাইতে হইতেছে; এবং ইহার আক্রমণ বৃটিশ সিংহের রাজনীতিরও আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর বিলাতী জুতা ও বিলাতী মরাল কারেজ উভয়েরই প্রতি সমান রাজি ছিলেন। স্বাধীন আত্মাকেও কোন্ স্থানে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়—তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি, নিজের বিবেক এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্তঃবলিদান দেওয়ার সময়-বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না; কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল; মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে; যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাটপুরুষের ঐতিহাসিক বিরাট জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণি মুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজল আমাদের পাষাণহৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা কপট ধার্ম্মিকতা ও ভণ্ড ব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রু-

জল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল;—কেন না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে একদিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচার সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্বুদ্ধিতায় হউক সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ সহানুভূতি নাই। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনীয় করা ফ্যাশন হইয়া পড়িয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীর মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্তর্ভুক্ত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না। সমাজশরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকেও ঠিক্ জীব-শরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়; এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শরীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে rudimentary organ আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়ব গুলায় জীবন ধারণে ও জীবন রক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্রদেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা

জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা অনাবশ্যক ও ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গের সহযোগে তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজশরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন rudimentary organএর মত। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের ভারস্বরূপ যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সংস্কারক, তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক, তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইও না।—তোমার ছুরিকায় ধার আছে, সত্য কথা; কিন্তু জীবন বড় মহার্ঘ সামগ্রী।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে, এবং যে শ্রোতৃগণের পরম সহিষ্ণুতার ফলে সেই পুষ্পাঞ্জলি দান নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপ-সংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়গণের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহাদের চরিত্রের কোন একটা দেশ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার যে কিছু সংস্কার বদ্ধমূল আছে, কৃত্রিম সলজ্জভাব পরিহার করিয়া সেই সকল সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার

আছে, পার্সনাল বা ব্যক্তিগত হইলেও বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফস্বলে পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্য আছে, যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালেই সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তকপরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা, ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি ও পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। কালী দুর্গা দশাবতারের চিত্রপটের সহিত বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্ত্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। কি কারণে জানি না, এই লোকটার মূর্ত্তির ও আচরণের সহিত আমার মনঃকল্পিত বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির ও ব্যবসায়ের কিরূপ একটা সাদৃশ্য ঘটিয়া গিয়াছিল। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চয় বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার সলিউশনের ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১ শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতাসহরে আসি; এবং ২৩ শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগরদর্শনলালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে

পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য আর্য্য মনুষ্যত্বের মহাদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই মহান্ আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর এই মুমূর্ষু দেহে নবজীবনসঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? বিদ্যাসাগর এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, অতীতে তিনি মিশিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি এখনও বর্ত্তমান; তাঁহার আদর্শ আমাদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই পতিত ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে, বিপত্তির এই ঘোর মহানিশায়, মহাশক্তির সাধনা করিয়া এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে? *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

হাসি ও অশ্রু।

১

"তবে তুমি আমাকে ভালবাস না?"

"না।"

"যখন তুমি আমাকে ভালবাস না, তখন আমি মরি আর বাঁচি, তোমার পক্ষে সমান? কেমন তাই ত!—কি বল?"

"তাই।"

কথাটা বলিয়াই সরলা ভাবিল—কি বলিলাম! শুনিতে পাওয়া যায়, দুষ্ট-

* গত ১৩ই শ্রাবণ, বিদ্যাসাগর-স্মরণ-সভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

সরস্বতী দেবী যখন যাহার স্কন্ধে আবির্ভূতা হয়েন, তখন সে তাঁহার প্ররোচনায় যে সকল কথা বলে, সে সকল কথা অমঙ্গলমাত্র আনয়ন করে। বোধ হয়, যে মুহূর্ত্তে রাগের মাথায় সরলা স্বামীকে এই কথাটা বলিল, সে মুহূর্ত্তে দুষ্ট সরস্বতী দেবী তাহাকে ঐ কথাটা বলিতে প্ররোচিত করিয়া থাকিবেন। নহিলে জানিয়া শুনিয়া সে এমন একটা মিথ্যা কথা বলিবে কেন?

সরলা ভাবিল—কি বলিলাম! কিন্তু তখন সে আর সংশোধনের উপায় দেখিল না; কারণ তাহার কথা শুনিয়াই ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্বামী নরেশচন্দ্র সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তখন বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা ভাবিতে লাগিল—তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহার পর তাঁহার কাছে আর কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? কিছুক্ষণ কাঁদিয়া মুখ তুলিয়া সরলা দেখিল, সকাল হইয়াছে; তাড়াতাড়ি উঠিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে চলিয়া গেল। সারাদিন কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—কেমন করিয়া তাঁহার কাছে আর মুখ দেখাইব?

স্বামী স্ত্রীতে কয়টা বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল,—দুই জনেই রাগী, অভিমানী, একগুঁয়ে, দুই জনেই বড় অল্পে রাগ করে। আর বোধ হয়, দুই জনেরই ভালবাসা বড় গাঢ় ছিল, নহিলে কথায় কথায় তাহারা পরস্পরের উপর এত রাগ করিবে কেন? এ দুই বৎসরে তাহারা এমন কতবারই পরস্পরের উপর রাগ করিয়াছে;—বোধ হয় এমন সপ্তাহ যায় নাই, যে সপ্তাহে তাহারা তিন বার ঝগড়া করে নাই। তবে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া শরতের লঘু মেঘের মত, তাহাদের রাগ, অভিমান দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইত। সামান্য একটা কি খুঁটিনাটি লইয়া অন্য দিনেরই মত আজ স্বামীস্ত্রীতে কথা-কাটাকাটি হইতেছিল; কিন্তু শেষে উভয়েই দেখিল, হাসিতে হাসিতে কপাল ব্যথা হইয়াছে;—আজ ব্যাপারটা কিছু গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

২

সরলার কথা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া নরেশ ভাবিতে লাগিল—এত প্রেম, এত যত্ন, এত আদর, সে সকলের এই প্রতিদান! আমি মরিলে চোখে এক ফোঁটা জলও আসিবে না! আর এক জনের নয়নে এক ফোঁটা জলও আসিবে না ভাবিয়া, নরেশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তখন নরেশের মনে হইল—কেহ দেখিবে না ত? নরেশ উঠিয়া চক্ষু মুছিল। তখন পূর্ব্বগগন রক্তিমাভ হইয়া আসি-

তেছে, সহর ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। সে দিন সমস্ত দিন নরেশ বড় অন্তমনস্ক রহিল।

নরেশ আপনাকে আপনি প্রবোধ দিল—সরলা রাগের মাথায় কথাটা বলিয়াছে; সে নিশ্চয় সে জন্ত দুঃখিত হইয়াছে; সে ক্ষমা চাহিবে।

এমনই ভাবিয়া দিন গেল। রাত্রিকালে সাক্ষাৎ হইলে কেহই কোন কথা কহিল না। সরলা ভাবিল, যে কথা বলিয়াছি, তাহার পর কথা কহিলে উনি আরও বিরক্ত হইবেন; একবার যদি উনি একটা কথা কহেন, তবে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহি। সরলা কেবল আশা করিতে লাগিল, নরেশ একটা কথা বলিবে; নরেশ একটু নড়িলে চড়িলে সরলা আশা করিতে লাগিল, নরেশ এইবার কথা কহিবে। নরেশ ভাবিল—সরলা যে কথা বলিয়াছে, তাহা বলিয়া সে তবে দুঃখিত নহে! তাহা হইলে সে সে কথা বলিত। নরেশের মনে পূর্ব্বে ক্রোধ অপেক্ষা বেদনাই প্রবল ছিল—এখন ক্রোধ ও বেদনা সমান দাঁড়াইল।

প্রভাতে নরেশ দাদাকে বলিল, সে রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে যাইবে। তাহার রুড়কী যাইবার আর সবই স্থির ছিল, কেবল তাহারই মত ছিল না। দাদা বলিলেন, "ভাল।" নরেশ বলিল, "আমি কাল রওনা হইব।" দাদা বলিলেন, "কালই কেমন করিয়া যাওয়া হইবে? যোগাড় যাগাড় করিতে হইবে ত?" নরেশ বলিল, "দেখিবেন।" নরেশ চিরকালই ঐরূপ; যখন যে কাজের উপর তাহার ঝোঁক হয়, তখন সে কাজ করিতে সে বিলম্ব সহিতে পারে না। দাদা তাহা জানিতেন, তাই কিছুই আশ্চর্য্য হইলেন না। নরেশ পর দিবস যাত্রার সকল আয়োজন করিতে লাগিল।

৩

যেদিন নরেশ রুড়কী যাইবে স্থির করিল, সেই দিন সরলার এক ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে, তাহার পিতা তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে আসিলেন।

শ্বশুরকে গাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে যাইয়া নরেশ দেখিল, সরলার মুখখানি বেশ প্রফুল্ল। সরলা ভাবিতেছিল—সে পিত্রালয়ে যাইলে নরেশের কিছুতেই রুড়কী যাওয়া হইবে না; কারণ, নরেশ সত্যই আর তাহাকে একবার না বলিয়া যাইবে না। বাস্তবিক তাহার অমত ছিল বলিয়াই নরেশ পূর্ব্বে রুড়কী যাইতে চাহে নাই। কিন্তু নরেশ ভাবিল, সরলা তাহার কাছ হইতে

এ হাসির পরিণাম অশ্রু। সরলা চলিয়া গেল। নরেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

পরদিন নরেশ চলিয়া গেল।

ভগিনীর বিবাহ-উৎসবের মধ্যে সরলা যখন সে কথা শুনিল, তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন আলোক নিবিয়া গেল; তাহার ব্যথিত কাতর হৃদয় হইতে একটা অসীম বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া কুসুমসুরভিসমাকুল পবনে মিশাইয়া গেল। সে ভাবিল—"কি করিলাম!"

এ দিকে নরেশের কথাই সত্য হইল, সরলার অধরপ্রান্তে হাসি মিলাইবার পূর্ব্বেই তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। স্বামিগৃহে ফিরিয়া সরলা দেখিল, আর কিছুই ভাল লাগে না—কেবল একা একা ভাবিতে ও কাঁদিতেই ভাল লাগে। তাহার মনে প্রথমে একটু অভিমান হইল—নরেশ একবার তাহাকে বলিয়াও গেল না! কিন্তু তাহার পরেই সে ভাবিল—দোষ তাঁহার না আমার? আমি তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছি, আর কোন স্বামী হইলে আর স্ত্রীর মুখদর্শন করিত না। তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার ভালবাসার কি সীমা আছে? তিনি কি ব্যথাই পাইয়াছেন!

সরলার হাসিমুখে বিষাদের ঘনছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

৪

আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে আসিয়া নরেশও দেখিল, কিছুই ভাল লাগে না। সে আপনার অধ্যয়নে সকল ভাবনা ডুবাইতে চেষ্টা করিল। নরেশ কাহারও সহিত বড় মিশিত না, আপনার অধ্যয়ন ও আপনার চিন্তা লইয়াই থাকিত। কিন্তু তাহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তখন সেই দূর স্নেহস্নিগ্ধ গৃহের কথা তাহার মনে পড়িত। আর যখন সে শ্রমক্লান্ত দেহে শয়ন করিত, তখন তাহার হৃদয়ের বেদনা যাতনা যেন আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। সুপ্তিমগ্ন শব্দহীন নিশীথে কেবল সরলার কথা তাহার মনে পড়িত। এক এক দিন মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া নরেশ নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরে চাহিয়া ভাবিত,—তাহার দূর গৃহেও সে কত দিন নিশীথে ঐ সকল তারকা দেখিয়াছে, তখন সরলার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, মান, অভিমানের কত কথাই বলিয়াছে!—সরলা কি এখনও তাহার কথা ভাবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নরেশের নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

আমি যদি পুরুষ হইতাম, তবে এতদিন কিছুতেই না আসিয়া থাকিতে পারিতাম না। রমণী অপেক্ষা পুরুষ কত সুখী! তাঁহাকে না দেখিলে আমার যত কষ্ট হয়, আমাকে না দেখিলে তাঁহার কি তত কষ্ট হয়? হইলে তিনি আসিতেন।

সরলা কয় বার ভাবিল, স্বামীকে পত্র লিখিবে; কিন্তু আবার ভাবিল যদি তিনি বিরক্ত হয়েন! আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহাতে তিনি ক্ষমা না করিলে আর কি বলিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিব?

সরলা শুকাইতে লাগিল, নরেশ শুকাইতে লাগিল; দিন কাটিতে লাগিল।

৫

এক বৎসর কাটিয়া গেল; মার ও দাদার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ছুটীর সময় নরেশ বাড়ী আসিল না। সে সময় সে কোথাও বেড়াইতে যাইত।

পরবার ছুটীর সময় নরেশ দাদার পত্র পাইল—মার বড় অসুখ, তিনি একবার তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। নরেশ বুঝিল, এটা কেবল তাহাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্ম দাদার চালাকি। ছুটি প্রায় কাটাইয়া নরেশ বাড়ী আসিল। কিন্তু যেমন গিয়াছিল, তেমন আসিল না; সে পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশ হইয়াছে, গম্ভীর হইয়াছে; তাহার মুখে যেন বিষাদের ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে;—তাহার শীর্ণবদনে উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে; তাহার বর্ণ মলিন হইয়াছে।

মা বলিলেন, "বাছার শরীর কালি হইয়া গিয়াছে। শরীর নষ্ট করিয়া তোর আর পড়িয়া কাজ নাই। তোর শরীর বড় না পড়া বড়?" দাদা বলিলেন, "তোমার বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া পড়া মানে যদি সকলের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করা হয়, তবে তোমার পড়া ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।" শুনিয়া নরেশ একটু হাসিল।

নরেশ বাড়ী আসিলে বহু দিন পরে সরলার বিষাদছায়াচ্ছন্ন আননে হাসি ফুটিল; যেন বর্ষার পরে শরতের মেঘমুক্ত আকাশে রবিকর হাসিল। সরলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যেন আশা ও আনন্দ আর ধরে না। সরলা ভাবিল—তবে এত দিনে আমাকে তাঁহার মনে পড়িয়াছে।

৬

দুই জনেই বড় আশা করিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাতের সময় কেহই কথা কহিল

কথা কহিল না। নরেশ ভাবিল—সরলা ত আমাকে বলিয়াছে, আমার জীবন মরণ তাহার পক্ষে সমান। তবে সে কথা বলিয়া সরলা এত দিনে একটু দুঃখিতও হয় নাই! সরলা কথা না কহিলে আমি কথা কহিব কেন? সরলার ভয় হইল, সে আগে কিছু বলিলে পাছে নরেশ আরও বিরক্ত হয়, আরও রাগ করে, তাহার সঙ্গে আবার একটু লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মনে প্রথমে একটু অভিমান হইল; সে ভাবিল—আমি না বুঝিয়া দোষ করিয়াছি; তাই বলিয়া একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না কেমন আছি! কিন্তু বেদনায় মর্ম্মব্যথায় তাহার অভিমান ভাসিয়া গেল; সরলা সারা রাত্রি কাঁদিল। নরেশ ভাবিল—এত দিন পরে দেখা,—একটা কথা নাই! এত দিন তাহার মনে ক্রোধ ও বেদনা সমান ছিল, এখন বেদনা অপেক্ষা ক্রোধই অধিক দাঁড়াইল। দুই জনেই পরস্পরকে বড় ভালবাসিত। যাহাকে ভালবাসি, যে আমাকে ভালবাসে বলিয়া বিশ্বাস করি, যাহার ভালবাসা আমারই প্রাপ্য, তাহার নিকট আমি জগতের আর সকলের অপেক্ষা বড়; তাই তাহার নিকট অধিক প্রত্যাশাই করিয়া থাকি। পরস্পর পরস্পরের কাছে এই অধিক প্রত্যাশা করিয়াছিল বলিয়াই এত ইচ্ছা সত্ত্বেও বুঝি কেহ আগে কথা কহিতে চাহিল না। স্ত্রী সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, স্বামী তাহাকে ভালবাসে না; স্বামীও সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, স্ত্রী তাহাকে ভালবাসে না। কারণ সে বিশ্বাসের সহিত যে বেদনা বিজড়িত, তাহা কেহই ইচ্ছা করিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

পরদিন সকালে নরেশ বলিল যে, সে সেই দিন রাত্রেই রুড়কী যাইবে। মা বলিলেন, "তাহা কিছুতেই হইবে না।" নরেশ ছুটী প্রায় কাটাইয়া আসিয়াছিল; বলিল, "মা, এত দিন পরিশ্রম করিলাম, এখন কামাই করিলে সব বৃথা হইবে।" ইহার উপর আর কথা চলে না। নরেশ পোর্টমেণ্ট গুছাইল।

বড় আশা করিয়া নরেশ বাড়ী আসিয়াছিল; হতাশ হইয়া আঁধার মুখে সে চলিয়া গেল। দোষ করিয়া ক্ষমা চাহিতে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ, সে সুখ-ভোগ সরলার ভাগ্যে হইল না। সেই দিন নিশীথে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা ভাবিতে লাগিল—আমি দোষ করিয়াছি, তুমি কেন আমায় বুঝাইয়া বলিলে না;—তুমি কেন আমায় তিরস্কার করিলে না? তুমি মুখ আঁধার করিয়া চলিয়া গেলে;—তুমি ক্ষমা না করিলে আমি যে মরিতেও

আমার এত কষ্ট হইত না। একবার ফিরিয়া এস, একবার আমায় ক্ষমা কর, একবার আমায় তেমনই করিয়া সরলা বলিয়া ডাক।

সরলার ব্যথিত, তৃষিত, তাপিত হৃদয়ে বাসনা হইল—একবার যদি তিনি ফিরিয়া আসেন!

৭

ক্রমে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল,—নরেশ বাড়ী আসিল না। সময় সময় নরেশের কথা বলিয়া মা দুঃখ করিতেন; তাহাতে সরলার দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিত। সে ভাবিত, তাহার দোষেই ত মার এত কষ্ট! সরলা কেবল কাঁদিত।

নরেশের শেষ পরীক্ষা হইয়া গেল, তবুও নরেশ বাড়ী আসিল না। আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া দাদা আবার তাহাকে পত্র লিখিলেন। এবার সরলা আর থাকিতে পারিল না; সেও নরেশকে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। তিন বৎসর পরে সরলা স্বামীকে সম্বোধন করিতে বসিল। সরলা বহুক্ষণ ভাবিল—কি লিখিবে; তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে লাগিল। কিন্তু এত দিন পরে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিল না; তাহার চখের জল পড়িয়া লেখা অস্পষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। দুইখানা কাগজ নষ্ট করিয়া তৃতীয়খানায় সরলা লিখিল :—

"প্রিয়তম, তোমার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তুমি বাড়ী আসিবে না কেন?

"তুমি আসিবে না শুনিয়া মা কাঁদিতেছেন; আর সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। আমার দোষের জন্য সকলকে কষ্ট দিতেছ কেন? আশা করি তুমি বাড়ী আসিবে।

"এখানে সকলে একরূপ ভাল আছেন। ভরসা করি তুমি ভাল আছ। একবার আসিয়ো। ইতি

সেবিকা

শ্রীমতী সরলা।"

পাছে নরেশ বিরক্ত হয়, রাগ করে, এই ভয়ে সরলা আপনার কথা কিছুই লিখিল না; নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সাহস করিয়া লিখিতে পারিল না—"আমি দোষ করিয়াছি; কিন্তু তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে না?"

সরলার পত্র পড়িয়া বহুদিন পরে নরেশের চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল পড়িল; সে অশ্রু কতকটা বেদনার, কতকটা অভিমানের। সে ভাবিল—

তাই সরলা তাহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছে! তবে তাহার জন্য সরলার এতটুকুও কষ্ট হয় নাই! সে যাহা বলিয়াছিল, তাহার জন্য সরলা দুঃখিত নহে! সরলা ত তাহাকে বলিয়াছে, তাহার জীবন মরণ সরলার পক্ষে সমান। নরেশ বুঝিল না, ঐ ক্ষুদ্র পত্রের অক্ষরে অক্ষরে রমণীহৃদয়ের কি বাসনা, কি বেদনা, কি মর্ম্মব্যথা, আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে।

নরেশ সে পত্রের উত্তর দিল না; দাদাকে লিখিল—নানা কারণে তাহার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা নাই।

দাদা সে পত্র পাইলে, কথাটা শুনিয়া মা কাঁদিলেন। কথায় কথায় সরলাও সে কথাটা শুনিল। তাহার পরদিন সরলার প্রবল জ্বর হইল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

দাদাকে পত্র লিখিবার কয় দিন পরে নরেশ মার এক পত্র পাইল। মা লিখিয়াছেন, "বাবা, তোকে পেটে ধরিয়াছি, মানুষ করিয়াছি, আমার একটা কথা রাখ্; একবার বাড়ী আয়। তুই বড় হইয়া একবার মার খোঁজও লইবি না বলিয়াই কি এত কষ্ট করিয়া তোকে মানুষ করিয়াছিলাম? বাবা, তুই ত কখনও আমার অবাধ্য হ'স নাই, এখন এমন হইলি কেন? আজ কয় দিন হইতে ছোটবৌমার বড় জ্বর; তাই ব্যস্ত বলিয়া আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। পত্রপাঠ বাড়ী আসিস্।"

মার পত্র পড়িয়া নরেশ বহুক্ষণ ভাবিল। তাহার হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই স্নেহস্নিগ্ধ গৃহ,—সেই সকল পরিচিত মুখ, নরেশ সেই সকল কথা ভাবিতে লাগিল। সে আর একবার মার পত্র-খানি পড়িল,—তাহার পর ভাবিল—আমি কুপুত্র, মাকে এত কষ্ট দিয়াছি, তাঁহার একটা অনুরোধ রাখিব না?

তাহার পর নরেশ বাক্স হইতে সরলার পত্রখানা বাহির করিয়া আবার পড়িল। সে পত্রে এখনও তাহার দুই ফোঁটা অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে। পড়িয়া নরেশ সেখানা আবার তুলিয়া রাখিল।

নরেশ বাড়ী যাইবে স্থির করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

৮

বাড়ী আসিয়া নরেশ দেখিল, সরলার অসুখ অনেকটা কমিয়াছে; কিন্তু সরলা ঔষধসেবনে একেবারেই অসম্মত।

অভিমান, রাগ, প্রেমে নিমগ্ন হইয়া গেল। সরলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাহার একখানি শীর্ণহস্ত হস্তে লইয়া, নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সরলা, কেমন আছ?" কতদিন পরে সাক্ষাৎ! আরও কত দিন পরে এই স্নেহসম্ভাষণ! সে আজ কত দিনের কথা! সরলার মনে যে কত সুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠিল, তাহা স্থির করা কি সম্ভব? সে কথা কহিতে পারিল না, কেবল একবার স্বামীর মুখপানে চাহিল। রমণীর নয়নে যখন প্রেমভাব দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন সকল রমণীনয়নই এক অপূর্ব্ব মাধুরীময় হইয়া উঠে; সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী মাধুর্য্য যে না দেখিয়াছে, সে কখনও তাহা বুঝিতে পারিবে না। সরলার নয়ন জলে ভরিয়া আসিল—এ অশ্রু আনন্দের কি অভিমানের, বলিতে পারি না।

নরেশ বলিল, "সরলা, ঔষধ খাইবে না কেন?" সরলা কিছু বলিতে পারিল না—তবে এবার নয়ন ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। যে দুঃখে সরলা ঔষধ সেবন করিতে চাহে নাই, সরলার সে দুঃখ আর আছে কি? ঔষধ আনিয়া নরেশ বলিল, "সরলা, খাও।" সরলা আর দ্বিরুক্তি করিল না। যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসা যায়, সে ভালবাসিয়া—যত্ন করিয়া কিছু করিতে আদেশ করিলে সে আদেশপালনে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, একটা অকূল তৃপ্তি থাকে। আনন্দে সরলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সরলা দিন দিন সারিয়া উঠিতে লাগিল।

৯

কয় দিন পরে একদিন নরেশ সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সরলা, আজ কেমন আছ?"

সরলা বলিল, "ভাল আছি।" তাহার পর সে বলিল, "তুমি এত কাহিল হইয়া গিয়াছ কেন?"

সরলার কথা শুনিয়া নরেশের বেদনা, অভিমান, ফিরিয়া আসিল; সে বলিল, "যে মরুক্ আর বাঁচুক্ তোমার পক্ষে সমান, তাহার কথা আর কেন সরলা?"

সরলা কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "আমি দোষ করিয়াছি।—তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে না? এ তিন বৎসর আমি যে যাতনা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?" সরলা আর বলিতে পারিল না—অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নরেশ বলিল, "আমি যখন আসিয়াছিলাম, তখনও ত আমাকে কিছু বল নাই ?"

সরলা বলিল, "সে দিন যদি তুমি একটা কথা কহিতে, একবার যদি সরলা বলিয়া ডাকিতে, তবে তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মনের দুঃখ দূর করিতাম। আমি রাগের মাথায় যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার কাছে এ পোড়া মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইতেছিল। তুমি একটা কথাও কহিলে না, আমার ভয় হইল, আমি কথা কহিলে পাছে তুমি আরও বিরক্ত হও, আরও রাগ কর। কথা কহিতে, ক্ষমা চাহিতে, আমার সাহস হইল না। তাহার পর মুখ অন্ধকার করিয়া তুমি চলিয়া গেলে—তুমি আমাকে পদাঘাত করিলেও আমার তত কষ্ট হইত না। থাকিতে না পারিয়া শেষে তোমাকে পত্র লিখিলাম ; পাছে তুমি বিরক্ত হও, সেই ভয়ে একবার ক্ষমা চাহিতেও পারিলাম না।—"

নরেশ বলিল, "তবে সরলা, এখন আমি মরি আর বাঁচি, তোমার পক্ষে সমান কি ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। বল তুমি ও কথা আর বলিবে না—একবার বল, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে।"

সরলার কথা শুনিয়া নরেশের চক্ষে জল আসিল! সরলাকে আরও কাছে আনিয়া সে বলিল, "সরলা, আগে যদি এ কথা বলিতে, তবে এতদিন দু জনকে এ কষ্ট সহিতে হইত না।"

তখন সাশ্রুনয়নে তাহারা পরস্পরের মুখ চুম্বন করিল। হাসি ও অশ্রু মিশিয়া গেল।

শ্রীহরি গোস্বামীর জীবনচরিত।

(ন্যায়চূড়ামণির অভিশাপ।)

একদিন শ্রীহরি
প্যাণ্টকোট পরি'

সঙ্গে তাঁর বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্ম্মধ্বনি ;
সঙ্গে ছিলেন অন্য
আরো মান্য গণ্য

যাঁহার বিজ্ঞান-জ্ঞান—বিদিত ধরণী,
লুপ্ত প্রায় হক্‌স্‌লি নিজে,
এমন কি ফ্যারাডে যে
ফ্যারাডে, তিনিই গুঁড়ো; টিণ্ড্যাল ত যান ভিজে!

(২)

মহাত্মাদের ক'টি
পায়েতে চটি,
পরণে ধুতি
—গরদ কিম্বা সুতি
এক একটি নামাবলি সবারই বিরাজে;
(আহা-কৃষ্ণনামাবলি বিনা ভক্তেরে কি সাজে?)
কপালে ফোঁটা
সরু ও মোটা,
গায়ে সোজা বাঁকা
হরিনাম আঁকা,
এক একটি টিকী ঝুলে ঘাড়ের উপরি;—
টিকী মান্য—টিকী গণ্য—আহা, টিকীতেই হরি!

(৩)

এ অতি গম্ভীর সভা; সবাই ধ্যানে মগ্ন;
ছুরি আর ফর্কে
—ধারাল সব তর্কে,
কঠিন কোমল প্রশ্ন করিছেন ভগ্ন;
সবার প্রাণ ভক্তিপূর্ণ, সবারই বাক্য রুদ্ধ,
ঠুন্ ঠুন্ ঠক্ ভিন্ন নাহি কোন শব্দ,
কেবল একবার টিকী নেড়ে
—"আহা—কি মধুর বেড়ে"—
বলিলেন চূড়ামণি;—আবার সব স্তব্ধ;
—হইল একটু ভুল
ভাবী কুতর্কের মূল,
সে "মধুর" হরির নাম কি মুরগীর ঝোল,
শ্রোতাদের মধ্যে একটু রয়ে গেল গোল!

(৪)

যা হোক—ডিনার সমাপ্ত করি সুরাপানে রত,
(নাটকের পর অভিনয়ে প্রহসনের মত)
গুম্ফহীন শ্মশ্রুহীন মহামতি যত;
তখন—ন্যায়চূড়ামণি—
বিজ্ঞানের খনি,
উঠ্‌লেন টিকীর গুণগানে; পড়িল অমনি

তিনি—গেলাস হাতে নিয়ে
অর্দ্ধ-রুদ্ধ-কণ্ঠ হয়ে
উঠিলেন হিন্দুধর্ম্ম ঘুষিতে জগতে;—

(৫)

"আমি বল্‌তে পারি বেশ
আর ইতে সন্দো নাই লেশ—
বিজ্ঞানে জেনেছি ইটি—
নিশ্চয়—ইলেক্‌ট্রিসিটি—
নিবসে টিকিতে (যথা কৈলাসে মহেশ)—
আর্য্যদের কীর্ত্তি আহা অতি চমৎকার!
হবে না কেউ তাদের সমান
টিকিই তাহার প্রধান প্রমাণ
স্বীকার করেন গেটে ও ম্যাক্সমুলার।

(৬)

"হা বাঙ্গালি নব্য
হ'য়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক, খ, পড়ি করে কতই গর্ব্ব—
ডুবিতেছে 'খাবিতেছে' সভ্যতা-হিল্লোলে;
হা ব্যাস তোমার মর্ম্ম,
হা মনু তোমার কর্ম্ম,
—হা টিকী—হা হিন্দুধর্ম্ম—
ডুবিল কি সব আজ মুরগীর ঝোলে!"

(৭)

[এখন—তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাহি জানি,
যদিও শাস্ত্রের কথা উটের মত মানি,
যে, 'যে মরে সে মরে;
ব্রহ্মার বাপেরও বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মরে' গেলে প্রাণী;
বরং তার চারি দিক,
একবারে, নেহাত, ঠিক,
মোরে যায়—গোলায় যায় বল্লালসেনের মত;
এমন কি, কথায়ই বলে—'যে গত সে গত'—"

(৮)

তাই বল্‌ছি—যদিও এর কারণ ঠিক্ না জানি,
—হয় বক্তার হজ্‌মেনি ভাল কট্‌লেট্‌ খানি,
কিম্বা চপ্ ক্যারি স্বাদু,
কিম্বা মন্ত্র, কিম্বা যাদু,

তাহাতে দিব না মত]—যা হোক্ নির্ভীক
হ'য়ে এই কথা আমি বল্‌তে পারি ঠিক্,
যখন বক্তা "মুরগীর ঝোল"
ছাড়িলেন এই বোল,
শুন্‌লেন সবাই তারি ডাক যেন বক্তার পেটে,
অবিকল—যা বলুন না 'মুলার' আর 'গেটে'।

(৯)

সবাই উঠ্‌লেন হেসে,
বক্তা গেলেন ফেঁসে,
সবার পানে চেয়ে, একটু বৈজ্ঞানিক বেশে'
কহিলেন অপ্রতিভ চূড়ামণি শেষে,
"না,—না; একি অতি অসম্ভব কথা,
তোমরা কি উল্টাতে চাও মরণের প্রথা ?
চিরকাল জান—
শাস্ত্র নাহি মান ?
খেলে কি পেটের মধ্যে করে জীব শব্দ ?
বিশেষ—টিকীর প্রভাবে সব হজম আর স্তব্ধ।

(১০)

"দেখ—যতক্ষণ আছে
এই—কৌটা নাকের কাছে,
এই—নামাবলি বুকে,
এই—হরিনাম মুখে,
—আর এই বৈদ্যুতিক—তাই ত এঁ্যা সে
কি ?"
মাথায় হাত দিয়ে বক্তা দেখেন নাইক টিকী—

(১১)

সকলেই ত্রস্ত,
অতিশয় ব্যস্ত—
দেওয়ালে, পাখায়, মেজে দেখে দিয়ে হস্ত;
খোঁজে পাতি পাতি করি চূড়ামণির চূড়ো—
নইলে চূড়ামণি
উঠিয়ে এখনি
শাপ দিয়ে সকলকে ক'রে দিবেন গুঁড়ো;
ঠেকাতে পার্‌বে না কারো হারাধন খুড়ো।

(১২)

সবাই টেবিল নাড়ে,
নামাবলি ঝাড়ে,
(সবাই দেখে হাত দিয়ে আপন আপন ঘাড়ে;)
কেউ ঝাড়ে কোঁচা;
কেউ মারে খোঁচা
টেবিলের নীচে;
কেউ ম্যাটিন খিচে;
চেয়ার গুলো দিল উল্টে—সব হল মিছে;
সবাই বল্লে শেষে,—পাওয়া যাবে না সে চূড়ো,
যদি সবাই খুঁজে খুঁজে হয়ে যায় বুড়ো।

(১৩)

যেন—মণিহারাফণী—
তখন ন্যায়মণি—
—চূড়ো গেছে উড়ে—হায় যেন দুষ্ট শনি-
দৃষ্টে গণেশের মুণ্ড অদৃশ্য অমনি ;—
কিম্বা অগস্ত্যকে দেখে
বিন্ধ্যাচল থেকে
নত গত হত শৃঙ্গ হায় রে যেমনি ;—
তখন উঠে ন্যায়মণি বিশ্বামিত্র সম,
দেখালেন নিজ বীর্য্য, ধর্ম্মপরাক্রম—
বলিলেন, "নিয়ে আয় পুরাণ আর মনু,
যে নিয়েছে টিকী তারে কোরে দিব হনু—"
চারি দিক দেখে
সকলকে ডেকে
শাপিলেন টিকী-চোরে মনু পুরাণ থেকে।

(১৪)

"যে নিয়েছে টিকী এই শাপ দিলাম তা'কে,
হবেই সে বিপদ্‌গ্রস্ত যেখানে সে থাকে ;—
তার পায়ে হবে বাত;
সে উঠ্‌তে হবে কাৎ;
খেতে খেতে তার গলায় বেধে যাবে ভাত;
তার পিল লাগ্‌বে হাসিতে;
বিষম লাগ্‌বে কাশিতে;
সে দিনে দুপরেতে,
ওছট্ খাবে যেতে ;
শুতে লাগ্‌বে মশা, আর বস্‌তে লাগ্‌বে মাছি;
নে'তে, খেতে, যেতে পড়্‌বে টিক্‌টিকী আর
হাঁচি।

(১৫)

"সে পাবে না ভোজ খেতে
কলার পাত পেতে ;
পাবে না সে দইয়ের আর চিঁড়ের আর কলার
মনোহরার, সন্দেশের সুমধুর 'কলায়';

পাবে না সে খাজা;
পরমান্ন, গজা,
পাবে না সে কলার পাত, ঘট আর থুরী;
ডাক্‌বে না তার নেমন্তন্নে মহেশ চৌধুরী;
হারাবে তার থালা বাটি, হারাবে তার ঘটি;
হারাবে তার ধুতি চাদর, হারাবে তার চটি;
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে হনু,
ধ্রুব, চোঁচা,—এ বিষয়ে সন্দো নাই অণু—"

(১৬)

তর্কচূড়ামণি এই অভিশাপ দিয়ে—
চলে' গেলেন চটে' আপন চটী চাদর নিয়ে;
কেউ—কখন শুনিনি এমন দারুণ অভিশাপ;
সকলেই বলিল,—"বাপ্‌রে বাপ্!"

(১৭)

ক্রমেতে প্রকাশ হোল শ্রীহরির শয়তানি
শ্রীহরিই টিকীচোর সবে ফেল্লে জানি,—
মত্ত সুরাপানে ন্যায়চূড়ামণি যবে,
সে সময়ে দুষ্ট সে শ্রীহরি, হবে,
ছোট কাঁচি দিয়ে
টিকী কেটে নিয়ে,
দিয়েছিল ছুড়ে ফেলে বারান্দায় গিয়ে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

দিন যায় কেটে
চূড়ামণির পেটে
(ক্রমে) হজম হোল ক্যাট্‌লেট্ সহ মূলার গেটে—
দেখা দিল টিকী আরও লম্বা, আরো ভালো,
আরও আধ্যাত্মিক—আর মিষ্‌মিষে কালো।

(২)

এ দিকে শ্রীহরি
প্যাণ্ট্, কোট পরি,
খান কেবল ক্যাট্‌লেট চপ্ আর ক্যরি।
মহাত্মার সাজে,
হিতকর কাজে,

"সুরাই অমৃত; আহা—কট্‌লেটই সুধা,
নিবারে যা চিরকাল দেবগণের ক্ষুধা;
শ্রীহরিই ইন্দ্র, আর গোস্বামিনীই শচী"—
দিলেন গোপাল শাস্ত্রী এই নব শাস্ত্র রচি।

(৩)

দিন যায়—শ্রীহরির ক্রমে,—
জানি না কি ভ্রমে,
জানি না কি প্রকৃতির অন্যায় নিয়মে,
হ'ল দুই পুত্র—(সে ত হয় নিজ পাপে)
আর এককন্যা—(সেটি কিন্তু চূড়ামণির শাপে)।

(৪)

"এইবার শ্রীহরি ভায়া দেখুক্ মজাটি কি—"
বলিলেন বিদ্যাবাগীশ, "রাখ্‌বে না ও টিকী;
কাট্‌বে না ও ফোঁটা—আর রাখবে গোঁফ দাড়ি।
কর ওরে একঘরে; যাব না ওর বাড়ী;
যাব না ও পাড়া,
—(কেবল রাতে ছাড়া
দু একবারমাত্র, চড়ে' শ্রীহরির গাড়ী)।"

(৫)

দিন যায়—শ্রীহরি 'একঘরে',
তাই ক্রোধভরে
রাতে খান রোষ্ট চপ্ আরো বেশী করে';
মহাত্মারাও এসে
মাঝে মাঝে, হেসে,
ক্যরি চপ খেয়ে, অবশেষে
দিয়ে যান বিজ্ঞ বিজ্ঞ ধর্ম্ম-উপদেশে।

(৬)

শ্রীহরির দুঃখ
ছেলে দুটি মূর্খ;
তার উপরে তাদের আবার স্বভাবটা রুক্ষ;
একটি—'বম্বে যাব' ব'লে
বিলেত গেল চলে;
দ্বিতীয়টি 'ফেল' হোল তিনবার 'এল্ এ';
এইরূপ দাঁড়াল ত তাঁর দুই ছেলে।

(৭)

হেমাঙ্গিনীর ক্রমে
প্রকৃতির ভ্রমে
বয়স বাড়েই—কভু একটু না কমে;
ক্রমে হেমাঙ্গিনী

রূপেতে রতি,
বিদ্যায় সরস্বতী,
—সতীত্বে সাবিত্রী, পাকে দ্রৌপদী সুন্দরী ;
উঠিলেন 'বোধোদয়' প্রায় শেষ করি'।

(৮)

শ্রীহরি করেন তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ,
কিন্তু পাত্রের মোটে নাইক নাম গন্ধ ;
দিল না কেউ বরে
শ্রীহরির ঘরে ;
বরং—"প্রকাশ্যে খায় মুরগী" বলে' দিল 'গাল মন্দ';
সকলেই খুসী,
শ্রীহরি রুষি,
অবশেষে মারিলেন দেওয়ালেতে ঘুঁসি।

(৯)

সেই দিন মিষ্টার বোস শশী বাবুকে দিয়ে
পাঠালেন বলে',
তাঁর সঙ্গে হলে'
দেন কি শ্রীহরি বাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে ?
এখন—মিষ্টার বোস
—নাহি কোন দোষ,
সিভিলিয়ান;—শ্রীহরি ত বড়ই 'সন্তোষ';
তিনি একটু হেসে,
পা দুলিয়ে, কেশে',
পড়ে একবার মাথা নেড়ে বারান্দায় এসে,
নীচে পানে তাকিয়ে দিলেন এক তুড়ি ;
এমন সময় উপস্থিত হরিদাসী খুড়ী।

(১০)

"তাইত খুড়ী যে; কাকী! বাড়ীর সব ভাল ত ?
প্রণাম হই"—"বেঁচে থাক বাবা বছর পাঁচ শত;
(আর) ধনে পুত্রে হও বাপ! লক্ষ্মীশ্বরের মত" ;
(—লক্ষ্মীশ্বর ভায়ার যে ছিল কয় ছেলে,
এ কথা যদিও বড় পুরাণে না মেলে)
—নানান্ কথার পরে
খুড়ী বল্লেন, "অরে
দ্যোথ্‌তো শ্রীহরি!
সুগণনা করি,
হেমাঙ্গিনীর আমাদের বয়স কত হল ?"
—"আমাদের বহুৎ হল, হেমাঙ্গিনীর ষোল ;"
"—বলিস্ কি ? তবে
বিয়ের কি হবে!"
খুড়ী ত মূর্চ্ছা প্রায়—"বিয়ে হ'বে কবে ?"
—"বিয়ের চারি দিক
সবই ত ঠিক—
পাত্রেরই ত গোল।—খুড়ী, করিও না রোষ,
মিলেছে এক পাত্র মিষ্টার এস্. কে. বোস্"।
"সে কে ?" "শম্ভু বোসের ছেলে" ; খুড়ী ত অবাক্—
"সে কিরে ?"; শ্রীহরি বল্লেন, "সব ঠিক ঠাক।"

(১১)

—এবার কিন্তু সটাং মূর্চ্ছা গেলেন খুড়ী ;
ঘণ্টা খানিক পরে
ধরাধরি করে'
বারান্দায় নিয়ে,
'স্মেলিং বট্‌ল্' দিয়ে,
জ্ঞান হ'ল যখন তাঁর—তখন তিনি বুড়ী ;
বয়স তাঁর বেড়ে গেল হঠাৎ এক কুড়ি ;
চুল গেল পেকে, পড়ে গেল দাঁত,
নাক গেল ঝুলে—আর এ সব অকস্মাৎ!!!
শ্রীহরি ত নেই—
বল্লেন, "এই এই—
তাই ত—এও কি হয়? কি হোল কি উৎপাত!"

(১২)

সে দিন ত গেল,
পর দিন এল,
তখন খুড়ীর 'গতর' যেন একটু জোর পেল ;
বাহির-ঘর থেকে
শ্রীহরিকে ডেকে,
(একটু সম্মুখ দিকে বেঁকে)
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে কহিলেন খুড়ী,—
(—তিনি এখন পঁয়ষট্টি বৎসরের বুড়ী—)

(১৩)

"শ্রীহরি রে! পাগলামি রাখ্,—দিয়ে মন
আমার পরামর্শ—আর আমার কথা শোন্ ;
তোর মেয়ের হ'ল
এখন বছর ষোল,
বলিস্‌নে সেটা—বলিস্ বছর আট নয় ;
দেখি দিখি ওর বিয়ে হয় কি না হয়;
আমিই এনে দিব পাত্র"
—বলে এই মাত্র
উঠিলেন—বসিলেন—একবার ঝেড়ে গাত্র ;
"শান্তিপুরের কাছে
একটি পাত্র আছে,
কুলীন, আর সে আমার ভাইয়ের এক ছাত্র,

কর্ত্তা তারে ঠিক—তুই মুরগী খাস বটে,
তা হোক্, তা তারা
লোক নয় তেমন ধারা
খাস্ খাবি গোপনে, তাতে কি দোষ ঘটে;
কেবল দেখিস্ যেন সেটা বেশী নাহি রটে;
আর এক কাজ—শোন্!" বহুক্ষণ ধরে'
তার পর কি কইলেন—ফুস্ ফুস্ করে'।
বল্লেন তার পরে,
একটু উচ্চস্বরে,
"এই রকম কর, কুলে আনিস নাক কালী—
ঘোষ বোস দত্ত মত্ত কলঙ্কের ডালি;
আর ভার আমার উপর"—উঠিলেন খুড়ী;
শ্রীহরি সজোরে আবার দিলেন এক তুড়ি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(১)

পর দিন থেকে,
প্যান্ট্ কোট্ রেখে,
শ্রীহরি নিলেন গেরুয়া; আর পণ্ডিতদের ডেকে
এক এক শ' টাকা আর রূপোর গ্লাস থালা
দিলেন প্রতি জনে,
আর সেই ক্ষণে
মুড়াইলেন মাথা; পরে হোল ঘোল ঢালা,
খেলেন গোময়; নিলেন রুদ্রাক্ষের মালা;
পণ্ডিতদের নিয়ে,
মেয়ের দিলেন বিয়ে,
প্যারি মৈত্রের ছেলের সঙ্গে;—সে একটু কালা,
একচক্ষুহীন, মূর্খ, বেঁটে, আর কালো,
গরিব, মাতাল;—নইলে আর সব ভালো।

(২)

এখন শ্রীহরি,
হরিনাম স্মরি',
প্রকাশ্যেতে নাহি খান রোষ্ট্ আর ক্যারি;
যদি কেউ খায়—তিনি বলেন, "উঁ: ছি ছি:!"
তার অর্থ—'প্রাণিহত্যা কেন মিছামিছি—';
জপেন হরির মালা পড়েন ভাগবত;
সবাই বলে, "গোস্বামীজী অতি ঋষি, সৎ।"
ব্যারিষ্টার ছেলে,
বিলেত থেকে এলে,
মুরগীখোর বলে' তারে দিলেন জাতে ঠেলে।

(৩)

এখনও শ্রীহরি,
গেরুয়াখানি পরি',
যান্ দেখ্‌বে পথে কভু, হরিনাম করি;
হাতে মালা; কপালটি চন্দনেতে মাখা;
কামান গোঁফ দাড়ি; গায়ে হরিনাম আঁকা;
মুণ্ডিত মস্তকে তাঁর টিকী দীর্ঘ অতি;
অতি ভক্ত সন্ন্যাসীজী—গম্ভীর মুরতি।
কিন্তু দুষ্টে দোষে,
(সেটি কিন্তু রোষে)
বলে তা'রা, "দেখায় তাঁরে অবিকল হনু,
কেশহীন মাথা, অর্দ্ধবস্ত্রহীন তনু;
ফলিল বা চূড়ামণির সেই অভিশাপ!"
সবাই বলিল তারা. "বাপ্‌রে বাপ্,
ন্যায়চূড়ামণির—কি অসীম প্রতাপ!"

শ্রীহরি গোস্বামীজীর কথা অমৃত সমান,
দিলারাম ভণে, আর শুনে পুণ্যবান্।

পুনশ্চ।

পরে জানা গেল যে, শ্রীহরি নামে কেহ—
কভু ছিলেন কি না, তা'তে গভীর সন্দেহ।
থাকিলেও তিনি দিইছিলেন কোন খানা—
পণ্ডিতদের কি না, এরূপ যায় নাই জানা।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

পথের কথা।

এবার কার্য্যানুরোধে কয়েক দিনের জন্য মালদহ অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। আজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে বসিলাম। ইহা সবিশেষ কৌতুকাবহ; বন্ধু বলেন, ইহা 'রত্নবিশেষ';—"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"—কিন্তু এ কালে সকলই বিপরীত; সুতরাং এমন প্রত্নতত্ত্বের মহারত্নের ভাগ্যে 'মৃগ্যতে হি তৎ' না হইলেও হইতে পারে! সেই আশঙ্কায়, সকল কথা খুলিয়া বলাই স্থির করিয়াছি। জগন্নাথের মহিমাময় রূপৈশ্বর্য্যের কথা অনেকে অনেকভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু 'পথের কথাটা' অল্প লোকেই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেই বলেন, 'জগন্নাথের কথা যেন চিরজীবন মনে থাকে, কিন্তু পথের কথা,—তাহা যেন আর মনে করিতে না হয়! পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরও সেই কথা!

আমরা দু জনেই সমব্যবসায়ী। আমি কিছু কৃশকলেবর; বন্ধু অপেক্ষাকৃত হাড়ে মাংসে জড়িত;—কিন্তু হাঁপানী-রোগ-গ্রস্ত! * রোগানুরোধেই হউক, আর সুচতুর চিকিৎসকানুশাসনেই হউক, বন্ধুবর নিতান্ত অজ্ঞাতসারে শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিকানুরাগভাগিনী প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রতি ধীরে ধীরে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন! সত্য কথা বলিতে কি,—প্রসন্নময়ীর সুধারসের সঙ্গে চা-পাতার শুভ-সম্মিলন ঘটিবামাত্র আমিও কথঞ্চিৎ আত্মহারা হইয়া পড়ি;—কিন্তু বন্ধু বড়ই উদার, তজ্জন্য কখনও বন্ধু-বিচ্ছেদের আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই!

২৫শে শ্রাবণ, শনিবার, অমাবস্যা,—ব্যারোমিটার ২৯.৭; থারমোমিটার ৯০। কোথায় বা তোমার "রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন," আর কোথায় বা তোমার "মত্ত দাদুরী বোল";—কেবল গুমট গরম, কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার! আমরা সেই মহানিশীথিনী সম্মুখে করিয়া ধীরে ধীরে বজরায় আসিয়া আরোহণ করিলাম। যেখানে নৌকারোহণ করিলাম, তাহার নাম 'ইংলিশবাজার',—মালদহ জেলার সদর-ষ্টেশন, মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরে

---

* এ সকল আত্ম-পরিচয়ের সার্থকতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে; সুতরাং ইংরাজি প্রথামতে [illegible] অনুমতি লইয়াই এ সকল কথা লিখিত হইল।

অবস্থিত। সেকালে এখানে ইংরেজেরা একটি দুর্গাকার বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিতেন। তখন লোকে ইহাকে বলিত, 'রং রেজা'; তাহাই পরে 'আংরেজাবাদ' নামে মিঃ পেম্বার্টনের মানচিত্রে পরিচিত হইয়া, কালক্রমে 'ইংলিস বাজারে' পরিণত হইয়াছে! এখানে কিন্তু ইংরাজদিগের বাজার নাই, কেবল দেশীয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগেরই একাধিপত্য। একমাত্র ইংরাজ এখানকার কালেক্টার,—তিনিও প্রাচীন তন্ত্রের লোক,—শীঘ্রই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন ভগ্নাবশেষ দেখিতে চলিয়াছি।

কালেক্টার সাহেব ইংরাজ এবং সিভিলিয়ান; কিন্তু ইংরাজ সিভিলিয়ান নহেন;—বোধ হয়, ইহাই যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমাদের সঙ্গে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিয়াছেন। * গ্রন্থখানি সচিত্র, সুন্দর, গৌড়কাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয়ে পরিপূর্ণ! গ্রন্থকার মালদহের কালেক্টার ছিলেন, তাঁহার বিধবা বিবি গ্রন্থপ্রচার করিয়া স্বামীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালেক্টার শ্রীযুক্ত পোর্চ, সামুয়েল্‌স্ এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় স্বহস্তে টীকা টিপ্পনী সংযোগ করিয়া গ্রন্থখানিকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছেন। নৌকায় আসিয়াই পুস্তক খুলিয়া রহস্যনির্ণয়ে নিযুক্ত হইলাম। বালকেরা বলে, "একে নিদ্রা, দুইয়ে পাঠ, তিনে গোলমাল, চা'রে হাট";—কিন্তু ঘোর কলি! আমরা মোটে দু জন; তথাপি পাঠ হইল না। পুস্তক খুলিতে না খুলিতেই বৌদ্ধের কথা, হিন্দুর কথা, পাঠানের কথা, মোগলের কথা, ইংরাজের কথা, বাঙ্গালীর কথা,—সে কালের তাঁহাদের কথা এবং একালের আমাদের কথা,—এক সঙ্গে এত কথা উঠিয়া পড়িল যে, বন্ধু অজ্ঞাতসারে যৎকিঞ্চিৎ 'মাত্রাবৃদ্ধি' করিয়া উৎসাহে উঠিয়া বসিলেন; আমিও পুরাকাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম! বলা বাহুল্য যে, তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর ক্ষীণ পরমায়ু কখন যে শেষ হইয়া গেল, কেহই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না!

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, একটি হাটের নীচে, ঘাটের ধারে বজরা বাঁধিয়া, মাঝি মাল্লা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; খান্‌সামা মহাশয় চুল্লীর উপর বৃহদায়তন কেট্‌লি চাপাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জ্বাল বাড়াইয়া দিতেছেন;

—প্রভাত হইয়াছে! ঘাটে নামিয়া হাটে উঠিলাম; বোধ হয় বহুদিনের পর সূর্য্যোদয় দর্শন করিলাম, কিন্তু হায়! হাটে, ঘাটে, মাঠে, বনান্তরালে, কত তল্লাস করিলাম,—না প্রসন্ন গোয়ালিনী, না দুগ্ধভাণ্ড! বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে; যেখানে নৌকা লাগাইয়াছে, তাহার নাম "বালিয়া নবাবগঞ্জ"; এখান হইতেই স্থলপথে যাত্রা করিতে হইবে, হয় ত ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইতে পারে! সুতরাং নিতান্ত বিষণ্ণবদনে প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া গব্যসম্পর্কশূন্য সুতিক্ত চা-রসের সঙ্গে মিষ্টান্নসংযোগ করিয়া "যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়" সম্প্রদান করিতে আরম্ভ করিলাম। কে কত দূর ক্ষিপ্রহস্ত, তদ্বিষয়ে আকারে ইঙ্গিতে বন্ধুর সঙ্গে তুমুল তর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে মালদহনিবাসী জনৈক উৎসাহী নবীন যুবক আসিয়া আমাদের দলপুষ্টি করিয়া মিষ্টান্নভাণ্ডের সমুচিত সমাদর-রক্ষায় কায়মনে নিযুক্ত হইলেন; বাক্য আপাততঃ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল!

শেঠজী তরুণ যুবক, নূতন উকীল;—আমাদের পথপ্রদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়া, এত দূর হস্তিপৃষ্ঠে কত ক্লেশে শুভাগমন করিয়াছেন। এইখানে আমাদের ত্রিমূর্ত্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখি। শেঠজী সাহিত্যানুরাগী;—সম্প্রতি গীতার পদ্যানুবাদে নিযুক্ত, পকেটে তাহারই প্রুফ্‌শিট; আমি ইতিহাস-সংকলনের জন্য ব্যাকুল, সঙ্গে বৃহদায়তন পুরাতন ইতিবৃত্ত; বন্ধু প্রকৃতি-সুন্দরীর নিত্য নবীন তরুগুল্মলতার সৌন্দর্য্যসম্ভোগের জন্য উদ্ভিদ্বিদ্যার নবানুরাগে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে বৃহত্তর সচিত্র সুন্দর উদ্ভিদ্-বিদ্যা। আমি নরকীর্ত্তিদর্শনাকাঙ্ক্ষায়, বন্ধু প্রকৃতিপাঠ অধ্যয়ন করিবার ভরসায়, আর শেঠজী নিতান্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধুসংকল্পে পড়িয়া গীতা হস্তে আমাদের সারথি হইতে আসিয়াছেন! কিন্তু আমাদের সম্মুখে যে বনবন্ধুর সুদুর্গম পথ, তাহাতে মনোরথ চলিলেও, রথ চলে না; পদব্রজেও অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। অগত্যা গজবাহনে যাত্রা করাই স্থির হইয়া গেল।

আমরা তিন জনেই কঠোর কংগ্রেস-ওয়ালা। বন্ধু বলিলেন, বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তি দেখিতে যাইতেছি, ধুতি চাদর লইয়া যাওয়াই সুসঙ্গত। শেঠজী বলিলেন, তিনি সম্প্রতি কালেজ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আজ কাল কালেজে "চাদর-নিবারিণী সভার" যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ধুতির উপর কোট

তাড়াতাড়ি চাদর ত্যাগ করিয়া শেঠজীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বসিলেন; সুতরাং আমি "আউট-ভোট" হইয়া গেলাম।

গজবাহনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা যাঁহাদের একেবারেই অভ্যাস নাই, তাঁহাদের কথা বলিতে চাহি না; আমাদিগেরও দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল, বৃদ্ধা হস্তিনী যখন কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ পথে হেলিতে দুলিতে চলিতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, এ যাত্রা অনেক দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে হইবে।

আমরা যে পথ দিয়া চলিলাম, তাহার নাম "দিনাজপুর রোড",—কাঁচা রাস্তা, বর্ষণাভাবে ধূলিধূসরিত! এ পথে জনমানবের সন্ধান পাওয়া যায় না; তবে আজ কাল যে সকল সাস্তাল রমণীরা পথের ধারে মাটি কাটিয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কুলীসর্দ্দারের মহিমাবৃদ্ধি করিতেছে, তাহারাই হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; আমরা চলিতে লাগিলাম;—"বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং সমুদ্বহচ্চারু-নিতম্ব-রম্যং;"—গোপাঙ্গনানৃত্যে সেকালের রাজপুত্রের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল; আর আজ আমাদের ত্রিমূর্ত্তির ঘন ঘন পার্শ্বপরিবর্ত্তনশীল তির্য্যক্‌গতি কাহারও আনন্দবর্দ্ধন করিল না, ইহাই দুঃখের কথা!

প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্ত্তমান নাম—পাণ্ডুয়া, কেহ কেহ "পরুয়া" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। বালিয়া নবাবগঞ্জ হইতে পাণ্ডুয়া বা পরুয়া বোধ হয় পাঁচ মাইল হইবে, কিন্তু পথক্লেশে পড়িয়া পাঁচ মাইল যেন পঞ্চাশ মাইল বোধ হইতে লাগিল। একে গজবাহন, তাহাতে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান, তাহার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে বাঙ্গালীর নগ্ন শির জ্বলিয়া উঠিয়াছে;—এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেকেই নৌকায় ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু "বীতরাগভয়ক্রোধঃ" গীতানুবাদক শেঠজী, আর উদ্ভিদ্বিদ্যাবিশারদ ধুস্তূর-চুরুটিকামোদী সহৃদয় বন্ধুবর সে শ্রেণীর লোক নহেন; সুতরাং আমরা তিনটি প্রাণী গজস্কন্ধে—"ঠাসনঠাসা" * হইয়া যথাসম্ভব হাস্যকৌতুকে পাণ্ডুয়া যাত্রা করিলাম। বর্ষণাভাবে ধান্যক্ষেত্র তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ হইয়াছে; চারি দিকে জঙ্গল, তাহার মধ্যে কত লতা, কত পাতা, কত ফুল, কত ফল, কত বেণুবংশ, কত রক্তকোকনদ,—বন্ধু মধ্যে মধ্যে অবতরণ করিয়া সাহ্লাদে ফুল ফল লতা পাতা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় লাট সাহেবের উদ্যানে যে বেউড় বাঁশ সযত্নে প্রতিপালিত, এখানে তাহা বনজাতস্বচ্ছন্দশোভায় চারি দিক সুন্দর করিয়া

---

* মালদহ অঞ্চলের লোকে তাহাদের "গৌড়ীয় সাধু ভাষায়" চাপাচাপি করিয়া বসাকে

তুলিয়াছে। শেঠজী বলিলেন যে, ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষে এই সকল বংশবন মঞ্জরিত হইয়া যথেষ্ট চাউল প্রসব করিয়াছিল। আর যাই কোথা? বন্ধু অমনি "পুস্তকমুদ্‌ঘাট্য" বুঝাইতে বসিলেন যে, ধান্যবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ একই পর্য্যায়ভুক্ত, উভয়েই "গ্রামিনেসি"। বাঁশ ও ঘাস এক হয় হউক, কিন্তু তাহা লইয়া এই বন্ধুর পথে বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করিয়া কি হইবে? আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্ধুকে ঐতিহাসিক পন্থায় আরূঢ় করিবার জন্য দেখাইলাম,— "ঐ দেখ, কত বড়, কত প্রাচীন, কত শত শিমুল গাছ। কাল পরাজয় করিয়া উহারা না জানি, কত কাল এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত রাজার কত বাদশাহের উত্থান পতন দর্শন করিয়াছে। উহারা এক একখানি সজীব ইতিহাস।" বন্ধু অবসর পাইয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যেমন সৃষ্টিছাড়া ঐতিহাসিক বাতিক! গাছ আবার ইতিহাস।" আমি বেশ সপ্রতিভ ভাবে দেখাইয়া দিলাম যে, "এই সকল বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিশাল শাল্মলী তরুতে কণ্টক নাই কেন? যমরাজ বহুকাল ধরিয়া বহু লক্ষ মহাপ্রাণীকে ইহাদের গাত্রঘর্ষণে নিযুক্ত করিয়া কালক্রমে তরু-কলেবর মসৃণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত সরল সজীব অদ্ভুত ইতিহাস।" বন্ধু বলিলেন, "ইহাই যদি ঐতিহাসিক গবেষণা বলিয়া পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে, তবে এই যে রাশি রাশি লজ্জাবতী লতা বনভাগ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহারও একটা ইতিহাস বাহির কর।" আমি বলিলাম,"—র লোকের বোধ হয় চক্ষুলজ্জা নাই; তাই সে দেশের যাবতীয় লজ্জাবতী লতা বনান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।" বন্ধু আমার ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় পাইয়া একেবারে অবাক্;— কিছুক্ষণ পরে বলিলেন যে, "তোমরা ঐতিহাসিক দল। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই; এক টুক্‌রা কলসীর কাণা কুড়াইয়া পাইলে, তাহা হইতে যখন ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকার জন্মবিবরণ লিখিয়া ফেলিতে পার, তখন তোমরা সকলই করিতে পার।" এইরূপ কথাকৌতুকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে, আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

প্রাচীন ইতিহাস।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিলাম, তাহার কথা বুঝিতে হইলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা

আবশ্যক। আজ যাহা তরুগুল্মাচ্ছন্ন জনসমাগমশূন্য ভগ্নস্তূপরাশি, এক দিন তাহা বঙ্গদেশের বিচিত্র রাজধানীর সৌধমালার গৌরববর্দ্ধন করিত; আজ যেখানে রাখাল বালকেরা নিতান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে মুক্তকণ্ঠে গোচারণের গান গাহিতে গাহিতে অবলীলাক্রমে চারি দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, সেখানেই একদিন কত রাজা কত প্রজা সসম্ভ্রমে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইত! সেকালের কথা না জানিলে সেকালের ভগ্নকীর্ত্তির প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না। তাই সংক্ষেপে (বন্ধু বলিতেছেন—অতিসংক্ষেপে) সে কালের কাহিনীর আলোচনা করিতে হইবে।

ইংরাজেরা বলেন যে, ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলীজীর হাতে পড়িবার পর হইতেই গৌড়ের সর্ব্বজনপরিচিত বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের আরম্ভ। * তাহার পূর্ব্বেও গৌড় ছিল;—এখনও বল্লালদীঘি এবং বল্লাল দুর্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে সুবর্ণগ্রাম এবং গৌড়—এই দুই পুরাতন মহানগরের নাম শুনিতে পাওয়া যাইত। গৌড়ে রাজধানী ছিল, সুবর্ণগ্রামে রাজপ্রতিনিধির মহানগর স্থাপিত হইয়াছিল। তখন জাহ্নবী গৌড়-নগরীর পদধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। আদিশূরের সময়েও সেইরূপ ছিল; বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণপ্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"সুরসরিদবধৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং"

সেই সুরসরিদবধৌত গৌড় জনপদ যে সত্য সত্যই সুরম্যহর্ম্ম্যচ্ছটায় কিরূপ মনোজ্ঞ বেশ ধারণ করিত, তাহা এখন কবিকল্পনার বিষয়ীভূত; তবে কবি-কল্পনা যে নিতান্ত আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা নহে, আমরা স্থানে স্থানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। যেখানে মুসলমানের সমুন্নত মসজেদ, সেখানেই হিন্দুর সযত্নরচিত দেবমন্দিরের কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরফলকের ভিত্তিভূমি! বন্ধুর ব্রহ্মতেজ জ্বলিয়া উঠিল; তিনি সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে হইতে বলিতে লাগিলেন, "ছি! তোমার কথায় ভুলিয়া এত ক্লেশে এত দূরদেশে আসিয়া অবশেষে কি ইহাই দেখিতে হইল?—এ যে নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা—কেবল Vandalism!" শেঠজী অমনি সুর ধরিলেন, "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী!" হায়! মথুরাপুরী ত ক গতা,—কিন্তু কেবল কি হা হতোঽস্মি করিলেই মথুরাপুরী পুনরায় স্বাগতা হইবে?

* The known and authentic history of Gaur commences at the time

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় গৌড়াধিপতিগণ গৌড়পতাকা বহু দূরে বহন করিয়াছিলেন; কাশী কান্যকুব্জেও তাঁহাদের শাসনক্ষমতা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে প্রস্তরফলক বাহির হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন গৌড়ের গৌরব-ফলক! তাহাতে খোদিত আছে;—

নমো বুদ্ধায়।

বারাণসীসরস্যাং গুরোঃ শ্রীধামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নমিত-নৃপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবালাকীর্ণং। ১।
ভূপালচিহ্নে ষষ্ঠাদিকীর্ত্তিরত্নধারা নিচয়গৌড়াধিপ
মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ। ২।
সহজীকৃতপণ্ডিতৈঃ বৌদ্ধাবারনিবর্ত্তনৌ যৌ ধর্ম্মরশ্মিকান্
সংঘান্ ধর্ম্মচক্র পুনর্ভবং। ৩।
কৃতবন্তৌ চ নবীনমেবু মহাস্থানে শৈলরাজকূটং এনাং
শ্রীস্থিরপাল বসন্তপালোনুজঃ সমানৈঃ। ৪।

সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিন ১১। *

বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুরাগী নবীন নরপতিগণ শঙ্খঘণ্টা-নিনাদমুখরিত দেবমন্দিরে গৌড়জনপদ সুশোভিত করিয়াছিলেন; পাঠান আসিয়া "আল্লা হো আক্‌বর" রবে সকল কীর্ত্তি ধূলিপরিণত করিয়া যে বিচিত্র সৌধমালায় মুসলমান-গৌরব সুসংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহাও এখন বনজন্তুর নিভৃতনিবাসে পরিণত হইয়াছে;—তবে আর দুঃখ কি?

পাঠানশাসনের ইতিহাস মহাবিপ্লবের ইতিহাস। বক্তিয়ার খিলিজীর স্থানে মহম্মদ সেরান খাঁ নিযুক্ত হন; তিনি খিলিজীবিদ্রোহে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে আলিমর্দ্দন খিলিজী সিংহাসনে আরোহণ করেন, নিষ্ঠুরস্বভাবের জন্য লোকে তাঁহাকে গোপনে নিহত করিয়াছিল। তাহার পর গয়েসউদ্দীন; ইনিই গৌড়বাদসাহের বিচিত্র রাজভবন-নির্ম্মাতা প্রথম পাঠান ভূপতি। কিন্তু দিল্লীশ্বরের আদেশে শাহজাদা নাসিরুদ্দীন ইহার রাজধানী আক্রমণ করায় গয়েসউদ্দীন সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতেই খিলিজীবিদ্রোহ জাগরিত হইয়া উঠে, এবং নাসিরুদ্দীনের সিংহাসন আলাউদ্দীন দৌলত শাহ বলপূর্ব্বক অধিকার করেন।

এই সকল মহাবিপ্লবের অবসানে বাঙ্গালার পাঠান ভূপতিগণ স্বাধীন হইয়া

---

* Asiatic Researches, Vol. V.

উঠিয়াছিলেন। হাজি ইলিয়স সেই স্বাধীন পাঠান রাজবংশের আদিপুরুষ, এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সেই স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। ১৩৪৬ হইতে ১৪৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইঁহাদিগেরই রাজধানী হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহ কয়েক বার সসৈন্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবরোধ করিয়া পাঠানের স্বাধীনশক্তি পদানত করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধিসংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই হইতে সম্রাট আকবরের শাসনসূচনা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে পাঠানদিগের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

এই স্বাধীন পাঠান রাজ্যের ইতিহাস সবিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। এ সময়ে সমগ্র বঙ্গভূমি মুসলমানের পদানত হয় নাই; যেখানে যেখানে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তত্তৎ স্থানেও হিন্দুদিগের প্রবল প্রতাপ সমাদৃত হইত। ইলিয়স্-রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা সেকেন্দার শাহা ১৩৫৮ হইতে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়া পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের রাজধানী বিচিত্র সৌধচূড়ায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৩৬৯) "আদিনা—মস্‌জেদ" এখনও তাহার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে! সেকেন্দর শাহ বাঙ্গালীর নিকট সবিশেষ সুপরি[illegible]চিত; তিনি গোয়ালপাড়ার যুদ্ধে পুত্রহস্তে নিহত হন;—পি[illegible]। আজম শাহ [illegible] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে উপবেশন [illegible] করেন। এই বৎসর বাঙ্গালার [illegible]সর একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে ভাতুড়িয়ার হিন্দু রাজা গণেশ * [illegible]বলে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন রাজধানীতে দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুমুসলমানের নিকট সমভাবে সমাদর লাভ করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হন। তৎকালে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া এক রাজনৈতিক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল; গণেশ হিন্দুরাজা, তাঁহার পুত্র জাঠমল্ল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যুবরাজ হইলেন। কালক্রমে এই যুবরাজ জাঠমল্ল জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, দীর্ঘকাল সগৌরবে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের এই সকল বিস্ময়-বিজড়িত বিলুপ্তকাহিনী লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা একালের হিন্দু মুসলমানের—বাঙ্গালীমাত্রেরই সমধিক গৌরবের লীলাভূমি! কিন্তু হায়! সে

* কোন ইতিহাসে ইঁহার নাম রাজা গণেশ, কোন ইতিহাসে—রাজা কংস।

লীলাভূমি আজ শ্মশান! সেই শ্মশানের সম্মুখে আসিয়া মন্থরগামিনী হস্তিনী যখন বৃংহিতনাদে বনভূমি প্রতিশব্দিত করিয়া তুলিল, তখন মনে হইল, সময়-স্রোত সন্তরণ করিয়া আমরা যেন কোনও এক অদৃষ্টলোকে শুভাগমন করিয়াছি! তিন জনেই ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলাম।

পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে হইলে কথঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একে ত কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ,—চারি দিকে বনজঙ্গল,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ,—তাহাতে আবার যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কৌতূহলোদ্দীপক, যাহা কিছু পুরাকাহিনীর গৌরবমূলক, তাহা বহুযুগের রাজা বাদশাহেরা সযত্নে অপহরণ করিয়া আপন আপন অভিনব রাজপ্রাসাদের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন;—যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে পুরাতন গৌরবের কতটুকু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে? হয় ত এক-খানি সুরঞ্জিত ইষ্টক, এক টুক্‌রা কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরফলক, এক আধখানি বিলুপ্তপ্রায় ফলকলিপি,—সচরাচর এইরূপ যৎসামান্য নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাই সযত্নে পরীক্ষা করিয়া, সাগ্রহে অধ্যয়ন করিয়া তাহার ভিতর হইতে পুরাতত্ত্ব বাহির করিতে হয়! ভগ্নাব-শেষের প্রথম দৃশ্য [illegible]ই জন্য তেমন [illegible]দয়োন্মাদক নহে। এ ত আর বেণুবংশ-রাশির সজীব সুন্দর প্রাকৃতিক [illegible] নহে; এ ত আর বনান্তরাল-লজ্জাবতীলতার নধর পত্রপুষ্প নহে;—এ যে শুধু তৃণগুল্মাচ্ছন্ন কঠিন প[illegible] বন্ধু তাহা বুঝিলেন না! আমরা যখন সেকেন্দর শাহের অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ-আদীনা মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুল দেহযষ্টি লইয়া কোনরূপে গজস্কন্ধ হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলাম, তখন বন্ধু অবসন্নদেহে উৎসাহাগ্নি জ্বালিবার জন্য ধুস্তূর-চুরুটিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া, নিতান্ত নিরাশা-কাতর ব্যঙ্গোক্তিসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"এই বুঝি তোমার আদীনা!"

আদীনা মস্‌জেদ।

এই সেই আদীনা! রাভেন্‌শা সাহেবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মালদহের প্রত্যেক কালেক্টার এখানে শুভাগমন করিয়াছেন, এবং কত দেশ বিদেশের পরিব্রাজকগণ এখানে আসিয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন শিল্পবিদ্যার জয়স্তম্ভ বলিয়া ইহার দিকে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া দেখিয়াছেন! আমরা কিন্তু ইহার সম্মুখে আসিয়া অজ্ঞাতসারে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম,—এই সেই

আদীনা! বলা বাহুল্য যে, প্রথম সন্দর্শনে আমরা যেন একবারেই হত হইয়া পড়িলাম।

এখন আর বাহির হইতে আদীনার শোভা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার উপায় নাই; কেবল দ্বারফলকে এখনও ইহার জন্মকথা লিখিত রহিয়াছে, * তদ্ভিন্ন শোভা সৌন্দর্য্য সকলই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে!

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন সাহেব আদীনার ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"এই মস্‌জেদ উত্তর দক্ষিণে ৫০০ ফিট, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০ ফিট পরিসর; ৬০ ফিট উচ্চ, ২৬০ স্তম্ভের মধ্যে ১৫০ স্তম্ভ বর্ত্তমান।" † আমরা ৮৫ বৎসর পরে পরিদর্শন করিতে আসিয়া আর কি দেখিতে পাইব? এখন কেবল ৫০০ ফিট দীর্ঘ ৩০০ ফিট প্রস্থ দেয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু তাহার উচ্চতা সকল স্থানে ৬০ ফিট নহে; গম্বুজগুলি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, স্তম্ভ মোট ৬৮ বর্ত্তমান! এই সুবৃহৎ ভজনালয়ে রাজা প্রজা সকলেই সমবেত হইত; হয় ত গৌরবের দিনে কত সহস্র মুসলমান উপাসক এক সঙ্গে আরাধনায় নিযুক্ত হইত; স্বয়ং বাদসাহ আমীর ওমরাহ লইয়া আসিতেন; হয় ত নাগরিকদিগের সঙ্গে সিপাহী ও সেনাপতিগণও শুভাগমন করিতেন।

...শ্চিমোত্তর খণ্ডের কিয়দংশে এখনও ১৫টি গম্বুজ বর্ত্তমান...

...ন্তর নীচেই "বাদশাহকা তথ্‌ত"—বাদশাহের...

‹ল স্থানে তক্তা পাতা নাই ; সহজে আরোহণ করিবারও সুবিধা দেখা যায় ।।। বালকেরা যেরূপ কৌতূহলপরায়ণ, সেইরূপ অন্য লোকের কৌতূহল দূর করিতেও সমুৎসুক। পাছে আমরা 'বাদশাহকা তখ্‌তের' এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থা দেখিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইবার সুবিধা না পাই, সে জন্য তাহারা জিজ্ঞাসা না করিতেই বলিয়া দিল যে, "বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে স্বহস্তে ইহা গঠন করিয়াছিলেন ; অনেক খাটুনি, একা মানুষ, সব কাজ শেষ না হইতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল ;—বেচারা আর কি করিবে ? কাজেই তখ্‌ত এমন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছে।"

তখ্‌ত অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকায় আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। উপরে না উঠিলে আদীনার আসল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু উপরে উঠিবার সিঁড়ি নাই! শেঠজী এবং বন্ধু কাঠবিড়ালীর মত অবলীলাক্রমে স্তম্ভ বাহিয়া উপরে উঠিলেন, অবলীলাক্রমে লম্ফে লম্ফে কড়িকাঠ হইতে কড়িকাঠ অতিক্রম করিয়া ধ্বংসাবশিষ্ট 'বাদশাহকা তখ্‌তে' সওয়ার হইয়া বাদশাহী ধরণে গুরুগম্ভীরগর্জ্জনে খানসামাকে ডাকিয়া এক নিশ্বাসে ফরমাইশ হাঁকিলেন, —"সোডা, পান, তামাক্‌!" আমি নীচে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়' ... দ একবার চেষ্টা করিলাম, কায়ক্লেশে স্তম্ভ বাহিয়া আচ্ছাদ ... কাছে বসিলাম, কিন্তু বহু আয়াসেও তাহার ...

শেঠজী বলিলেন, দেখুন, পাঠান কেমন নিপুণহস্তে সুমসৃণ কষ্টিপাথরে লতা-পদ্ম কাটিয়াছে! আমি বলিলাম—হাঁ, তা—কিন্তু আমাদের মেয়েরা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিবার জন্য এমন অনেক অদ্ভুত লতা পদ্ম কাটিয়া থাকে; সে কাল পাথর, এ কষ্টি পাথর—ইহাই যাহা কিছু তফাৎ! কিন্তু এ দেশে ত নিকটে পাহাড় পর্ব্বত নাই; পাঠানেরা এত পাথর কোথায় পাইল? শেঠজী ভাবিলেন, এবার আমি বুঝি তাঁহাকে 'চা'ল মাত' করিলাম। তাঁহাকে ভাবিবার অবসর না দিয়াই আমি দেখাইতে লাগিলাম যে, যাহার উপরিতলে পাঠানেরা মসজেদ-শোভা বিস্তীর্ণ করিয়াছে, তাহার নিম্নতলে কেবল হিন্দু দেবমন্দিরের লতাপদ্ম এবং সুগঠিত স্তম্ভরাজি! যাহারা পাহাড় ভাঙ্গিয়া, পাথর কাটিয়া, এই সকল সুলিখিত চিত্র বিচিত্র উপকরণের সাহায্যে দেবমন্দির রচনা করিয়াছিল, তাহারাই বড়? না, যাহারা হাতের কাছে মাল মসলা পুঞ্জীকৃত দেখিয়া কেবল লৌহদণ্ডাঘাতে সেই সকল দেবমন্দির নিপাতিত করিয়া, তাহারই উপকরণে এই সকল মুসলমান-মসজেদ গঠন করিয়াছে, তাহারা বড়? বাস্তবিক, স্থানে স্থানে লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং বক্তৃতাবেদিকার পাদপীঠতলে যে সকল হিন্দু দেবমূর্ত্তির খোদিত-পাষাণ বিপরীতভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা এখন কালসহকারে বাহির হইয়া পড়িয়া—।

কারুকার্য্য দিত রহিয়া

ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, না হয় মানিলাম আদীনা কুৎসিত, কিন্তু এত বড় 'হল',—ইহাও এমন বড় নয় কি? আমি বলিলাম, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের' আবশ্যক কি? এই মহামন্দিরের যেথানে ইচ্ছা দণ্ডায়মান হউন, আমি মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করি; তাহা হইলেই ত হইল? শেঠজী ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি সেই ৫০০ ফিট হলের একেবারে শেষসীমায় গিয়া হাজির, আমি মধ্যস্থলের বক্তৃতাবেদিকায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলাম! শেঠজী পরাস্ত হইলেন, বন্ধু সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, হস্তিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল;—কেবল ঘন ঘন করতালির পরিবর্ত্তে বন্ধুর নিকট ঘন ঘন তিরস্কার লাভ করিলাম। তাঁহার বিশ্বাস যে, আমার ফুস্‌ফুস্‌ বুঝি ফাটিয়া গেল! আমি হাসিয়া বলিলাম যে, আমি যেথানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছি, ইহা ত বক্তৃতারই স্থান। সেকালের মুসলমান মৌলবী এথানে দাঁড়াইয়া এই সুবৃহৎ মন্দিরের সর্ব্বত্র কণ্ঠস্বর প্রেরণ করিতে পারিতেন; আর আমি একালের বাঙ্গালী, আমি পারিব না কেন? সেকালের সকল সম্পদ হারাইয়া কেবল রসনাসাহায্যে দিগ্বিজয় করিতেছি; বাঙ্গালী হইয়া বক্তৃতায় কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে পারিব না! বলা ...ই সুবিস্তৃত ধর্ম্মমন্দির যথন ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া দীক্ষা প্রদান ... দিতেছিলাম, তথন

দিল্লীর বাদশাহ। তিনি গয়েসুদ্দীনকে পদানত করিবার নাসিরুদ্দীনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১২২৭ খৃষ্ট সময়ে শাহজাদা নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে সুলতান গয়েসুদ্দীনের যুদ্ধে গয়েসুদ্দীন নিহত হন। এতদনুসারে একলক্ষি আদীনা হই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আদীনা এখন ভগ্নস্তূপ, অথচ একং দণ্ডায়মান।

আকাশ ক্রমেই আঁধার হইয়া আসিতেছে, একলক্ষিও নিরাপদ স্থ বলিয়া বোধ হইল না;—সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহিঃ হইয়া পড়িতে হইল। তথাপি যতটুকু দেখিলাম, তাহাতেই একলক্ষির প্রাচীনত্ব বুঝিতে আর ইতস্ততঃ থাকিল না।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অনেক দিনের পুরাতন রাজধানী। এখন পুরাতন মালদহে নিকট মহানন্দা নদীর সহিত কালিন্দীর জলস্রোত মিলিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অতি পুরাকালে কালিন্দী যেখানে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, সেইখানেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের হিন্দুরাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড় হইতেও পুরাতন; পুরাকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিতে হয় ত সমগ্র উত্তর বাঙ্গলাকেই বুঝাইত। কাল- দিগের রাজ্যভুক্ত হইয়া পৌণ্ড্রবর্

মখরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজশ্রীমদ্ধর্ম্মপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-
াব্রতটীমণ্ডলসম্বন্ধমহান্তাপ্রকাশবিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রনামগ্রামস্ত চ সীমা পশ্চি-
রেণ কাদম্বরীদেবকুলিকা খর্জ্জুরবৃক্ষশ্চ। পূর্ব্বোত্তরেণ রাজপুত্রদেবটকৃতালিঃ"

লিপিতে যে কাদম্বরীমন্দিরাদির উল্লেখ আছে, সেই সকল হিন্দু-
কি হইল? আদীনা মন্দিরে তাহার কিছু কিছু রহস্যভেদ করিয়া-
ম, একলক্ষিতে আসিয়া দেখিলাম যে, পাঠানভূপতি সেই সকল হিন্দু
বালয় চূর্ণ করিয়াই যে সমাধিমন্দির রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আর
কছুমাত্র সন্দেহ নাই!

জেনারেল কনিংহাম বলেন যে, একলক্ষি পাঠান সমাধিমন্দিরের অত্যুৎকৃষ্ট
দর্শন! † আমরা কিন্তু নানা কারণে তাহার সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ করিবার
অবসর পাইলাম না। তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব পরিদর্শন শেষ করিয়াই জঙ্গল
ভাঙ্গিয়া আবার সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; তখন মাথার উপর বারি-
বর্ষণ আরম্ভ হইল।

মালদহ আজকাল আমাদের নিকট "ফজলী"-প্রভৃতি বলিয়াই পরিচিত
য়াছে; মালদহের লোকেও তাহাই গৌরবের বস্তু বলিয়া দেশে বিদেশে
করিতেছেন। কিন্তু নরকীর্ত্তিদর্শনাকাঙ্ক্ষী
ই অধিক

মশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজশ্রীমদ্ধর্ম্মপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-
ােবতটীমণ্ডলসম্বন্ধমহান্তাপ্রকাশবিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রনামগ্রামস্ত চ সীমা পশ্চি-
রেণ কাদম্বরীদেবকুলিকা খর্জ্জুরবৃক্ষশ্চ। পূর্ব্বোত্তরেণ রাজপুত্রদেবটকৃতালিঃ”

লিপিতে যে কাদম্বরীমন্দিরাদির উল্লেখ আছে, সেই সকল হিন্দু-
কি হইল? আদীনা মন্দিরে তাহার কিছু কিছু রহস্যভেদ করিয়া-
াম, একলক্ষিতে আসিয়া দেখিলাম যে, পাঠানভূপতি সেই সকল হিন্দু
বালয় চূর্ণ করিয়াই যে সমাধিমন্দির রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আর
কছুমাত্র সন্দেহ নাই!

জেনারেল কনিংহাম বলেন যে, একলক্ষি পাঠান সমাধিমন্দিরের অত্যুৎকৃষ্ট
দর্শন! + আমরা কিন্তু নানা কারণে তাহার সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ করিবার
অবসর পাইলাম না। তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব পরিদর্শন শেষ করিয়াই জঙ্গল
ভাঙ্গিয়া আবার সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; তখন মাথার উপর বারি-
বর্ষণ আরম্ভ হইল।

মালদহ আজকাল আমাদের নিকট "ফজলী"-প্রসূতি বলিয়াই পরিচিত
হইয়াছে; মালদহের লোকেও তাহাই গৌরবের বস্তু বলিয়া দেশে বিদেশে
করিতেছেন। কিন্তু নরকীর্ত্তিদর্শনাকাঙ্ক্ষী
ই অধিক

একলক্ষি যে কাহার সমাধিমন্দির, সে বিষয়েও মতভেদ দেখিতে পাওয় যায়। রিয়াজে এইরূপ একটি সমাধিমন্দিরের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রিয়াজোল্লিখিত জেলালুদ্দীন আবুল মোজাফার মোহম্মদ শাহার সমাধিমন্দিরই এই পুরাতন একলক্ষি! *

প্রত্যাবর্ত্তন।

যখন 'একলক্ষি' হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন প্রথমে বিন্দুপাত, পরে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। আমরা যথাসম্ভব দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়াই দেখিলাম, এক স্থানে অনেকগুলি ভগ্ন কীর্ত্তি, সেখানে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া হস্তিনী বারিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। আমরা একটি ইষ্টকনির্ম্মিত আধুনিক মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, তাহার নাম "মোসাফেরখানা।" এখানে অনেক রকমের কাণ্ডকারখানা বর্ত্তমান। প্রবেশ-দ্বারে ফিলখানা, একটু ভিতরে আসিলেই বাম দিকে দপ্তর-খানা, সম্মুখে সুপ্রশস্ত মোসাফেরখানা, আর তাহার পার্শ্বেই সুবিখ্যাত লঙ্গরখানা।

এই মোসাফেরখানা একেবারে জনশূন্য নহে; এখানে আসিয়া এক মৌলবী সশিষ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; বন্ধু সহসা বলিয়া উঠিলেন:—এ যে ষষ্টিসহস্রশিষ্যপরিসেবিত বশিষ্ঠদেব দেখিতেছি!" আমাদের শুভাগমনে বশিষ্ঠদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি জাতিতে বাঙ্গালী, কিন্তু মৌলবী বলিয়া বোধ হয় বাঙ্গালা কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করিলেন। মৌলবী সাহেব রাজসাহীর লোক, আমাদের কথাবার্ত্তায় কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াই তাঁহার মৌলবীগিরি কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। বৃষ্টি ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতেই তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরিবার জন্য গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; নিদারুণ অঙ্কুশতাড়নায় স্বয়ং গজেন্দ্ররমণীও যখন গজেন্দ্রগমন পরিত্যাগ করিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিলেন, তখন আমরা নিতান্ত কায়ক্লেশে গজপৃষ্ঠে আসন-রক্ষা করিতে নিযুক্ত রহিলাম!

হস্তিনী জীর্ণা শীর্ণা, প্রায় কঙ্কালাবশিষ্টদেহা; তাহাকে দেখিবামাত্রই

---

* This can hardly be other than the domed tomb referred to in Riaz-us-Salatin as that of Jalaluddin Abul Muzaffar Mahammad Shah.—Blochmanns' contributions to the Journal of the Bengal Asiatic Society Vol. XLIII, part I, P. 267.

কি জানি আমার সহসা কেমন করুণার উদ্রেক্ হইয়াছিল। বন্ধু বলিলেন, একখানি তোষক লও; আমি বলিলাম, আহা! বেচারীর আর ভার বাড়াইও না! ভার লাঘবের জন্য যে কেবল তোষক ফেলিয়া আসিলাম তাহা নহে, নিতান্ত অজ্ঞাতসারে যেন সকল বিষয়েই ভারলাঘব করিবার আয়োজন করিলাম। সেই জন্য দুজন ধূম্রপায়ীর জন্য একটি মাত্র দিয়াশালাই লইয়াছিলাম। বন্ধুর কোটে সেই দিয়াশালাই, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বালোচনার চিরসহচর শাণিত ছুরিকা, বন্ধুর জীবনবন্ধু ধুস্তূরচুরুটিকা, পানের দোনা, দোক্তাপাতা, অপিচ সকৌটা কমলাকান্তবটিকা;—আমরা যখন অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি, তখন পথক্লেশে, বারিবর্ষণে, হস্তিসংঘর্ষণে, নানা কারণেই বন্ধুর মৌতাত ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু হায়! অনবধানবশতঃ বন্ধুর কোটটি কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না! ভুক্তভোগী পাঠক! আপনারা হয় ত বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের সুখের ভ্রমণকাহিনী কত গভীর বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িল! আমরা কোনরূপে নৌকার দিকে অগ্রসর হইলাম,—পথ আর ফুরায় না। অবশেষে সেই দীর্ঘ পথ যখন ফুরাইল; তখন পরহিতব্রতধারী উৎসাহী শেঠজী এক লম্ফে গজস্কন্ধ হইতে অবত করিয়া হাটের মধ্যে ছুটিয়া চলিলেন, আমি তাড়াতাড়ি চুল্লীর উপর কেট্ চাপাইয়া দিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই শেঠজীর দৌত্যপ্রসাদে এক ঘটী দু সংগ্রহ করিয়া গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া সেই সুধারসে চা-রস সংমিশ্রি করিয়া তাহার সঙ্গে মিষ্টান্নসংযোগে কিছুমাত্র কৃপণতা না করিয়া তিন জনেই অবসন্ন দেহে উৎসাহসঞ্চয়ে নিযুক্ত হইলাম;—নৌকা মালদহের অভিমুখে ভাসিয়া চলিল।

নষ্ট-চন্দ্র।

দুষ্টবুদ্ধিটা চন্দ্রের চিরদিনই আছে। যে দিন সুধাসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের মধ্য হইতে রজত স্বপ্নে গগন পূর্ণ করিয়া চন্দ্র উত্থিত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই চন্দ্রের দুষ্টবুদ্ধি। নিশীথে যখন জগৎ সুপ্ত, তখন চন্দ্র ধনীর গৃহের বাতায়নপথে ও দরিদ্রের কুটীরের বেড়ার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়া আপনার দুষ্ট কৌতূহল পরিতৃপ্ত করেন। সুখসুপ্ত সুন্দরীর বিকশিত সরসিজললিত মুখে এতটুকু অমল ধবল কিরণ মাখাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন; কুমুদের দল ফুটাইয়া সরসীর চলমলয়পবনতাড়িত তরঙ্গমালার সহিত তাহার ক্রীড়া দেখেন; পথের উপর কিরণ ঢালিয়া পথিকের জলে স্থল-ভ্রম ঘটান।

এ পাগল, প্রেমিক ও কবির সখা নষ্টবুদ্ধি চন্দ্রের নষ্টবুদ্ধি না কি এক দিন বাড়িয়া উঠে যে, সে রাত্রে যে তাঁহাকে দেখে, সেও লোকের কিছু নষ্ট ! ভাদ্র চতুর্থীতে চন্দ্রদর্শন করিলে অপরের উদ্যানে ফলমূল নষ্ট করিয়া ন্দ্রের দর্শনজনিত পাপ ক্ষয় করিতে হয়। নষ্টচন্দ্র পল্লিগ্রামের একটা হোৎসব। সহরে এ সকল হাঙ্গাম নাই; সহরে লোকের গাম্ভীর্য্য অধিক। সহরে দরিদ্রগণের উদরান্নের জন্য অর্থচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার সময় নাই; মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত—আমোদে সময় নষ্ট করিবার অবসর তাঁহাদিগের নাই; আর ধনিগণ পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থের সহিত আপনাদের নষ্ট করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। ইট কাঠে গড়া সহরে প্রকৃতি কৃত্রিমতার বন্ধনপীড়িতা, স্বাভাবিক পল্লীসুলভ আনন্দোপভোগ সহরবাসীর বড় হয় না।

পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে; ধনিগণ মানস-সরোবরের শীকরশীতল পবনস্পর্শলোলুপ বিহগজাতির মত রাজধানীতে নীড়-সংস্থাপনে ব্যস্ত—বাহিরের লম্বা চালে কেবল অন্তঃসারশূন্য হইতেছেন; জমীদারে প্রজায় এখন আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ নাই; বিদেশবাসী জমীদারের কর্ণে আর প্রজার আর্ত্ত চীৎকার পঁহুছে না; গ্রামের হিতার্থে, গ্রামবাসীদিগের আমোদের জন্য জমীদার এখন কিছুই সময় বা অর্থব্যয় করিতে চাহেন না। নষ্টচন্দ্রেও তাই এখন আর সে আমোদ নাই। যাহারা চীন জাপান সংগ্রাম বা

ভেনিজুলিয়ান বিপত্তির বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে, সেই সকল গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ এখনও দুঃখ করিয়া বলে যে, পূর্ব্বে বাবুরাও এক একবার সখ করিয়া নষ্টচন্দ্রে যাইতেন—কাহারও কিছু ক্ষতি হইলে সহৃদয় জমীদার সে ক্ষতির পূরণ করিতেন,—এখন আর সে দিন নাই। এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আইসে। সত্যই এখন আর সে দিন নাই, তবে এখনও পল্লীগ্রামের লোকেরা নষ্টচন্দ্রে আমোদ করিয়া থাকে।

* * * * * * * * *

এবার নষ্টচন্দ্রের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতেই গ্রামের নিম্নশ্রেণীস্থ যুবক-মহলে বলাবলি হইতে লাগিল যে, এবার একটু জাঁকাইয়া নষ্টচন্দ্র করিতে হইবে। তড়িৎ-বাহিত সংবাদের মত এ সংবাদ চারি দিকে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। রামমোহন সাহার বড় আটচালার দাওয়ায় অর্দ্ধছিন্ন মাদুরের উপর তাহাদের বৈঠক বসিতে লাগিল—গ্রামের যুবক-মহলে একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। কয় দিন সেই দাওয়ায় অনেক তামাক পোড়াইয়া, গম্ভীরবুদ্ধিদাতা গুড়ুকের প্রভাবে তাহারা একটা মতলব বাহির করিল—এবার মোহন বাবুকে ধরিতে হই মোহন বাবু জমীদারের আত্মীয়—পাকা "পাড়াগেঁয়ে বাবু"; পল্লীবা সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রায়ই তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে আইসে। ম স্থির হইলে পঞ্চানন, ব্রজ, হরি প্রভৃতি কয় জন মাতব্বর মোহন বাবুর গৃহে উপস্থিত হইল।

মোহন বাবুর ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী; সম্মুখে কতকগুলা বাঁশঝাড়ের শ্যাম পত্রাবলীর মধ্য দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে; পশ্চাতে একটা কাঁটাল গাছের ঘনশ্যাম পত্ররাশির উপর সূর্য্যকর জ্বলিতেছে; প্রাঙ্গনে একটা কুমড়া লতা মাচার উপর ছড়াইয়াছে; প্রাঙ্গনের আসেপাশে বর্ষাবারিপাতস্নিগ্ধ দূর্ব্বাদলের উপর মেঘমুক্ত তপনকিরণ পড়িয়াছে। সকলে আসিয়া রোয়াকের উপর হইতে কক্ষমধ্যস্থ বাবুকে প্রণাম করিল। তখন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রান্তে মোহন বাবু কেবল এক ছিলিম তামাকের জোগাড়ে চাকর হরুকে ডাকিতে-ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধে গামছাখানা ফেলা, মাথার ঠিক মধ্যস্থলে কেশ বিভক্ত, বড় এক জোড়া ছাঁটা শক্ত গোঁফ নিম্নে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আগন্তুক-দিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "পাঁচু, এক ছিলিম তামাক সাজ ত!" পঞ্চানন কলিকা প্রভৃতি লইয়া বাহিরে আসিয়া তামাক সাজিয়া টানিয়া ধরাইয়া

বাবুকে কলিকাটা দিয়া আসিল। তামাক টানিতে টানিতে বাবু তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পঞ্চানন বলিল, "বাবু, এবার নষ্টচন্দ্রটা ভাল করিয়া করিতে হইবে।" বাবু বলিলেন, "সে কবে? তার ত এখনও বিলম্ব আছে?" ব্রজ, হরি, দুলাল, তিন জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর তিন দিন আছে।" মোহন বাবু বলিলেন, "বটে, বটে! তা হবে। তোরা পারিলেই হয়।" হরি বলিল, "আপনার হুকুম হইলেই হয়।" পঞ্চানন মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিল, "ও ত আমাদের একটা আমোদ বাবু,—একেবারে উঠে যায়। বাপ পিতামহের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" মোহন বাবু বলিলেন, "তা ত বটেই।"

তাহার পর মোহন বাবু হুঁকা হইতে নিঃশেষপীত-ধূম কলিকাটা দিলেন। যুবকগণ সেটা লইয়া বাহিরে একটু আড়ালে গিয়া এক এক টান টানিয়া আবার কলিকাটা দিয়া আসিল, এবং বাবুর নিকট অভয় পাইয়া উল্লসিত-চিত্তে গৃহে ফিরিল।

সেই দিন অপরাহ্নে পাশা খেলিতে যাইবার সময় পথে জমীদারের [illegible]রীর মুহুরী অমরের সহিত মোহন বাবুর দেখা হইল। অমর ছিপ্‌ছিপে, [illegible]হারা, অল্প বয়স, মুখে অল্প অল্প গোঁফ, দাড়ি কামান, জমীদারের কাছারীতে [illegible]ীর কার্য্যে নবব্রতী; সে তখন পাকা রোকড় লিখিয়া একবার বাড়ী [illegible]তেছিল। মোহন বাবু বলিলেন, "ওহে!—এবার নষ্টচন্দ্রটা ভাল করিয়া [illegible]তে হইবে।" এক গাল হাসি হাসিয়া অমর বলিল, "তা হ'বে—মোহন বাবু!" অমর বুঝিতে পারে নাই যে, মোহন বাবুর তাক ছিল, তাহার বাগানেই গোটা দুই কলাগাছ কাটাইবেন।

এ দিকে যুবকদল নদীসৈকতের চোকাল বালুকা দিয়া দায় ধার দিতে লাগিল। পাড়ার বৃদ্ধারা ঘাটের পথে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ছোঁড়ারা এবার খেপিয়াছে; কেবল দায় ধার দিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস প্রভাতে যুবকেরা মোহন বাবুকে জানাইল,—আজ "নষ্ট-চন্দ্র করিতে হইবে।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে আসিস্।" দিন কাটিয়া গেল, শরতের তপন অম্লান জ্যোতিতে অস্ত গেল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই এক একখানা দা-হাতে যুবকেরা মোহন বাবুর বাড়ী হাজির হইতে লাগিল। মোহনবাবু বলিলেন, "এমন পাগল ত দেখিনি! লোকে ঘুমাইবার আগে ত আর নষ্টচন্দ্র হবে না; যা, সব

খেয়ে আয়।" তখন সকলে বাড়ী ফিরিল ও নাকে মুখে দুটা ভাত গুঁজিয়া ফিরিয়া আসিল। কাহারও কাহারও সহিত দুই একটা বালক তামাসা দেখিতে আসিল। সকলে রোয়াকে আসিয়া জমা হইলে কক্ষমধ্যে তক্তপোশের উপর বসিয়া মোহন বাবু খোঁজ লইতে লাগিলেন, কাহার বাগানে কি আছে, কাহার প্রাঙ্গনে কি ফলিয়াছে। তখন এ বলিল, শ্যামের ক্ষেতে খুব উচ্ছে হইয়াছে; ও বলিল, হরির উঠানে খুব কুমড়া ফলিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে অনেক রাত্রি হইল; যে সব বালক তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রথমে কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিল, তাহার পর সেই মুক্ত রোয়াকে ঘুমাইয়া পড়িল; আকাশ হইতে তারকারা সেই সকল বালকের পল্লীসুলভ স্বাস্থ্যলাবণ্যভরা মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। এ দিকে হুঁকা হাতে মোহনবাবু সদলে বাহির হইলেন। তাঁহার বাটীর অদূরেই গ্রামের জমীদারের বৃহৎ অট্টালিকা; তাহারই কাছে একটা চৌমাথার ধারে একটা বড় তিন্তিড়ী বৃক্ষ তাহার ঘনবিন্যস্ত শাখাসমূহের ছায়ায় শ্রান্ত পথিকদিগকে বিশ্রাম দিয়া থাকে—তাহারা সেই ছায়ায় উনান খুঁড়িয়া রন্ধন করে। সেই তরুতলে একখানা গোশকট পড়িয়াছিল,—বাবু আসিয়া তাহার উ বসিলেন; অমর পার্শ্বে বসিল, আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তব্ধ রজ কোন শব্দ নাই, কেবল অদূরে তটিনীতীরস্থ কোন বৃক্ষ হইতে একটা সঙ্গি ডাহুকের বিরাব পবনে কোমল হইয়া আসিতেছে।

তখন সুগ্রীব যেরূপ সীতার অন্বেষণে দিক ভাগ করিয়া কপিসৈন পাঠাইয়াছিলেন, মোহনবাবু সেইরূপ ফলমূলান্বেষণে লোকের বাড়ী ও বাগান ভাগ করিয়া লোক পাঠাইলেন। অমর তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার উদ্যানে দুইটা কলাগাছ কর্ত্তিতমূলে ভূমিশয়নে পরদিন প্রভাতে তাহার দৃষ্টির অপেক্ষা করিতে লাগিল। রতি নাপিতের ক্ষেত্রে দুই ঝাড় ইক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া আসিতে পথে দুলাল দেখিল যে, ব্রজ তাহারই গৃহ-প্রাঙ্গনে একটা উচ্ছেলতা কাটিয়া আসিতেছে। সে বলিল, "ওরে! কাল সকালে মা যে আর রক্ষা রাখ্‌বেন না।" ব্রজ বলিল, "তবেই ত আমার আর ঘুম হ'বে না।" দুই জনে হাসিতে হাসিতে চলিল। ডাকপিয়ন শশধর যাহাতে সকালে উঠিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতিবেশীর দাওয়ার কলস দুইটা তাহার উঠানে কাঁটাল গাছে ঝুলিতেছে, এবং উক্ত প্রতিবেশী আবার যাহাতে দেখিতে পায় যে, শশধরের লেবুগাছের গোটা কতক ডাল এবং গোটা দুই ঝুড়ি তাহার

গৃহপ্রাঙ্গনে পড়িয়া আছে, তাহার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ইহার উঠানে পুঁইলতাটা কাটা পড়িল; উহার চালের উপর হইতে দুইটা কুমড়া পাড়িয়া কাটিয়া উঠানময় ছড়াইয়া আসা হইল; যাহাতে রাম প্রভাতে উঠিয়া দেখে যে, তাহার বাগানে গোটা দুই নারিকেল গাছ ফলশূন্য, আবার যাহাতে শ্যাম দেখে যে, তাহার কর্ষিত ক্ষেত্র খণ্ডীকৃত নারিকেলে পূর্ণ, তাহার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করা হইল। নষ্ট-চন্দ্রের রাত্রে ফলমূলাদি কেবল নষ্টই করিতে হয়।

সেই গোশকটের উপর উপবেশন করিয়া, কোথায় কি হইতে লাগিল, মোহন বাবু তাহার খোঁজ লইতে লাগিলেন, আর তামাক টানিতে লাগিলেন; যুবকগণ ঘন ঘন তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সে রাত্রে পঞ্চাননই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের কাজ করিল—সে খোদ মোহন বাবুর বিততবহুবল্লী নবপল্লবঘন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক ছড়া কলা সুদ্ধ একটা কলাগাছ কাটিয়া আসিল, এবং পরদিবস প্রভাতে যে উক্ত বাবু শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া বৎসের দলে মিশায় গৃহিণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবেন, তাহা কল্পনা করিয়া, সে ও তাহার সঙ্গিগণ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিল। লোকে বলে, কাক অন্য সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলেও, কোন প্রাণী কাকের মাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু এবার কাকের মাংসও ভক্ষিত হইল। মোহন বাবু আপনার ভিন্ন আর সকলের বাগানে ও প্রাঙ্গনে নষ্ট-চন্দ্রের ব্যবস্থা দিতেছিলেন; এবার তাঁহার বাগানেও নষ্টচন্দ্র হইয়া গেল!

এইরূপ যুবকদলের হস্তে যে সময় সময় ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। হয় ত কোন দরিদ্র বিধবা নষ্ট-চন্দ্রের পর দিবস প্রভাতে দেখেন যে, তাঁহার গোময় দিয়া নিকান পরিষ্কার প্রাঙ্গনে তাঁহার বহুদিনের তরকারীর সম্বল ঝিঙ্গার গাছটা কর্ত্তিতমূল,—ম্লান হইয়া গিয়াছে; হয় ত বা কেহ দেখেন, যে কুমড়া কয়টা বিক্রয় করিয়া সে হাটের খরচ চলিবে ভাবিয়াছিলেন—সে কয়টার মধ্যে দুইটা নাই। কিন্তু যাহারা ভক্ষক, তাহারাই আবার রক্ষক হয়। যুবকগণ প্রায়ই সকল ক্ষতির পূরণ করিয়া থাকে। রমণীগণ তাহাদিগের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে লজ্জিতা হইবে এরূপ ভাবিলে, তাহারা জননীগণের উপর সাহায্যদানের ভারার্পণ করে। তাঁহারা হয় ত বা "দিদি, এবার ক্ষেতে মেলা তরকারী ফলেছে—তাই তোমাকে দুটা দিতে এলাম", হয় ত বা "দেখ রামের মা!

দিতে এলাম; আমার হরিও যে, তোমার রামও তাই।" এই বলিয়া সাহায্য দিয়া যান। কিন্তু নষ্টচন্দ্রের রাত্রে কিছু নষ্ট হইলে অতিদরিদ্রও বলে, "তা যাক —ছোঁড়ারা আমোদ ক'রে করেছে বই ত নয়!" পল্লীবাসীদিগের মধ্যে সহানুভূতির অভাব নাই।

* * * * *

এ দিকে নিশা শেষ হইয়া আসিল; স্তূপে স্তূপে অন্ধকার ক্রমেই মিলাইয়া যাইতে লাগিল; প্রভাত-তারকার ম্লানজ্যোতিও বিলুপ্তপ্রায়। যুবকদল আসিয়া তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে সমবেত হইল।

তখন দুই একটা ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গম কূজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর অদূরে তটিনীবক্ষে কোন নৌকায় এক জন মাঝি জাগিয়া মালসা হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে গাহিতেছে,—

"ননদিনী, বলো নাগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সায়রে।"

কুসুমসুরভিসমাকুল প্রভাতসমীরসেবিত পল্লীপথে প্রাতঃস্নানার্থিনীদিগের পদধ্বনি ধ্বনিত হইবার পূর্ব্বেই, মহোল্লাসে জাগরণারুণনেত্র যুবকগণ স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া চলিল। যেন একটা স্বপ্ন শেষ হইল।

গিরিয়া।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে, এবং বর্ত্তমান জঙ্গীপুর উপবিভাগের নিকট, একটি বিশাল প্রান্তর ভাগীরথীর সলিলপ্রবাহ দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রান্তরের সাধারণ নাম গিরিয়া। ইহার বক্ষঃস্থিত গিরিয়া নামক একটি প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে এই নামের উৎপত্তি। এই প্রান্তর ভাগীরথীর উভয়-তীরবর্ত্তী হওয়ায় দুইটি পৃথক প্রান্তর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা এক নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ গিরিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থান ইহার নিকটে না থাকায়, ভাগীরথীর উভয়তীরস্থ চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী প্রান্তরের একই নাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু কখন কখন ভাগীরথীর পশ্চিম-

তীরবর্ত্তী প্রান্তরকে সূতীর ময়দানও বলিয়া থাকে। সূতী ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরের একটী প্রসিদ্ধ স্থান, সেই জন্য তাহাকে সূতীর ময়দান বলে। পশ্চিম-পারের প্রান্তরকে সময়ে সময়ে সূতীর ময়দান বলিলেও, দুই প্রান্তরই সাধারণতঃ গিরিয়া প্রান্তর নামে অভিহিত হয়। গিরিয়া প্রান্তর ভাগীরথীর সলিলসিক্ত হইলেও, তাঁহার চঞ্চল গতিপ্রভাবে স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিশাল প্রান্তর দুই বার নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে গিরিয়ার ন্যায় বিশাল প্রান্তর আর নাই। এই জন্য ইহা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুইবার মহাসমরক্রীড়ার রঙ্গভূমি হইয়াছিল; সুপ্রসিদ্ধ পলাশী-প্রান্তর অপেক্ষাও গিরিয়ার আয়তন বৃহৎ। গিরিয়ার বিস্তৃত সমরক্ষেত্রকে কোনও ঐতিহাসিক * মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুবৃহৎ পণিপথক্ষেত্র যেরূপ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর নিকটে অবস্থিত, গিরিয়ার বিশাল রণভূমিও সেইরূপ বঙ্গরাজ্যের রাজধানী মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত। পাণিপথে যেরূপ মোগলসাম্রাজ্যস্থাপনের সূচনা ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, গিরিয়াতেও সেইরূপ আলিবর্দ্দি খাঁর জ্যপ্রাপ্তি ও মীরকাশীমের বাঙ্গালা হইতে চিরবিদায় সংঘটিত হয়। পলাশীর ায় গিরিয়াও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় স্থান। উভয়ই মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী, এবং এই দুইটি প্রান্তর ব্যতীত মুর্শিদাবাদের আর কোনও ল প্রকৃত সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। পলাশীতে ইংরেজরাজত্বের সূচনা য়, কিন্তু গিরিয়াতে তাহার পথ একরূপ নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। উধুয়ানালায় (উদয়নালা) মীরকাশীমের সৈন্য সর্ব্বতোভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও, তথায় প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। গিরিয়াতেই মীরকাশীমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল। উধুয়ানালায় ইংরেজেরা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে মীরকাশীমের শিবির আক্রমণ করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন। সুতরাং গিরিয়ার পর তাঁহাদের মধ্যে যে আর প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও বাঙ্গালার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে।

গিরিয়াপ্রান্তর পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারি ক্রোশের অধিক হইবে, এবং উত্তর-দক্ষিণে খামরা হইতে সূতী পর্য্যন্তও প্রায় চারি ক্রোশ। † গিরিয়ার স্থাননির্ণয়

* H. Beveridge. (Calcutta Review. April 1893.)

† মুতাক্ষরীণে এই দূরত্ব কিছু অধিক পরিমাণে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত

লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। ষ্টীফেনথেলার ইহাকে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্ম্মে গিরিয়াপ্রান্তরকে পশ্চিম-তীরস্থ বলিয়াছেন। * রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে গিরিয়া গ্রাম পূর্ব্ব পারে ও গিরিয়াসমরক্ষেত্র পশ্চিমপারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দ হইতে ৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত জরিপবিভাগকৃত মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্রে ও বর্ত্তমান সময়ে গিরিয়া গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারেই আছে, এবং বর্ত্তমান গিরিয়া গ্রাম যে স্থলে অবস্থিত, সে স্থান কখনও ভাগীরথীর গর্ভস্থ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী তাহার প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। কালে গিরিয়া যে ভাগীরথীগর্ভস্থ হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? এই ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করা দুরূহ নহে। পূর্ব্বের বিবরণ এবং বর্ত্তমান সময়ের অবস্থানানুসারে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হয় যে, গিরিয়া গ্রাম বরাবরই ভাগীরথীর পূর্ব্বপারেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু ভাগীরথীর উভয়তীরবর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তর গিরিয়াপ্রান্তর নামে অভিহিত হওয়ায়, কেহ কেহ গিরিয়াপ্রান্তরকে কেবল পশ্চিমতীরস্থ বলিয়াছেন। কিন্তু উভয়তীরবর্ত্তী প্রান্তরের নামই গিরিয়া। যাঁহারা গিরিয়াপ্রান্তরকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নির্দ্দেশ করি[য়া]ছেন, তাঁহারা আলিবর্দ্দির সহিত সরফরাজের যুদ্ধপ্রসঙ্গে সে কথার উ[ল্লেখ] করেন। আলিবর্দ্দি পশ্চিমতীরে অবস্থান করায়, এবং প্রথমেই পশ্চিমপা[রে] যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহারা কেবলমাত্র পশ্চিমপারের কথাই লিখিয়াছেন।

আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রথমে খামরায় উপস্থিত হন, পরে গিরিয়া গ্রামের নিকটে শিবিরসন্নিবেশ করেন। আলিবর্দ্দি সেই সময়ে সূতীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মুতাক্ষরীণ-কার সরফরাজের শিবির হইতে আলিবর্দ্দির শিবির ৫।৬ ক্রোশের অধিক নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (Seir Mutaqherin ; Trans. Vol I. P. 352.) রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রানুযায়ী সূতী ও খামরার ব্যবধান চারি ক্রোশের অধিক নহে। খামরা হইতে গিরিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম ও কিছু উত্তরও বটে। তাহা হইলে সূতী ও গিরিয়ার ব্যবধান চারি ক্রোশের কম হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত জরিপবিভাগ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদের যে মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সূতী ও গিরিয়ার ব্যবধান ৩ ক্রোশের কিছু উপর। বর্ত্তমান গিরিয়া হইতেও সূতী তিন ক্রোশের কিছু উপর হইবে। গিরিয়া গ্রামের মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, অধিক দূর ব্যাপিয়া সে পরিবর্ত্তন কখনও ঘটে নাই। সুতরাং সায়রের মতানুযায়ী গিরিয়া ও সূতীর ব্যবধান কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়।

† Orme's Indostan. Vol II. P. 31.

কিন্তু আলিবর্দ্দির যুদ্ধও উভয় পারেই হইয়াছিল। আবার আলিবর্দ্দির যুদ্ধস্থল হইতে মীরকাশীমের যুদ্ধস্থল স্বতন্ত্র। এক্ষণে এই সকল স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমরা দুই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিয়া কোন কোন স্থানে কিরূপভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং এক্ষণেই বা রণস্থলের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি।

গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নবাব সরফরাজ খাঁ ও আলিবর্দ্দি খাঁর মধ্যে সংঘটিত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দিকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার একেশ্বর করিবার জন্য সরফরাজের মন্ত্রী হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদ প্রভৃতি যে ষড়যন্ত্রের সূচনা করেন, গিরিয়া-যুদ্ধে তাহার অভিনয় সমাপ্ত হয়, এবং নবাব সরফরাজকে চিরদিনের জন্য মরধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আলিবর্দ্দি খাঁ পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে ধাবিত হইয়া রাজমহল, ফরকা ও পরে সূতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা হইতে সা মর্ত্তেজা হিন্দীর সমাধিস্থল চারগাছ বালাট্টা পর্য্যন্ত শিবির-সন্নিবেশ করিয়া পিপিনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনে বামনিয়া, দ্বিতীয় দিনে দেওয়ান সরাই ও তৃতীয় দিনে থামরায় উপস্থিত হন। * থামরা হইতে নবাব গিরিয়ায় শিবিরসন্নিবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার কতক সৈন্য থামরায় অবস্থিতি করিতে থাক। নবাব গিরিয়ায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রধান সেনাপতি গাওসখাঁ ভাগীরথী পার হইয়া প্রায় সূতী পর্য্যন্ত ধাবিত হন। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু সে সন্ধি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায়, পুনর্ব্বার যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দি নিজ সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ নন্দলাল নামে এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অধীনে রাখিয়া, অপর দুই দল নিজে লইয়া রাত্রিযোগে নদী পার হইলেন। গাওসখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নন্দলালের প্রতি আদেশ ছিল, এবং তিনি নিজে সরফরাজের শিবির আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হন। রিয়াজে লিখিত আছে যে, গাওসখাঁ ও মীর সরফউদ্দীন গিরিয়ানালার পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। † এই গিরিয়ানালার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দি নদীর যে তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই তীরে গাওস-

* Riyazu-s-salatin. pp 310-11.

খাঁর সহিত নন্দলালের যুদ্ধ হয়। ইহাতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরই বোধ হইতেছে। তাহা হইলে গিরিয়ানালা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে হইবার সম্ভাবনা। রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে গিরিয়া যুদ্ধপ্রান্তরের নিকট একটি নালা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে বালুকাস্তূপমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে। কারণ, ভাগীরথী পশ্চিম হইতে অনেক পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছেন। সায়রের কথানুসারে গাওসখাঁর অবস্থান পশ্চিমতীরেই বুঝায়।

প্রভাত হইবামাত্র আলিবর্দ্দি নিজের অধীনস্থ দুই দল সৈন্য লইয়া সরফরাজকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক দিয়া আক্রমণ করিলেন। এ দিকে নন্দলালও গাওস খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সরফরাজ হস্তিপৃষ্ঠে বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। হস্তিচালক তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু সরফরাজ তাহাকে তিরস্কার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটি বন্দুকের গুলি সরফরাজের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি হস্তিপৃষ্ঠে শায়িত হন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে কেবল সরফরাজই সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। হস্তিচালক তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে নেক্টাখালির প্রাসাদে সমাহিত করা হয়। * সরফরাজের সহিত আলিবর্দ্দির যে যুদ্ধ হয়, তাহা গিরিয়া গ্রামের নিকট, এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে; এক্ষণে তাহার কতকাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ও কতকাংশ তাঁহার গর্ভস্থ হইয়া অবশিষ্টাংশ আজিও পূর্ব্বপারে রহিয়াছে। গাওস খাঁ নন্দলালের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন, এবং নন্দলালেরও ইহজীবনের লীলা শেষ হয়। গাওসখাঁ তৎপরে প্রভুর সাহায্যের জন্য গিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। কতক দূর অগ্রসর হইয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহার প্রভু বন্দুকের গুলির আঘাতে হস্তিপৃষ্ঠে শায়িত হইয়াছেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়, মহম্মদ কুতুব ও মহম্মদপীরকে † আহ্বান করিয়া, যাহাতে আলিবর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রদান করিতে পারা যায়, তাহার জন্য পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন

* এই নেক্টাখালিকে লেংটাখালিও বলিয়া থাকে; লেংটাখালি সাহানগর থানার পূর্ব্বে। এক্ষণে তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সরফরাজের সমাধির কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

† রিয়াজে মহম্মদ পীরের স্থলে বাবর লিখিত আছে। (Riyazu-s-salatin ; P. 320.)

করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং আপনাদিগের সৈন্য সমবেত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সরফরাজের মৃত্যুশ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে ধাবিত হয়। যাহা অবশিষ্ট ছিল, গাওসখাঁ তাহাদিগকে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আলিবর্দ্দির সৈন্যসাগর মথিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বীর পুত্রদ্বয়ও পিতার পথের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের তরবারিচালনে আলিবর্দ্দির সৈন্যগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। গাওস খাঁ আলিবর্দ্দির গোলন্দাজ সেনাপতি ছেদন হাজারীর একটি বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া যেমন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, অমনি আরও দুইটি গুলি আসিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলে। কুতুব ও পীরের তরবারিচালনে ছেদন হাজারী বিশেষরূপে আহত হয়; পরে অব্যর্থ গুলির আঘাতে পিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই পিতৃ-আদেশ-পরায়ণ পুত্রদ্বয় ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। যে স্থানে তাঁহাদের পবিত্র দেহ নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহাদিগকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু গাওস খাঁর গুরু সা হায়দরী নামে জনৈক ফকীর তাঁহাদিগের মৃতদেহ গিরিয়া হইতে উত্তোলন করিয়া ভাগলপুরে লইয়া যান, এবং তথায় তাঁহাদিগকে পুনঃসমাহিত করেন। সা হায়দরী ভাগলপুরেই বাস করিতেন; সিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। সা হায়দরী এক সময়ে গাওসকে কোন সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্ত করায়, তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব ও সিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গাওস খাঁর মৃত্যুশ্রবণে সা হায়দরী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া আলিবর্দ্দিকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। পরে গিরিয়া হইতে গাওস খাঁর, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের ও অন্যান্য সহচরের মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া ভাগলপুরে লইয়া গিয়া আবার সমাহিত করেন, এবং অবশেষে প্রিয়শিষ্য গাওস খাঁর পার্শ্বে নিজেও সমাহিত হন। * প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া প্রভুর সিংহাসনরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়ায়, গাওসখাঁ সাধারণের নিকট মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। এক দিকে যেমন আলিবর্দ্দি খাঁ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রভুপুত্রের রক্তপাত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন, অন্য দিকে সেইরূপ গাওস খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় শোণিতদান করিয়া প্রভুর সিংহাসনরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাওস খাঁর সেই অনুপম

মহত্ত্ব বহুদিন হইতে গিরিয়ার চতুঃপার্শ্বে গ্রাম্য-কবিতায় গীত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে তাঁহাকে অতিমানুষ বলিয়া মনে করে। এরূপ বিবেচনা সাধারণের মনে সহজেই উপস্থিত হয়। যিনি সপরিবারে ফকীরের নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রভুর কল্যাণে অনায়াসে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে পারেন, এবং যাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী * পুরুষ প্রত্যেকেই বীরত্বের পূর্ণাবতার, তাঁহাকে অতিমানুষ বিবেচনা করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গিরিয়ার যে স্থানে গাওস খাঁর পবিত্রদেহ পতিত হয়, তথায় তাঁহার স্মৃতির জন্য একটি দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গিরিয়ার নিকট মমীনটোলা গ্রামের চাঁদপুর নামক মৌজায় উক্ত দরগা নির্ম্মিত হয়। চাঁদপুর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। মমীনটোলার কতকাংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, চাঁদপুর এক্ষণে পশ্চিমতীরে পড়িয়াছে। এক্ষণে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইল, গাওস খাঁর দরগা ভাগীরথী-গর্ভস্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নূতন চাঁদপুরে আর একটি সামান্য দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। গাওস খাঁর দরগা মুসলমানগণ শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

১৭৪১ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে গিরিয়ায় প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাওস খাঁর সহিত সরফরাজের অন্যান্য অনেক সেনাপতি যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন দেন। বিজয় সিংহ নামে সরফরাজের জনৈক রাজপুত সেনাপতি প্রথমে থামরার নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন; পরে অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূতলশায়ী হন। তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহও এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করে। যে স্থলে সেই রাজপুত বালক অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাকে অদ্যাপি জালিম সিংহের মাঠ কহিয়া থাকে।

* গাওস খাঁর পত্নীও বীররমণী ছিলেন। স্বামী ও পুত্রের দেহত্যাগের পর তিনি ভাগলপুরে বাস করিতেন। যৎকালে পেশওয়া বালাজী রাও বিহার হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যেরা ভাগলপুরে উপস্থিত হইলে, নগরের যাবদীয় লোক গঙ্গাপারে পলায়ন করে। কিন্তু বীররমণী গাওস খাঁর পত্নী আপনার অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া স্বীয় ভবন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা সমস্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা বন্দুকের শব্দে ও গুলিবর্ষণে চমকিত হইয়া উঠে। বালাজী রাও অনুসন্ধানে সেই বীরললনার সাহসের পরিচয় পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন, এবং নিজ সৈন্যদিগকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া, গাওস খাঁর পত্নীকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশজাত কতকগুলি কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। Mutagherin

গিরিয়া হইতে অর্দ্ধক্রোশের কিছু অধিক দক্ষিণপূর্ব্ব মিঠিপুর নামে এক গ্রাম আছে। মিঠিপুর হইতে খামরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের নামই জালিম সিংহের মাঠ। গিরিয়া হইতে খামরা দুই ক্রোশের অধিক পূর্ব্বে অবস্থিত। জালিম সিংহের মাঠের নিকট আকবরপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মিঠিপুর গ্রামে কয়েক ঘর চৌহান রাজপুত বাস করেন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর, ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যৎকালে মানসিংহ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ প্রসিদ্ধ বাদসাহী সড়ক দিয়া দিল্লী গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা খামরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, মানসিংহের অনুচর কতিপয় চৌহান রাজপুত কোনও কারণবশতঃ দিল্লী যাইতে ইচ্ছা না করিয়া, মিঠিপুরে আপনাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং বর্ত্তমান চৌহানগণ তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বিজয় সিংহ মিঠিপুরস্থ রাজপুতবংশীয়, কি রাজপুতানা হইতে নবাগত, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিঠিপুর ও গিরিয়ার মধ্যে কাণাপুকুর নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, যুদ্ধের সময় জলাভাবে অস্ত্র দ্বারা ঐ জলাশয় খনন করা হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় তাহা শুষ্ক থাকে। দীঘল গিরিয়া ও ছোট গিরিয়া নামে এক্ষণে প্রায় পরস্পরসংলগ্ন দুইখানি গ্রাম হইয়াছে। দীঘল গিরিয়া হইতেই ছোট গিরিয়ার উৎপত্তি। দশ শতাব্দীর যুদ্ধের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গিরিয়া গ্রামের মধ্যে মধ্যে স্থানপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মীরকাশীমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার স্থল বিভিন্ন। এই যুদ্ধ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বাঁশলই নদীর মোহানার নিকট হইয়াছিল। সে স্থানের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে লালখাঁর দেওয়াড় নামে সুবৃহৎ চরে পরিণত হইয়াছে। লালখাঁর দেওয়াড় এক্ষণে একখানি বিস্তৃত পল্লী হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশলইএর বর্ত্তমান মোহানা হইতে পূর্ব্ব মোহানা অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে ছিল, এক্ষণে তাহা লালখাঁর দেওয়াড়ের গর্ভস্থ। বাঁশলই রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থলে বক্রগতি অবলম্বনপূর্ব্বক জঙ্গীপুরের নিকট কানপুর নামক স্থানের উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কানপুরে বহুসংখ্যক দস্যুর বাস ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাহারা খাইবার গিরিপথ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দস্যুবৃত্তি করিত। বাঁশলইএর মোহানা

হইতে স্থতী তিন ক্রোশেরও অধিক উত্তর হইবে। মীরকাশীমের সৈন্য কাটো ও মতিঝিলের নিকট পরাজিত হইয়া স্থতীতে আসিয়া অন্যান্য সৈন্যদে সহিত মিলিত হয়। স্থতীতে মীরকাশীমের ইউরোপীয় ও আর্ম্মেণীয় সেনাপতি সমরু ও মার্কার অবস্থিতি করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার দেশীয় প্রধান প্রধান সেনাপতি আসদউল্লা, নাশীর খাঁ, বদরউদ্দীন, সেরআলি প্রভৃতিও ইংরেজদিগকে বাধাপ্রদান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। মেজর আডাম্‌সের অধীন ইংরাজ সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গা পার হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ বাদসাহী সড়ক ধরিয়া স্থতীর দিকে অগ্রসর হয়। মুর্শিদাবাদ হইতে স্থতী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় পার দিয়া দুইটি সড়ক চলিয়া গিয়াছে। সরফরাজের সৈন্য পূর্ব্বপারের সড়ক দিয়া গমন করায়, থামরা ও গিরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজসৈন্য পশ্চিম পারের সড়ক দিয়া বাঁশলইএর মোহানার নিকট উপস্থিত হয়। মীরকাশীমের পরাজিত সৈন্যগণও উক্ত সড়ক দিয়া স্থতীর দিকে গিয়াছিল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এই যুদ্ধ হয়। ভাগীরথীর কেবল পশ্চিমতীরে স্থতীর নিকট এই যুদ্ধ হওয়ায়, মুতাক্ষরীণকার প্রভৃতি ইহাকে স্থতীর যুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইংরেজেরা ইহাকে গিরিয়ার যুদ্ধ কহেন; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্থতী পর্য্যন্ত ভাগীরথী উভয়তীরবর্ত্তী প্রান্তরের নামই গিরিয়াপ্রান্তর; স্থতরাং এ বিষয়ে কোন্ পার্থক্য নাই। মীরকাশীমের সৈন্যগণের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই হইয়াছিল। ভাগীরথী ও বাঁশলই তাহাদের দুই পার্শ্বের পরিথাস্বরূপ হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন তাহারা অন্যান্য দিকেও পরিখা খনন করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে পশ্চিমে যাইবার একমাত্র সড়ক তাহারা অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যস্থলে সমরু ও মার্কার, দক্ষিণপার্শ্বে আসদউল্লা ও বামপার্শ্বে সেরআলি, ইংরেজসৈন্য মথিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আসদউল্লার সৈন্য দক্ষিণ দিকে বাঁশলইএর নিকট পর্য্যন্ত অবস্থান করে। ইংরেজসৈন্যগণ বাদসাহী সড়ক ধরিয়া আসিয়া বাঁশলইএর মোহানার নিকট উক্ত নদী পার হয়। সম্ভবতঃ বাঁশলই যেখানে সড়ককে বিভক্ত করিয়াছে, সেইখানে ইংরাজসৈন্য পার হইয়া থাকিবে। যদিও তাহার কিছু পূর্ব্বে বর্ত্তমান মোহানা, এবং প্রাচীন মোহানা আরও পূর্ব্বে ছিল, তথাপি মোহানার নিকট যাইবার কোনও আবশ্যক দেখা যায় না, ও বর্ষাকালে মোহানার নিকট পার হওয়া বড় সহজ্য ব্যাপার নহে। মেজর আডাম্‌সের সহিত মেজর কার্ণাক, নক্সা গ্রাণ্ট

প্রভৃতি সেনাপতিও ছিলেন। ইংরেজসৈন্যগণ বাঁশলই পার হইলে, মীরকাশীমের সৈন্য অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আসদউল্লার সৈন্যগণ ইংরাজদিগের অনেককে বাঁশলইএর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজেরা অপর পার্শ্বে জয়লাভ করায়, মীরকাশীমের সৈন্যদিগকে অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, সেরআলি যদি কিছু বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে ইংরাজদিগকে বাঁশলই ও ভাগীরথীর গর্ভে চিরবিশ্রামলাভ করিতে হইত। এই যুদ্ধের পর মীরকাশীমের সৈন্যের সহিত ইংরাজদিগের আর প্রকৃত যুদ্ধ ঘটে নাই। ইহার পর উধুয়ানালা শিবির আক্রমণ করিয়া ইংরেজেরা মীরকাশীমের সৈন্যগণকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

যে প্রান্তরে মীরকাশীমের সৈন্যের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভাগীরথী তাহা গর্ভস্থ করিয়া লালখাঁর দেওয়াড়ে পরিণত করিয়াছেন। সূতীর নিকট কোন্দলিয়া নামে একটি ময়দান আছে; প্রবাদ যে, সেইখানে প্রথমে নবাব ও ইংরাজসৈন্যের প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সূতীর নিকট বাজিতপুর নামক স্থানের সর্ব্বেশ্বর দেবের মন্দিরের তীরে একটি যুদ্ধের চিত্র আছে; সাধারণে বলিয়া থাকে যে, মীরকাশীম ও ইংরাজদিগের যুদ্ধ স্মরণ করিয়া সেই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গিরিয়া প্রান্তরের ...য় যুদ্ধস্থলেরই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভাগীরথী প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন ...তি অবলম্বন করায় ক্রমাগত উক্ত:পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব মোহানা সূতীর নিকট ছাপঘাটীতে ছিল; এক্ষণে তাহা সূতী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে বিশ্বনাথপুর নামক স্থানে সরিয়া আসিয়াছে। সূতী হইতে প্রায় ১॥ ক্রোশ দক্ষিণে আটপলগাছি নামক স্থানের নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেন। রেনেলের মানচিত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সেই আটপলগাছি হইতে ভাগীরথী প্রায় ১॥ ক্রোশ পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপে ভাগীরথী গিরিয়াপ্রান্তর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গতির এইরূপ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, বিশাল গিরিয়াপ্রান্তরের চিহ্ন অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও তাহা বহুদূরব্যাপী ভূভাগে আপনার বিশাল কায় বিস্তার করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত বলিয়াছে।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কবিতারচনা।

"নিউ রিভিউ" পত্রে মিষ্টার গ্লাড্‌ষ্টোন মনুষ্য রচনা ও কবিতা রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। তাঁহার কবিতারচনাসম্বন্ধীয় বক্তব্যের সহিত আমরা তাঁহার মনুষ্যরচনাসম্বন্ধীয় বক্তব্যও প্রদান করিলাম।

মানবের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে,—জগতে সবাই কি করিতেছে। ইহার এক উত্তর, সকলেই বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হইতেছে; আর এক উত্তর, সকল লোকেই আপনাদিগের গঠন কার্য্য করিতেছে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ লোকই গঠনকার্য্য কিরূপ হইতেছে, সে দিকে বড় দৃষ্টিপাত করে না। লোকে ধন ও যশের গঠন লইয়াই ব্যস্ত, আপনাদের গঠনে তাহারা মনোযোগ দেয় না। যৌবনকালে সকলেরই মনে করা উচিত যে, সুচরিত্র গঠন সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যৌবনে সৎ ও প্রাণোপযোগী ব্যবহার করার মত সুফলপ্রদ আর কিছুই নাই। প্রথমাবস্থায় বসন্তসমাগমে পাদপকুল যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, মানবও যৌবনাবস্থায় সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হয় জগতে আমাদের সকলেরই বিশেষ কার্য্য আছে,—কোন বিষয়ে কাহার বিশেষ দক্ষতা তাহা স্থির করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়কে অর্থ, উত্তেজনা ও উচ্চাশার সময় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যে প্রগাঢ় চিন্তা ও ধীর শ্র প্রস্তাবে জার্ম্মানেরা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে, ইংরাজ সেই প্রগাঢ় চিন্তা ও শ্রমের তত পক্ষপাতী নহে। এখানে ইংরাজ অর্থে আদিম ইংরাজী ভাষার ব্যবহারকারী জাতিগণের প্রধান প্রধান অংশ বুঝিতে হইবে। ইংরাজের মানসিক ক্ষমতা যেরূপ, সেই ক্ষমতার প্রয়োগসংকল্প সেরূপ নহে; তাই সেই ক্ষমতার অনুরূপ সাফল্যের অভাব সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজের এই কঠোর, বিচ্ছেদবিহীন কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে বলিয়া ইংরাজ অনেক সময় সহজসাধ্য কার্য্য অন্বেষণ করে,—কুসুমময় পথই অবলম্বন করিতে চাহে।

চরিত্র-গঠন।

মানসিক শ্রম যে সকল পথে চালিত হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে কবিতারচনার পথই সর্ব্বাপেক্ষা কুসুমময়।

কবিতা রচনা করিবার প্রলোভন এতই প্রবল যে, আমরা প্রায় সকলেই একবার না একবার কবিতারচনার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। উড়িতে পারা যাইবে কি না, উড়িতে চেষ্টা না করিলে, তাহা বুঝা যায় না। জলে না নামিলে সন্তরণশিক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। পতঙ্গ যখন দীপশিখায় উড়িয়া পড়িবেই পড়িবে—তখন তাহাতে দোষ কি? এ সকল কবিতা পাঠ করিয়া কেহ কেহ আনন্দানুভবও করে; তাহা ভিন্ন কন্দর্পদেবের অন্ধতারূপ অপরাধ থাকায়,

কবিতা-প্রকাশ।

চনা করিয়া দেখা উচিত। কবিতারচনার প্রলোভন হইতে লেখক স্বয়ং নিষ্কৃতি পান। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "ইটন মিস্‌লেনি" পত্রে, প্রবন্ধ, অনুবাদ, এমন কি, প্রাসঙ্গিক কবিতাও লিখিতেন।

সাহিত্যে আবশ্যকের অতিরিক্ত কবিতা বা কবিতা বলিয়া পরিচিত ছন্দে রচিত রচনা প্রকাশিত হয়, তত আর কিছুই হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কবিতারচনার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। তাহার পর কেহ কিছু রচনা করিলে, তাহা ভাল হইল কি না জানিবার জন্য, পাঠকসমাজে

অতিরিক্ত।

কাশ করেন;—কারণ, সুবর্ণ বিশুদ্ধ কি না, অগ্নিতে সমর্পিত হইলেই তাহা স্থির করা যায়। তনি সুদীর্ঘ জীবনে অনেকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এবং লেখক ও প্রকাশকদিগের ায় অনেক গ্রন্থ উপহার পাইয়াছেন। যখন একখানা পুস্তক দেখিয়া ভাল লাগে, তখন থমেই মনে একটা অনিশ্চয়ের ভাব ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; কিন্তু প্রথমেই যদি খা যায় যে, সেখানা কবিতাপুস্তক, তবে সত্য সত্যই বড় হতাশ হইতে হয়। অবশ্য লেখক মন অনেক কবিতাগ্রন্থ পাইয়াছেন—যে সকল পাঠ করিয়া তিনি প্রভূত আনন্দ অনুভব রিয়াছেন, এবং প্রেরকের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু যিনি এক বা ততোধিক কবিতা-স্তক প্রকাশিত করিয়াছেন,—তাঁহাকেই যদি কবি বলিতে হয়, তবে বিগত চল্লিশ বা পঞ্চাশ ৎসরের মধ্যে গ্রেটব্রিটেনে যে সকল কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের গণনা রিতে হইলে সহস্রের ঘরে যাইতে হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লেখকই শস্বী হইতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। অতি অল্পসংখ্যক কবিতালেখক বা লেখিকা শোলাভের উপযুক্ত স্থায়ী ভিত্তির গঠনে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠক মনে রাখিবেন, লেখক ময়ের কথা বলিতেছেন, টেনিসন ও ব্রাউনিং, উভয়েই তৎপূর্ব্বের লোক। কবিতা-দিগের মধ্যে দুই এক জন অবশ্য প্রতিভাশালী কবি; কিন্তু সেই দুই একটি তারকা আর সকলেই প্রায় ক্ষণস্থায়িনী ক্ষীণদীপ্তির অধিকারী খদ্যোত। খদ্যোত তারকার সমান বলিয়া চলিতে পারিবে কেন? লেখক বলিতেছেন, কবিতালেখক যেন র কবিতা প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে বহু বার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন, সকল প্রকাশ করা সমীচীন হইবে কি না?

মিষ্টার গ্লাড্‌ষ্টোন ব্রিটেনে কবিতার যে অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন—এ দেশেও কবিতার বস্থা প্রায় সেইরূপ। তবে কথা আছে,—"বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়," এবং "শিখাবিদ্যা রীয়সী," তাই অনুকরণের অধোগতি সর্ব্বথা শোচনীয়। সেই জন্য এদেশে ছন্দের এত বেশী পব্যবহার, এবং কবিতালেখকের আক্কেলের এত বিস্ময়কর অভাব।

বার্ণস্।

। দিন বার্ণসের একটি প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন উপলক্ষে ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি ষ্টার অষ্টিন্ যাহা বলিয়াছেন,—বোধ করি, তাহা পাঠকের প্রীতিপ্রদ হইবে।

একটি প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ আছে, মরণের পূর্ব্বে কাহাকেও সুখী বলা যায় না; রণের পূর্ব্বে কাহারও যশেরও স্থায়িত্বসম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। বার্ণসের মৃত্যুর পর শত বর্ষ চলিয়া গেল,—এখন বার্ণস্ যে কীর্ত্তিশিখরে অক্ষুণ্ণ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছেন, সেখান হইতে তাঁহার নামিবার কানও সম্ভাবনাই নাই। কোনও কোনও কবি কতকগুলি লোকের নিকট বিশেষ আদৃত; ন্তু সকলেই বার্ণসের উপাসক। ইহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নহে। দরিদ্রের কুটীরে

"জগতের তুমি।"

বার্ণসের জন্ম—আর তাঁহার কবিতায় মানবহৃদয়ের সাধারণ ভাব, চিরসঞ্চিত দুঃ ক্লেশকর বাসনার কথাই প্রতিধ্বনিত।

প্রকৃতির মনোরম মাধুরী, প্রবল প্রলোভন, জীবন্ত যাতনা, প্রণয়ের সান্ত্বনা, স্বদে প্রতি কর্ত্তব্য, সৎসঙ্গের আনন্দ, শ্রমের নৈতিক উচ্চতা, মানবের অজেয় মহত্ব, এই স বিষয়ে বার্ণস্ গীত গাহিয়াছেন। এ সকল বিষয় কাহার না ভ লাগে? তাই জগৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার ললিত মধুর কবিতা শ্র করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত মহান ছিলেন না। যদি বার্ণস লোক কেমন ছিলেন দেখি প্রত্যেক স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে নীতির অবজ্ঞা করি হয়, অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করিতে হয়। বার্ণসের চরিত্র স্কচদিগের উচ্চ আদর্শের উপযো ছিল না। বার্ণস তাঁহার কোন না কোন কবিতার অনুকরণাতীত মাধুরীর সহিত সর্ব্বদা সম্মত মহত্ব ও উচ্চাদর্শের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন;—তাই তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে ভাল বাসেন ও ভক্তি করেন। তাঁহার কবিতা কি মধুময়ী! ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছে যে, বার্ণস্ তাঁহার আত্মজীবনের ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়া লোককে উপদেশ দিতেন—তাই তাঁহা উপদেশ এত প্রাণস্পর্শী, তাই উপদেষ্টার দোষ না ভুলিয়া থাকা যায় না। বার্ণসের ম পারিবারিক জীবন লইয়া আর কোন রাজনৈতিক, সৈনিক বা বৈজ্ঞানিক, বার্ণসের ম কোনও জাতির ভালবাসা লাভ করিতে পারেন না। বার্ণস্ তাঁহার আপনার (এবং বোধ হ জগতের অধিকাংশ লোকের) পাপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; তথাপি কোন মহাত্মা সেই পাপীর মত সাধারণের ভালবাসা ও ভক্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। অশ্রুজলে বার্ণসের পাপ বিধৌত হইয়া গিয়াছে। বার্ণস্ তাঁহার দোষের কথা এমন সরলভাবে—এমন করুণভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, পাঠক অনিচ্ছাসত্বেও অশ্রুজলে বার্ণসের দোষ প্রক্ষালিত করিয়া, তাঁহার গুণ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার উপাসনা করেন।

কবিতা।

শয়তানের দুঃখেও যিনি ব্যথিত, সকল মানবের মধ্যে অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাবসংস্থাপনের যিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র,—তাঁহাকে কি ভাল না বাসিয়া, ভক্তি না করিয়া থাকা যায়?

বার্ণসের মৃত্যুর শতবাৎসরিক শোকসভা-উপলক্ষে লর্ড রোজবেরি যাহা বলিয়াছে, আমরা তাহারও সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

কেবল স্কট্‌ল্যাণ্ড নহে, সমগ্র মানবজাতি বার্ণসের নিকট ঋণী। তবে স্কট্‌ল্যাণ্ডের ঋ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্কচজাতিকে উন্নত করিয়াছেন, এ স্কট্‌ল্যাণ্ড ও স্কটিশ ভাষা পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের কোনও প্রাধান্যই ছিল না, এবং স্কচ্ ভাষাও বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ ছিল। এই সময় বার্ণসের আবির্ভাবে জাতীয় জীবনে স্কট্‌ল্যাণ্ডের অধিকার পুনঃস্থাপিত হয়, এবং স্কটিশ ভাষা চিরস্মরণীয় হয়।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের ঋণ।

জীবন-সায়াহ্নে যখন কবি আপনার বিগত জীবনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, যশে স্থায়িত্বে সন্দেহ ও তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মত দুর্ভাগ্য আর কে ছিল? মৃত্যুর পূর্ব্বে বার্ণস বলিয়াছিলেন, "শত বৎসর পরে লোকে আমার কথা আরও ভাবিবে।" আজ শত বৎসর পরে সত্যই তাহা হইয়াছে। বার্ণস মানবের সমতা বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন; বার্ণসের রচনার কত সংস্করণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর দুঃসাধ্য! শত বৎসর পরের কথা বলিবার সময় বার্ণস যাহাই কেন চিন্তা করিয়া থাকুন না তিনি আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে যে স্বপ্নই কেন দেখিয়া থাকুন না—আজ তাঁহার ভাগ্যে

যশ।

যশোলাভ হইয়াছে, তাহা যে কখন তাঁহার কল্পনাতেও আইসে নাই, ইহা নিঃসংশয়ে া যাইতে পারে।

বার্ণস যে এখন জগতের ভালবাসা ও প্রশংসা পাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দ ও র্বের বিষয় আর কি আছে? স্কচদিগের পক্ষে বার্ণসের বিষয় আলোচনা করা অপেক্ষা সুখদায়ক আর কি আছে? মানবজাতির উপর বার্ণসের এই ভাবেরও তাঁহার সাফল্যের কারণ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য নহে। তাঁহার সাফল্যের কারণ, ভাব ও সহানুভূতি। তিনি দরিদ্র কৃষকের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং শ্রমের অবসরকালে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার কৃষিকার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। সহসা পল্লবের ছায়াস্নিগ্ধ আবরণান্তরাল হইতে এবণে অমিয় ঢালিয়া পাপিয়া যেমন গাহিয়া উঠে, তিনি তেমনই প্রাণময় প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীতের বিরাম ছিল না। কবিতায় বার্ণসকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বার্ণস এক জন বাগ্মী ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ বোধ-শক্তি ও বাগ্মিতা ছিল। তাঁহার সহানুভূতি উদার ও সর্ব্বব্যাপিনী। পীড়িত ও ঘৃণিতদিগকে তিনি বিশেষভাবে আপনার আশ্রয় দিয়াছিলেন। সকল প্রকারের পীড়ককে, এমন কি, শিকারী পর্য্যন্ত তিনি শত্রু জ্ঞান করিতেন। তিনি গৃহের মাধুরী ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি-রূপে গৃহের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্যথিত, তৃষিত, তাপিতমাত্রেই তাঁহার কাছে সহানুভূতি পাইত। বার্ণস্ অনেকের মতে রাজনৈতিক ছিলেন; কিন্তু তিনি কোন বিশেষদলভুক্ত ছিলেন না। কবি কখনও রাজনৈতিক হয়েন নাই, কোনও রাজনৈতিক কখনও কবি হয়েন নাই। বার্ণসের রাজনীতি কল্পনায় চালিত হইত।

সাফল্য।

যে প্রেমের কথায় বার্ণস বলিয়াছেনঃ—

"প্রেম বিনা কিবা বল মানবজীবন,
অরুণ আগমহীন চির অমানিশি;
নিদাঘের মেঘমুক্ত উজ্জল তপন
প্রেমের আলোকে হয় পুলকিত দিশি!"

যতদিন সেই প্রেমালোকে মানব-হৃদয় উজ্জ্বল হইবে, যতদিন বিহগ গীত গাহিবে, যতদিন কুসুম বিকশিত হইবে, ততদিন বার্ণসের কবিতা ও বার্ণসের নাম আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

বার্ণস।

বার্ণস স্বভাবের কবি, বার্ণস স্বভাবতঃই কবি। ফুল যেমন আপনি বিক-শিত হয়, বিহগ যেমন আপনি সুস্বরলহরী ছড়ায়, তটিনী যেমন আপনি ফেনিলোচ্ছ্বাসে কলগীতি গাহিয়া বহিয়া যায়, বার্ণসের কবিতা তেমনই আপনি আত্মপ্রকাশ করিত। তাই কত সম্রাট, কত রাজনৈতিক, কত ধর্ম্মযাজক, আপন আপন কার্য্যসাধনের পর যশ অযশ সহ মানবের স্মৃতিপথ হইতে দূরে অপসারিত হইয়াছেন, আর কৃষাণ কবি বার্ণস্ আজ কেবল স্কটল্যাণ্ডে নহে, কেবল গ্রেটব্রিটেনে নহে, সমগ্র সভ্য জগতে পূজিত, আদৃত, সম্মানিত। বার্ণস্ যখন যে ভাব ধরিয়া রচনা করিয়াছেন, তখন সেই ভাবই তাঁহার লেখনীতে মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়াছে। বার্ণসের প্রণয়বিহ্বল গীতিকবিতা সকল ও Tam o'shauter তুলনা করিয়া পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বার্ণসের সহানুভূতি ও প্রেম সাগরের সহিতই উপমেয়;—তাহার আবেগ উচ্ছ্বাস ভীষণ, তাহার বিস্তার সীমাহীন। এই প্রেমের জন্য, এই সহানুভূতির জন্যই কৃষাণ কবির জীবন কলঙ্কলাঞ্ছিত, আবার এত-দুভয়ের জন্যই তাঁহার কবিতা এত প্রাণস্পর্শিনী, এত মাধুর্য্যময়ী। কবি স্বভাবতঃই কবি, চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না; এ কথার সত্যতা আর সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বার্ণসের কবিতায় তাহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে।

জীবনচরিত।

মার্ক টোয়েন।

অল্পদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক "মার্ক টোয়েন" আখ্যাধারী মিষ্টার ক্লিমেন্স্ ভারতব আসিয়াছিলেন। এরূপ প্রসিদ্ধ অতিথিসৎকার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় হইলেও, সর্ব্বদা সহজ নহে ব্যবসায় ভিন্ন অন্য সময় ভারতবর্ষ প্রায়ই ইংরাজ বা আমেরিকানের চিন্তার বাহিরে পড়ে "হার্পার্স্ মন্থলি পত্রে" মার্ক টোয়েনের বন্ধু মিষ্টার টুইডেল্ এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া "সাহিত্যের" পাঠকদের উপহার দিব।

আকৃতি ও প্রকৃতি।

মার্ক টোয়েনের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রভেদ লক্ষিত হয়। সেই পলিতকেশ বৃদ্ধ যে এত হাস্যোদ্দীপক রচনা লিখিয়াছেন, তাঁহার স্থির মুখভাব ও স্বপ্নাবেশময় নয়ন দেখিলে সহজে তাহা বিশ্বাস হয় না। সর্ব্বপ্রকার পাঠকের নিকট প্রশংসা-প্রাপ্তির সৌভাগ্য মার্ক টোয়েনের মত আর কোনও লেখকেরই হয় নাই। একবার এক জন কশাই মার্ক টোয়েনকে দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা, সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনিই কি সব পুস্তক লিখিয়াছেন?" তিনিই সে সকল পুস্তকের লেখক শুনিয়া সে বলিয়াছিল, "তা বটে—তা বটে; কিন্তু আপনার চেহারা দেখিয়া তাহা বোধ হয় না।"

প্রথম জীবনে মার্ক টোয়েন দশ বৎসর কাল মিসিসিপি নদীতে জাহাজের পথ-প্রদর্শক বা 'পাইলটের' কাজ করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সমরারম্ভে মিসিসিপি নদীতে জাহাজের যাতায়াত বন্ধ হইলে, তিনি সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ইহা তিনি তখন দুর্ভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক The Jumping Frog সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত তাঁহার মুখে গল্প শুনিয়া একজন বন্ধু তাঁহাকে উহা লিখিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কি লিখিয়া তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি কিছু দিন পাণ্ডুলিপি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা পর পুস্তক প্রকাশিত হইলে উহার বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কালিফর্ণিয়ায় সাত বৎসর কাটাইয়া, তিনি "বফেলো এক্সপ্রেসের" সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন—১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার The Innocents Abroad পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহার ১২৫০০০ খানা বিক্রীত হয়—কেহ ভাবিবেন না, আমরা শূন্য (০) ভুল করিয়াছি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি "আটলাণ্টিক মন্থলি" পত্রে কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। বিষয়াভাবে তিনি লিখিতে অস্বীকৃত হইতেছিলেন—এমন সময় তাঁহার মিসিসিপিতে অবস্থানের গল্প শুনিয়া, তাঁহার বন্ধু তাহাই লিখিতে অনুরোধ করেন। মার্ক টোয়েন তাহাই করিয়াছেন।

পরিহাস-প্রবৃত্তি।

মার্ক টোয়েনের বাটীর সম্মুখস্থ একটা বাটীতে নূতন বাসিন্দা আসিবার কয় দিন পরেই একদিন প্রভাতে সেই বাটীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া গৃহস্থদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম ক্লিমেনস্। আমার পত্নী ও আমি আপনাদের বাটীতে আসিয়া আপনাদের সহিত পরিচিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে যে আসিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অসময়ে এই ভাবে আসার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—কিন্তু আপনাদের বাটীতে আগুন লাগিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এ সংবাদ শুনিয়া বাটীর লোকের তখন আর তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অবসর হয় নাই!

করিয়াছিলেন। একবার রবিবারে গির্জ্জায় যাইয়া ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মালোচনা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজককে সে কথা বলিবার জন্য মার্ক টোয়েন দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আসিলে পরিহাসরসিক বলিলেন, "দেখুন, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু আমি এ কথা আপনাকে বলিতে বাধ্য যে, আজ সকালে আপনি যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, সেরূপ বক্তৃতা আমি বাদ দিতে পারি। আমি চিন্তা করিতে গির্জ্জায় আসিয়া থাকি; কিন্তু আজ আমি চিন্তা করিতে পারি নাই। আপনি আমার কার্য্যে ব্যাঘাত করিয়াছেন। আমি বাধ্য হইয়া আপনার বক্তৃতা শুনিয়াছি, কাজেই আমার অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বৃথা গিয়াছে। আমার প্রার্থনা, ভবিষ্যতে যেন আর এরূপ না হয়।"

মার্ক টোয়েন ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ডিকেন্সের গ্রন্থ তাঁহার ভাল লাগে না। কিন্তু ব্রাউনিংএ তাঁহার অচলা ভক্তি। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক। ঐতিহাসিক প্রবন্ধে পরিহাস-রসিকের ও পরিহাসপূর্ণ প্রবন্ধে প্রভূত প্রভেদ। তিনি বিড়াল বড় ভাল বাসেন।

পতি-পত্নী।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের প্রেম ও সুখের সীমা নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীর প্রশংসা করিয়া, পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন,—"জীবনে একবার একখানি পুস্তকের উৎসর্গ ভিন্ন বোধ হয়, আর কোথাও আমি ছাপায় আমার পত্নীর উল্লেখ করি নাই। কাজেই পনের বৎসর পরে আজ তাঁহার কথা বলিলে, বোধ হয়, অন্যায় হইবে না। আমি একটি নূতন কাজ করিব। আমি তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহাকে সম্পাদনভার না দিয়া, এই পাণ্ডুলিপি মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইব। তাহা হইলে ইহা উনানে সম্পাদিত হইবে না।" মার্ক টোয়েনের পত্নী, সত্য সত্যই স্বামীর—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

শিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষা।

ন্যাশন্যাল্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে কুমারী লিনা সোরাবজী ভারতমহিলাদিগের জন্য অনুষ্ঠিত ও তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

আরম্ভ ও ব্যাপ্তি।

লেখিকা বোম্বাই বিভাগের স্ত্রীশিক্ষার কথারই আলোচনা করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রদিগের সাহিত্যসমিতি প্রথম বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। প্রায় ঐ সময়েই বঙ্গদেশেও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে ছাত্রসমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষা দেশে প্রচলিত হইবে না; কারণ, দেশের সমাজস্থ গণ্য মান্য ব্যক্তিরা কেহই এ ব্যাপারে যোগদান করেন নাই। কিন্তু ছাত্রসমিতি বুঝিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যাপারে দেশের লোকের দীর্ঘকালব্যাপী কুসংস্কার দূর করা প্রয়োজন, সে সকল ব্যাপার জনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াই আবশ্যক। তাঁহাদিগের এই দূরদর্শিতার ফলে বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষা স্থগিত হইয়া যায় নাই। কিন্তু বেথুনের গমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অবনতি লক্ষিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যালয়ের কার্য্য দেশীয় ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, এবং প্রথম ছয় মাস কয় জন লোক ইচ্ছা করিয়া শিক্ষকতার ভার লইয়া

বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ক্রমে লোকে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহার জন্ত অর্থ ব্যয় করিতেও প্রস্তুত হয়। এখন কথা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে কোন্ পথ অবলম্বন করা আবশ্যক? লেখিকার মতে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক আচারফলে বালিকারা এত অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ করে যে, তাহারা বাল্যকাল-উপভোগের অবসর পায় না। যে বয়সে ইংরাজ বালিকারা পুতুল খেলা, পরীর গল্প ও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত থাকে, সেই বয়সেই ভারতবর্ষে বালিকাদের মানসিক বিকাশ হয়। লেখিকা, ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় বালিকাদিগকে পাশাপাশি বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখিয়া উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়াছেন। বয়সের অনুপযুক্ত চিন্তা প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া ভারতের বালিকারাও শিক্ষালাভ করিতে বড় আনন্দানুভব করে।

শিক্ষার বিভাগ।

ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা স্থির করা দুষ্কর; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতে রমণীদিগের অবস্থা এইরূপ। কোনও ভারতমহিলার একটি কদাকার সন্তান হয়; তাঁহার কোনও বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, হয় ত শিশু বড় হইলে দেখিতে ভাল হইবে; তাহাতে জননী উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার সন্তানের শৈশবের কথা ত ভুলিতে পারিবেন না! ইহা নিতান্তই শোচনীয়। এ রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে গার্হস্থ্য জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ভারতে মহিলাদিগের পক্ষে গৃহে শিক্ষার অত্যন্ত অভাব—যেখানে সে সকল সত্ত্বেও কোনও মহামতি মহিলার আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা কেবল আপনাদিগের অদমনীয় স্বাতন্ত্র্য-বলে উন্নীতা হইয়াছেন। আশা আছে, ভবিষ্যতে এ অন্ধকার বিদূরিত হইবে। ভারতে এখন বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব নাই; পিতা মাতারা তাঁহাদিগের দুহিতাদিগকে এই সহজপ্রাপ্য শিক্ষালাভের সুযোগ দিলেই সুদিন আসিবে। স্ত্রীশিক্ষাকে তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—উচ্চশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, গৃহশিক্ষা। ভারতে রমণীদিগের জন্য দুই প্রকার বিদ্যালয় আছে—গভর্মেণ্টের নিজস্ব ও গভর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে গভর্মেণ্টের অনুমোদিত পুস্তক পড়ান হয়; এবং বন্দোবস্তে স্বাধীন হইলেও গভর্মেণ্টের পরিদর্শকদিগের পরিদর্শনাধীন। শিল্পশিক্ষারও উন্নতি হইতেছে। অনেক সময় পুরুষ অপেক্ষা মহিলা শিক্ষকগণ অধিক দক্ষ হয়েন, ও অধিক বেতন লাভ করেন। এখন শিক্ষাবিভাগে কিন্ডার-গারটেন প্রণালীও প্রবেশলাভ করিতেছে;—আশা করা যায়, ভবিষ্যতে শিক্ষা আরও সহজলভ্য হইবে। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক চালিত। ইহা ব্যতীত মিসনারী বিদ্যালয়ও অনেক আছে। কিন্তু বালিকাদিগকে অতি অল্প বয়সেই সংসার-ভার লইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। বিবাহের পর অতি অল্পসংখ্যক বালিকা শিক্ষয়িত্রী হইবার অভিপ্রায়ে পাঠ করেন। মহিলাদিগের গৃহে যাইয়া শিক্ষাদানের বন্দোবস্তও আছে। সূচীকার্য্যেও কাহারও কাহারও বেশ মনোযোগ দেখা যায়। অবশ্য গৃহশিক্ষায় ও বিদ্যালয়ে শিক্ষায় প্রভেদ প্রভূত; কারণ, প্রথমোক্ত শিক্ষায় দ্বিতীয়োক্ত শিক্ষার নিয়ম নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদিগকে উপাধি দিতেছেন। ইহা গৌরবের কথা বটে। মহিলাগণ সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য প্রায়ই উইল্‌সন কলেজে ও চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার জন্য গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। বোম্বাইয়ে মহিলাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যালয় বড় আবশ্যক। পুনায় প্রধানতঃ তিনটি বিদ্যালয়ে রমণীগণ কর্ত্তৃক রমণীগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রথম পণ্ডিতা রমাবাইয়ের বিধবাশ্রম, দ্বিতীয় সিটি হাই স্কুল, তৃতীয় লেখিকার জননীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল।

ভিক্টোরিয়া স্কুলে শিক্ষিতা যে সকল মহিলা সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের শিক্ষাগুণে সকলকে সুখী করিয়াছেন। অবরোধ শিক্ষার একটা অন্তরায়; কারণ—

অবরোধ। অবরোধে দিন দুই চার ঘণ্টা পড়াইবার যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হয় না। তাহাতে হয় ত সামান্য একটু ইংরাজী বা সঙ্গীত বা সূচিকার্য্যের শিক্ষা হয়; কিন্তু সময় সময় ছাত্রীর তাসখেলা বা ভ্রমণেচ্ছার আধিক্য হেতু শিক্ষয়িত্রী ছুটী লাভ করেন। পুণায় এক জন রমণী অবরোধবাসিনী মহিলাদিগকে চন্দ্রালোকে অশ্বারোহণ শিখাইতেন; যদি তাঁহারা এইরূপ স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক ব্যায়ামের চর্চ্চা করেন, তবে বোধ হয় চিরচন্দ্রমাশালিনী যামিনী বাঞ্ছনীয় হইবে। দুই চারি জন মহিলা টেনিস প্রভৃতি খেলা ভালবাসেন; কিন্তু অনেকে আবার আলস্যবশতঃ শ্রমের দিকে যাইতে চাহেন না। লেখিকা জানেন, কোনও পরিবারে মহিলারা শ্রমাভাবে বিকলাঙ্গ হইয়াছেন। একবার এক মহিলাসম্মিলনে লেখিকা জানিয়াছিলেন যে, সমাগত পঞ্চাশ জন ভারত-রমণীর মধ্যে এক জন মাত্র দৌড়িতে জানেন! তিনি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইংরাজী-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ মহিলা অবরোধ অবজ্ঞা করিতে চাহেন না। কোন মুসলমানমহিলা লেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামীর প্ররোচনায় এক জন ইংরাজ মহিলার সহিত খোলা গাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া তিনি যেরূপ অসুবিধা বোধ করিয়াছিলেন—তেমন আর কখনও করেন নাই। যাঁহারা অবরোধ অবজ্ঞা করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে অবরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা অনাবশ্যক; তবে তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ চেষ্টা করিলে অবরোধেও তাঁহাদিগের জন্য অনেক কার্য্য করিতে পারেন। ভারতের প্রধান নগরীসমূহে পুষ্পপ্রদর্শনী প্রভৃতিতে মহিলাদিগের জন্য একটা স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে। এখন উচ্চশ্রেণীস্থগণ দুহিতৃগণকে সুশিক্ষিতা করিতেই চাহেন;—তবে এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, লেখাপড়া শিখিলে তাঁহারা ভাল করিয়া গৃহকর্ম্ম করেন না। অর্থাৎ হেমচন্দ্রের ভাষায়:—

"কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি, ভাত রাঁধ্‌তে ডাল!"

সেটা বোধ হয় অল্পশিক্ষাবশতঃই হইতেছে। সুশিক্ষায় ইহা হইবে না। নিম্নশ্রেণীস্থগণ স্ত্রীশিক্ষা বড় চাহেন না।

জাতীয় উন্নতির পক্ষে পুরুষগণের ন্যায় মহিলাগণের উন্নতিও আবশ্যক, এবং আশা করা যায়, বর্ত্তমান ভবিষ্যতে মুকুলিত হইলে এ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে; কারণ, এখনই সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে।

বিবিধ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

আগষ্ট সংখ্যা ইণ্ডিয়া পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক স্বামীজীর লণ্ডন নগরে অবস্থিতিকালে কৌতূহলী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাক্ষাতে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উপস্থিত হয়। তাহার অপনোদন করিয়া স্বামীজি লেখককে বুঝাইয়া দেন যে, প্রচার কার্য্য ভারতবাসীর পক্ষে নূতন নহে। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধ প্রচারকেরা চতুঃপার্শ্বস্থ সকল দেশেই প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। এখন ভারতবাসীরা স্বার্থপর হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে যে, আপনার দ্রব্যে সকলকে ভাগী করিতে হয়। বাস্তবিক ভারতবাসীরা চিরদিন জগৎকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিতেছে। দর্শন, ধর্ম্মবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা—ভারতবর্ষ হইতে জগৎবাসী শিক্ষা করিতেছে। বিজয়, সাম্রাজ্য ও বিজ্ঞানের বিস্তার, ইহাই ইংলণ্ডের ব্রত বোধ হয়। ইংরাজের দৃষ্টি স্থূল জগতে, ইংরাজ জড়বাদী। ভারতবাসী অধ্যাত্মতাপ্রবণ—তাহার দৃষ্টি চিৎ-অভিমুখে। দিন দিন হিন্দুভাব যে পরিমাণে য়ুরোপে বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে স্বামীজির বিশ্বাস যে, কালে জার্ম্মান দার্শনিক সোপেনহোয়েরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। সোপেনহোয়ের বলিতেন যে, মধ্য যুগের শেষে যেমন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের সম্পর্কে য়ুরোপে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ আর্য্যদর্শন মত যথোচিত প্রসর লাভ করিলে, তাহার প্রভাবে য়ুরোপীয় চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ নূতন দিকে প্রবাহিত হইবে।

হিন্দুর ধর্ম্মপ্রচার।

'জেতাজাতির এইরূপে বিজয়সাধন আর কখন ভারতে হইয়াছে কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি মুসলমান রাজত্বকালে সুফি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির উল্লেখ করেন। আর সুফিমত যে হিন্দু মতের অতি সন্নিহিত, তাহাও বুঝাইয়া দেন। স্পর্দ্ধিত ইংরাজজাতির পক্ষেও বিধাতা বোধ হয় এইরূপ শুভাদৃষ্টের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ইংরাজ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই ভারতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আর এই আকর্ষণের ভাব দিন দিন প্রসর লাভ করিতেছে। যাহারা হিন্দুর সাহিত্যে একেবারেই দৃষ্টিহীন, তাহারাই হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

জেতার উপর বিজয়।

স্বামীজি কি ধর্ম্মমত প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেন যে, তাঁহার প্রচারের বিষয় এক কথায় ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্মের সারোদ্ধার। সকল ধর্ম্মেরই একটা স্থায়ী চিরন্তন ভাগ ও একটা অস্থায়ী অপ্রয়োজনীয় ভাগ আছে; অস্থায়ী ভাগটা বাদ দিলে যে সার ভাগ অবশিষ্ট থাকে—তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল ধর্ম্মের মূলতঃ ঐক্য উপলব্ধ হয়। ঈশ্বর, আল্লা, গড্, জিহোভা ইত্যাদি নামে প্রচ্ছন্ন হইয়া এক জগৎপ্রাণ কীটাণু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। এই ঐক্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া মানুষ উক্ত অপ্রয়োজনীয় অস্থায়ী অংশের প্রতি দৃষ্টিশীল। তাহার ফলে জগতে ধর্ম্ম লইয়া এত যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যা। জীবপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তিই যখন ধর্ম্মের সারোদ্ধার, তখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিসম্বাদ কেন বুঝা কঠিন। হিন্দুরা কি কখন ধর্ম্মমত লইয়া কাহাকে উৎপীড়ন করে না? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলিলেন যে, এ পর্য্যন্ত ত করে নাই। হিন্দু ধর্ম্মবিষয়ে অসহিষ্ণু নহে। তাহার গম্ভীর আস্তিক্যের বিষয় ভাবিলে বোধ হয় বুঝি সে নাস্তিককে উৎপীড়ন করিবে। ফলতঃ কিন্তু ঘোর নিরীশ্বরবাদী জৈনেরা কখনও কোনরূপ অত্যাচরিত হয় নাই।

দুই ভাগ;—স্থায়ী ও অস্থায়ী।

ইংলণ্ডে সাম্প্রদায়িকতার বাহুল্য সত্ত্বেও ক্রমশঃ ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য ভাব প্রসর লাভ করিতেছে। মানুষের ভ্রাতৃভাব প্রথমতঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পরে কালক্রমে তাহা জাগতিক ভ্রাতৃভাবে পরিণত হয়। ইংরেজের সংসর্গে ভারতে জাতিভেদের বিলোপ হইয়া এই ভ্রাতৃভাবের প্রচার হইতেছে। কোন কোন সহৃদয় ইংরাজ জাতিভেদ প্রথাকে ভারতবাসীর পক্ষে উপকারক মনে করেন। স্বামীজির মতে প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রণালীর মধ্যে গণনীয়।

উপসংহার।

কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রথার শোচনীয় অপচার ঘটিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কালে কালে মহাত্মা ধর্ম্মশিক্ষকগণ জাতিভেদের শৃঙ্খল ভগ্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধদেবের উদ্যম সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ভিতর হইতেই সংস্কার হওয়া উচিত। বাহিরের প্রেরণায় হওয়া সুকঠিন। সেই জন্য স্বামীজি ভারতবাসীকে ইংগভাবাপন্ন দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, জাতির জীবন জাতির দীর্ঘকালসঞ্চিত সংস্কার-পুঞ্জের ফল। য়ুরোপীয়ের ও ভারতবাসীর সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে য়ুরোপীয়ের যাহা উপাদেয়, যাহা হিন্দুজাতির সহায়ক, তাহা ভারতবাসীর আত্মসাৎ করা উচিত।

সর্পের বিচার।

সর্প সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের পত্রিকায় হাতোয়া রাজ্যে প্রচলিত সর্পসম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী বিষয়ে একটি কৌতুহলোদ্দীপক সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক সাহিত্যের জন্য স্বয়ং তাহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

সর্পের মীমাংসা।

"সারণ জেলার অন্তর্গত পচলখে পরগণায় শিউকুয়ারা ও পিপ্রা নামক দুইখানি গ্রাম আছে। মৌজা শিউকুয়ারা এক্ষণে হাতোয়ার মহারাজার সম্পত্তি; মৌজা পিপ্রা অপর এক মালিকের দখলে আছে। শিউকুয়ারা গ্রাম বহুকাল পূর্ব্বে গোরখপুর জেলার অন্তর্গত মৌজা মঝৌলির রাজার সম্পত্তি ছিল। শিউকুয়ারা পিপ্রা গ্রাম দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত; তাই দুই গ্রামের সীমানা লইয়া মঝৌলির রাজা ও পিপ্রার সত্ত্বাধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দুই পক্ষেরই চেষ্টা বিবাদী জমী আপনার দখলে আনেন। বিবাদ মিটিল না; পরিশেষে দুই পক্ষে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইল। মঝৌলির রাজা নিজ তরফে অনেক লাঠিয়াল জমা করিয়াছিলেন; পিপ্রার সত্ত্বাধিকারিগণের পক্ষেও লাঠি ও অস্ত্রাদি লইয়া বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। দাঙ্গা বাধে বাধে, এমন সময় একদিন রাত্রে বিবাদী গ্রামাধিকারিগণ স্বপ্নে দেখিলেন, একটি বৃহদাকার উরগ আবির্ভূত হইয়া বলিল, 'তোমরা বিবাদ করিয়া দাঙ্গাহাঙ্গাম করিও না। কল্য বিবাদী জমীর উপর দিয়া আমি যে পথ অবলম্বন করিয়া যাইব, সেই পথই গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমানা বলিয়া জানিবে।' এই বলিয়া সর্প অন্তর্হিত হইল। স্বপ্নদর্শনান্তে প্রতিদ্বন্দ্বীরা সমবেত অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া, সর্পের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। শিউকুয়ারায় একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ আছে; উহারই সন্নিকটে একটি শাখাপ্রশাখাবহুল বৃহৎ প্রবীণ পর্কটী বৃক্ষ দণ্ডায়মান। জমীদারদিগের স্বপ্নদর্শনের পর দিবস প্রত্যূষে ঐ পর্কটীবৃক্ষের কোটর হইতে একটি বৃহদাকার উরগ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিবাদী জমীর উপর দিয়া চলিয়া গেল। চলিতে চলিতে তাহার ফণানিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শে পথের তৃণাদি দগ্ধ হইয়া গেল। সেই অবধি শিউকুয়ারা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ঐ সর্পাবলম্বিত পথ 'সাঁপাহ' বলিয়া আখ্যাত হয়। এখনও গ্রামবাসিগণ ঐ 'সাঁপাহ'কে মৌজাদ্বয়ের সীমা বলিয়া জানে। এই জনশ্রুতি গ্রামবাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ়-নিখাত হইয়া গিয়াছে যে, এখনও কেহ শিউকুয়ারা-বাসীদিগকে সর্পের গমনপথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পাকুড়গাছ দেখাইয়া দেয় ও বলে যে, উরগরাজের গমনপথে অদ্যাপি তৃণাদি জন্মে না।

"সম্প্রতি মৌজে শিউকুয়ারা ও পিপ্রার খাকবস্ত জরিপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত

গ্রামদ্বয়ের চতুঃসীমা নির্দ্ধারণের সময় সীমানা লইয়া পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শিউকুয়ারা এক্ষণে হাতোয়ার মহারাজার সম্পত্তি। রাজ্যের আমিনের কার্য্যবিবরণী হইতে যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, সীমাবস্থিত প্রায় তিন বিঘা পতিত জমী লইয়া বিবাদ হয়। বিবাদী জমী শিউকুয়ারার অন্তর্গত ছিল; পিপ্রার স্বত্বাধিকারিগণ তাহা তাঁহাদিগের প্রাপ্য বলায়, তাঁহাদিগের আপত্তির কথা বন্দোবস্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে জানান হয়। বিবাদনিষ্পত্তির জন্য বন্দোবস্ত বিভাগ হইতে মৌলবী সৈয়দ আবল ফজ্জায়েল প্রেরিত হন। গত মার্চ্চ মাসে তিনি শিউকুয়ারায় আসিয়া কয় জন গ্রামবাসীর এজাহার গ্রহণ করেন। তাহারা সর্পসম্বন্ধীয় জনশ্রুতির কথা বলিয়া 'সাঁপাহ'কেই সীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মৌলবী সাহেবও এই নিষ্পত্তি করেন যে, যখন 'সাঁপাহ' বহুকাল হইতে সীমানা বলিয়া প্রচলিত আছে, তখন উহাই শিউকুয়ারা ও পিপ্রার সীমা নির্দ্ধারিত হইল। এই বিচারের বিরুদ্ধে আপিল হইলে, সারণের কালেক্টরও সর্পের বিচারের নজির অনুসারে মৌলবী সাহেবের বিচার বাহাল রাখিয়াছেন।

সাপের রায় ইংরেজ রাজ্যেও বাহাল রহিল।

"পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যেই সর্পসম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত দেখা যায়। বঙ্গদেশে যেরূপ সর্পরাজ্ঞী মনসার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও সেইরূপ সর্পপূজা প্রচলিত আছে। কোন কোন জাতির বিশ্বাস যে, সর্প আপনার মুখ হইতে অগ্নি উদ্গারিত করিয়া শত্রুধ্বংস ও অরণ্য পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারে। বঙ্গদেশে যে প্রবাদ আছে যে, 'যক্ষ' গুপ্তধন রক্ষা করিয়া থাকে, পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা সেইরূপ বিশ্বাস করে যে, সর্প গুপ্তধন রক্ষা করে। পঞ্জাবপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে, গুগা, জেওয়ার সিংহ, অর্জ্জন ও সর্জ্জন নামক সর্পবীরের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। রাজপুতানা প্রদেশে পীপানামক এক সর্পাবতারের সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এক সময়ে সম্পূ বা নাগ সরোবরের তীরে একটি সর্প বাস করিত। পীপা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ হ্রদতীরে গিয়া নাগকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া আসিত; নাগরাজও ব্রাহ্মণের ভক্তিতে প্রীত হই' তাহাকে প্রতিদিন দুইটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিত। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমনকালে, সে পুত্রের উপর ভুজঙ্গের দুগ্ধ যোগাইবার ভার দিয়া যায়। বালকসুলভ চপলতাবশতঃ, ব্রাহ্মণপুত্র সর্পকে নিহত করিয়া একদিনে প্রভূত ধনলাভ করিবার সঙ্কল্প করে। সে দুগ্ধ লইয়া বিবরসম্মুখে উপস্থিত হইল। পিপাসু উরগ বাহিরে আসিলে সে তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিল। সর্প বিবরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ব্যর্থমনোরথ ব্রাহ্মণকুমার গৃহে ফিরিয়া জননীকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। শুনিয়া জননী সর্পের বৈরনির্য্যাতনাশঙ্কায় পুত্রকে অন্যত্র প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পর দিবস প্রত্যূষেই ব্রাহ্মণী দেখিলেন, উরগদশনদষ্ট হইয়া পুত্র জীবন হারাইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত অবগত হইল, এবং সর্প বৈরনির্য্যাতনমানসেই এইরূপ করিয়াছে জানিয়া, তাহার অর্চ্চনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে সর্পকে পুনরায় দুগ্ধ উপহার দিল; সর্প তাহার ভক্তিদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, 'আমার সমস্ত গুপ্ত ধন তোমারই হইবে। তুমি এই ঘটনার স্মরণার্থ এখানে একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইবে।' সেই অবধি ইপীপার নাম সর্পবীর বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে, এবং সাম্পূনামক হ্রদের ও পীপার নামক নগরের নামেও উক্ত ঘটনার স্মৃতি কীর্ত্তিত হইতেছে।" *

সর্প-পূজা।

খাবারের নামতত্ত্ব।

জলপান।

কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে কি শিল্পে কি সাহিত্যে, সকল বিষয়েই আদান প্রদানের দ্বারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিপ্রদর্শনই মানব জাতির সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাতেই মানব জাতির কুটুম্বিতা রক্ষিত হয়। যেমন এক পরিবার অন্যান্য পরিবারের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতিও এক কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ। এই আত্মীয়তা থাকাতেই সহস্র যুদ্ধ বিরোধ সত্ত্বেও সভ্য জাতিরা পরস্পরের সহিত শিল্প ও বিদ্যা প্রভৃতির আদান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। কোনও সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী হস্তগত হইলে, আত্মীয়গণের সহিত বণ্টন না করিয়া খাইলে যেমন তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কোন সভ্য জাতিই তাহার জ্ঞানলব্ধ ধন, তাহার শিল্প, তাহার উপভোগ্য বস্তুসমূহে অন্যান্য জাতিদিগকে অংশীদার না করিয়া, একাকী উন্নত হইতে ইচ্ছা করে না। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, জাতিবিশেষের ভাষা হইতে শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য জাতির ভাষা পরিপুষ্ট, জাতিবিশেষের শিল্প ও সাহিত্যের দ্বারা অন্যান্য জাতিরা উন্নত, এবং জাতিবিশেষের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা অন্যান্য জাতি আলোকিত হয়।

আহারবিষয়েও দেখা যায়, মানব জাতির মধ্যে আদান প্রদানের ভাব বর্ত্তমান। খাদ্যাখাদ্য লইয়া যদিও অনেক সময়ে জাতিতে জাতিতে কলহ বিবাদ ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি ইহাও দেখা যায় যে, খাদ্য সম্বন্ধে শত্রু মিত্র সকল জাতির মধ্যে একটা অন্তঃসলিল বিনিময়ের স্রোত বহমান। খাদ্যাখাদ্য লইয়া যদিও হিন্দু মুসলমানে বিরোধ আছে, তথাপি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই খাদ্য সম্বন্ধে পরস্পরের অনুকরণ করিতেও ছাড়ে নাই। আজকাল আমাদিগের ভাত প্রভৃতি দেশীয় খাদ্য য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ প্রচলিত হইতেছে, সেইরূপ আবার কাট্‌লেট্ চপ প্রভৃতি য়ুরোপীয় খাদ্যগুলিও আমাদের মধ্যে "ঘরোয়া" হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কেবল বর্ত্তমান যুগে নয়, বহু প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির মধ্যে এইরূপ খাদ্যের বিনিময় চলিয়াছে। কিন্তু খাদ্যবিষয়ক এমনঃ কোন ইতিহাস

করিতে পারে। এক একটি খাদ্যসামগ্রী কত প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে; কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে হয় ত এক একটি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য কত যত্ন পরিশ্রম গিয়াছে। আমরা যে সকল খাদ্যসামগ্রী নিত্য আহার করি, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলির নাম কোনও প্রাচীন ভাষারূপ গিরিশিখর হইতে প্রবাহিত হইয়া, যুগযুগান্তর পরে বঙ্গভাষার ন্যায় কোনও উপভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখনও অনেক খাদ্যদ্রব্যের নাম পাওয়া যায়, যাহা একটি প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে শত শত দেশের ভাষায় স্থান পাইয়াছে। অনেক খাবারের নামের ভিতরে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, দেখা যায়। কি ফল মূল, কি ডালনা কালিয়া প্রভৃতি রাঁধা সামগ্রী, কি মিষ্টান্ন, কি রাঁধিবার পাত্রাদি উপকরণ, কিছুরই নাম একটা নিরর্থক শব্দ নহে; প্রত্যেকের নামের মূলে কোন না কোন অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা এই প্রচ্ছন্ন অর্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সর্ব্বাগ্রে জলপানের নামগুলি আলোচনার্থ গৃহীত হইল।

প্রথমে দেখা যাউক, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাবারের নাম জলপান হইল কেন। জল এবং পান, এই দুটি শব্দকে পৃথক করিয়া অর্থ করিতে গেলে, জল পান করা অর্থাৎ জল খাওয়া বুঝায়; কিন্তু এক্ষণে ইহারা এক যোগে যুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থ ব্যক্ত করিতেছে; জলপান এই যোগরূঢ় শব্দের সহিত পানীয়ের এক্ষণে বড় একটা সম্বন্ধ নাই; বিনা জলে এক ব্যক্তি মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা বেশ জলপান করিতে পারে। পানীয় জল না খাইলে যে তাহার জলপান করা অথবা জলপান খাওয়া হইল না, তাহা নয়।

কিন্তু জলই যে জলপান শব্দের মূলে, ইহা নিশ্চিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পানীয় দ্রব্যই সর্ব্বপ্রকার সৎকারবিষয়ে মুখ্য বলিয়া সচরাচর গণ্য হয়; কিন্তু কোন ব্যক্তিকে কেবল পানীয়ের দ্বারা সৎকার করিলে সৎকারের যেন একটু অভাব থাকিয়া যায়; তাই সমাজে পানীয় জল দিবার সঙ্গে একটু কিছু খাবার দিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে জলই প্রধান ছিল, খাবারটা পানীয়েরই আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ খাদ্যই পানীয়ের উপর জয়লাভ করিয়াছে; এক্ষণে খাবারের নামই জলপান দাঁড়াইয়াছে।

ভাতই আমাদিগের বাঙ্গলা দেশে প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত; মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা যে সামান্য আহার সম্পন্ন হয়, তাহাই জলপান বা জলখাবার

নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্যও থাকে; কিছু কাল পরে হয় ত বা জলপানের ন্যায় বিস্কুট প্রভৃতি আহারের নামই চা-পান হইয়া দাঁড়াইবে; চা-পানে হয় ত বা চা থাকিবে না!

জলপানও যাহার নাম, বস্তুতঃ জলখাবারও তাহারই নাম; উভয় শব্দই প্রায় একই অর্থবাচক। জলপান শব্দের ন্যায় জলযোগ শব্দও একই কারণে উৎপন্ন।

জলপানের খাবারের নামগুলি এক সময়ে এবং এক জনের প্রদত্ত নহে; কতকগুলি নাম অতি প্রাচীন কাল, এমন কি বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কতকগুলি বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। আবার কোন একটিমাত্র বিশেষ কারণই যে সকল খাবারের নামগুলির উৎপত্তিকারণ, তাহা নহে। কতকগুলি নাম উপকরণ এবং প্রস্তুতপ্রণালী হইতে উৎপন্ন; কতকগুলি নাম আকার ও গঠন হইতে উৎপন্ন; কতকগুলি নাম দেব দেবী ও খ্যাতিনামা ব্যক্তির নামানুসারে হইয়াছে; কতকগুলি নাম আস্বাদ বা গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। উদাহরণ দ্বারা আমার কথা ক্রমে স্পষ্ট করা যাইতেছে।

পান্তুয়া নাম হইল কেন? পানতুয়া নাম শুনিলেই সহসা মনে হয়, বুঝি জলপানের মিষ্টান্ন বলিয়া পান এবং জলার্থ তোয় শব্দ হইতেই পানতুয়া নাম আসিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা নহে; পানতুয়ায় যে রস, তাহাকে হিন্দীতে "পানিচাসনি" বা "পানিরস" বলে। পানি রস অর্থে যে রস ভাল করিয়া জ্বাল হয় নাই, যাহা অনেকটা জলীয় আছে। এই পানিরসে পানতুয়ার কোয়াগুলি ফেলা থাকে বলিয়াই পানতুয়া নাম হইয়াছে। জলে ভাত ভিজান থাকিলে তাহাকে যেমন পান্তা বা পান্ত ভাত বলা যায়, পানিরস হইতে সেই কারণে পানতুয়া নামও হইয়াছে। পান্তা, পান্ত, পান্তুয়া ইহারা প্রায় একই কথা। পশ্চিমভারতবাসীরা ওয়া' বা 'উয়া' অন্ত করিয়া কথা ব্যবহার করিতে বড় ভালবাসে;—যেমন ময়ূরকে "মোরোয়া" বলিবে, ক্ষেতকে "ক্ষেতোয়া" বলিবে, বঁধুকে "বঁধুয়া" বলিবে ইত্যাদি; পান্তুয়াও এই কারণে 'ওয়া' অন্ত শব্দ হইয়া থাকিবে। ইহা যে হিন্দী হইতে বঙ্গভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, পানিচাসনির পানি শব্দই তাহার প্রমাণ।

মানব জাতির মধ্যে প্রথম যখন জ্ঞানের উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, তখন হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত পশ্চিমভারত শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আহারশিল্পও ভারতের ঐ অংশেই প্রভূত উন্নতি লাভ করে। আহারবিষয়ে বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের নিকট বহুলপরিমাণে ঋণী। এই কারণে বাঙ্গলার অধিকাংশ মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য অনেক নাম হিন্দী এবং সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে "দুগ্ধকূপিকা" নামে যে একটি মিষ্টান্নের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পানতয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। পানতয়ার এবং দুগ্ধকূপিকার প্রস্তুতপ্রণালীর মধ্যে খুব সামান্য ইতরবিশেষই লক্ষিত হয়। ভাবপ্রকাশে দুগ্ধকূপিকা প্রস্তুত করিবার কালে ছানার সহিত তণ্ডুলচূর্ণ বা সফেদা মিশ্রিত করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু ছানার সহিত সফেদা দিলে মুচমুচে শক্ত হয় বলিয়াই আজকাল সফেদার পরিবর্ত্তে পানতয়াতে ময়দাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধকূপিকাগুলিকে ভাবপ্রকাশ ক্ষীরের পূর দিয়া "পূর্ণগর্ভা" করিতে বলিয়াছেন; এক্ষণে কিন্তু পানতয়ার ভিতরে ক্ষীরের পূরের পরিবর্ত্তে দুই একটি এলাচদানা দিয়াই অনেক সময়ে কায সারিয়া ফেলা হয়। দুগ্ধসঞ্জাত ক্ষীরের পূরই দুগ্ধকূপিকা নামের কারণ; কূপিকা অর্থে কোয়া; এমন কি, কোয়া শব্দই কূপিকা শব্দের অপভ্রংশ।

জিলিপি বা জিলিবিও হিন্দুস্থানী নাম। যেমন পানতয়া নামের কার পানিচাসনি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ জিলিবি নামও রসের না হইতে উৎপন্ন। জিলিবি "জ্বালাও" শব্দ হইতে উৎপন্ন। পানিচাসনি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে জ্বাল পাইলে, তবে তাহাকে "জ্বালাও চাসনি" বা "জ্বালাও রস" বলে। জিলিবির রস পানতয়ার রস অপেক্ষা "কড়া" বলিয়াই আঙ্গুলে লাগাইলে, সূতার ন্যায় উঠিতে থাকে; পানতয়ার পানিরসে কিন্তু তাহা হয় না। জ্বালাও শব্দ হইতে জ্বালাবি এবং ক্রমশঃ জিলিবি ও জিলিপি দাঁড়াইয়াছে। 'জ্বালাও' শব্দের মূলানুসন্ধানের জন্য আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না; ইহা সহজেই ধরা যায় যে, সংস্কৃত জ্বল ধাতুই "জ্বাল্", "জ্বালাও" প্রভৃতি শব্দের মূল।

সংস্কৃত ভাষায় জিলিবিকে কুণ্ডলিনী বলে।

"এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।" কুণ্ডলিনী নাম আকৃতি-বাচক। কুণ্ডলিনী বলে এই জন্য যে, ইহা কুণ্ডলাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করা হয়। আমাদের বঙ্গভাষাতেও "জিলিপির পাক" বলিয়া কথা প্রসিদ্ধ আছে।

হালোয়া বা হালুয়া এখনও বাঙ্গালীর খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পায়

নাই। বাঙ্গালীর হালোয়ার মধ্যে একমাত্র মোহনভোগই প্রচলিত। পশ্চিমে কিন্তু এই হালোয়া নামে নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত হয়। হালোয়ামাত্রই খুব পুষ্টিকর, ও গুরুপাক; পশ্চিমবাসীদিগেরই উপযুক্ত খাদ্য। পশ্চিমে যে হালোয়া একটি প্রধান মিষ্টান্ন বলিয়া গণ্য হয়, তাহার প্রমাণ মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারীদিগকে পশ্চিমে হালোয়াই বলে। শুনা যায়, গুরু নানক এবং তন্মতাবলম্বী শিখেরা হালোয়ার অনেক উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। শিখেরা হালোয়াকে অতিপবিত্রজ্ঞানে দেবপ্রসাদ বলিয়া থাইয়া থাকে। এই জন্যই উহারা হালোয়াকে কড়াপ্রসাদ নামে অভিহিত করে। কড়াপ্রসাদ অর্থে যে প্রসাদসামগ্রী কটাহে পাক হয়। হালোয়া নাম হইয়াছে হালোয়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতে। হালোয়া প্রস্তুত করিবার কালে হাতা দোলাইয়া দোলাইয়া অবিরত নাড়াই হইতেছে প্রধান কার্য্য; ঘণ্টা খানেক ধরিয়া অবিরাম নাড়িতে হয়, তবে হালোয়া প্রস্তুত হয়; এই হাতার দ্বারা নাড়াকে হিন্দীতে "হিলানা" বা "হেলানা" বলে। হিলানা বা হেলানা শব্দ হইতেই "হিলোয়া" বা "হেলোয়া" এবং ক্রমশঃ হালোয়া দাঁড়াইয়াছে। হিলানা এবং হালোয়া প্রভৃতি শব্দের মূলে সংস্কৃত হিল ধাতু বিরাজ করিতেছ। হিল্লোল, হলন প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি তুলনা কর।

বরফির উৎপত্তি হইয়াছে বরফ শব্দ হইতে; বরফ শব্দ পারস্য ভাষা হইতে হিন্দি ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। বরফি প্রস্তুত করিবার কালে রস জমিয়া শক্ত বরফের ন্যায় হইয়া যায় বলিয়া বরফি বলে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বরফ শব্দের মূল কি হইতে পারে। সংস্কৃত বৃষ ধাতু হইতে বরফ শব্দ আসা সম্ভব; তুষার বর্ষিত হয় বলিয়াই তুষারকে বরফ বলা সম্ভব। বরষ শব্দের 'ষ' খুব সম্ভব 'ফ'তে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দের শ, ষ ও স, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় ফতে পরিণত হয়; যথা, সংস্কৃত গ্রাস শব্দ ইংরাজীতে গ্রাস্প (Gresp) পারস্য ভাষায় গ্রেফ্ত, এবং জর্ম্মন ভাষায় গ্রিফ্ (Griff) হইয়াছে।

কিন্তু বরফ শব্দের মূল বৃষ ধাতুর সহিত যুক্ত থাকিলেও ক্রমে উহা অনেকটা সংহতিবাচক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈত্য প্রযুক্ত সংহত হওয়া অর্থাৎ জমাট বাঁধাই তুষারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তুষারের এই সঙ্ঘাত ধর্ম্মই বরফ শব্দের সংহতিবাচক হইবার কারণ। এক্ষণে দেখা যায়, জমাট-বাঁধা সংহত

লোকে কুল্পির বরফ, মালাই বরফ ইত্যাদি বলিয়া থাকে, এবং এই কারণেই এক শ্রেণীর মিষ্টান্নবিশেষের নামও বরফি হইয়াছে।

বরফ শব্দ পারসি শব্দ হইলেও, দূর য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে উহার অনুরূপ শব্দ দুর্লভ নহে। ইংরাজী ব্রীফ (Brief), ফরাসী ব্রেফ (Bref), লাটিন ব্রেভিস (Brevis) ইত্যাদি শব্দগুলি বরফ শব্দের সহিত সম্পূর্ণ একজাতীয় বলিয়া মনে হয়। ব্রীফ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শব্দগুলির অর্থ সংহত বা সংক্ষিপ্ত ; এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, বরফ শব্দও সংহতিবাচক। শব্দ এবং অর্থ, দুই হিসাবেই বরফ এবং ব্রীফ প্রভৃতি শব্দগুলিতে এতটা সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান যে, উহাদিগকে মূলে একজাতীয় বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারা যায়।

বোঁদে নামও হিন্দী নাম। প্রকৃত হিন্দী শব্দ বুন্দি ; বুন্দি আসিয়াছে সংস্কৃত বিন্দু শব্দ হইতে। এই খাদ্যসামগ্রীর আকার বারিবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু বলিয়া ইহাকে বুন্দি বলে। বুন্দির অর্থই বারিবিন্দু।

মতিচুর বলে এই জন্য যে ইহার বোঁদে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় দেখিতে ; মোতি অর্থে মুক্তা এবং চুর অর্থে চূর্ণ, অর্থাৎ গুঁড়া বা গুঁড়ার ন্যায় কোন কিছু।

রসগোল্লা, কাঁচা গোল্লা প্রভৃতি নামের কারণ উহাদিগের গোলাকৃতি চন্দ্রপুলি বলে, ইহা দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বলিয়া। পুলির বিষয় প৲ বলিব।

পেরাকি বা পেড়াকি নাম হইয়াছে, পেটক শব্দের অপভ্রংশ হইয়া। সংস্কৃত পেটক শব্দের অর্থ পেঁটরা ; পেঁটরার মধ্যে যেরূপ নানাবিধ দ্রব্যাদি পুরিয়া রাখা যায়, পেরাকির মধ্যেও সেইরূপ নারিকেলের ঝাঁই প্রভৃতি নানাবিধ পুর পুরিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই, ইহাকে পেরাকি অর্থাৎ পেটক বলে। পেরাকির গড়নও অনেকটা পেঁটরার মত।

শিঙ্গাড়া শব্দ সংস্কৃত শৃঙ্গাটক শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত শৃঙ্গাটকশব্দের প্রকৃত অর্থ পানিফল। পানিফলের তিন দিকে শৃঙ্গের ন্যায় কাঁটা আছে বলিয়াই শৃঙ্গাটক নাম। শিঙ্গাড়া এই পানিফলের আকারে করা হয় বলিয়াই, ইহারও নাম পানিফলের নামে রাখা হইয়াছে। সংস্কৃতেও ইহাকে শৃঙ্গাটক বলে।

"মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্‌গুরু।"

আকবর ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।

প্রথম প্রস্তাব।

আকবর সাহ কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। হিন্দু রাজসংসারের সহিত কুটুম্বিতা করাতে, তাঁহার রাজপরিবারস্থ হিন্দু ললনাগণের স্বধর্ম্মানুগত আচার ব্যবহারের ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না করাতে, অনেক সময় তিনি নিজে হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করাতে, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, আকবর সাহ হিন্দু মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রশস্ত ললাটে হোমাগ্নিসম্ভূত ভস্মের টীকা পরিতেন; মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিরামিষ খাদ্যের উপর নির্ভর করিতেন; নিজ অন্তঃপুরমধ্যে অগ্নির উপাসনায় সাদরে যোগ দিতেন; গঙ্গাজল পবিত্র ভাবিয়া, যখন যেখানে যাইতেন,—পানার্থে তাহা সঙ্গে লইতেন;—এই সমস্ত দেখিয়া অনেকের মনে হইত,—তিনি বাহিরে যে ধর্ম্মই মানিয়া চলুন না কেন, অন্তরে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন।

মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার সম্যক আস্থা ছিল না, ইহা সমসাময়িক ইতিবৃত্তকারগণের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। এক আবুল ফজল ও ফৈজি ব্যতীত আর সমস্ত ইতিবৃত্তলেখকই তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে জীবনের শেষার্দ্ধভাগে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, গোঁড়া বদৌনির ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় দূরে থাক্, তিনি তাহাদের আলোচ্য ভাষা আরবীর উপরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া, শেষ অবস্থায়, স্বীয় পাঠাগার হইতে আরবী পুস্তকগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপ্রচলিত "দীন-ইলাহি" বা "নূতন ধর্ম্মমতই" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তিনি এই মতের প্রচার করিয়া, মহম্মদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমান ব্যতীত আর এক সম্প্রদায় তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক "জেসুইট" মিশনারী। জাত্যংশে

ইহাদের অনেকেই পোর্ত্তুগীজ্। ইহারা যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা হইতেও প্রমাণিত হয়, আকবর সাহ খৃষ্টান ধর্ম্মেরও অপক্ষপাতী ছিলেন না।

এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আকবর সাহ তিন প্রকার ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন না। অবশ্য ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি সংগঠিত করিয়াছিল। কিন্তু আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই,—তিনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সারভাগের আলোচনা করিতেন, এবং যে ধর্ম্মের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য বোধ করিতেন, তাহা লইয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম "দীন-ইলাহি" এই সমস্ত সারোদ্ভূত ধর্ম্মের পরিণত ফলমাত্র।

বোধ হয়, সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভা লইয়া আকবরের ন্যায় কোন বিজাতীয় সম্রাট এই রত্নপ্রসূ ভারতভূমির একছত্র অধিকার লাভ, ও অপ্রতিহতপ্রভাবে তাহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আকবর সাহের জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তাঁহার বীরত্ব ও গৌরবময় সৈনিকজীবন; দ্বিতীয়তঃ, সাম্যনীতিমূলক আদর্শ সম্রাট জীবন; তৃতীয়তঃ, তাঁহার পরহিতকামনাপরিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন। এই তিন বিভাগেই তিনি শ্রেষ্ঠতার চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। এই তিন দিক্ দিয়া আকবরের চরিত্রের যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহার অমানুষিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তদীয় সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভার প্রশংসা করিতে হয়।

তাঁহার জীবনচরিত-প্রণেতা, তাঁহার সমসাময়িক ইতিবৃত্তকার, তাঁহার প্রিয় সহচর ও সুহৃদ ও চিরপ্রিয় আবুল্ ফজল্ তাঁহার চিত্র এরূপ বর্ণগৌরবে সমুজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, অনেকে তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এইরূপ প্রশংসাবাদের জন্য আবুল ফজলকে চাটুকার ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হইতে পারে, আবুল ফজলের কথিত বৃত্তান্তের কোনও কোনও অংশে পক্ষপাতের ছায়া আছে;—কিন্তু তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের বিশেষ কোনও অপলাপ হয় নাই। যেখানে কোন-না-কোন প্রকার অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত আছে,—একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই তাহার প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। বন্ধুত্বের, অনুগ্রহের,

বর্ণনা অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে তাহা শতবার মার্জ্জনীয় বলিয়া বোধ হইবে।

চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে উভয় পদার্থেরই শক্তিবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। ফৈজি ও আবুলফজল্ আকবরের দ্বারা যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজের আকর্ষণশক্তিও সম্রাটের উপর সেই পরিমাণে প্রয়োজিত করিয়াছিলেন। আকবরের নূতন ধর্ম্মমত,—এই আকর্ষণের অন্যতম ফল।

বাল্মীকি না হইলে রঘুকুলভূষণ রামের চরিত্র ফুটিত না;—ব্যাস না হইলে মহাভারতোক্ত বীরগণ প্রচ্ছন্ন থাকিতেন;—হোমার না থাকিলে ইলিয়ডের প্রচার হইত না; চাঁদকবি না থাকিলে পৃথ্বীরাজ ফুটিতেন না;—আবুল ফজল না থাকিলে আকবরের প্রকৃত চরিত্র আমরা দেখিতে পাইতাম না। সম্রাটের বংশধরগণের মধ্যেও যাঁহারা তাঁহার গুণাবলীর কিয়দংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হয় ত উপযুক্ত চিত্রকরের হস্তে তাঁহাদের চিত্র প্রতিফলিত হইবার উপায় ছিল না বলিয়া, তাঁহারা অন্য ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন।

আবুল ফজল ব্যতীত আরও কয়েক জন সমসাময়িক ঐতিহাসিক আকবরের সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বদৌনি সর্ব্বপ্রধান। বদৌনি আবুল ফজলের প্রধান শত্রু। আকবরও বদৌনিকে ক…ও স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। এরূপ স্থলে বদৌনির দ্বারা আকবরের চরিত্রচিত্র অতিদূষিতভাবে অতিরঞ্জিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আকবরের প্রতি বিশেষ অননুরক্ত এই বদৌনির রচনা হইতেই আবুল ফজলের লিখিত বৃত্তান্তের সম্যক সমর্থন হয়।

"আল্লাহো আকবর" দীন-ইলাহীর (আকবরের নূতন ধর্ম্মমতের) মূল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এই শব্দসমষ্টির অর্থ "ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ।" অন্য পক্ষে অর্থ করিয়া বলিতে গেলে, ইহাতে "আকবরই শ্রেষ্ঠ" এরূপও বুঝাইয়া থাকে। আবুল ফজলের মতে, আকবর সাহ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা তাঁহার অবতারস্বরূপ। ইহার সমর্থনার্থ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই,—"ঈশ্বরের চক্ষে কোন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিনায়কতাই সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ। ঈশ্বর এই মহাজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট,—পার্থিব সম্রাটেরও সম্রাটস্বরূপ। তাঁহার নিয়মে এই জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। তাঁহার সৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবের মধ্যে ন্যায়শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি পার্থিব

সম্রাট-পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। * * * ঈশ্বরের অনুমোদিত আদর্শ সম্রাটের চারিটি বিশেষত্ব চাই। প্রথম,—উদারতা ও প্রশান্তচিত্ততা; দ্বিতীয়,—ঈশ্বরের প্রতি দিন দিন উপচীয়মান ভক্তি; তৃতীয়,—প্রার্থনা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ;—চতুর্থ,—পুত্রবৎ বা আত্মবৎ প্রজাপালন। প্রথম গুণের কার্য্যকারিতাশক্তির বলে, সম্রাট, অসন্তোষকর কোনও বিষয়ে বা আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনায় চঞ্চল হইবেন না; অথবা প্রকৃষ্ট বিচারশক্তির অভাবে, কোনও বিশেষ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইলে নিরাশাপীড়িত হইবেন না। বিচারবিষয়ে তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করিবেন। দ্বিতীয়টির বলে তিনি ভাবিবেন, তৎকৃত কার্য্যগুলি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত;—তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা ঈশ্বরের কৃত ও বিনিয়োজিত; অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাতে নিযুক্ত করিতেছেন, রাজা তাহাই করিতেছেন। এই প্রকার কার্য্যে সাধারণের সহিত মতভেদবশতঃ কোনও প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইলেও, তাঁহার সেই কার্য্যের কোনও হানি হইবে না। তৃতীয়টির বলে তিনি জয়ে, পরাজয়ে, ঈশ্বরকে সমভাবে দেখিবেন; বিজয়োৎফুল্ল হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিবেন না; মনুষ্যের উপর কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিশ্বাস না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিবেন। বিচারশক্তির দ্বারা ইচ্ছাসমূহ পরিচালিত করিবেন। চঞ্চল হইয়া কার্য্যহানি করিবেন না। যাহার অর্জ্জনে কোনও ফল নাই, তজ্জন্য তিনি বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না। তিনি ক্রোধ ও অবিমৃষ্যকারিতার দমন করিবেন। অত্যাচারকে জ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করিবেন। বিচারকালে তিনি বিচারকস্বরূপ না হইয়া আপনাকে বিচারপ্রার্থীর ন্যায় বোধ করিবেন। অর্থী ও প্রত্যর্থীদের বৃথা আশায় প্রলোভিত করিবেন না। সত্য বাক্য, কঠোরতা ও কর্কশতায় পূর্ণ হইলেও, তাহা গ্রহণ করিবেন। তিনি নিজে অত্যাচার করিবেন না বটে,—কিন্তু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না; রাজ্যমধ্যে আর কেহ যাহাতে পরস্পরের উপর অত্যাচার না করে, এরূপ ব্যবস্থা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। * * * চতুর্থ বিধির প্রভাবে তিনি প্রেমে প্রজামণ্ডলীকে আবদ্ধ করিবেন। বিভিন্ন জাতির অধ্যুষিত বা বিবিধ ধর্ম্মসঙ্কুল প্রদেশের শাসনসময়ে বিশেষ সাবধান হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবেন যাহাতে তাঁহার নিজ-কৃত কার্য্যে, অথবা তাঁহার কর্ম্মচারীদের ব্যবহারদোষে, অযথা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয়।"

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বর স্বেচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কাহারও বা প্রজ্ঞা ও বিবেকশক্তি সমুজ্জ্বল,

আবার কাহারও বা তাহার বিপরীত। এই জন্যই ঈশ্বরের সৃষ্ট লোক-পুঞ্জের মধ্যে "দীন্" ও "দুনিয়া" লইয়া পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। কেহ বা "দীন" অর্থাৎ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া মুক্তিপথে চলিয়া যায়; আবার কেহ বা "দুনিয়া"-(সংসার)-অবলম্বনে তদ্বিপরীত পথের পথিক হয়। * * * * যখন সাধারণ মানবের সৌভাগ্যবশে এমন সময় উপস্থিত হয় যে, তাহার গুণে তাহারা সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখন তাহাদের দৃষ্টি সম্রাটের উপর পতিত হয়। সম্রাট্ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। সাধারণ মানবের অপেক্ষা সম্রাটের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রসারিণী; তিনি এই মর্ত্ত্যধামে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিচালক। তিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সাধারণ প্রজারও তদনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। * *"

আবুল ফজলের উল্লিখিত উক্তিগুলি সম্রাটের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও নির্ভরতার পরিচায়ক হইলেও, ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, আকবর সাহ নূতন ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কি প্রকার আদর্শ অধিনায়কত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা না বলিয়া, কি প্রকারে আকবরের রাজত্বকালে মহম্মদীয় ধর্ম্মের পতন ও তাঁহার নিজ-উদ্ভাবিত ধর্ম্ম "দীন্-ইলাহির" সম্যক পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব।

আকবরের মনুষ্যচরিত্রাংশ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই,—তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা সকল বিষয়ে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিশিষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগের সময়ে,—যে সময়ে রাজপুত্রেরা পঠদ্দশায়, বা ক্রীড়ামোদে আসক্ত হইয়া কালযাপন করেন,—আকবর সেই সময়ে সৈন্যদলের সঙ্গে রণরঙ্গে জীবন কাটাইয়াছেন।—তাহার পর, পিতার ক্ষীণহস্তস্খলিত, অদৃষ্টপরিবর্ত্তনসূচিত, অপহৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে, শান্তি ও সুশৃঙ্খলার স্থাপন করিতে, সেই কোমল কিশোর বয়সে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও শোণিতক্ষয় করিতে হইয়াছিল। যৌবনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াও তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। আত্মীয় ও সেনানায়কদের বিদ্রোহিতায় আকবর অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি বিজিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, দৃঢ়হস্তে সমস্ত ভারতে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সিংহাসনে বসিবার সময় কোনও প্রদেশই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল না;—কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি

হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ কৌশল করিয়া আক্‌বর সাহ তাঁহাদিগের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধস্থাপন ও সেই সম্বন্ধের সহায়তায় বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন,—এবং কার্য্যক্ষেত্রেও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, এই হিন্দুসংকুল ভারতবর্ষে মুলসমানের তরবারির সহায়তায় রাজ্যমূল সুদৃঢ় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। হিন্দুর প্রিয় হইতে হইলে, হিন্দুর সহানুভূতি লাভ করিতে গেলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্যনীতির অবলম্বনই প্রশস্ত পথ। বলদৃপ্ত, শৌর্য্যবীর্য্যময়, জাতীয় গৌরবের কেন্দ্রভূমি, সনাতন ধর্ম্মের প্রধান পরিপোষক রাজপুত জাতি তখন ভারতের জ্বলন্ত গৌরবস্বরূপ। রাজপুতের কেন্দ্রীভূত শক্তি এক মুহূর্ত্তেই হয় ত সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে পারে। কিন্তু সকল রাজপুতই ত অন্য রাজার মত নহেন। সকলেই ত ভিন্নধর্ম্মী যবন সম্রাটের করুণা-ভিখারী হইতে ইচ্ছুক নন। নানা দিক ভাবিয়া আকবর সাহ মিবারের মহারাজা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতাশালী রাজপুত রাজন্যগণের ও সামন্তবর্গের সহিত নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। কাহাকেও বা উচ্চপদ, কাহাকেও বা সেনানায়কত্ব, কাহাকেও বা স্বাধীন ক্ষমতাপ্রদান, কাহাকেও বা সাংসারিক বন্ধনে হস্তগত করিয়া, নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক করেন। এই দুর্ভেদ্য নীতির কূট মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে না পারিয়াই, ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে, বিহারী মল্ল, ভগবান দাস, মহারাজা মানসিংহ প্রভৃতি রাজন্যগণ যবনসংস্পর্শে আর্য্যগৌরব কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

রাজ্যের ভিত্তি যখন সুদৃঢ় হইল, তাঁহার রণদুন্দুভির গভীর নির্ঘোষে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শত্রুগণ যখন মহাঝটিকামুখে তৃণপত্রাদির ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন মহাপ্রতাপশালী আকবর সাহ আর এক দুঃসাধ্য কঠোর বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন।

এই কঠোর দুঃসাধ্য বিষয় আর কিছুই নহে,—প্রচলিত ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বিজেতার অধিনায়কত্বে এই শস্যশ্যামল, ফল-জল-ধনরত্নাদিপূর্ণ সনাতন ধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্রে, কতই না অত্যাচার অনাচারের অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মপ্রচারের ধুয়া ধরিয়াই ভারতের বহিঃশত্রুগণ, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভারতে ক্রমাগত মুসলমান অধিকারের ফলস্বরূপ এখানে একটি

স্বতন্ত্রগঠিত, পরাক্রান্ত মুসলমান জাতি সংগঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণ ইহাদের অধিনায়কত্ব করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষক, পরিচালক ও পরিপোষক এবং মহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারী, এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ নিযুক্ত ভক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এই বর্দ্ধিতপ্রতাপ ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ে, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক, উভয়বিধ অধিনায়কত্বে, মুসলমান সম্রাটদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে সম্রাটগণ অপ্রতিহত স্বাধীন ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা অত্রস্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ও ধর্ম্মজীবী কতকগুলি ব্যবস্থাপকের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। এই সকল ধর্ম্মনৈতিক ব্যবস্থাকারেরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বতোমুখ অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে বাদসাহের সহায়তা করিতেন। বাহিরে প্রকাশ থাকিত, বাদসাহ রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, উভয় বিভাগেরই নির্দ্ধারিত অধিনায়ক। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক মুসলমান ধর্ম্মাধ্যাপক বা "উল্‌মা"-গণ এ বিষয়ের সমস্ত ক্ষমতা আপনাদের হস্তেই রাখিয়াছিলেন।

বাহির হইতে দেখিলে তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রোপজীবী সম্প্রদায় বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিল না, এইরূপই বোধ হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখিতে পাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহেরা সময়ে সময়ে কৃতবিদ্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সম্পত্তিগুলির আয় হইতে বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান মুসলমান পণ্ডিতগণ কোরাণশাস্ত্রের উপদেশসমূহ পাঠার্থী বালকদের নিকট প্রচার করিতেন। এতদ্ভিন্ন কোনও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা মুসলমানসমাজসম্বন্ধীয় তর্ক উঠিলে, তাহাও এই পণ্ডিতদিগের দ্বারা মীমাংসিত হইত।

সম্রাটদিগের অনুগ্রহে সম্পত্তিবৃদ্ধির সহিত, সাধারণের সহানুভূতির সহিত, বড় বড় আমীর ওমরাহগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ প্রচুর সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজার উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্রাটের যেরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, পক্ষান্তরে এই সকল পণ্ডিতেরা আবার সমাজে সাধারণ প্রজার উপর ধর্ম্মনীতির বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতার পরিচালন করিতেন। এ পর্য্যন্ত বাদসাহগণ (হুমায়ুন পর্য্যন্ত) এই সমস্ত পণ্ডিত-আধ্যাধারীদের প্রশংসা করিয়াই আসিয়াছেন।

কিন্তু আকবর সাহ এইবার মনে মনে ইহাদের ক্ষমতার উচ্ছেদের কল্পনা করিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে এক দুরাশা জাগিয়া উঠিল যে, তিনি এই ধর্ম্ম-নৈতিক দলপতিগণকে ক্ষমতাভ্রষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যমধ্যে উভয়বিধ ক্ষমতাই আপনার হস্তে সংযত করিয়া রাখিবেন। কি প্রকার ঘটনাসূত্রে এই "উলমা" পণ্ডিতগণের মহাপতন সাধিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে সেই মহাপতনের ভিত্তির উপর আকবরের নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কি উদ্দেশ্যবশে আকবর সেই অভিনব ধর্ম্মমতের গঠনের জন্য পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণকে আপনার সভায় আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, আগামী বারে তাহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সুরবালা।

দশম অধ্যায়।

সুরবালার স্বামীর নাম আশুতোষ বসু। বাড়ী তাঁহার কুলগ্রামে। আশুতোষের পিতা ধর্ম্মদাস বসু এক জন বিষয়ী লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যে বিভব রাখিয়া যান, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে আশুতোষকে অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে হইত না। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান। ধর্ম্মদাস কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। পুত্রের প্রকৃতি বিপরীত। যে সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন আশুতোষের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর। সে আজি দশ এগার বৎসরের কথা। সুরবালার বিবাহ হইয়াছে পাঁচ বৎসরের উপর। সুরবালা আশুতোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আশুতোষ কুলীনসন্তান। প্রথমতঃ কুল করিবার নিমিত্ত এক পীড়িতা বা অর্দ্ধমৃতা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতে সে কেবল মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশুতোষের মাতার যত্নে এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসার গুণে সে কয়েক বৎসর মাত্র বাঁচিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর

বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিলেন। শরতের সহিত কৃষ্ণনগরে তাঁহার পরিচয় হয়। শরৎই এ বিবাহ স্থির করেন। শরতের মুখে আশুতোষের প্রশংসা না শুনিলে ভবতারণ তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষের বরে দিতেন না।

সুরবালার শাশুড়ী সে দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। বৈশাখ মাসে সুরবালা শ্বশুরবাড়ী যান তাঁহারই পীড়ার সংবাদ পাইয়া। সেই পীড়াই সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এবং গৃহিণী তাহাতেই প্রাণত্যাগ করেন। সুরবালা সেই হইতে শরতের বিবাহের সময় পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীতেই আছেন। এই আট দশ মাসের মধ্যে স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কেবল সেই প্রথমে যাহা ঘটিয়াছিল। আশুতোষ বাঁকুড়া জেলায় চাকরী করেন। পূর্ত্তবিভাগে তাঁহার কর্ম্ম। মাসিক ১২০৲ টাকা বেতন, এবং তদ্ব্যতীত পাথেয়প্রাপ্তি আছে। মাতার পীড়ার সংবাদে তিনি বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; এবং শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিলেন। শ্রাদ্ধের পর সকলেই ভাবিয়াছিল, আশুতোষ স্ত্রীকে হয় সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবেন; নয় তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি কিন্তু এ দুইএর একও করিলেন না। স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া আপনি বাঁকুড়ায় গেলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "আমি সেখানে পঁহুছিয়াই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া তোমায় নিয়ে যাব। তুমি এখানেই থাকে। যে বাসায় আছি, তা'তে পরিবার নিয়ে থাকা চলিবে না।" স্বামীর আদেশ রমণীর শিরোধার্য্য ভাবিয়া সুরবালা বাড়ীতেই রহিলেন। আশুতোষের বাসা কিন্তু আজিও ঠিক হয় নাই; অথচ প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সুরবালাকে আশুতোষ কাহার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন? বাড়ীতে কেবল একটি মাত্র বুড়ী ঝি; সে আশুতোষের পিতার আমল হইতে কর্ম্ম করিতেছে। তাহার নাম বামা। বামার বয়স এখন বার তের পণ্ডা হইবে। সে তাহার বয়স এইরূপই বলিত। আশুতোষকে সে হইতে দেখিয়াছে। আর আছেন বাড়ীর অতি নিকটে—এক বাড়ী বলিলেও চলে,—আশুতোষের এক পিতৃব্যপুত্র; তাঁহার নাম বিপিনবিহারী বসু। বিপিনের বাড়ীতেও তাঁহার এক যুবতী স্ত্রী সরোজিনী ভিন্ন আর কেহই নাই। বিপিন বাড়ীর নিকটেই এক মহাজনের গদীতে কর্ম্ম করেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই তাঁহাকে সেই গদীতে যাইতে হয়, এবং কাজের জন্য তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন প্রায়ই

স্নেহ গদীতেই হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে বিপিন বাড়ীতে আসেন। সুতরাং দিনের বেলা সাধারণতঃ বামাই দুই বাড়ীর দুটি বধূর একরূপ রক্ষয়িত্রী।

বামা উপযুক্ত রক্ষয়িত্রী বটে। পৃথিবীতে বামার আপনার বলিতে কেহই নাই। এই যেন তাহার বাড়ী। সুরবালা এবং সরোজিনী তাহার কন্যা হইলেও, বামা অধিক যত্ন এবং স্নেহ দেখাইতে পারিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বামা যদিও সুরবালার বাড়ীর ঝি, তথাপি সে সরোজিনীকে পর ভাবিত না। সরোজিনী এবং সুরবালা উভয়েই তাহাকে সম্ভ্রম দেখাইতেন। কথনও চাকরাণীর ন্যায় মনে করিতেন না।

ফলতঃ এই পরিবারে বামার মূল্য বড় অধিক ছিল। ঝি ভাল হইলে অনেক সময়েই তাহার দ্বারা পুরুষ চাকর অপেক্ষা অধিক কাজ হয়। কেন না, সে কেবল স্ত্রীজনোচিত কাজ করে, তাহা নহে; অনেক পুরুষোচিত কার্য্যেও তাহার অধিকার। বাহিরে কোন লোক আসিলে বামাই তাহার অভ্যর্থনা করে। বাজার হাট ত সে চিরকাল করিয়াছে। এ ছাড়া বামার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সে তাহার মিষ্ট কথায়। কুলগ্রামের এবং তন্নিকটবর্ত্তী দু চারি গ্রামের অনেক লোকই বোসেদের বাড়ীর বামা ঝিকে জানিত।

বামা সকাল বেলা বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে দুটি পয়সা হাতে করিয়া। বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাজারে যাইতেছে। বামা দেখিয়া কহিল, "দাদা বুঝি বাজার যাচ্ছ? আমার এই দুটি পয়সা নে যাও দাদা, দু পয়সার মাছ এনো; যাবার সময়ে এখানে ফেলে দে যাবে। দাদার মুখখানা আজ কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি।" "আর বোন্, আজ ক'দিন কেমন অসুখ করেছে, শরীরটা একবারেই ভাল নাই।" বলিয়া নরোত্তম পয়সা দুটি লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কখনও বামা একখানি কুঠার হস্তে বসিয়া আছে; শ্যামাচরণ রাস্তা দিয়া যাইতেছে। বামা বলিল, "শ্যাম, বাবা, ধর ত এই কুড়ুলখানি; আমার এই বাঁশটায় একটা কোপ দিয়ে দাও। তোমার হাতের কতক্ষণের কাজ লক্ষ্মী বাপ আমার?" শ্যাম হৃষ্ট অন্তঃকরণে আপনার কাজ ভুলিয়াও বামার কাঠ করিয়া দিয়া গেল।

বাহিরের কাজ যা কিছু, বামাই করে, বা এইরূপে অন্যকে দিয়া করাইয়া লয়। ভিতরের সমস্তই প্রায় সুরবালা করেন। রন্ধন প্রত্যহই তাঁহাকে করিতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য গৃহকর্ম্মও তিনি বৃদ্ধাকে বড় করিতে দেন না। সুরবালার সাংসারিক অবস্থাও বড় ভাল নহে। মাতার শ্রাদ্ধের সময়ে

আশুতোষ বাড়ীতে নগদ টাকা কিছুই রাখিয়া যান নাই। বাঁকুড়ায় যাইয়া অবধি তিনি স্ত্রীকে এক পয়সাও পাঠান নাই। সুরবালা টাকার জন্য স্বামীকে বিরক্ত করিতে চাহিতেন না। আশুতোষ অনেক সময়ে পত্রের জবাবও দিতেন না। মধ্যে মধ্যে সুরবালার মাতা কিছু কিছু পাঠাইতেন। সুরবালা তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ সংসার চালাইতেন। একমাত্র বামা ভিন্ন সুরবালার সাংসারিক অসচ্ছলতা অন্য কেহ জানিতে পারিত না। এমন কি, সরোজিনীও তাহা জানিতেন না। বামা মধ্যে মধ্যে বলিত, "লিখে দাও না—আর এমন করে চলে না।" সুরবালা বুঝাইতেন, তাঁর সেখানে খরচ বেশী, তাই টাকা পাঠাতে পারেন না। মা'র ব্যারামের সময়ে বোধ হয় অনেক টাকা ধার করে এনেছিলেন, তাই শুধ্‌তে হচ্ছে। আমাদের যা হ'ক একরকম্‌ চলে যাচ্ছে।

এইরূপে সুরবালা এক ভাঙ্গা বাড়ীতে একটিমাত্র চাকরাণী লইয়া বাস করেন। বাড়ীটি পুরাতন; অনেক দিন মেরামত হয় নাই। বাহিরের পূজার দালানে অনেক স্থানে গাছ গাজাইয়া গিয়াছে। যত দূর হাতে লাগাল পাওয়া যায়, বামা তত দূর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। ভিতর বাড়ীরও অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী রমণী দেবতা। পতিভক্তি এবং আত্মত্যাগে তিনি অতুলনীয়া। সুরবালা অনেক দিন এক বেলা রাঁধিয়া দু বেলা আহার করেন। কখনও কখনও ব্যঞ্জনহীন অন্নেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাঁহার পিতামাতাকেও তিনি কখনও এ সংবাদ জানিতে দেন নাই।

শরতের বিবাহের সংবাদ পাইয়াই সুরবালা পিতৃগৃহ যাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিয়া স্বামীকে এক চিঠি লিখিলেন। আশুতোষের তাহাতে আপত্তিই ছিল না। বাড়ীর কোনও তত্ত্বই লইতে হইবে না ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনি স্ত্রীর প্রার্থনার অনুমোদন করিলেন। বামাকে লইয়া সুরবালা বাজিতপুর গেলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বাজিৎপুরের ঘোষেদের বাটীতে বহুকাল ধরিয়া দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। যদুপতির আমল হইতেই পূজার ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ভবতারণের সময়ে অতি সমারোহের সহিত পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে এ পূজায় আমোদ অপেক্ষা আহারের আয়োজন অধিক। পল্লীগ্রামের হিন্দুর বাড়ী পূজা;—ইহাতে সাহেবী ভোজ বা নাচের বন্দোবস্ত নাই। আর ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যের প্রতি ভার দিয়া গৃহস্বামী বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বিদেশে যান না। ভবতারণের বাটীতে পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত।

বিজয়ার পরদিন সর্ব্বপ্রথমে যে অর্থ হস্তগত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পূজার জন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজন চলে। পূজার সময়ে আন্তরিক ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, এবং দরিদ্রের সেবা হইয়া থাকে। পূজার তিন দিন ধরিয়া ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ, উভয়ে প্রভাত হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অনাবৃতচরণে কেবল বাড়ীর এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং আহূত ও অনাহূত সমস্ত ব্যক্তিকেই উপযুক্ত সমাদর দেখাইয়া আহারাদিতে পরিতুষ্ট করেন। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক আহার, এবং অর্দ্ধ সহস্র লোক এক এক খণ্ড নূতন বস্ত্র পাইয়া থাকে।

শরতের বিবাহের পরবর্ত্তী পূজার সপ্তমীর দিনে সকাল বেলায় পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূজার দালানে এবং প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন। ঘোষেদের বাড়ীর নিয়ম এই যে, সপ্তমীর দিনে ব্রাহ্মণ, অষ্টমীর দিনে কায়স্থ, এবং নবমীর দিনে অন্ত্যজাতি ও কাঙ্গালী আদির আহার হইয়া থাকে। বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে একখানি পাল্‌কী আসিয়া সদর দরজায় নামিল। সদর দরজার সম্মুখে এক পার্শ্বে পূজার দালান। বাহিরের প্রাঙ্গন হইতে সদর দরজা দেখা যায়। পালকী হইতে একটি পুরুষ ও একটি যুবতী নামিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই বাটীর ভিতর হইতে ভবতারণ এবং বাহিরের দিক হইতে প্রেমচাঁদ আসিয়া সদর দরজার সম্মুখে সম্মিলিত হইলেন।

প্রেমচাঁদ কহিলেন, "দাদা, হ'ল কি?"

ভব। হবে আর কি? কালের গতি!

প্রেম। বেহারা ব্যাটাদের জিজ্ঞেস কল্লুম—পাঠিয়েছি দু পাল্‌কী; তোরা এক পাল্‌কীতে আন্‌লি কেন? তারা বলে,'আমরা কি কর্‌ব? ছোট বাবু বল্লেন, 'এক পাল্‌কীতে দু জন যাব। দু পাল্‌কীর বেহারা এক পাল্‌কীতে ষ্টেশনে পড়ে থাক্,—এর পর কেউ এলে তাকে নিয়ে যাবি। তোদের আর পাল্‌কী বহে আন্‌তে হবে না।' এক পাল্‌কীতে আস্‌বি, এসে না হয় খিড়কীর দোরে নাব্; তা না, আজ একটা ব্যাপারের দিন, বাড়ী পোরা লোক, ও এসে নেবে পড়ল সদর দরজায়। আর বউ ত বিবি। না আছে ঘোম্‌টা, না আছে একটু সঙ্কোচ-ভাব,—অথচ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী আস্‌ছেন।

ভব। তুমি এখানে ঐ দেখেচ; বাড়ীর ভেতরে আবার ওর উপর। আমার মাথা ঘুরে গেছে। দু জনে হন্ হন করে গিয়ে উপরে উঠ্‌ল। বউমার ইচ্ছাটা

যেন শরতের হাত ধরেই বরাবর যান। শরতের সাহসে ততটা বোধ হয় কুলোয় নি। মেয়েরা সকলেই এ দিকে ও দিকে বসে ;—না কাউকে নমস্কার করা, না একটু থামা। উপরে উঠে শুনলুম, একটা চাকরাণী বউমার গায়ের কাপড় খুলে দিয়ে বাতাস কচ্ছে। শরৎ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা উপরে যারা গেছে, দেখে শুনে সব ফিরে এসেছে।

প্রেম। বাহিরের ব্রাহ্মণ যাঁরা দেখেছেন, সব হাঁ করে বসে আছেন।

ভব। হাঁ করে থাক্‌বারই কথা। এ ত আর দেখেন নি!

প্রেম। এখন এর ওষুধ কি?

ভব। ওষুধ আর কি? তোমার ইচ্ছে হয়, কিছু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ্‌তে পার। ছেলেবেলা থেকেই ত তোমার কথা শোনে। আমি কিছু বল্‌ব না।

প্রেম। আপনার ঐ বুদ্ধিতেই এটা ঘটেছে। আপনি বাধা দিলে কি এত হত?

ভব। তা না হতে পার্ত্ত। কিন্তু আমি কোন দিনই সে রকম চলি নি। ওর ইচ্ছা হয়,—করুক। আমি আর এক যায়গায় বে দিলে ওর মনে ভাল বোধ হ'ত না। মুখে কিছু বলুক না বলুক, মনে মনে বল্‌ত,—বাবাই আমাকে এই করিলেন। কাজ কি ভাই? মানুষ করিবার করেছি, লেখা পড়া শেখাবার শিখিয়েছি। এখন ওর বয়স হয়েছে, আক্কেল বুদ্ধি হয়েছে, কাজ কি ওর ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে। উনি রোজগার করে এনে দু পয়সা দেবেন, সে প্রত্যাশা করি না। নিজে ভাল হন, সুখে থাক্‌বেন; না হন, কষ্ট পাবেন; ও যাই করুক, আমি কখনও ওকে মন্দ দেখিব না। ও কখনও বল্‌তে পারবে না যে, বাবা আমার উপর অন্যায় করেছেন। যাই, একবার বাইরে দেখিগে।

প্রেমচাঁদ মনের আবেগে কোনও কথা কহিলেন না। ভবতারণের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন, "দাদা! ধন্য তুমি। তোমার মনে কষ্ট কোন দিনই হ'বে না। শরৎ! এমন বাপ সংসারে ক' জনের আছে?"

শ্যামাচরণের অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিলেন। দু এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই একটি তসর-সুতি-পরিধানা অর্দ্ধবয়স্কা অপরিচিতা স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "এদের বাড়ীর চাকর বাকর কথা (১)?

(১) কোথা?

প্রেমচাঁদের মন ভাল ছিল না। তিনি কহিলেন, "তুমি বুঝি কলকাতা থেকে এসেছ ?"

স্ত্রী। হাঁ বটে।

প্রেম। চাকর কি করবে ?

স্ত্রী। বাজারকে যাবেক সাবান আন্‌তে, দিদিমণি গা ধবেক। (১)

প্রেম। তুমি যাও না কেন ?

স্ত্রী। আমি কি আপনার দেশের বাজারকে গেছি ? চিন্‌বো ক্যাণে।

প্রেম। জিজ্ঞেস করে যাও।

স্ত্রী। আপনি কে বট। কথার জবাব দিবেক নাই।

প্রেম। আ মলো। বল গিয়ে তোর দিদিমণিকে এ দেশে সাবান নাই।

স্ত্রী। তুমি কে বট ? তোমার কি তোয়াক্কা রাখি। যাই দিদিমণিকে বলি গিয়ে এখানে থাকা আমার পোষাবেক নাই।

এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটি গন্ গন্ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। সে রূপবতীর ঝি, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহা বলার প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, ঝি প্রেমচাঁদ অপেক্ষা বেশী চটিয়াছে।

ঝির স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেমচাঁদের পরিচ্ছদ দেখিয়া সে তাঁহাকে বাড়ীর 'কর্ত্তাপক্ষীয়' কেহ বলিয়া মনে করে নাই। প্রেমচাঁদের পায়ে চটি জুতা পর্য্যন্ত ছিল না ; গায়ে জামা নাই ; কেবল পরিধান একখানি ধুতি আর তাঁহার চেহারাও ঠিক বাবুর মত নহে। ঝির অপরাধ বড় বেশী নাই।

পরমপূজ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন কলিকাতার রাস্তায় এক ঝি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটির ধূলা কিঞ্চিৎ উড়িয়াছিল বলিয়া, এক তসর-পরা তাগা-হাতে ঝি কহিয়াছিল,—"উড়ে বামুনের রকম দেখ।"

হয় ত সে পদধূলি ঝিএর মনিব ভক্তির সহিত মস্তকে লইতেন,—কিন্তু ঝি তাহা জানিবে কি প্রকারে ?

তাই বলিতেছিলাম, এ স্থলে ঝির অপরাধ অধিক নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা হইয়া গিয়াছে। আজি বিজয়া। শরৎ এবার

(১) ধুইবেক।

পূজার ক'দিন প্রায়ই ফাঁকে ফাঁকে কাটাইয়াছেন। পূজার দালানের ধার দিয়াও যান নাই। লোকজনের আহারের সময় কখন কখন নীচে আসিয়াছেন মাত্র। বিজয়ার দিন বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। প্রতিমা অনেকক্ষণ বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর পুরুষ সকলেই বিসর্জ্জনের নৌকার সঙ্গে গিয়াছেন। শরৎ প্রতি বৎসরই ভাসানের সময় নৌকায় যাইয়া থাকেন। এবার যান নাই। উপরের একটি ঘরে বসিয়া "স্ত্রীর সহিত কথোপকথন" করিতেছেন। সুরবালা আসিয়া হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছোট্ দা'! ভাসান দেখ্‌তে যাবে না?" শরৎ বলিলেন, "না।" সুরবালা চলিয়া গেলেন।

শরৎ রূপবতীতে কথাবার্ত্তা যেরূপ চলিতেছিল, আমরা নিম্নে তাহার একটু নমুনা দিলাম।

রূপবতী কহিলেন, "আমি কিছুতেই থাক্‌ব না। তোমার সঙ্গেই যাব।"

শ। আমারই কি ইচ্ছা তোমাকে রেখে যাই? কিন্তু মাঘ মাস পর্য্যন্ত তোমার এখানে থাক্‌বার কথা।

রূ। এ দেশে মাঘমাস পর্য্যন্ত থাক্‌তে গেলে আমি মারাই যাব। আর আমি কি একলা থাক্‌ব? ঝি কিছুতেই থাক্‌বে না।

শ। ঝিএর রাগ পড়ে নি? বলিছি ত, কলিকাতায় গিয়েই ওকে একখানা ভাল গরদ কিনে দেব।

রূ। তা' ত দেবে? যে অপমানটা হয়েছে ওর তোমার বাড়ীতে এসে।

শ। আমার বাড়ী, তোমার বাড়ী নয়?

রূ। আমার বাড়ী হবে,—যদি কখনও কলিকাতায় বাড়ী কর, তা হলে। বাপ্, এই দেশে আবার বাড়ী—এত বড় একটা বাড়ী করেছে, এর ওপরে একটা পায়খানা নাই।

শ। সেকেলে বাড়ী আমাদের—

রূ। সব সেকেলে, শুধু বাড়ী কেন? হাজার কল্‌কাতায় যাও আর যেখানে যাও, পাড়াগেঁয়ে ভাব তোমাদের যাবে না।

শ। আমি কল্‌কেতাতেই বাড়ী করব।

রূ। না করলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। বাবা, এ দেশেও মানুষ থাকে। সব অসভ্যের একশেষ। আমাকে দেখ্‌লেই হাসে—ছোট ছোট মেয়েগুলো পর্য্যন্ত। আমি যেন ঠিক আলিপুরের বাগানের এক জানোয়ার।

শ। আমি তোমাকে নিয়েই যাব?

রূ। না নিয়ে গেলে রক্ষে থাক্‌বে না। ঝি সেই দিনই চলে যেত। আমি কত বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখেছি। গুম্‌রে গুম্‌রে মচ্ছে। কত আহ্লাদের ঝি ও জান? ও আমার মাকে বাপান্ত করে।

শ। দূর! অমন কথা বল্‌তে নাই।

রূ। বল্‌তে নেই কি? আদুরে ঝি ঐ ক'রে থাকে। তোমরা ত কখনও ঝিএর মুখ দেখনি। আছে কেবল কতকগুলো ছোটলোক চাকরাণী,—চাঁড়াল, বাগ্দী,—এই সব।

শ। তা যা'ক গিয়ে। কি বলে তোমায় নিয়ে যাওয়া যায়?

রূ। কেন, বল না যে মা'র অসুখ করেছে—চিটি পেয়েছ—

শ। মিথ্যে কথাটা বল্‌ব?

রূ। কি সত্যপীর রে!

শ। দেখা যা'ক। বোধ হয় অমনই হবে।

বস্তুতঃ নববধূর আচরণে বাড়ীর সকলেই এমন বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, শরৎ তাহাকে রাখিয়া গেলেই তাঁহারা বিপদ মনে করিতেন। সুতরাং শরতের মিথ্যা কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি স্ত্রীকে লইয়া যাইবেন, এ কথা জিহ্বাগ্রে আনিলেই সকলে অনুমোদন করিতেন। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল।

শরৎ এবং রূপবতীর কথোপকথন হইতে হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। প্রতিমাবিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। সকলেই বাড়ী ফিরিয়াছে। নমস্কার এবং কোলাকুলির ব্যাপার চলিতেছে। ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই নমস্কার পাইতেছেন, এবং ভৃত্যদিগকেও কোল দিতেছেন। প্রেমচাঁদের মাতা পূজার দালানের নিকটে ধান্য দূর্ব্বা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সকলে যাইয়া নমস্কার করিতেছে। বৃদ্ধা তাহাদের মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভবতারণের স্ত্রীও অনেকের পূজনীয়া। তিনি বাটীর মধ্যেই আছেন,—পাড়ার অসংখ্য ছেলে আসিয়া তাঁহাকে কেহ জ্যেঠাইমা, কেহ কাকীমা, কেহ ঠাকুমা বলিয়া নমস্কার করিয়া যাইতেছে। শরৎ কিন্তু নীচে আসেন নাই।

সুরবালা উপরে যাইয়া কহিলেন,—"ছোড়দা, তুমি কাউকে নমস্কার করবে না?" শরৎ উত্তর করিলেন, "না, আজ না।"

সুর। সে কি?

শর। তুই যা না।

সুরবালা আসিয়া তাহার ছোট ঠাকুরমার কাছে কহিল যে, শরৎ উপরে রহিয়াছেন, এবং নীচে আসিবেন না।

বৃদ্ধা ছুটিয়া উপরে গেলেন, এবং শরৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওরে আমাদের পায়ে গড় কল্লে তোর বিবিরই অপমান হবে। তোর ত না হতে পারে। এই সন্ধ্যার পর তুই কি বলে ওপরে বসে আছিস্। আজকের দিনে বাড়ী পোরা লোক,—তুই ওপরে। আর আর বছর ত পাড়ার সব বুড়ো বুড়ীদের নমস্কার করে আস্‌তিস্। বাড়ীর লোকে অপরাধ করে থাকে, না হয় তাদেরই নমস্কার করে আয়।"

শর। আমি আজ বেরুব না।

প্রেমচাঁদের মাতা। কি দুর্লক্ষণের কথা। আজ বৎসরের একটা দিন—তুই না হয় নীচে গিয়ে বসে থাক্।

শর। যাও না তুমি, আমি যাব না।

ভবতারণ বাহিরে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলেই নমস্কার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরৎ আসেন নাই। শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ কোথায়?"

শ্যামাচরণ ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন, এবং সুরবালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে উঠিলেন।

সুরবালা সঙ্গে চলিলেন, এবং শরৎকে ডাকিয়া কহিলেন, "বড়দা উপরে যাইতেছেন।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "শরৎ! বাবাকে নমস্কার কর নি?"

শর। না।

শ্যামা। কেন?

শর। দরকার হয় কাল করব। আজ্ না।

শ্যামা। সে কি? আজি সকলেই নমস্কার কচ্ছে। যাও, নীচে যাও, বাবা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন।

শর। এ কি একটা কথা যে, আজ না কল্লেই হবে না। মা বাপকে নমস্কার করা যে দিন ইচ্ছা কল্লেই হল।

এই সময়ে নীচে হইতে শরতের মা আসিলেন, এবং শরতের শেষ কথাটি

শুনিয়া কহিলেন, "তোমার নমস্কার করবার দরকার নাই। একটু এগিয়ে এস, আমি দুটো ধান দূর্ব্বা মাথায় দিয়ে যাই।"

শর। না, ধান দূর্ব্বা মাথায় দিতে হবে না। অমনই আশীর্ব্বাদ কর মনে মনে।

মাতা। আজিকার দিনে সকলেই মাকে নমস্কার করে।

শর। তা করুক, আমি করবো না।

শরতের মাতা একটু অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"আমি এই ধান দূর্ব্বাটা মাথায় দিয়ে যাই।"

শর। ও মাথায় দিলে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব।

শরৎ মনে মনে কহিলেন, এ প্রথার প্রশ্রয় দিব না।

শরতের জননী সেই ধান দূর্ব্বাগুলি হস্তে লইয়া কহিলেন, "কি আর বল্‌ব? তোমার যেমন বুদ্ধি হয়েছে, তাই কর। মা দুর্গা জানিবেন—এতে যেন তোমার কোন অমঙ্গল না হয়। আজকার দিনে সকলেই মা বাপের আশীর্ব্বাদ নেয়।"

শরৎ অচল অটল,—মনে মনে কহিতেছেন, পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিব না। ইহার পর দিনই শরৎ সস্ত্রীক কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাটীর কেহ কোন আপত্তিই করিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বামা বলিল, "এ এক রকম গায়ে পড়ে যাওয়া।"

পূজার পর সুরবালা শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাঁকুড়ায় যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আশুতোষকে দুই তিন পত্র লেখা হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার উত্তরই দেন নাই। বাসা প্রস্তুত হইয়াছে কি না, সংবাদ জানিবার জন্য পত্রে জিজ্ঞাসা ছিল; আশুতোষ তদ্বিষয়েও কোন কথা কহেন নাই। ফলতঃ নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিবার কথা ছলনামাত্র। আশুতোষ পূর্ব্ব হইতে যে বাসায় থাকেন, তাহাতেই পরিবার লইয়া থাকিবার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তিনি এ কথা বাড়ীতে জানিতে দেন নাই। বামা কোনওরূপে জানিতে পারিয়া সুরবালাকে ইহা কহিয়াছে। সুরবালা বাঁকুড়ায় যাইবার জন্য অধীর হইয়াছেন। এ ভাবে যাওয়ায় বামার সম্মতি ছিল না, তাই সে সুরবালার কথা শুনিয়া বলিল, "এ এক রকম গায়ে পড়ে যাওয়া।"

সুরবালা কহিলেন, "পরের কাছে যেতে গেলে ও কথা খাটে। আমি ত আর পরের বাড়ী যাচ্ছি না।

বা। আদর না থাক্‌লে আপনার বাড়ী পরের বাড়ীর চাইতেও খারাপ।

সু। ঝি, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। এখানে দুধে ভাতে খাবার চাইতে সেখানে যেয়ে যদি আমি না খেয়ে থাকি, সেও ভাল। তুমি ত বলছ সেখানে ঘর আছে; যদি ঘর না থাক্‌ত, তা হলেও আমি যেতাম। সেখানে যেয়ে তাঁর কাছে গাছের তলায় থাকি, সেও ভাল।

বা। তাঁর কাছ পেলে ত হতই, তিনি যে তাঁতে নাই।

সু। তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু তিনি ভাল হলেও আমার, মন্দ হলেও আমার। তাঁর ভাল মন্দে আমার যত আস্‌বে যাবে, এত পৃথিবীতে কারও নয়। আবার যদিই তাঁর কোনরূপ মতিভ্রম হয়ে থাকে, তা শোধরাতে আমি যেমন পারব, এমন সংসারে কেউ পার্‌বে না।

বামা এতক্ষণ তর্ক করিতেছিল, এই বার তাহার মন গলিল। সে কহিল, "ধন্য মেয়ে তুমি—ভগবান তোমার মনের দুঃখ দূর করিবেন। চল, আমি তোমাকে নিয়ে যাই বাঁকুড়ায়।" সুরবালাও এতক্ষণ বামাকে বুঝাইতেছিলেন। এইবার তাহার সহানুভূতি পাইবামাত্র চক্ষে জল বাহির হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"সেখানে যাই—লোকে জান্‌বে আমি আমার স্বামীর কাছে আছি—তাঁরও নিন্দা হবে না—আমারও মনের কষ্টের লাঘব হবে।"

বস্তুতঃ স্ত্রীর কোন সংবাদ না লওয়ায় লোকে আশুতোষকে অতিশয় নিন্দা করিত। সুরবালার ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার জন্য স্বামী নিন্দার ভাজন হইতেছেন, ইহাই ভাবিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। এরূপ চিন্তাও তাঁহার মনে আসিত যে, বাঁকুড়ায় গেলে স্বামী যদি আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন, তাহা আমি লোককে জানিতে দিব না। আমার আপনার লোক ত কেহ জানিতেই পারিবে না। সেখানকার কেহ জানিলেও তত আসে যায় না। তাহারা ত সকলেই অপরিচিত। সুরবালার এইরূপ চিন্তা অস্বাভাবিক নহে।

সংসারে সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতীকারের আশা না থাকিলে মানুষ সাধ্যমত আপনার দুঃখ বা অবমাননার বিষয় অন্যকে জানিতে দিতে চাহে না। অনেক সময়ে অন্যে জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষের মনে কষ্ট অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই

মনে এই ভাব সমান দেখা যায়। একরূপ লজ্জা যেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। আমি অন্যের উপহাসের বা সহানুভূতির সামগ্রী হইব, ইহা কেহই ইচ্ছা করে না।

শিশু আপন মনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আপন দোষে আঘাত পাইল; নিকটে কেহ না থাকিলে হয় ত গ্রাহ্যই করিল না। গা ঝাড়িয়া পুনরায় দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেমন সে আঘাত পাইয়াছে, অমনি জননী আসিয়া দেখিলেন, কহিলেন, আহা বড় লেগেছে—বালক তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া উঠিল। যুবক অসাবধানতায় অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। উঠিয়াই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অন্য কেহ দেখিল কি না? যদি কেহ না দেখিয়া থাকে,—ধূলা ঝাড়িয়া অমনি অশ্বে উঠিলেন; কিন্তু মানুষ কাহাকে দেখিতে পাইলেই লজ্জা ও কষ্টের একশেষ হইল। অথবা বঙ্গের কোন দরিদ্র বৃদ্ধ প্রজা অত্যাচারী ভূস্বামী কর্ত্তৃক অল্প কারণে বা অকারণে নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত হইল। প্রহারান্তে সে পাদুকাপৃষ্ট পৃষ্ঠদেশে বা রুধিরাক্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিল, দর্শকমণ্ডলীমধ্যে তাহার পরিচিত লোক কেহ আছেন কি না। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রত্যেক স্থলেই অপরিচিত অপেক্ষা পরিচিত লোকের উপস্থিতি সমধিক অসহনীয় হইয়া থাকে।

স্বামীর অবজ্ঞা যে স্ত্রীলোকের মর্ম্মান্তিক ক্লেশের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অন্যের নিকট জ্ঞাপন করিলে ইহার প্রতীকারের আশা নাই। সুতরাং সুরবালা যে ইহা যত দূর সাধ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? ফলতঃ তিনি সংকল্প করিলেন, সেখানে যাইয়া স্বামীর স্বভাব শুধরাইতে চেষ্টা করিব। যদি জগদীশ্বর আমার সহায় হন, তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হয়, তবেই দেশে ফিরিব; নচেৎ আর আপনার জন কাহারও কাছে মুখ দেখাইব না।

সুরবালা! তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। যদি মানুষের চরিত্রপরিবর্ত্তনে মানুষের কোন শক্তি থাকে, তবে তাহা তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণীর আছেই।

বামার মত হওয়াতে সুরবালা আনন্দিতা হইলেন। এক্ষণে যাইবার কথা। বামা আর সুরবালা বাঁকুড়ায় যাইতে পারেন না। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়-কাম হইলে উপায়ের জন্য ভাবিতে হয় না। কালিদাস কহিয়াছেন যে, স্থির-নিশ্চয় মন আর সমুদ্রগা স্রোতস্বতী, ইহাদিগকে কেহই বাধা দিতে পারে না। সুরবালা স্বামিসদনে যাইতে কৃতসংকল্পা। ইহাতে প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে কেন?

এই সময়ে সরোজিনীর ভ্রাতা কয়েক দিনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সুরবালা প্রস্তাব করিলেন, তিনি বাড়ীতে থাকিবেন, আর কয়েক দিনের জন্য বিদায় লইয়া বিপিন তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন। বিপিনবিহারী সহজেই ইহাতে সম্মত হইলেন। সুরবালার যাইবার দিন স্থির হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১২—সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে যে ডাকগাড়ী রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়ায় যায়, তাহাতে আরোহী ছিলেন বিপিন, বামা ও সুরবালা। ১৮ই অগ্রহায়ণ প্রাতে তাঁহারা বাঁকুড়ায় পঁহুছিলেন। আশুতোষের বাসা খুঁজিয়া লইতে কোনই কষ্ট হইল না। গাড়োয়ানকে তাঁহার নাম বলিবামাত্র সে চিনিতে পারিল, এবং ডাক নাবাইয়া দিয়াই একেবারে গাড়ী লইয়া আশুতোষের বাসার সম্মুখে দাঁড় করাইল। অসৎকার্য্যে অপরিমিত ব্যয় করেন বলিয়া আশুতোষের নাম বাঁকুড়ায় সুপরিচিত। সুরবালা বামা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আশুতোষ তখন নিদ্রাগত। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। বিপিন এবং বামা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং সুরবালার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। আশুতোষ এক বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে বিপিন কহিলেন, "আমি আজি সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাইতে চাই।" আশুতোষ তাহাতে সম্মতি না দিয়া তাহাকে একদিন থাকিতে কহিলেন, এবং আপিসে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালে আশুতোষ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বিপিন তখন বেড়াইতে গিয়াছেন। আশুতোষের ভৃত্য এবং পাচক উভয়েই বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে। বাসায় সুরবালা এবং বামা।

আশুতোষ গৃহমধ্যে বসিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময়ে অবসর বুঝিয়া সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে তাঁহার গতি, দৃষ্টি এবং মুখশ্রীতে, এমন কি, সর্ব্বাবয়বে যে এক অপূর্ব্ব মনোহর ভাব লক্ষিত হইতেছিল, আমরা তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে অক্ষম। স্বামিসন্দর্শনে সাধ্বী স্বভাবতই পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন। অনাদর আশঙ্কায় সুরবালার অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কণ্টকিত হইতেছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি নম্রতা এবং দীনতার ছায়া তাঁহার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল। তিনি আশুতোষের সম্মুখে

আসিয়া এমনই ভাবে দাঁড়াইলেন, যেন কোন আজ্ঞাকারিণী পরিচারিকা আদেশপ্রতীক্ষায় প্রভুসমীপে দণ্ডায়মান। আশুতোষ একবারমাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন; কোনও কথা কহিলেন না। তিনি জুতা খুলিয়া পায়ের মোজা দুটি অল্পমাত্র টানিয়াছেন, এমন সময়ে সুরবালা তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া স্বহস্তে মোজা দুইটি খুলিলেন, এবং স্বামীর চরণে হস্ত-স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত মস্তকে দিলেন; এই অবসরে নয়নের দু এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু অলক্ষিতে আশুতোষের চরণদ্বয় ধৌত করিল। আশুতোষ কথা কহিলেন—

মানুষের হৃদয় পাষাণ নহে। আশুতোষ মনে করিয়াছিলেন, স্ত্রীকে অতি কর্কশভাবে সম্বোধন করিবেন। কিন্তু সুরবালার ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বকল্পিত কঠোরতা অনেকটা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি কহিলেন—

"তুমি একবারে এখানে এসে উঠ্‌লে কার কথা মত?"

সু। কথা আর কার? তোমার কাছে আস্‌ব, এতে আর কার কথার দরকার?

আ। স্ত্রীস্বাধীনতার স্কুলে পড়েছ বুঝি?

সু। স্বামীর কাছে আস্‌তে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সকল সময়েই সমান।

আ। এখানে যদি ঘর না থাকৃত?

সু। তুমি যেখানে থাকৃতে, আমিও সেখানে থাকৃতাম্।

আ। গাছের তলায়?

সু। হাঁ, গাছের তলায়।

আ। বাবা, তোমার মতন স্ত্রীলোক ত্রেতাযুগে জন্মালে ছিল ভাল।

সুরবালা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ম্লান মুখ আরও নত করিলেন। তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে বিদ্রূপ ভাল লাগিবে কেন?

আশুতোষ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কহিলেন,—"এখন যেমন এসেছ—তেমনি অনুগ্রহ করে কালই আবার বিপিনের সঙ্গে ফিরে যাও দেখি।"

সু। তা হলে কি তুমি সুখী হও?

আ। আমার জন্যে বল্‌ছি না, তোমার জন্যেই বলছি। কেন এখানে থেকে মিছামিছি কষ্ট পাবে? আমি পাঁচ দিন থাকি বাসায়, আর দশ দিন থাকি বাইরে।

সু। তা হ'ক, তবু ত পাঁচ দিনের জন্যেও তোমাকে দেখতে পাব ?

আ। বড় বেশী খাতির যে। যাদু টাদু জান নাকি ?

সু। তুমি বল্লে আমাকে কাজেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমি দেশে থাকাতে লোকে তোমারই নিন্দা করে। এখানে এসে ফিরে গেলে তোমার আরও অখ্যাতি হবে। আমি এইখানেই থাকি। যদি কখনও তোমার কোন অসন্তোষের কাজ করি, আমাকে সেই দিনই তাড়িয়ে দিও।

সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আশুতোষের মন অনেকটা নরম হইল। বিবাহিতা স্ত্রী নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর ন্যায় আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, এরূপ চিন্তা তাঁহার মনে আসিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, এবং জানি, এ যে সহজে আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। পয়সা কড়িও যে ও থাকিলেই অধিক ব্যয় হইবে, তাহাও নহে। বড়মানুষের মেয়ে ;—বরং ওর দ্বারায় আমার কিছু সাহায্য হইতে পারে। আর লোকের কাছে বলা যাবে, আমি এখন পরিবার নিয়ে আছি। এ একটা আবরণ মন্দ নয়। যাদের সঙ্গে ইয়ার্কি দি, তাদের ত সকলেরই পরিবার সঙ্গে।

ক্ষণেক পরে আশুতোষ কহিলেন, "আচ্ছা ; এসেছ থাক। বিপিন তা হলে বাড়ী যা'ক। তোমাদের নে যাবে বলেই আমি ওকে থাকৃতে বলেছিলাম।"

সুরবালা ইহাতেই যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ইহাকেই তিনি স্বামীর আদর মনে করিয়া লইলেন। বাড়ী হইতে আসিবার সময় এরূপ ব্যবহার পাইবেন, ইহা তিনি আশা করেন নাই। সংসারে মানুষ অনেক সময়ে অধিক আশা করিয়াই ঈপ্সিতবস্তুলাভেও সুখ অনুভব করিতে পারে না।

আশুতোষ কহিলেন, "আমাকে জল খেয়েই বেরুতে হবে।"

সু। কোথায় যাবে ?

আ। নিজের কাজে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন কৈফিয়ৎ দিই নি। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে উপরিস্থের কাছে দিতে হয় জানি।

সু। আমি ত আর কৈফিয়ৎ চাই নি। অমনই জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম।

আ। নেমন্তন্ন আছে।

সু। কখন ফিরবে ?

আ। রাত্রে ফিরি কি না বল্‌তে পারি না।

সুরবালা আর কথা কহিলেন না।

আশুতোষ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মনে করিলেন, স্ত্রীর প্রতি এক দিনেই অনেকটা অনুগ্রহ দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। পরে ভাবিলেন, একবারে থাকার অনুমতিটা দিয়ে অতি গর্হিত কাজই করা হইয়াছে। শেষে সিদ্ধান্ত হইল, ইয়ারবর্গের সহিত একবার এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।

পর দিন প্রভাতেও আশুতোষ বাসায় ফিরিলেন না। বেলা ৮টা বাজিলে তাঁহার চাকর রামা যাইয়া তাঁহাকে এক ভদ্রলোকের অগম্য স্থান হইতে তুলিয়া আনিল। আশুতোষ স্নান করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন, এবং সারা দিন ঘুমাইয়া কাটাইলেন। সে দিন রবিবার ছিল। সন্ধ্যাকালে বিপিন যাইবার সময় আশুতোষ উঠিলেন, তখনও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লাল রহিয়াছে।

বিপিন চলিয়া গেল। সুরবালা রহিয়া গেলেন। মানুষ না পিশাচের নিকটে?

ক্রমশঃ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। "সেকালের নাজীর" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় নাজীর-চরিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাজীর গোপীনাথ সরকারের পারিবারিক জীবনের বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত করিয়াই লেখক বিরত হইয়াছেন; নাজীরের জীবনে সেকালের আইন আদালতের, উকীল আমলার, আসামী ফরিয়াদীর ছবিও জড়িত থাকিবার কথা; কিন্তু লেখক সে বিষয়ে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। এই জন্য তাঁহার নাজীর-চিত্র অঙ্গহীন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়ের "জাপান ও জাপানী" একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ইহাতে জাপান ও জাপানীদের বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। "জ্যোতিষের সহিত তাপের সম্বন্ধবিচার" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ প্রবন্ধটি যদিও সাধারণ পাঠকের অনুপযোগী, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পাঠকসমাজে নিশ্চয়ই সাদরে অধীত হইবে। "নূতন কবিতা" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনা। আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কে তুমি দেবের কন্যা? প্রীতিময়ী! তোমার যতনে
বসোরা-গোলাপ-কুঞ্জ ভরি গেল কুসুমে কুসুমে!
কে তুমি গো আহ্লাদিনি? নেত্রে হাসি! তোমার চরণে
মুখর নূপুর বাজে—রাগরক্ত পাদপদ্ম চুমে
প্রফুল্ল অশোক-তরু ঝলসিল রতনে রতনে!
কে তুমি কৌতুকময়ি? হেরি তোমা, শঙ্খ-ঘণ্টা-ধূমে,
শেফালির শাখে শাখে, গৃহাঙ্গনে, দূর বনভূমে

হ'ল পূজা; উর্ব্বশী-উদ্বাহে মরি যেন গো নন্দনে!
হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, এস, এস, কবির আশ্রমে।
হের দেখ পুষ্পরাশি ঢালি দিল তোমার চরণে
আমার কল্পনা-বধূ; মন্দ মন্দ কর-আন্দোলনে
ডাকে তোমা কবিকুঞ্জে আশা সখী বিলাস-বিভ্রমে!
যুগে যুগে জন্মে জন্মে নবোৎসাহে দেবেন্দ্র-বন্দিতা,
ধর ধর অর্ঘ্য-পুষ্প, দাসের এ নূতন কবিতা!"

"প্রত্যাবর্ত্তন" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী। শ্রীযুক্ত হেমন্তবল্লভ গুপ্ত, এম্. এ., "ছাতু ও গুড়" লইয়া ভারতীর আসরে দেখা দিয়াছেন। লেখক যে কি মাথামুণ্ড বলিতে চান, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "ছাতু ও গুড়ে" রসিকতার চেষ্টা আছে, কোটেশনের ঘটা আছে, কিন্তু রস নাই। অন্নবৎসল বঙ্গে সহসা এ শুষ্ক শক্তু কেন? শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "সিরাজদ্দৌলা" বেশ হইতেছে। অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, লেখক এবার তাহা প্রমাণিত করিয়া, বাঙ্গলার ইতিহাসের এই দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা মুছিয়া দিয়াছেন। এইরূপে হতভাগ্য নবাব সিরাজের প্রেতাত্মার উপযুক্ত তর্পণ করিয়া, অক্ষয় বাবু বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমানকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলেন। আমরা অক্ষয় বাবুর সিরাজ প্রবন্ধ হইতে এই উল্লেখযোগ্য ও সর্ব্বসাধারণের অবশ্যপাঠ্য "অন্ধকূপ-হত্যার" ইতিহাসটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী সভ্যজগতের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নরশোণিতলোলুপ নৃশংস নরপতি বলিয়া শত কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের অধিবাসীদিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সর্ব্বজনসম্মত সন্দেহ-ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই! * * *

"যাঁহারা সেকালের লোক, যাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ইংরাজ বাঙ্গালীর কুটিল কৌশলজালে জরাবদ্ধ হইয়া সিরাজদ্দৌলা ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না!

"মুসলমানদিগের ইতিহাসে অন্ধকূপহত্যার নাম গন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। সাইয়েদ গোলাম হোসেনের রচিত "মুতাক্ষরীণ" গ্রন্থ সেকালের সর্ব্বজনসমাদৃত সুবিস্তৃত ইতিহাস;—তাহাতে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, ইংরাজদিগেরও অনেক দুঃখদৈন্যের সমাচার আছে; কিন্তু সমগ্র মুতাক্ষরীণগ্রন্থে, আকারে ইঙ্গিতেও, অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই! হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মুতাক্ষরীণের যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি টীকাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,—'সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন,—অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিজ কলিকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপহত্যার সংবাদ জানিত না।' যাহাদের বুকের উপর এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা ইহার কিছুই জানিল না;—ইহা কি আদৌ সম্ভব হইতে পারে? শুধু তাহাই নহে,—হতাবশিষ্ট ইংরাজগণ মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতার কুটীরে কুটীরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও কি এই শোকসমাচার রটনা করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন? * * *

"রণপলায়িত ইংরাজবীরপুরুষগণ পল্তার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল গুপ্তমন্ত্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া মান্দ্রাজের ইংরাজমণ্ডলী কলিকাতার পুনরুদ্ধারকল্পে যে সকল বাগ্‌বিতণ্ডায়

দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। মান্দ্রাজের ইংরাজ-দরবারের অনুরোধরক্ষার্থে দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। মান্দ্রাজদরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত পিগট সাহেব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলার নিকট তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ণ পত্র লিখিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ;—তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র সামরিক লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই! সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের যে আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই!

"মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের জন্য কড়ায় গণ্ডায় অঙ্কপাত করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় অন্ধকূপে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিল, সন্ধিপত্রে তাহাদের বা তাহাদের স্ত্রীপুত্রের জন্য কপর্দ্দকও লিখিত হয় নাই কেন? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী নিতান্তই কাহারও রচা কথা।

"অন্ধকূপহত্যাকাহিনী কবে কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল,—সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্যপরিপূর্ণ! হলওয়েল সাহেব তাহার প্রথম প্রচারক। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হলওয়েল তাঁহার প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম ডেভিসকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই অন্ধকূপহত্যার প্রথম এবং শেষ পরিচয়! হলওয়েল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সাইরেণ' নামক পোতারোহণে বিলাতযাত্রাকালে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই বিষাদ-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা যে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল, সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পলাশির যুদ্ধাবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজবণিকের অপকীর্ত্তির উ... করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল, সেই সময়ে (তৎপূ... নহে!) এই পত্রখানি জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল! * * *

"হলওয়েল যে কারাগৃহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ ফিট প্রস্থ। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণ কক্ষে ১৪৬ জন নরনারী কিরূপে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্প লোকেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন! এক এক জন মানুষের জন্য অন্ততঃ ৬ ফিট দীর্ঘ ২ ফিট প্রস্থ এবং ২ ফিট বেধসমন্বিত স্থানের নিতান্ত আবশ্যক ;—তাহা হইলেও ওরূপ সংকীর্ণ কক্ষে ৮১ জনের অধিক লোকের কিছুতেই স্থান সংকুলন হইতে পারে না। অথচ তাহারই মধ্যে ১৪৬ জন নরনারী কেমন করিয়া স্থানলাভ করিয়াছিল? * * *

"সিরাজদ্দৌলা দুর্গজয় করিবার সময়ে আদৌ ১৪৬ জন লোক বন্দী হওয়াই বিশেষ সন্দেহের কথা! হলওয়েল যেদিন দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করেন, সেদিন দুর্গমধ্যে কেবলমাত্র ১৯০ জন বর্ত্তমান ছিল ; আর আর সকলেই দুর্গাধিপতি মহামতি ড্রেক সাহেবের সাধুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই ১৯০ জন লোকের মধ্যে দুই দিবসের অক্লান্ত রণতরঙ্গে অনেকেই জীবনবিসর্জ্জন করে ; যাহারা জীবিত ছিল, তন্মধ্যে আহত ও মুমূর্ষুর সংখ্যাও অল্প ছিল না। যে সকল লোক কোনরূপে পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহারাই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ; তদ্ভিন্ন যাহাদের শক্তি ছিল, সাহস ছিল, পলায়নের প্রবৃত্তি ছিল, তাহারা অনেকেই দুর্গজয়ের কোলাহলের অবসর পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে সকল নরনারী মিরজা আমীরবেগের হস্তে পতিত হয়, মীরজাফরের কৃপায় তাহারা সেইদিনই নিরাপদে পলতায় প্রেরিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় হলওয়েলের

কথিত ১৪৬ জন বন্দী কারারুদ্ধ হওয়া বিশেষ সন্দেহস্থল। হলওয়েল স্বপ্রণীত পুস্তকে যে সকল মৃত ও মৃতকল্প সহযোগীদিগের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ৬৬ জনের অধিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"ইংরাজ ইতিহাসলেখকমাত্রেই হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাহার দোষে এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামখ্যাত মহাত্মা বিভারিজ বলেন যে, 'আমাদের পক্ষে অন্ধকূপ-হত্যার কথা তুলিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের কলঙ্ক ঘোষণা করা শোভা পায় না। এ বিষয়ে বোধ হয় বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই কর্ত্তব্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট অমৃতসর প্রদেশে কি দুর্ঘটনাই না সংঘটিত হইয়াছিল।' বিভারিজ সাহেব যে দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নিকট অন্ধকূপ-হত্যা লজ্জায় মলিন হইয়া যায়। একটি ক্ষুদ্রায়তন গোলাকার কক্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক সিপাহীকে কারারুদ্ধ করিয়া ইংরেজেরা তাহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া ২৩৭ জন হতভাগাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া গুলি করেন; তখন বন্দীদিগের মধ্যে আর কেহ বাহিরে আসিতে স্বীকার করিল না। ইংরেজের আদেশে কক্ষদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন সংজ্ঞাশূন্য ৪৫ জন হতভাগার অবসন্ন দেহ টানিয়া বাহির করিতে হইল;—ভয়ে, রণশ্রমে, গলদ্‌ঘর্ম্মে, গ্রীষ্মাতিশয্যে, দমবন্ধ হইয়া তাহাদের কত না দুর্গতি হইয়াছিল! * * *

"অন্ধকূপহত্যা সত্য হইলেও সিরাজদ্দৌলার অপরাধ কি? স্বয়ং হলওয়েল সাহেবই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সংস্রব থাকা তিনি বিশ্বাস করেন নাই; তাহার ধারণা এইরূপ যে, নবাবসেনাদিগের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা [illegible]টিত হইয়াছিল। * *

সিরাজদ্দৌলাই যে হতভাগ্য ইংরাজ বন্দীদিগকে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার [illegible]দয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং হলওয়েলের লিখিত কাহিনী অনুসরণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ বলিবার অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, ম্যালিসন, স্বপ্রণীত ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচন করিয়া গিয়াছেন।

"অন্ধকূপহত্যা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজেরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান সহকারী অপরাধী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মহাত্মা হাওয়ার্ডের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশেই এইরূপ পূতিগন্ধময় আলোকসম্পাতশূন্য অন্ধকূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে আসিয়াও, স্বদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সেইরূপ অন্ধকূপ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল অন্ধকূপে কত হতভাগাই না অকালে অন্যায় উৎপীড়নে জীবনবিসর্জ্জন করিত! কত উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক, কত মদমত্ত নাবিক, কত অন্নহীন দাদনগ্রস্ত দরিদ্র বাঙ্গালী যমযাতনায় ছটফট করিয়া মরিত! ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মবেদনায় লিখিয়াছেন যে, 'হায়! যদি অন্ধকূপ না থাকিত, তাহা হইলে ত ইংরাজ বন্দীদিগের এরূপ শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারিত না'!"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের একটি ভাবুকতাপূর্ণ গান ও শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর "যোগেশ" নামক একটি ক্ষুদ্র গল্পে শ্রাবণের ভারতী সমাপ্ত হইয়াছে। গল্পটির কোনও বিশেষত্ব নাই।

ভারতী। আশ্বিন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "সিরাজদ্দৌলা"; এবার

'কলিকাতার পুনরুদ্ধার' ও 'আলিনগরের সন্ধি' এই দুই পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর "তত্ত্ব" নামক সামাজিক গল্পটি মোটের উপর সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখক অল্প পরিসরের মধ্যে যে কয়টি চরিত্রের রেখাপাত করিয়াছেন, তন্মধ্যে মিত্রগৃহিণীর, বিশেষতঃ বিন্দির মার, একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "কদম্ব-সুন্দরী" এখনও সমাপ্ত হয় নাই; এই সুদীর্ঘ কবিতার কোনও কোনও স্থলে গীতিকবিতার উপযোগী ঝঙ্কার আছে, কোথাও বা সংক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল ভাবের উচ্ছ্বাস আছে,—কোথাও বা কবির কল্পনাচিত্রগুলি সমুজ্জ্বল ও সুন্দর, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না;—মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন সুরের পরস্পরবিরোধী আলাপে বৈচিত্র্যসাধন দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বরং রসভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মঙ্গল" একটি জ্যোতিষ-বিষয়ক প্রবন্ধ। "চকোর" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনের একটি কবিতা। বোধ হয়, লেখক নূতন ব্রতী। কবিতাটির 'নৈতিক তত্ত্ব'টুকু লেখক নিজেই লিখিয়াছেন, পাঠককে তাহা নিজে সংগ্রহ করিবার অবকাশ দেন নাই;—যোগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—

"হায় ও চকোর সম প্রিয় আত্মাধন মম,
কবে বা ছুটিবে।
এ মোহ-শৃঙ্খল কাটি, আমার সোনার পাখী
কবে বা উড়িবে!"

হায়, তথাপি কিন্তু কবিতা লিখিতে হইবে! জীবন-পাখী উড়িবার আগে যোগেন্দ্র বাবু যে কাব্যকথা লিখিয়া রাখিতেছেন, উদ্ধৃত নমুনা হইতেই পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, যোগেন্দ্র বাবুর কবিকীর্ত্তিকামনা সফল হউক। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ছেলে মানুষ করা" প্রবন্ধটি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য প্রভাত বাবু বাঙ্গালীর ছেলের একটি নূতন রোগ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না রোগটির নাম 'কাব্যি', সাধুভাষায় কবি-রোগ বলিতে পারা যায়। অজাতশ্মশ্রু দুগ্ধ শিশু-কবিদের 'কার্ত্তিকের' মত ঝাঁকড়া চুল, উর্দ্ধদৃষ্টি, এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা কবিতায় '[illegible] কেন কাহার জন্য' হাহাকার দেখিয়া হাসিও পায়, চোখে জলও আসে। ইহাদের কি গতি হইবে? এ রোগের ঔষধ কি?

ভারতী। ভাদ্র। "মনসার ভাসান" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র। আমাদের নিতান্ত 'একঘেয়ে' ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হইল। "নারী-মঙ্গল" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি মধুর কবিতা। কবিতাটি অকারণে একটু অধিকমাত্রায় বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাই তেমন জমাট হয় নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী "পুরাবৃত্ত-তত্ত্ব" প্রবন্ধে, পুরাবৃত্তের শিক্ষা কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা একটু গুরুতর;—প্রসাদগুণের অভাবে সহজে তাহা পরিপাক করা যায় না। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় "দেশবিদেশ" প্রবন্ধে তাঁহার মধ্যপ্রদেশের ভ্রমণকাহিনী লিখিতেছেন।

কবিতাকুঞ্জ।

সর।

১

সর সর সর!
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, তুই কি থাকিবি ছুঁড়ী,
দিবি না আমারে স্থান তিল অবসর?
কোথা কি পাব না থালি,
এক কণা ধুলা বালি,
রাখিতে অনন্ত প্রাণ তাহার উপর?
সর সর সর!

২

সর সর সর!
দাঁড়ায়ে আঁধার ছেড়ে, জ্যোৎস্না আসিতে দেরে,
প্রাণে ঢালুক সুধা পূর্ণ সুধাকর,
তুই যে তুই যে বালা, কালান্তক মহাজ্বালা,
প্রতি রোমকূপে তোর সহস্র ভাস্কর!
সর সর সর!

৩

সর সর সর!
মোর সনে কি যে আড়ি, কিছুই বুঝিতে নারি,
আছে ত জগতে আরো কত নারী নর,
তাদের কি দিস্ ঠেলে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ফেলে,
তারা কি আপন তোর, আমিই কি পর?
সর সর সর!

৪

সর সর সর!
মর্ ছুঁড়ী লক্ষ্মীছাড়া, একটু সরিয়ে দাঁড়া,
কোথায় রাখিব প্রাণ,—কিসের উপর?
তুই যে বামন সম, আবৃত করিলি মম,
ও ক্ষুদ্র চরণ-তলে বিশ্ব চরাচর!
সর সর সর!

রক্ষালিপি।

সমর্পিনু আজি মা গো! রাজীব-চরণে
এ প্রাণ-শিশুরে মোর। স্নেহ-আশীর্ব্বাদে
বিনাশিয়া সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-পরমাদে
রক্ষা তুমি কর এরে অক্ষয় যতনে।
ভাগ্যহীন আমি মাগো! সংসার-ভবনে
একটি যে রত্ন বক্ষে ধ'রেছিনু সাধে,
তা'রেও হরিল কাল;—পূর্ণিমার চাঁদে
গ্রাসিল জলদ যেন শারদ গগনে।
তাই আজি সভয়ে মা! অভয় ভাবিয়া
লইনু আশ্রয় পদে। যে অপূর্ব্ব বলে
শূন্য পথে সপ্তলোক রেখেছ ধরিয়া,
পালিছ বিশ্বেরে নিত্য স্তন্য-অন্ন-জলে,
সেই মৃত্যু-বিজয়িনী শক্তি সঞ্চারিয়া
দাও রক্ষালিপিখানি বাঁধিয়া এ গলে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

গান।

(খাম্বাজ।)

আমার মনের ভগন দুয়ারে, সহসা
তুমি কে গো তুমি কে?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু উজল নিজ আলোকে।
তুমি কে গো তুমি কে?

একি প্রেম-প্রতিম অঙ্গ, একি যৌবনরূপরঙ্গ
একি মন্দাকিনী মন্দ সলিলভঙ্গ,
একি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত তোমার নয়ন পলকে;
তুমি কে গো তুমি কে?

ছিল অশ্রু-জলদ-লীন হৃদয় দুঃখতামস গগনে,
আজি প্রাণ মম ইন্দ্রধনু তোমার নয়ন কিরণে,
আজি প্রাণ মম মত্ত মধুপ লুণ্ঠিত তব চরণে,

আজি জীবন মরণ ধরম সরম সকলি লীন
পলকে ;
তুমি কে গো তুমি কে ?

তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর মনের মলিন কন্দরে,
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে,
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ অম্বরে,
মম জীবন-গহন-চয়ন কুসুম শোভিত তব
অলকে ;
তুমি কে গো তুমি কে ?

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

মরণ-আকাঙ্ক্ষা।

সম্মুখে তব দেখ লো চাহিয়া
আসি'ছে রাতি,
মেঘের আড়ালে যেতেছে ডুবিয়া
তপন ভাতি ;
এখনি রবির অস্ত কিরণ
রচিবে আপন মৃত্যু শয়ন,
কেবল ঊর্দ্ধ আঁধার গগনে
চাহিবে তারকা বালা ;
আমার শ্রান্ত অলস নয়নে
নিবিয়া আসিছে আলা।

যৌবন-কূলে প্রথম যখন
সমুখে আসি'
অরুণ কিরণে উজলি আপন
মাধুরী-রাশি,
স্বপন-শ্রান্ত হৃদয়ে আমার
সোনার স্বপন জাগালে আবার,
আলোক, মুক্তি দেখা'লে কেবল
তরুণ অরুণ হাসি,
ফুটিল হৃদয় কমলের দল
ব্যাকুল বাসনারাশি।

দীর্ঘ এ পথ আমরা দু জন
এসেছি চলি,
অবশ শ্রান্ত কাতর নয়ন
পড়িছে ঢলি',
একবার আর নয়ন তুলিয়া
আমার এ মুখে দেখনি চাহিয়া,
দেখ নাই হাসি আর একবার
কোমল অধরমূলে,
সে আলোকরাশি হেরি নাই আর
ব্যাকুল নয়নকূলে।

ঊর্দ্ধ গগনে উঠেছে তপন
কিরণ-মালা।
ধরার অঙ্গে আলোক-বসন
জ্বেলেছে জ্বালা,
চারি ধারে শুধু উষ্ণ বাতাস
গগনে জাগায়ে তুলেছে হুতাশ,
শ্রান্ত প্রকৃতি তন্দ্রা-আকুল
নয়নে ঘুমের ঘোর ;
তোমার ও দুটি নয়ন ব্যাকুল
চাহেনি এ মুখে মোর।

এখন তপন যেতেছে নিবিয়া
মেঘের বুকে,
বিষাদের ছায়া পড়িছে আসিয়া
ধরার মুখে ;
চারিদিকে হের আসিছে আঁধার,
সোনার স্বপন টুটেছে আমার,
আশার আলোক গিয়াছে নিবিয়া
নিরাশা আঁধার ঘোরে,
হের চারিদিকে আসি'ছে ছাইয়া
আঁধার, ঘিরিয়া মোরে।

ঢাকি'ছে আলোক নয়নে আমার
আঁধার নামি,
নিশ্বাস-বায়ু এ দেহ মাঝার
যেতেছে থামি,
এখনি শ্রান্ত দু নয়ন পরে
আসিবে আঁধার চিরদিন তরে,
—চাহ এ নয়নে যাচি শেষ বার
দাঁড়ায়ে মরণ-কূলে,
আন সেই হাসি অধরে আবার,
আলোক নয়নমূলে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

জীবন্ত দেবতা।

কোন স্বর্গ হতে এলে জীবন্ত দেবতা ?
ফুটন্ত কুসুম সম,
বদন পবিত্রতম,
বচন বেদের সম স্বর্গের বারতা।
চরণ পঙ্কজ মাঝে
সহস্র চন্দ্রমা রাজে,
ঘুমায় চরণতলে অসংখ্য তপন ;
অধরে জোছনা ভরা,
কপোল অমৃতে গড়া,
কে তুমি দুঃখীর ঘরে অমূল্য রতন ?
পাইয়া দরশ সুধা
মিটিল পিয়াস ক্ষুধা,
শত পূত পীঠস্থান তব পদ-রজ,—
চাই না অনন্ত স্বর্গ,
চাই না দেবতাবর্গ,
চাহি না মলয়ানিল,—প্রফুল্ল পঙ্কজ ;
না চাই তপন শশী,
শত ভালবাসাবাসি,
তোমাতে ডুবিয়া রই, সব যাই ভুলি,
জীবন্ত দেবতা স্বামী, দেহ পদ ধূলি।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দেবী।

মনে করে।

মনে করে, ভুলে গেছি নেই মনে আর
যদিও ভাঙ্গিয়া গেছে কুহক-স্বপন।
শুভ্র গগনের বুকে প্রভাত মাঝার
সোণালী উষার সেই রঞ্জিত বরণ।

ভুলে গেছি একখানি শুভ্র আবরণ
স্থির সলিলের বুকে পড়িয়াছে ধীরে।
দুরন্ত হিমানী পরে কুয়াসা মতন
ঢাকিয়াছে শরতের দীপ্ত শশধরে।

মাঝে মাঝে ভাঙ্গে ঘোর বসন্ত বাতাস,
জাগায় প্রাণের মাঝে হারান বাসনা ;
কোন কুসুমের সেই মধুর সুবাস
আমারি মাঝারে যেন হারায় আপনা !

আমি কোন সুধা পিয়ে মদির নয়নে
তুলিতে কুসুম, বিঁধে কণ্টক চরণে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পর্ব্বতের প্রতি নির্ঝরিণী।

তুমি প্রভু ! উচ্চ সুমহান,—
আমি অতিক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা ;
চিরদিন চরণে তোমার
রহিব আপনা হয়ে হারা।
তুমি নিত্য কঠিন পাষাণে
বিদীর্ণ করিও এই হিয়া,
তবু আমি উছলি পড়িব
শত ধারে শতধা হইয়া।
আমি প্রভু ! নিশিদিন ধরি
করিব মহিমা তব গান,
শুনিবে না এ বিজনে কেহ
ক্ষীণ কণ্ঠ বিলাপীর তান।
ফলে ফুলে শোভাময় কত
দীর্ঘ বিটপীর ছায়া পাবে,
কুসুমিতা কোমল লতিকা
ও হৃদয় আচ্ছাদিয়া রবে,—
জানিবে না জানিবে না কেহ,
কোথা এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা
চিরদিন চরণ বেড়িয়া
পড়িছে আপনা হয়ে হারা।
তুমিও ভুলিয়া যাবে প্রভু !
নিশিদিন কাঁদে কে বিজনে,
নিরবধি কার প্রেম-ধারা
উচ্ছ্বসিয়া পড়িছে চরণে।
অতীতের পুরোণো কাহিনী
স্মরণেও আসিবে না হায়,
জুড়াইয়া ছিল আগে প্রাণ
কার স্নিগ্ধ করুণা-ধারায় !
তখন ত ছিল না বিটপী
তোমারে করিতে ছায়াদান,
পুষ্পময়ী লতিকারা ঘিরি
সৌরভে ত জুড়াত না প্রাণ।
তুমি একা দাঁড়াইয়া ছিলে
সুমহান দেবতার মত,
পদতলে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
আনন্দেতে হ'ত প্রবাহিত।
চিরদিন প্রবাহিত হব,—
তুমি স্থান দাও বা না দাও,
তথাপি চরণ ঘিরি রব,
তুমি যদি ফিরিয়া না চাও !

শ্রীউমাশশী দেবী।

রূপ-তৃষ্ণা।

১

জীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণায় হায়,
রূপ-পিপাসায়!
দরশে মিটাতে চাই, পরশে জুড়াতে যাই,
বৃথায় বৃথায় চেষ্টা, কণ্ঠতালু হায়
সে আশ্লেষে, আরও গো শুকায়।
কুমুদ কহ্লার ফোটে, উর্ম্মিমালা নেচে উঠে,
হায় তবু শুষ্ক কুম্ভ শূন্য থেকে যায়;
প্রাণ যায় মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

২

অহো আমি মাতোয়ারা মোহ-মদিরায়,
ইষ্ট-দেবতায়,
পর্ব্বে পর্ব্বে পূজিয়াছি, পদতলে সঁপিয়াছি
রাশি রাশি অর্ঘ্য পুষ্প, প্রভাতে সন্ধ্যায়।
হেমকান্তি উষাকালে, সন্ধ্যার সোনালি জালে
হইয়াছি হর্ষদীপ্ত সে মুখ-প্রভায়।
করে তার কর ঢাকি, গণ্ডে তার গণ্ড রাখি,
দেখিয়াছি রূপতৃষ্ণা মিটান' কি যায়?
বিফল বিফল সব, চাতক হয় নীরব;
সিন্দুরিয়া জলধর আকাশে মিলায়!
(মোর) ছাতি ফাটে রূপের তৃষ্ণায়!

৩

ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! নিশি জাগি, সে যবে ঘুমায়,
ছাদে পড়ি, ফুল জ্যোৎস্নায়,
তাহার মুখমণ্ডলে, একদৃষ্টে কুতূহলে,
হেরিয়াছি নিশিপদ্ম কিবা শোভা পায়!
আরও যেন জ্যোৎস্না ভায়, চকোরেরা আরো
ধায়,
মঙ্গল-মহিমা গান জ্যোৎস্না পুরে ধরে!
কৌতুহলে লটপট্, পক্ষ দুটি ঝট্‌পট্,
রাশি রাশি দৃষ্টি-অলি মুখে আসি পড়ে!
চকোর পলায়ে যায়, লুব্ধ ভৃঙ্গ শুধু পায়
হলাহল; ভাগ্যে তার একি হায় দায়,
প্রাণ যায় মধুর তৃষ্ণায়!

৪

সর্ব্বনাশা ভালবাসা, দারুণ পিপাসা
ঘুচিল না হায়!
এই পিপাসার লাগি, নিশি নিশি কত জাগি,
সে যবে ঘুমায়,
দীপ জ্বালি লয়ে বাতি, হেরি করি আতিপাতি
কি হীরা কি কহিনুর সে আননে ভায়!
সে কেশ-জলদে কোন্ বিদ্যুৎ খেলায়!
মোহকর মনোহর, হেরিয়ে ফুল্ল অধর,
বুঝিবারে কি সৌরভ মাখা আছে তায়,
চুম্বিয়াছি আবেষ্টিয়া পাগলের প্রায়!
একি এ মোহের নেশা, একি এ রূপের তৃষা,
প্রথম বরিষা-সিক্ত ধরণীর প্রায়!
ছাতি ফাটে দারুণ তৃষ্ণায়!

৫

সর্ব্বনাশা ভালবাসা, দারুণ পিপাসা,
ঘুচিল না হায়!
তুলে তারে লয়ে খাটে, শ্মশানে জাহ্নবী-ঘাটে,
জ্বালিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি, চাহিলাম হায়,
জানিতে সে রূপকান্তি কেমন দেখায়!
সে বর বপুর মাঝে, কি দ্রব্য লুকান আছে,
যাহে তনু উদ্ভাসিত লাবণ্য-ছটায়!
লক্ লক্ জিহ্বা দিয়া, তনু তার পোড়াইয়া,
রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি কহিল আমায়;—
"বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব
বুঝিয়াছ হে উন্মত্ত!
ঘরে যাও, আর কেন মর পিপাসায়,
অগ্নিক্ষেত্রে, মৃগতৃষ্ণিকায়?"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

৭ম ভাগ। ১৩০৩; কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, বি. এল্., শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়,
স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু,
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও সম্পাদক
প্রভৃতি।

সূচী

কলিকাতা,
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন,
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি ক
ও
১৩/৭, বৃন্দাবন বসুর লেন;
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ক

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

মন্বন্তর।

"সাতাত্তরের মন্বন্তরের" কথা ইতিহাসের জীর্ণস্তরে মিশিয়া গিয়াছিল ; আবার কিন্তু কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে! আবার পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্ববাঙ্গলার সীমান্তদেশ,—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, হা অন্ন! হা অন্ন! রবে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে! ভারতবাসীর উপেক্ষিত বিষাদব্যাকুলতায় এবার ভারতেশ্বরীর সিংহাসন চঞ্চল হইয়াছে ;—প্রকৃতিপুঞ্জের জীবনরক্ষার জন্য তাড়িত-বার্ত্তা সমাগত হইতেছে ; সুনিপুণ রাজকর্ম্মচারিগণ বিনিদ্র-নয়নে রাশি রাশি পুরাতন রাজদপ্তর কণ্ঠস্থ করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য দীর্ঘাতিদীর্ঘ মন্তব্যলিপির রচনা করিতেছেন। সহানুভূতির অবধি নাই ; সান্ত্বনার অন্ত নাই ;—কিন্তু হায়! তথাপি কালের চিতা ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গলা দেশ দরিদ্র দেশ ;—যে দেশের শিল্প বাণিজ্য অন্তর্হিত হইয়া তাঁতি কর্ম্মকার হাহাকার করিতেছে ; কোটী কোটী নরনারী কেবলমাত্র বিদেশের কল্যাণে কোনরূপে লজ্জারক্ষা করিয়া "প্রায়োপবেশন" অভ্যাস করিতে বাধ্য হইতেছে ; তাহার প্রতি বৎসরের ইতিহাসই দুঃখদৈন্যের বিষাদ-কাহিনী! রাজপুরুষেরা সে কথা স্বীকার করিতে অসম্মত ; কিন্তু সকলেই দেখিতেছেন যে, বাঙ্গালী দিন দিন কত অন্নহীন হইয়া পড়িতেছে! এই "হা অন্ন! হো অন্ন!" রব বাঙ্গালীর চিররুগ্ন জীবনের অসাধ্য পুরাতন ব্যাধির ন্যায় অঙ্গগ্রহে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ! কাজেই বাঙ্গালী আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে, আবার 'সাতাত্তরের মন্বন্তরের' বিষাদ-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে!

বাঙ্গালা দেশ কৃষি-প্রধান ;—ধান্যই একমাত্র ধন, সম্পদ, বল, ভরসা। এক সময়ে এ দেশের মৃৎগহ্বরে অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড উৎপন্ন হইত ;—ইহা কবির কল্পনা নহে, ঐতিহাসিক সত্য! (১) এক সময়ে এ দেশের নদ নদী স্বর্ণ-রেণু বহন করিত ;—ইহাও কবি-কল্পনা নহে, ঐতিহাসিক সত্য! (২) এক সময়ে এ দেশের শিল্পভাণ্ডার বিদেশে বহন করিবার জন্য নানা দিগ্দেশের বণিক-সমিতি জলে স্থলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ উহার পণ্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিত,—

(১) Ain-Akbari.

(২) Tavernier's Travels.

ইহাও কবি-কল্পনা নহে, ঐতিহাসিক সত্য! (৩) এ সকল কিন্তু বহুদিনের বিলুপ্ত কাহিনী। পরবর্ত্তী যুগে ইংরেজেরা যখন সসম্ভ্রমে বণিকবেশে শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গদেশে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন, তখন আর ভূগর্ভ রত্ন প্রসব করিত না, নদ নদী স্বর্ণরেণু বহন করিত না; কিন্তু তখনও মোগল বাদসাহ-দিগের নিকট বঙ্গভূমি 'স্বর্গভূমি' বলিয়া পরিচিত ছিল! (৪) সেই স্বর্গরাজ্যের মোগল শাসনকর্ত্তা নবাব শায়েস্তা খাঁ রাজধানী ঢাকা নগরীর পশ্চিম তোরণ-দ্বার চিররুদ্ধ করিয়া, তাহার উপর লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার শাসন-সময়ে টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রীত হইল; ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা এইরূপ সুলভ জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিলে, এই তোরণদ্বার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিবেন না।" (৫) শায়েস্তা খাঁর সেই জয়স্তম্ভদ্বার সরফরাজ খাঁর শাসনসময়ে যশোবন্ত সিংহের যশোগৌরব ঘোষণা করিয়া সগর্ব্বে আর একবার উন্মুক্ত হইয়াছিল! (৬) তাহার পর হইতে যে সকল ঘটনাপ্রবাহে ৮ মন ৮ সেরে পরিণত হইয়াছে, যাঁহারা স্বহস্তে সেই দুঃখদুর্দ্দশার ইতিহাস গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সে কথা আর নূতন করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। "সজলা সফলা শস্যশ্যামলা মাতা" বলিয়া আর বঙ্গভূমিকে অভিবাদন করা শোভা পায় না। মাতা এখন "স্ুইস্ পাষাণ", অথবা মিশরের দগ্ধ মরুর ন্যায় অনুর্ব্বর; বাঙ্গালী এখন উদরান্নের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে! সত্যই যে এমন করিয়া বাঙ্গালীর কপাল পুড়িয়াছে, "সাতাত্তরের মন্বন্তরেই" তাহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই জন্য "মন্বন্তরের" কথা বাঙ্গালী ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছে না।

পলাশির যুদ্ধে ইংরাজ বাঙ্গালীর সমবেত শক্তি মোগল প্রতাপ পদদলিত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি মোগলের নাম বঙ্গদেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মীর কাশিমের পরাজয়ে মোগল শক্তির পরাজয় সম্পূর্ণ হইল। সেই সময়ে ভারতভাগ্যবিধাতা লর্ড ক্লাইব বিলাতের বণিক্-সমিতিকে লিখিয়া

(৩) Danver's Portuguese in India.

(৪) I never saw a country in which provisions were so cheap.—Travels of Iben-Batuta.

(৫) It is related that during his Government, grain was so cheap that rice was sold at the rate of 640 lbs weight for the rupee.—Stewart, p. 203.

(৬) The gate had continued closed to this time; when Jeswont Roy, having succeeded in reducing the price of grain to Shaista Khan's standard, ordered it to be opened.—Stewart, p. 268.

পাঠাইলেন,—"আরও কিছু দিন দেশীয় শক্তির পদানত হইয়া স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তৃগণের লুণ্ঠন ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সামান্য বণিকের ন্যায় এ দেশে অবস্থান করিব, কিম্বা এখন হইতেই তরবারি হস্তে কোম্পানীর ক্ষমতারক্ষা ও রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইব? কোন্ পথ অবলম্বন করিব, তাহার মীমাংসা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পরিণামে কি হইবে, জানি না; কিন্তু একবার যখন শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন প্রত্যেক যুদ্ধে, প্রত্যেক মন্ত্রণায়, আমাদিগের ধন সম্পদ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিবে। কোম্পানীর শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করাই এখন একমাত্র সদুপায়।" (৭)

এই সদুপায় অবলম্বন করিবার জন্য কোম্পানী বাহাদুর বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া রাজস্বসংগ্রহে অগ্রসর হইলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ লিখিতে লাগিলেন যে,—"রাজস্বসংগ্রহ ভিন্ন শাসন ও বিচার বিভাগে যেন কদাচ হস্তক্ষেপ করা না হয়।" (৮) সুতরাং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া শোষণকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এক বৎসরের মধ্যেই চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল; কোম্পানী বাহাদুরেরও লাভ হইল না, লাভ হইল কেবল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের। তাঁহারা ১৮৬৬ সালের মধ্যেই লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"জমীদারগণ বহুবর্ষের রাজস্ব অনাদায় রাখিয়া নানারূপ কলকৌশলে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজকর আত্মসাৎ করিয়া যেরূপ মহা অপকারসাধন করিতেছেন, তাহা নিবারণ করিবার বিধান না করিলে, দেওয়ানীর আয়ে রাজস্বসংগ্রহের ব্যয়ভারেরও সংকুলন হইবে না!" (৯) সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য জমীদারবংশ ধ্বংস করিয়া একের জমিদারী অন্যের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব উঠিতে লাগিল; কিন্তু লর্ড

---

(৭) The time now approaches when we may be able to determine with some degree af certainty, whether our remaining as Merchants, subjected to the jurisdiction, encroachments and insults of the country Government, or the supporting your privileges and possessions by the sword, are likely to prove most beneficial to the Company. &c. &c.—Clive's letter to Court, September 3, 1765, para 21.

(৮) Court's letter, 17 May, 1766.

(৯) Without the greatest care being taken to prevent Zamindars from carrying in long balances, and defrauding the Government under various pretences, your collections would soon dwindle to a sum insufficient to defray their own charges.—er tLetto Court, 8 September, 1766.

ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায়, জমীদারবংশ আপাততঃ শান্তিলাভ করিলেন।

ক্লাইব স্বদেশে চিরপ্রস্থান করিয়াও হতভাগিনী বঙ্গভূমির স্নেহমমতা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; যাঁহারা বঙ্গভাগ্য শাসন করিতেছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া কোম্পানী বাহাদুরই দেশের রাজা হইয়াছেন; নবাবের আর কোনও ক্ষমতাই নাই,—তিনি কেবল পুরাতন পদগৌরবের ছায়াতলে কালযাপন করিতেছেন! কিন্তু তথাপি এই নাম এবং এই ছায়াকে আমরা যে সত্যই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এইরূপ ভাবে কার্য্য করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।" (১০)

এই রাজনীতির কল্যাণে বঙ্গদেশে যে অরাজকতার সূত্রপাত হইল, ইতিহাসে তাহারই নাম Double Government; যিনি নামে শাসনকর্ত্তা, কাজে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিল না; যাঁহারা কার্য্যতঃ প্রভু, তাঁহাদের কিছু মাত্র দায়িত্ব রহিল না;—বঙ্গভূমি শীঘ্রই অভিনব মহাবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল! কি ইংরাজ, কি মুসলমান,—কেহই প্রজারক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন না; অস্তপথাবলম্বী মোগল প্রতাপ সায়াহ্নের শীতলরশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে মেঘান্তরালে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল; নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উত্থানোন্মুখ বৃটিশপ্রতিভা কেবল বিরহবেদনাই বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! ইংরেজেরা বাণিজ্যলোভে প্রজাসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের অপরাধের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণীকৃত হইতে লাগিল;—কিন্তু হায়! প্রজার রোদনে কেহই কর্ণপাত করিলেন না! জমীদারদল মান সম্ভ্রম এবং জমীদারী-রক্ষার জন্য ইংরেজের করুণাকটাক্ষের আশায়, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন;—জলে স্থলে বাঙ্গালীর কষ্টসঞ্চিত শস্যভাণ্ডার প্রকারান্তরে লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল।

একজন বিখ্যাত ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যে সকল দেশীয় গোমস্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল যে, নবাব এবং রাজপুরুষদিগকেও গ্রাহ্য করিত না;—প্রজাপীড়ন করিত, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, আবার স্বয়ং বিচারক সাজিয়া শাস্তিপ্রদান করিত! এত করিয়াও তাহাদের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হইত না!"(১১)

---

(১০) Clive's letter to the Select Committee, 1767.

দোষ কাহার, তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন ;—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম ইংরাজকবলে, চব্বিশ পরগণা কোম্পানীর খাস তহশিলে, এবং অবশিষ্ট স্থান মহম্মদ রেজা খাঁর নায়েবীর শাসনাধীন ;—এইরূপ ভাবে নূতন শাসন প্রচলিত হইল।

কিছু দিন এইরূপ শোষণকার্য্য চলিতে না চলিতেই বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ! সে মেঘ বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে গ্রামে নগরে প্রাসাদে কুটীরে—সর্ব্বত্র প্রবলপ্রতাপে যেরূপ ভাবে অশনিবর্ষণ করিয়া গিয়াছে, শত যুদ্ধেও সেরূপ সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয় নাই। ইতিহাসে ইহারই নাম "সাতাত্তরের মন্বন্তর।"

বর্গীর হাঙ্গামার শত লুণ্ঠনেও বঙ্গভূমি কাঙ্গালিনী হয় নাই ; সিরাজশাসনের সূচনা হইতে মীর কাশীমের অধঃপতন পর্য্যন্ত যে সকল প্রবল রাজবিপ্লবে বঙ্গভূমি উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত হইতেছিল, তাহাতেও প্রজাপুঞ্জ গৃহবিচ্যুত হয় নাই ; ফিরিঙ্গীর গোমস্তা মহাশয়দিগের নির্দ্দয় নিপীড়নেও শস্যক্ষেত্র তৃণকণ্টকে সমাচ্ছন্ন হয় নাই ;—কিন্তু এই দৈবদুর্ব্বিপাকে সোনার বাঙ্গলা চিরদিনের মত লৌহমূর্ত্তি ধারণ করিল ! ইহাই সেই সর্ব্বজীবভৈরব মহামন্বন্তর !

বাঙ্গালী অন্নগত-প্রাণ ; সুতরাং হলচালনাই তাহার একমাত্র সৌভাগ্যসোপান। এই সৌভাগ্য, আকাশের মেঘ এবং নদ নদীর জলপ্লাবনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিলে, নদ নদী প্রয়োজনানুরূপ জলধারা বহন করিয়া আনিলে, সামান্য শ্রমেই বঙ্গীয় কৃষকের কুটীর-প্রাঙ্গণ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ! সে তাহার বৎসরের অন্নগ্রাস সঞ্চয় করিয়া, অবশ্যদেয় রাজকর পরিশোধ করিয়া, পুত্র কলত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে আর এক বৎসর জীবনধারণ করে। কিন্তু দেবতা বিমুখ হইলে, এক বৎসরেই বহু বৎসরের সুখ সৌভাগ্য ভস্ম হইয়া যায় !

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে সকল কৃষকসন্তান আশা ও উৎসাহের সহিত গ্রাম্য সঙ্গীত গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হলকর্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিল, —উপযুক্ত বর্ষণাভাবে, সুসময়ে জলসেক না পাইয়া, শীঘ্রই তাহাদের আশা ও উৎসাহ উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। হৈমন্তিক ধান্য নষ্ট হইয়া গেল, অগ্নিমূল্য সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে লাগিল। তখনও বাঙ্গালী কৃষকের "গৃহস্থালী" ছিল ; তাহা এখনকার ন্যায় শূন্যভাণ্ডে পরিণত হয় নাই ; সুতরাং এক বৎসরের

হাহাকার করিত না! প্রত্যেক গৃহস্থালীতেই অন্ততঃ তিন বৎসরের আহার্য্য ও বীজধান্য সঞ্চিত থাকিত; সুতরাং কোনও এক বৎসর সহসা অগ্নিমূল্য প্রচলিত হইলেও, তাহাতে কৃষকপল্লী হাহাকার করিত না। এক বৎসর নিরাশ হইয়া পর বৎসরের ফশলের আশায় আবার কৃষককুল হলকর্ষণ করিল; কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৎসর চলিয়া গেল;—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দেও শস্যের আশা নির্ম্মূল হইল।

এবার অভূতপূর্ব্ব বিপৎপাতের আশঙ্কায় কৃষককুল আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাজপুরুষেরা ইংরাজদিগের নিকট সে কথা নিবেদন করিলেন, দীন দুঃখীরা কিছু কিছু অন্নকষ্ট সহ্য করিতে লাগিল;—কিন্তু ইংরাজ দেওয়ান অথবা তাঁহাদিগের মুসলমান নায়েব, কেহই সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না! রাজস্ব—রাজস্ব—রাজস্ব,—ইহাই কেবল তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং রাজস্বসংগ্রহের কিছুমাত্র ক্রটি হইল না!

রাজপুরুষেরা মন্বন্তরের কথা কানে তুলিতে সম্মত না হইলেও, চারি দিক হইতে কেবল সেই এক কথাই তাঁহাদিগের কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম,—সকল দিক হইতেই হাহাকারে দেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! প্রদেশীয় ফৌজদার ও জমীদারগণ ভগ্নহৃদয়ে সেই দুঃখদৈন্যের করুণ কাহিনী রাজদ্বারে বহন করিতে লাগিলেন! যখন কালের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ইংরাজ দেওয়ান এবং তাঁহাদিগের মুসলমান নায়েব সহসা চমকিয়া উঠিলেন;—ইংরাজ সেনার অন্নসংস্থানের জন্য ছলে বলে কৌশলে যথাসাধ্য চাউল ধান গোলাজাত করিয়া, পুনরায় নিপুণহস্তে রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন!

রাজস্বসংগ্রহে এরূপ নির্ম্মম কঠোরতা প্রচলিত হইল যে, রাজা ও জমীদারবর্গ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। যথাকালে রাজস্বপ্রদানে শিথিলতা করিলে পৈতৃক রাজ্য, ধন, মান, সম্ভ্রম,—কিছুই যে অধিকদিন জমীদারবংশের গৌরবরক্ষা করিবে না, সে কথা সকলেই আকারে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা কিছু দিনের অবসর পাইবার জন্য রাজদ্বারে কাকুতি মিনতি জানাইতে ক্রটি করিলেন না। সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না! তখন আত্মরক্ষার জন্য জমীদারগণও নির্ম্মমহৃদয়ে করসংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। কৃষকপল্লীতে হাহাকার পড়িয়া গেল;—দুই বৎসরের শস্যনাশেও তাহারা সম্বলহীন

অন্নেও হস্তক্ষেপ করিতে হইল,—বীজধান্য পর্য্যন্তও বিক্রীত হইতে লাগিল! ইহাই যে মন্বন্তরের প্রধান এবং প্রকৃত দুর্দ্দশার কারণ, তখন কিন্তু কেহই সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের সূচনা হইতেই চারি দিকে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল;—অন্নাভাবের সঙ্গে মহামারী মিলিত হইয়া গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করিল! মহম্মদ রেজা খাঁ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; তিনিও ইংরাজ প্রভুর নিকট দেশের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা, জমীদার ও রাজপুরুষগণ যেরূপ প্রাণের ব্যাকুলতায় রাজদ্বারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলিল না। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তরুণ জীবনে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আত্মীয় স্বজনগণও প্রিয়তম জন্মভূমির স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে শুভাগমন করিয়াছেন; এ দেশে আসিয়া কোম্পানী-দত্ত সামান্য বেতনে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনই চলিত না; সুতরাং সকলেই গোপনে গোপনে স্বনামী বিনামী বাণিজ্য ব্যবসায়ে ইচ্ছানুরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেন! (১২) সকলেই ইহা জানিতেন। কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্য কেহই ইহার গতিরোধ করিতেন না। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কত তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, কত তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ণ আদেশ-লিপি পাঠাইয়াছেন;—কিন্তু কেহই তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। (১৩) দেশময় মহামন্বন্তর জাগিয়া উঠিলে, এই সকল শ্বেতাঙ্গ সওদাগর-গোষ্ঠীর পক্ষে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার সহজ পথ আবিষ্কৃত হইল। তাঁহারা বাহুবলে সুলভ মূল্যে অন্নসঞ্চয় করিয়া, তাহাই আবার ইচ্ছানুরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভিক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য কোনরূপ

---

(১২) When youth embark in your service, at the age of 15 or 16, it can not be reasonably supposed they set out with any fixed principles of moral rectitude.—Holwell's India Tracts, p. 426.

(১৩) Orders against it transmitted to your President and Council of Fort William from the year 1702 to 1756, each of these orders directing, on detection, immediate dismission from the service, and the aggressor to be sent to England on the first returning ship, but notwithstanding these orders, and the utmost vigilance of your Council abroad to prevent this practice, it was found impossible.—A Defence of Mr. Vansittart's Con-

আয়োজন করা দূরে থাকুক, বরং দুর্ভিক্ষ যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহাই ইহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

পাটনার শাসনকর্ত্তা মহারাজ সিতাব রায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"অন্নাভাবের কথা আর কি লিখিব? পাটনার ন্যায় সমৃদ্ধ মহানগরীর প্রকাণ্ড রাজপথে প্রত্যহ পঞ্চাশ জন হতভাগার মৃতদেহ ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছে!" নদীয়া, বর্দ্ধমান, এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতেও এইরূপ সংবাদ আসিতে লাগিল। পূর্ণিয়ার মহম্মদ আলি খাঁ, বিষ্ণুপুরের নবকিশোর, যশোহরের অজাগরমল্ল, রাজমহলের প্রতাপ রায় প্রভৃতি ফৌজদারগণ, প্রতিদিন এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের শোচনীয় সংবাদে রাজপুরুষগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন;—অবশেষে মুর্শিদাবাদ এবং কলিকাতার রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উদরান্ন সংগ্রহ করিবার আশায়, কৃষাণ কৃষাণীরা পুত্র কন্যার হাত ধরিয়া রুক্ষকেশে, শুষ্ককণ্ঠে, শূন্য ভাণ্ড লইয়া রাজদ্বারে সমবেত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, সদাশয় ধনকুবেরগণ কেহ কেহ অর্থসাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু হায়! চারি দিকে যে মহামন্বন্তরের চিতাকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত জাহ্নবীজলও তাহা শীতল করিতে পারিল না। ক্রমশঃ জীবিতের হাহাকারের সঙ্গে মুমূর্ষুর অস্ফুট আর্ত্তনাদ মিলিত হইয়া রাজপথ মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

একজন বর্ণনানিপুণ ইংরাজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালী এমন শান্তস্বভাব যে, আকস্মিক বিপৎপাতেও সে সহসা ধৈর্য্যচ্যুত হয় না! অদম্য হৃদয়বেগ এমন সম্পূর্ণরূপে সংযত করা অভ্যস্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর ক্রোধাগ্নিও সুসংযত;—তাহার প্রবল উত্তাপে হৃদয়স্তর দগ্ধ হইয়া গেলেও বাঙ্গালী সহসা সে কথা দন্তস্ফুট করিতে চাহে না! ইহাদের কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ;—শীতল শান্তিসলিলধারার ন্যায় বংশের পর বংশ বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু একদিনের জন্যও তাহা বাহ্যাড়ম্বরে প্রকাশিত হয় না! পারিবারিক ব্যাপারেই বাঙ্গালীর আত্মগোপনচেষ্টা সমধিক জয়লাভ করিয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে কত অন্নহীন সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে চেষ্টা করিয়াও ভিক্ষাগ্রহণে সম্মত করিতে পারা যায় নাই! কত দরিদ্র পরিবার ধীরে ধীরে মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে,—তথাপি একদিনের জন্যও তাহাদের হাহাকার বাহিরের লোকের কর্ণগোচর হয় নাই! (১৪)

(১৪) Hunter's Annals of Rural Bengal.

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের নিদারুণ গ্রীষ্মকালে শত শত লোকে কালকবলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। কৃষকেরা গোমহিষাদি বিক্রয় করিল, কৃষিযন্ত্রাদি হস্তান্তরিত করিল, বীজধান্য পর্য্যন্তও দুর্ভিক্ষে দগ্ধ হইয়া গেল ;—অবশেষে তাহারা পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু হায়! অল্পদিনের মধ্যেই ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইল!

যতদিন বৃক্ষলতা এবং তৃণপত্র অবশিষ্ট ছিল, তত দিন তাহাতেও কত লোকে জঠরজ্বালার নিবারণ করিল ;—অবশেষে জুন মাসে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেব সংবাদ পাঠাইলেন যে, "জীবিতেরা মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে!" যেখানে রাজধানী বা প্রধান নগর, সেখানেই প্রতিদিন বন্যাতাড়িত জলপ্রবাহের ন্যায় জনস্রোত প্রবেশ করিতে লাগিল ;—অনাহার অনিদ্রার সহিত মহামারী মিলিত হইল! জীবিত এবং জীবন্মৃত নরনারী বালক বালিকা মৃতদেহের সহিত মিলিত হইয়া স্তূপে স্তূপে রাজপথ অবরোধ করিয়া ফেলিল! মৃতের সৎকার, পরমাত্মীয়ের সামাজিক অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি একেবারে পরিত্যক্ত হইল! কাক, শকুনি, শৃগাল, কুক্কুর যে দেশের প্রকৃতি-নিযুক্ত শবখাদক, তাহারাও আত্মকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অশক্ত হইয়া উঠিল!

একজন সমসাময়িক সহৃদয় ইংরাজ কবি মুরশিদাবাদের পথে ঘাটে এই সকল হৃদয়বিদারক শ্মশানচিত্র পরিদর্শন করিয়া হৃদয়ের আবেগে ইংরাজি সাহিত্যে যে সকরুণ কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—যত দিন মানবহৃদয় পরপীড়ায় করুণ বিলাপে অশ্রুবর্ষণ করিতে বিস্মৃত না হইবে, তত দিন তাহা মন্বন্তরের করুণকাহিনী জাগরূক করিয়া রাখিবে! কবি লিখিয়াছেন :—

"এখনো স্মৃতির চক্ষে দেখি সেই ছায়া,
শীর্ণ অঙ্গ, লুপ্ত চক্ষু, প্রাণহীন কায়া!
এখনও শুনি যেন পাতিয়া শ্রবণ,—
মাতৃ-আর্ত্তনাদ সহ শিশুর রোদন!
এখনও জাগে যেন প্রাণের ভিতর
হতাশের হাহাকার,—মর্ম্মভেদী স্বর!
শব সহ শবাকার মুমূর্ষু জীবন
অগণিত স্তূপাকার ;—ভীষণ দর্শন!
এখনও শুনি যেন শকুনি-নিঃস্বন
শৃগাল-চীৎকার সহ কুক্কুর-গর্জ্জন!
অবারিত দিবালোকে ঘেরি চারিধার
শব ধরি কাড়াকাড়ি করে অনিবার!
সে ভীষণ দৃশ্যপট করিতে বর্ণন
মানব-লেখনী স্তব্ধ,—সরে না বচন!
কত বর্ষ গত,—আরো কত বর্ষ যাবে ;
তবু সে স্মৃতির রেখা কভু না মুছিবে!" (১৫)

ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সত্যই সে ভীষণ কাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া মানব-লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে! এই মহামন্বন্তরে বঙ্গদেশের যে কি অভূত-

পূর্ব্ব সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল, কেবল পরবর্ত্তী ইতিহাসই তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম!

বিধাতার মঙ্গলময় নিয়মে ঝটিকার অবসানে শান্তির ন্যায়, দুর্ভিক্ষের অবসানে অনুকূল পবন যথাকালে বারিধারা বহন করিয়া আনিল। কিন্তু হায়! বাঙ্গলার বিজন বনে হলকর্ষণ করিবে কে? হলকর্ষণক্ষম কৃষকপরিবার জীবিত নাই;—একতৃতীয়াংশেরও অধিক লোক অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে! যাহারা জীবিত, তাহারাও শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ, অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ শীর্ণ, গো মহিষ, কৃষিযন্ত্র, এবং বীজধান্যের অভাবে নিরুপায়! এবার চারি দিক হইতেই আশঙ্কার উচ্চরোল উঠিল! ভারতে ও বিলাতে বঙ্গীয় কৃষকের মলিন মুখের দিকে অনেকের স্নেহদৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। রাজস্বসংগ্রহকারী রাজকর্ম্মচারিগণও হতাশনয়নে শূন্যময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হা হুতাশে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন! এত দিন ধনকুবেরদিগের সৌধপাদমূলে নিরন্ন কাঙ্গাল কৃষক "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেছিল; এখন কৃষকহীন বঙ্গভূমির কুবেরসন্তানগণ ভবিষ্যতে রাজকরসংগ্রহের উপায়ান্তর না দেখিয়া, হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন! সুতরাং শীঘ্রই অনুসন্ধান আরব্ধ হইল!

বিপদে পড়িয়া ইংরাজেরাও স্বীকার করিলেন যে, "তাঁহারা এত দিন এ দেশকে জন কতক উদ্যমশীল ইংরাজ-বণিকের পণ্যশালা বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন; এ দেশে যে কোটী কোটী নরনারী বাস করিতেছে, তাহা কেবল আকস্মিক ঘটনামাত্র বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বিপদে পড়িয়া সকলেই বুঝিলেন যে, বাঙ্গালীই বঙ্গদেশের সকল সুখসৌভাগ্যের মূল। এ দেশে আসিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে বাঙ্গালীর সুখ দুঃখে উদাসীন হইলে চলিবে না!" বিধাতার মঙ্গলবিধানে মন্বন্তরের ন্যায় মহা অমঙ্গল হইতেও এ দেশের ভবিষ্যৎকল্যাণের সূচনা হইল; বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের প্রতি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি নিপতিত হইবার সূত্রপাত হইল।

কাহার দোষে লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কাল-কবলে জীবন বিসর্জ্জন করিল, অদৃষ্টবাদী বঙ্গবাসী আর তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। কিন্তু বিলাতের অনুসন্ধানলোলুপ বৃটিশ সওদাগর ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ভারতশাসনকার্য্যে বরণ করিয়া, ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য অতী-

১৭৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিলাতের ডিরেক্টারগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও মন্বন্তরের গতিরোধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু যাঁহারা এরূপ বিপদের দিনেও পরপীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। ইংরাজেরা বাঙ্গলা দেশে আসিয়া ধান চাউলের ব্যবসায় খুলিয়া সমুদায় শস্য গোলাজাত করিয়াছিলেন বলিয়াই যে এরূপ ভয়ঙ্কর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সত্য কথা; কিন্তু তজ্জন্য আমরা কাহাকেও কিছু বলিতে চাহি না। তাঁহারা যে নিরন্ন কৃষকপরিবারকে বাহুবলে বীজধান্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া, তদ্দ্বারা আপনারা অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের ঘৃণাপ্রদর্শনের প্রধান কারণ! এই সকল হৃদয়হীন ইংরেজাধম অর্থলোলুপ ব্যবসায়িগণ যে আমাদিগেরই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীমাত্র, তাহা বুঝিতে আমাদিগের কিছুমাত্র ইতস্ততঃ হয় নাই!" (১৬)

হেষ্টিংস আসিয়া যখন মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আরও কত শোচনীয় কাহিনী প্রকাশিত হইতে লাগিল! তিনি লিখিলেন যে:—"এত বড় মহামন্বন্তরেও রাজস্বসংগ্রহে কিছুমাত্র শিথিলতা করা হয় নাই! এক-তৃতীয়াংশ কৃষক জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, কৃষিকার্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু তথাপি দুর্ভিক্ষশেষে পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে রাজকর সংগৃহীত হইতেছে! যে সকল কারণে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। সেকালে 'নাজাই জমা' নামে একটি রাজকর প্রচলিত ছিল;—স্বগ্রামের কোন কৃষক মৃত কি পলায়িত হইলে, বর্ত্তমান প্রজাদিগকে তাহার দেয় রাজকর অংশানুসারে পূরণ করিয়া দিতে হইত;—ইহারই নাম 'নাজাই জমা!' এই নিয়ম প্রচলিত থাকায় প্রজারা সহজে পলায়ন করিতে পারিত না; কেহ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেও, প্রতিবেশীরাই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইত, কর-সংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারিগণ ভূস্বামীকে প্রতারণা করিয়া রাজকর আত্মসাৎ না করে,—প্রজা থাকুক আর না থাকুক, রাজার রাজস্বসংগ্রহে কিছুমাত্র ক্রটী না হয়, এই জন্য 'নাজাই জমার' প্রচলন হইয়াছিল। সুখের দিনে ইহাতে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু মন্বন্তরের সময়ে ইহাতেই অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।" (১৭)

কিরূপ ভাবে রাজকর সংগৃহীত হইয়াছিল, সরকারী কাগজপত্রে এখনও তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে শস্যনাশ ও দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব-সূচনা; ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ঘনীভূত হইয়া, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মন্বন্তর আনয়ন করে। এই তিন বৎসর কিরূপ অপ্রতিহতপ্রভাবে ইংরাজ দেওয়ান শুভপুণ্যাহান্তে রাজকর সংগৃহীত করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ	...	...	...	...	১৫২৫৪৮৫৩৷/৪৶
১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ	...	...	...	...	১৩১৪৯১৪৮৷৵/৩॥
১৭৭০ খৃষ্টাব্দ	...	...	...	...	১৪০০৬০৩০৷৶/৩॥

১৭৬৮।১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব প্রদান করিবার জন্য প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল;—১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যখন মন্বন্তর পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত, তখনও পূর্ণমাত্রায় রাজকর সংগৃহীত হইয়াছিল! লোকের সর্ব্বনাশ ঘটিতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহাও সুসম্পন্ন হইল! দেশে কৃষক নাই; ক্ষেত্রে হলকর্ষণ নাই; জমীদারীতে কপর্দ্দক আদায় হইবার উপায় দেখা যায় না; অথচ ইংরাজ-রাজ এই দুর্বৎসরে পাকেচক্রে জমীদারদিগের নিকট হইতে ১৫৩৩৩৬৬০৶৴/৯॥ রাজকর আদায় করিয়া লইলেন! এই উপলক্ষে এ দেশের অধিকাংশ রাজা জমীদার সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন!

যে সকল রাজা ও জমীদার রাজস্বদানে অশক্ত হইলেন, তাঁহাদের রাজ্যভোগ বিলুপ্ত হইয়া গেল;—কেহ কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, কাহারও কাহারও পুত্র কলত্র পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল! দুর্ভিক্ষাবসানে বর্দ্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজ ভগ্নহৃদয়ে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন;—তাঁহার ইতিহাস-বিশ্রুত অক্ষয় ভাণ্ডার এরূপ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজসপাত্র বিক্রয় করিয়াও ক্রিয়া সম্পন্ন হইল না; উপরন্তু গবর্মেণ্টের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হইল! নদীয়ার রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপবাহাদুর কোনরূপে প্রাণে প্রাণে পরিত্রাণলাভ করিলেন, কিন্তু এই সূত্রেই তাঁহার রাজ্যনাশের সূচনা হইল! বীরভূমির মহম্মদ জামা খাঁ তরুণ যুবক, এক বৎসরও রাজ্যভোগ করেন নাই;—তাঁহাকে ঋণদায়ে কারাগারে গমন করিতে হইল! বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ মহারাজ দামোদর সিংহ কলিকাতার গোকুল চন্দ্র মিত্রের নিকট লক্ষ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়া পৈতৃক বিগ্রহ মদনমোহন ঠাকুর বন্ধক দিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না;—তাঁহাকেও পলিতকেশে কারাগারে গমন করিতে হইল। (১৮)

এই মহাবিপ্লবে দীনপালিনী রাণী ভবানীকেও নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল! তাঁহার সুশাসনকৌশলে রাজসাহীর বিস্তীর্ণ জনপদ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না; কিন্তু সহজে রাজস্ব প্রদান না করিলে তাঁহাকেও যে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে, এ কথা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করা হইল! কাঙ্গাল সন্তানের দুঃখ দৈন্যে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় রাণী ভবানী চিরদিন অশ্রুমোচন করিয়াছেন; চিরদিন তাঁহার স্নেহধারায় বঙ্গবাসী নরনারী দুঃখে কষ্টে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে;—সুতরাং মহামন্বন্তরে তিনি নীরবে হাহাকার শ্রবণ করিতে পারিলেন না! অকাতরে মুক্তহস্তে রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া প্রজারক্ষা করিতে গিয়া, প্রশংসার পরিবর্ত্তে রাণী ভবানীকে রাজস্বদানের জন্য পুনঃপুনঃ তাড়না সহ্য করিতে হইল! দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বৈদ্যনাথ দুর্ভিক্ষশেষে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ১৩৭০৯৩২ টাকা রাজস্বের মধ্যে ১২০০০০০ টাকা পরিশোধ করিয়া, অবশিষ্ট রাজস্বপ্রদানের জন্য কয়েক মাস অবসর প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—এই অপরাধে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল যে, "রাজা যদি কোম্পানীর প্রাপ্য পূর্ণ রাজস্ব প্রদান করিতে শিথিলতা করেন, তবে তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় কলিকাতায় আগমন করিতে হইবে!" প্রতিবেশীর দুর্দ্দশার সমাচার অবগত হইয়া রাণী ভবানী আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পাইলেন না;—যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে রাজ্যরক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকেও রাজভাণ্ডার শূন্য করিতে হইল!

রাণী ভবানী কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যরক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্নজলের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা কেবল ইংরাজের জীর্ণ দপ্তরে কীটদষ্ট হইতে লাগিল; "সবিশেষ প্রতিভাশালিনী" বলিয়া শূন্যগর্ভ প্রশংসাবাণী লাভ করিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল! দুর্ভিক্ষের সূচনায় বুদ্ধিমতী মহারাণী অন্নসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া রাজকোষ শূন্যপ্রায় করিয়াছিলেন। রাজসাহীর ইংরাজ কালেক্‌টার রৌস্‌ সাহেব লিখিয়া গিয়াছিলেন যেঃ—"দেশে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, কেবল একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা সুপ্রকাশিত হইবে! রাজসাহী অঞ্চলের লোকে বোধ হয় কখনও অন্য স্থান হইতে ধান চাউলের আমদানী করে নাই;—এবার তাহাও করিতে হইয়াছে!" রাণী ভবানী প্রজারক্ষার জন্য মুরশিদাবাদ এবং দিনাজপুর হইতে অগ্নিমূল্যে চাউল ধান ক্রয় করিয়া স্বরাজ্যে তাহাই টাকায়

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তখন চারি দিকে অন্নছত্র খুলিয়া অকাতরে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজভাণ্ডার হইতে রাজস্ব প্রদান করিয়া, জলহীন স্থানে জলাশয় খনন করাইয়া, অন্নহীন নরনারীকে অন্নজল বিতরণ করিয়া, রুগ্নশয্যাপার্শ্বে ঔষধ পথ্য প্রেরণ করিয়া, রাণী ভবানী কিরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল একটিমাত্র কথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে ;—"রাজধানী মুরশিদাবাদে যখন টাকায় তিন সের চাউল, ভবানীর অন্নছত্রে তখন লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নজল উপভোগ করিতেছিল!" এই পুণ্য-কাহিনী বর্ণনা করিবার জীবিত সাক্ষী বর্ত্তমান নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাসে এমন "অন্নপূর্ণার অবতার" কেহ কখন দেখে নাই, দেখিবে না! সাতাত্তরের মন্বন্তরের অবসানে মাতা অন্নপূর্ণাকেও অন্নহীনা হইয়া উত্তরকালে গবর্মেণ্টের মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া, কাঙ্গালিনীর ন্যায় গঙ্গাতীরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল! যখন তাঁহার দেহাবসান হইল, তখন ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহার হৃতসর্ব্বস্ব নামাবশিষ্ট নাটোরাধিপতি পৌত্র কুমার বিশ্বনাথ রায় বাহাদুর ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সরকারী পুস্তকে (১৯) এইরূপ লিখিত আছে :—

"Letter from collector of Murshidabad, transmitting a petition from Kumar Biswa Nath Rai, praying assistance of Government towards defraying the expense of the funeral obsequies of his deceased grand-mother, the late Rani Bhabani."—"Letter to collector of Murshidabad in reply *declining* to recommend the application of Kumar Biswa Nath Rai to be complied with."

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি বৈদেশিকগণ কর্তৃক বহুবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। আততায়ীর তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে, অনেক নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত-স্রোতে ধরাতল প্লাবিত হইয়াছে ; সমুন্নত সৌধ ও সুখময় কুঞ্জ শ্মশানে পরিণত

হইয়াছে; দেবমন্দির কলঙ্কিত ও বিদ্ধস্ত হইয়াছে। মহম্মদ গজনী, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান দস্যুগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শস্যশ্যামল ভারতকে কতবার মরুভূমি করিয়া গিয়াছে; কিন্তু দিল্লীর অধঃপতনকালে কঠোরহৃদয় নরপিশাচ নাদির শাহ ভারতে প্রবেশ করিয়া যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। নাদির শাহের আক্রমণেই ভারত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার অনুষ্ঠিত দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বর্ণনা করিতে হৃদয় অবসন্ন হয়, লেখনী থামিয়া আসে। নাদির শাহ ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় লুণ্ঠিত উৎপীড়িত ভারতবর্ষকে হৃতসর্ব্বস্ব মধুচক্রের ন্যায় কিরূপ নিষ্পিষ্ট অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের গ্রন্থ-অবলম্বনে আমরা তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি; কিন্তু দিল্লীর লুণ্ঠন-কাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, নাদির শাহের অভ্যুদয় ও তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

নাদির শাহ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খোরাসানের রাজধানী মাসাদ নগরের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে দাস্তগাড়ের দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ইমাম সাহ দাস্তগাড়ের দুর্গপতি ছিলেন। উজবেগ তাতারগণের আক্রমণ হইতে খোরাসান প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্যই এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নাদির শৈশবকালেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য দুর্গের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। নাদির বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও এই পৈতৃক অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। যুবক নাদির পিতৃব্য কর্ত্তৃক ভিক্ষুকের ন্যায় দুর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মাসাদের যুবরাজ ইমাম আলি রাজার অধীনে সেনানায়কের পদ লাভ করেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সের সময় উজবেগগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া লইয়া যায়। চারি বৎসর তাহাদের অধীনে ক্রীত-দাসের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া তিনি পলায়ন করেন, এবং ক্রমে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী অনুচরের সাহায্যে একটি পরাক্রান্ত দস্যুদল সংস্থাপন করিলেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শাহ তমাস্প্ পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে শিশু ও দুর্ব্বল দেখিয়া রুস ও তুরুস্ক একযোগে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তমাস্প্ কাস্পিয়ান সাগরের প্রান্তদেশে পলায়নপূর্ব্বক কাজর নামধারী পরাক্রান্ত দস্যুদলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মেষপালন ইহাদের ব্যবসায় ছিল, এবং নাদির শাহ

ইহাদের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উৎসাহশীল যুবক নাদিরের হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল; তিনি তমাস্পকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

রাজকুমার তমাস্পের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক নাদির বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তমাস্পের প্রতিপক্ষ খিলিজীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ক্রমে খোরাসান, মাজিন্দারান, সিস্তান, কিন্‌মার্ক প্রভৃতি প্রদেশ নাদির শাহের পদলুণ্ঠিত হইল। তিনি তমাস্পকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিলেন, এবং স্বয়ং তমাস্প কুলি খাঁ (অর্থাৎ তমাস্পের ভৃত্য) এই পদবী গ্রহণপূর্ব্বক এই বর্দ্ধিতায়তন রাজ্যের সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তুর্কীদিগের উপর নাদিরের রোষদৃষ্টি পতিত হইল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি হিরাট নগর অবরোধ করেন; দশ মাস কাল অবরোধের পর নগর বিজিত হইল। এই সময় তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত শিয়া ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া "সুন্নি" মত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই সাম্প্রদায়িক মত পরিত্যাগ করাতে, তিনি 'আবদালা'দিগের যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হন, এবং ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্যতম কারণ।

হামদাদ নগরের তুর্কিদিগকে জয় করিয়া তিনি আর্ম্মেনীয় প্রদেশসমূহে একাধিপত্য লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি পরাজিত তুর্কীরাজের শিশু পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। এই শিশুরাজের নাম তৃতীয় আব্বাস। তিন বৎসর বয়সের সময় এই বালকের মৃত্যু হইল। সৈন্যগণের সম্পূর্ণ অনুরাগভাজন হইলেও তিনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন না; ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সহিষ্ণুতার সহিত অতি সতর্কভাবে কালপাত করিতে লাগিলেন। ইহার অল্প কাল পরে, মরঘাব নগরে তিনি এক প্রকাণ্ড দরবারে রাজ্যের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি, প্রজা এবং সৈন্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন। এই দরবারস্থলে এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে পারস্যের অধিপতিরূপে বরণ করিল, কিন্তু তিনি বাহিক উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক সমাগত জনগণের প্রদত্ত রাজমুকুট রোমান বীর জুলিয়াস সিজরের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি এই রাজসম্মান প্রদর্শনের জন্য সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, ঈশ্বরের আদেশক্রমেই তিনি শিয়ামত দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করি-

একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা হউক, ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি প্রকাশ্যভাবে পারস্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ এবং স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এই মুদ্রার একদিকে লিখিত ছিল;—

"পৃথিবীপালনকর্ত্তা পারস্যের নাদিরের মুদ্রা ধরায় তাঁহার সাম্রাজ্য ঘোষণা করিতেছে।"

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে একটি গোলাকার চক্রের মধ্যে লিখিত ছিল,—

"যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

নাদির শাহ তমাস্পের এক ভগিনীর সহিত তাঁহার প্রথম পুত্রের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন দেশের পরাজিত রাজগণের সহিত বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তিনি অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন; এমন কি, দিল্লী ও বোখারার রাজপরিবারেও তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

নাদিরের কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহসী হইত না। একদা তিনি রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান মোল্লাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজস্ব হইতে যে প্রচুর অর্থ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন? মোল্লাগণ উত্তর দিলেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য, অর্থাৎ দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার, মোল্লাদিগের বেতন, ধর্ম্মমন্দিরসমূহের রক্ষা ও সংস্কারের নিমিত্ত এই অর্থ ব্যয়িত হয়। নাদির আদেশ করিলেন, এই অর্থ অতঃপর সৈন্যদিগের পোষণে ব্যয় করা হইবে; তাহারাই দেশের রক্ষক, মোল্লাগণের নমাজ ও প্রার্থনায় দেশরক্ষা হয় না। ধর্ম্মকর্ম্মে যে অর্থব্যয় হইত, তাহা হইতে এত টাকা সৈন্যগণের ব্যয়ভারবহনের জন্য প্রদত্ত হইল যে, রাজকোষে বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা উদ্বৃত্ত হইল।

পারস্যের যে অংশ শত্রুহস্তগত হইয়াছিল, তাহা হস্তগত করিয়া নাদির শাহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তিনি অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া কান্দাহার আক্রমণ করিলেন। এই সময় হোসেন খাঁ খিলিজী নামক এক ব্যক্তি কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নাদির শাহকে নগরে প্রবেশ করিতে দেন নাই, কিন্তু অবশেষে অবরুদ্ধ নগর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইল;—১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার পারস্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। নাদির শাহ কান্দাহারে যে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এই মুদ্রার এক দিকে লিখিত ছিল;—"নাদির শাহ"; অন্য দিকে,—"পরমেশ্বর তাঁহার রাজ্যে মঙ্গল বিধান করুন। কান্দাহারে মুদ্রিত।" এই কয়েকটি অক্ষর মুদ্রিত

কান্দাহার অবরোধের সময় কয়েক জন আফগান ভারতবর্ষে পলায়ন পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ সমস্ত আফগান জাতির উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য আলি মর্দ্দান খাঁকে দূত-রূপে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক পলায়িত আফগান-দিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করেন। সম্রাট পারস্য রাজদূতকে বিশেষ সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, বিদ্রোহী আফগানদিগকে শীঘ্রই প্রেরণ করা হইবে। এই কথায় বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক পারস্য রাজদূত দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু মহম্মদ শাহ তাঁহার অঙ্গীকারপালনে কিছুমাত্র মনোযোগ প্রকাশ করিলেন না; অনন্তর নাদির শাহ পুনর্ব্বার মহম্মদ খাঁ নামক আর এক ব্যক্তিকে দূতরূপে দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। দিল্লীশ্বরের এই ঔদাস্য দেখিয়া নাদির শাহ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তৃতীয় দূত প্রেরিত হইল; নাদির এই দূতকে আদেশ করিলেন, যেন তিনি চল্লিশ দিনের অধিক কাল দিল্লীনগরে না থাকেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে প্রায় এক বৎসর কাল দিল্লী নগরে বসাইয়া রাখিলেন। এই সময় দিল্লীর সম্রাট দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; নাদির শাহের অনুরোধের কথা তখন তাঁহার মন হইতে একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ নাদিরকে তিনি সমযোগ্য ব্যক্তি বলিয়াও মনে করিতেন না। সুতরাং নাদিরের অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইল। নিজাম উলমুল্‌ক ও সাদাত খাঁ নামক দুই জন ওমরাহ কোনও কারণে দিল্লীশ্বরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; তাহারা নাদির শাহকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়া পত্র লিখিল।

এই পত্র পাইয়া উৎসাহপূর্ণ-চিত্তে নাদির ভারতবর্ষ আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাঁহার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ, তাঁহার সম্মান, দিল্লীশ্বরের ধন-গৌরব ও রাজক্ষমতার ছায়ায় পড়িয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; তিনি তাই দিল্লীর সিংহাসনে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কাজীলবাসী, জর্জ্জিয়ান, খোরাসানী, তুর্কী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সেনাগণ তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক লক্ষ পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবিজয়োদ্দেশে নাদির কান্দাহার ত্যাগ

গজনীর শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। সেই উদ্দাম তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান পারস্য অনীকিনীর গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অনন্তর নাদির কাবুলে প্রবেশ করিলেন।—সার্দ্দিল খাঁ নামক সপ্ততিবর্ষীয় একজন বৃদ্ধ আমীর তৎকালে কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কাবুলের প্রধান প্রধান অধিবাসিগণ বৃদ্ধ নাদির শাহের যথাযোগ্য সম্মান অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তেজস্বী বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার পুরীপ্রবেশে বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। ভয়ে বা প্রলোভনে, কিছুতেই সেই স্বদেশহিতৈষী বৃদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না। ছয় সপ্তাহ কাল নাদির শাহকে সসৈন্যে নগরপ্রান্তে অতিবাহিত করিতে হইল। তখন নাদির শাহ সার্দ্দিল খাঁর বিরুদ্ধে এক ঘোরতর ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। এক জন কপটবন্ধুকে যেমন তিনি পুরদ্বার খুলিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নগরে অভ্যর্থনা করিবেন, সেই অবসরে সে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল; নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল; সার্দ্দালের দুই পুত্র নগররক্ষার জন্য প্রাণপণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; মাতৃভূমিরক্ষার জন্য পিতা ও পুত্রদ্বয়ের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। কাবুলের রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া নাদির প্রায় তিন কোটী টাকা নগদ এবং প্রায় দুই কোটী টাকা মূল্যের বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছাদিও তাঁহার হস্তগত হইল।

নাদির শাহ সাত মাস কাবুলে অতিবাহিত করিলেন; ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্যোগেই তাঁহার কাল কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নাদির মোগল সম্রাটের নিকট আর এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে দিল্লী পর্য্যন্ত পঁহুছিতে হয় নাই; জেলালাবাদের শাসনকর্ত্তা আব্বাস খাঁর হস্তে তাহার মৃত্যু হয়; দূতের মৃত্যুসংবাদে নাদির ক্রোধে অধীর হইয়া জেলালাবাদ আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে আব্বাস খাঁর পতন হইল; তাঁহার পরিবারবর্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নাদির শাহের পটমণ্ডপে প্রেরিত হইলেন।

অনন্তর নাদির শাহ পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাসির খাঁ পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, শিকার, নমাজ ও কোরাণ পাঠ করিতেই তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন,—নাদির শাহের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি বিষম ভীত ও চিন্তিত হইলেন, এবং দিল্লীশ্বরের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সে সময় ষড়যন্ত্রকারীদিগের চক্রান্তে দিল্লী হইতে একটি সৈন্যও

প্রেরিত হইল না। তথাপি নাসির খাঁ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যাহা সাধ্য, তাহা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি সাত সহস্র আফগান ও ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খাইবারপাশ রোধ করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সাত সহস্র সৈন্য উন্মত্ত অসংখ্য পারসীকের বিরুদ্ধে কি করিবে? নাসির খাঁর সৈন্যগণ কেহ ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় অকম্পিতহৃদয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। নাসির বন্দী হইলেন।

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নাদির শাহ দিল্লীর সম্রাটের একটি একখানি পত্র প্রেরণ করেন; পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ:—মহাশয়ের সহিত সৌহৃদ্যস্থাপনোদ্দেশে এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মে আন্তরিক অনুরাগপরশতঃই আমি কাবুলে আসিয়া উক্ত নগর অধিকার করিয়াছি; আমাদের রাজগণের সহিত মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের যে বন্ধুতা ছিল, তাহার কথা ইতিহাসে প্রচুর বর্ণিত আছে। আলি মর্ত্তাজার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার সহিত বন্ধুতাস্থাপন এবং ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন আমার ভারতযাত্রার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আপনার বিখ্যাত এবং সম্ভ্রান্ত বংশের আমি এতাবৎ কাল সুহৃদ ছিলাম, চিরকাল থাকিব।"

বর্ষাকালে নাদির সিন্ধুনদী পার হইলেন, নদী উচ্ছ্বসিত এবং স্রোত প্রবল হইলেও, নদী পার হইতে তাঁহাকে বিশেষ কোন অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই। পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই তিনি সৈন্যগণকে দেশলুণ্ঠনের আদেশ দান করিলেন। পারসীক সৈন্যগণ স্বর্ণভূমি লুণ্ঠন করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র গৃহ জ্বালাইয়া দিল; শান্ত নিরপরাধীকেও অসঙ্কোচে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। ধনধান্যপূর্ণ সুখের মনোরম উপবন পঞ্চনদ প্রদেশে যে গভীর ভীতি, যে করুণ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের আরম্ভ হইল, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিছু কালের জন্য লোকের জীবন বিপন্ন হইল, এবং সকলেই সশঙ্ক অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। পশুত্বের বিজয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল।

মির্জ্জা মাধি বলেন, নাদির অসংখ্য তুর্কী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় মহাগর্জ্জনে প্রথমে ঝিলাম এবং তৎপরে চিনাব নদী অতিক্রম করিলেন। এই সময়ে লাহোরের সহকারী শাসনকর্ত্তা কালোন্দর খাঁ দশ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত ইমানাবাদে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; একদিন রাত্রিকালে তিনি অতর্কিতভাবে নাদির শাহের সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। পঞ্জাবের

শাসনকর্ত্তা জাকারী খাঁ পূর্ব্ব হইতেই বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া লাহোরের দশ ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। জাকারী খাঁর পতনসংবাদে ভীত চিত্তে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পারস্য সৈন্যগণ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী অরক্ষিত গ্রাম ও নগরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া, অধিবাসিবর্গকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিবসে পারস্যরাজ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন; নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইয়া তিনি দেখিলেন, লাহোরের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধ উপস্থিত হইল, লহোরের শাসনকর্ত্তা এবং তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল। শালীমার নামক উপবনে নাদির শাহের সৈন্যদিগের আড্ডা হইল।

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া লাহোরের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা আজুদ্দৌলা নবাব জাকারী খাঁ বাহাদুর শাহের কৃপা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন; শাহ তাঁহাকে দূতমুখে নিমন্ত্রণ করিলেন। এবং জাকারী খাঁ শাহের পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলে শাহ কর্ত্তৃক পরমসমাদরে গৃহীত হইলেন; মূল্যবান পরিচ্ছদ, রত্নমণ্ডিত তরবারি, এবং সুদৃশ্য অশ্ব তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইল। জাকারী খাঁ নাদির শাহকে রাজকোষ হইতে বিশ লক্ষ টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন। প্রধান প্রধান অধিবাসিবর্গের নিকট হইতেও বহু মুদ্রা হস্তগত হইল। জাকারী খাঁ লাহোরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; নাগরিকবর্গের মান সম্ভ্রম ও জীবন এইরূপে রক্ষিত হইল। ২৯ শে ডিসেম্বর তারিখে নাদির লাহোর ত্যাগ করিলেন। লাহোর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই মুদ্রার একদিকে লিখিত ছিল:—"সুলতান নাদির";—অপর পৃষ্ঠায়:—"১১৫১ খৃষ্টাব্দে রাজধানী লাহোরে মুদ্রিত হইল, পরমেশ্বর তাঁহার রাজ্য সুরক্ষিত করুন!" এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র সাত শত বন্দী আনীত হইয়াছিল; নাদিরের আদেশে অতি নৃশংসরূপে তাহারা নিহত হইল।

১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নাদির দিল্লী নগরের অদূরবর্ত্তী কার্ণাল নামক সমতল ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পূর্ব্ব হইতেই সসৈন্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেনাপতিবর্গের মধ্যে বর্হান-উল-মুলক, অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদত খাঁ, প্রধান সেনাপতি খাঁ-ই-হুরান খাঁ, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা আসফ্জা-নিজাম-উল্-মুলক, এবং প্রধান উজির কামরুদ্দি খাঁ, দিল্লীশ্বরের উন্নত পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ

পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী; নাদির শাহের সৈন্য সংখ্যায় অনেক কম হইলেও তাহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহ, সাহসী; সুতরাং দিল্লীর সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না। সাদত খাঁ প্রথমেই রণে ভঙ্গ দিলেন। রণক্ষেত্রের এক দিকে তুমুল কলরব উত্থিত এবং অসংখ্য সৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও খাঁ-ই-দুরান খাঁ অটলভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন; শীঘ্রই তিনি আহত হইয়া পড়িলেন; সাদত খাঁ বন্দী হইলেন। দুরান খাঁর ভ্রাতা নফজ্জল খাঁ, তাঁহার পুত্র আলি এবং রাজা জগমল নব বলে উদ্দীপ্ত হইয়া পারসীক-দিগকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না। এই আহবে দশ সহস্র ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের হৃদয়-শোণিত বিসর্জ্জন করিল, দিল্লীশ্বরের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দশ জন রাজা, শতাধিক সর্দ্দার এবং ত্রিশ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল। বিজয়োন্মত্ত নাদির শাহ দিল্লীশ্বরের আশ্রয়স্থলের চতুর্দ্দিকের পথ ঘাট অবরুদ্ধ করিলেন।

এক মাস এই অবস্থায় কাটিয়া গেল; উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট মহম্মদ শাহ রাজমুকুট ও রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ী বীরের কৃপাভিলাষী হইলেন। নাদির শাহের নিকট পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক একদিন তিনি প্রধান উজীর, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া নাদির শাহের বস্ত্রাবাসের সম্মুখীন হইলেন। নাদিরের পুত্র নাসুরুল্লা মির্জা পিতার দূতস্বরূপে সম্রাটকে অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট বস্ত্রাবাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, নাদির শাহ মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন; উভয়ে এক মস্‌নদের উপরই উপবিষ্ট হইলেন। জলযোগের আয়োজন চলিতে লাগিল; একজন ভৃত্য পাত্রপূর্ণ কাফি লইয়া নাদির শাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি স্বহস্তে কাফি লইয়া সম্ভ্রমের সহিত মহম্মদ শাহকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন, আমরা উভয়েই পরস্পরের ভ্রাতা; আপনি সুখে ভারত সাম্রাজ্য ভোগ করুন।" নাদির শাহের সহিত সম্রাটের কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ চলিল; উভয়েই পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা এবং সৌহৃদ্য প্রদর্শন করি-লেন; কথাপ্রসঙ্গে নাজির শাহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, "অসভ্য মহারাষ্ট্রগণ প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের নিকট চৌথ আদায় করিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" সম্রাট নাদির শাহের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন, "যদি আমি আপনার অনুরোধপালনে বিলম্ব না করিতাম, তাহা হইলে আপনার দর্শন-

সুখলাভে সক্ষম হইতাম না।" এই মধুরালাপে নাদির শাহের কোমলতাহীন কঠোর মুখমণ্ডলে শুষ্ক হাস্যের উদয় হইল।

অনন্তর নাজির শাহ তাঁহার উজিরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। পরামর্শ শেষ হইলে পূর্ব্ব কক্ষে প্রতিগমন পূর্ব্বক সকলকে জ্ঞাত করিলেন, মহম্মদ শাহ পারস্য সাম্রাজ্যের কোন অপকার করেন নাই, তিনিও ভারতবর্ষকে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু এই যুদ্ধে নাদির শাহের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা দিল্লীশ্বরকে বহন করিতে হইবে। নাদির শাহ কয়েক দিন দিল্লীতে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম করিবেন; দেয় অর্থ প্রাপ্ত হইলেই তিনি সসৈন্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন।

মহম্মদ শাহ পরিবারবর্গের সহিত নাদিরের "নজরবন্দী" হইয়া রহিলেন; তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে পারসীক অশ্বারোহিগণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অনন্তর দুর্গের ও সম্রাটের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত ধনভাণ্ডারের চাবি নাদির শাহের হস্তে সমর্পিত হইল। সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া নাদির শাহ মহা সমারোহে দিল্লী যাত্রা করিলেন; গৌরব-বিচ্যুতা দিল্লী নগরী তাহার হৃদয়ের ক্ষত এবং নিদারুণ অপমান লোহিত বস্ত্র ও বহুমূল্য অলঙ্কারে সমাবৃত করিয়া বিজয়ী বীরকে মহাসম্মানে গ্রহণ করিল। দিল্লীর প্রত্যেক শূন্য গৃহ, দুর্গের প্রত্যেক কক্ষ, পারসীক সৈন্যের উচ্ছ্বসিত কোলাহল এবং বিজয়নিনাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

দিল্লী নগরে উপস্থিত হইয়া নাদির শাহ দিল্লীশ্বরের নিকট যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পঞ্চবিংশতি কোটী মুদ্রার দাবী করিলেন; মোগল গৌরব-রবি ভারতাকাশে সমুদিত হইবার প্রারম্ভকাল হইতে এতদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত বহুমূল্য হীরক, রত্ন এবং পুঞ্জীভূত স্বর্ণমুদ্রা দিল্লীর নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাজকীয় ধনাগারে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, নির্ব্বোধ দুর্ব্বল মহম্মদ শাহ, হৃদয়শোণিত অপেক্ষাও মূল্যবান, ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ সেই সকল ধন রত্ন নাদির শাহের চরণমূলে সমর্পণ করিলেন। ভারতের অদ্বিতীয় রত্ন কহিনূর, শিল্পনৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষের পরিচয়স্থল, ভারতের চিরকীর্ত্তিস্বরূপ, অপূর্ব্ব ময়ূরসিংহাসন নাদির শাহের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্রাটের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; কিন্তু তিনি আপনার জীবন ও রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য, নাগরিকবর্গের মান ও প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাহাও নীরবে সহ্য করিলেন; কিন্তু হায়! যাহার

মহম্মদীয় পার্ব্বণ ঈদ উপস্থিত হইল; দিল্লীর শ্রেষ্ঠতম মিনারে দিগ্‌বিজয়ী নাদির শাহের নামে "খুৎবা" পঠিত হইল; তিনি স্বনামে মুদ্রা মুদ্রিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই মুদ্রার একদিকে লিখিত হইল:—

"ঈশ্বরানুগৃহীত নাদির পৃথিবীতে রাজরাজেশ্বর এবং প্রভুর প্রভু।"

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল:—

"পরমেশ্বর তাঁহার রাজত্বকাল দীর্ঘ করুন, জাহানাবাদে শাহকে পরাস্ত করা হইল।"

নাদির শাহ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এবং সৈন্য-গণের মধ্যে কেহ যাহাতে কোনও নাগরিকের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন।

সময় নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু দিল্লীবাসিগণ দেবতার অভিসম্পাতে পড়িয়াছিল; বিধি-নির্ব্বন্ধে হঠাৎ এমন এক ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হইল, যাহার রোমাঞ্চকর কাহিনী অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রুধির-রঞ্জিত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

ঈদের পরদিন একজন কপোতপালক কয়েকটি পারাবত লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল; একজন উদ্ধত কলহপ্রিয় পারসীক সৈন্য তাহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কপোত গ্রহণ করে; এই ঘটনায় নাগরিকবর্গ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কপোতপালক সকলের নিকট প্রকাশ করিল, নাদির শাহ তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি দিল্লীলুণ্ঠনের ভার অর্পণ করিয়াছেন; এই কথা শুনিয়া সাধারণের মধ্যে গভীর কলরব উত্থিত হইল; নগরের বিভিন্ন স্থানে যে সকল পারসীক বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল; অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইতিমধ্যে নগরে জনরব প্রচারিত হইল যে, নাদির শাহ নিহত হইয়াছেন। এই জনরবে সাধারণের অবরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি বায়ুতাড়িত দাবানলের আকার ধারণ করিল। নগরে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। পারস্যবাসিগণ দিল্লীবাসীর হস্তে দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে এক দল উন্মত্ত নাগরিক রাজকীয় অশ্বশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সহিস ও মাহুতদিগকে বিনষ্ট করিল। মধ্যরাত্রে নাদির শাহের কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল; নিদ্রোত্থিত শাহ সক্রোধে বলিলেন, আমার কর্ম্মচারিবর্গ স্বার্থপরবশ হইয়া নাগরিকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে; তাহাদের ইচ্ছা, আমি নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিবার আদেশ দান করি। কর্ম্মচারিগণ বিশেষ নির্ব্বন্ধ

করিলে, শাহ তাহাদিগকে সে রাত্রে কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যূষে নাদির শাহ অশ্বারোহণে প্রাসাদ হইতে চাঁদ্নি চকে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরিকগণ শান্ত হইবে, এবং তাহাদের সন্ধুক্ষিত ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে; কিন্তু নাগরিকবর্গ তখন উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন। নাদির শাহ পথপ্রান্তে তাঁহার স্বদেশীয়গণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত দেখিলেন; ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও একদলমাত্র সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহনিবারণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহা বৃথা হইল। উদ্ধত নাগরিকগণ পারসীক সৈন্যবর্গের উপর তীর ও বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। নাদির শাহ তখন নবনির্ম্মিত রোসনউদ্দৌলা নামক হর্ম্ম্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজাম-উল্-মুলক, সারবুলান্ত খাঁ, প্রধান উজির ও কাম-রুদ্দিন খাঁ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলেন। ওমরাহবর্গ প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইয়া নত-জানুভাবে কোরাণ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এই বিভ্রাটের কোনও কারণই অবগত নহেন। এই কথা শুনিয়া নাদির শাহের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু আজ দুর্দ্দিনে সূর্য্যোদয় হইয়াছিল; কোন্ অট্টালিকা হইতে একজন নগরবাসী নাদির শাহকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিল; শাহের একজন পার্শ্বচর সেই আঘাতে নিহত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নাদিরের মুখমণ্ডল পৈশাচিক ভাব ধারণ করিল; সক্রোধে গর্জ্জনপূর্ব্বক তিনি অসি নিষ্কাশিত করিলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তে শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লী নগরকে শ্মশানে পরিণত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। নগর শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, নাদির শাহের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র পুনর্ব্বার রক্তপাত আরম্ভ হইল। সমুন্নত সৌধের সুপরিচ্ছন্ন নিষ্কলঙ্ক প্রাঙ্গন হইতে শোণিতস্রোত রাজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল; আগ্নেয়াস্ত্রের গভীর নির্ঘোষে দিল্লীনগর মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া উঠিল। ধনী ও দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, যুদ্ধকুশল বীর ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কিম্বা বালক বালিকা, কাহারও আজ অব্যাহতি নাই। প্রতিহিংসা-পরায়ণ উন্মত্ত পারসীক সৈন্যগণ সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ করিতে লাগিল; সুন্দর সুশোভিত হর্ম্ম্যশ্রেণী ভস্মীভূত হইতে লাগিল; দলে দলে নাগ-

করিল। রৌসনউদ্দৌলার বাতায়নসন্নিকটে উপবেশন করিয়া নাদির শাহ গম্ভীরমূর্ত্তিতে এই প্রলয়-ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার হৃদয়ে দয়া নাই, সমস্ত বিশ্বে কাহারও প্রতি সম্মান কিম্বা করুণা নাই, আজ তিনি নির্ব্বাক, নিশ্চল; সমগ্র দিল্লীবাসীর কঠোর ভাগ্যের নিয়ন্তা। প্রভাতে হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছিল, মধ্যাহ্নের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ লোক নিহত হইল। পারসীক সৈন্যগণ সম্মানিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিবারের যাহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাইল, সেই অবস্থাতেই নিহত করিল। যাহাদের আত্মসম্মানের ভয় ছিল, তাহারা অবমাননার আশঙ্কায় সপরিবারে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক আত্মাহুতি দান করিল; প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অনেকে গভীর কূপে ঝম্প প্রদান করিল, কিন্তু প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না। চাঁদ্‌নি চক, দেরিবা বাজার, জুম্মা মস্‌জিদের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুন্নত অট্টালিকাশ্রেণী ভস্মস্তূপে পরিণত হইল; ধূম, ভস্মরাশি এবং গৃহদাহের শব্দে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাজপথে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া যায় না; মহাঝটিকার পর বৃক্ষরাজির পত্রসমূহ শাখাচ্যুত হইয়া যেরূপ বৃক্ষমূল আবৃত করে, মৃতদেহেও সমস্ত রাজপথ সেইরূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি একটি প্রাণীও নাদির শাহের নিকট উপস্থিত হইয়া নগরের উদ্ধারের জন্য তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে সাহস করিল না। অবশেষে কম্পিতকায়, নির্ব্বাক সম্রাট, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, নিতান্ত দীন বেশে, অবনত নয়নে, সঙ্কুচিত ভাবে শাহের সম্মুখীন হইলেন, এবং সকলে নতজানু হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা পূর্ব্বক বলিলেন :—

"কাসে নমানদ্ কে দিগর্ বেঃ তেগ্ নাজ কোশি
মগার কে জেন্দা কুনি খালকারা উ বাজ কোশি।"

অর্থাৎ, "প্রতিহিংসাপূর্ণ তরবারি হইতে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই। যদি অধিকতর ধ্বংস আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিদিগের দেহে নব প্রাণের সঞ্চার করিয়া হত্যাকাণ্ডের পুনরারম্ভ করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া নাদির শাহ তাঁহার উন্মুক্ত অসি কোষনিবদ্ধ করিয়া নগরে শান্তিস্থাপনের আদেশ প্রচার করিলেন। অনন্তর তিনি দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক যে সকল ওমরাহকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রতিহিংসাস্পৃহার নিবৃত্তি হইল না; তাঁহার আদেশে দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের সহস্র সহস্র

প্রথমে বিদ্রোহ সমুত্থিত হইয়াছিল, বিনা বিচারে তত্রত্য সাত শত লোকের নাসা কর্ণ ছেদন করা হইল। তাহার পর তিনি দিল্লীর প্রাসাদ এবং গুপ্ত ধনাগারসমূহ লুণ্ঠন পূর্ব্বক যে কিছু মূল্যবান ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেন, তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলেন; প্রধান প্রধান ওমরাহবর্গকেও সর্ব্বস্বান্ত করা হইল। তাঁহাদের গুপ্তধন হস্তগত করিবার জন্য সেই সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রতি ও প্রতিষ্ঠাভাজন বণিকগণের উপর যেরূপ কঠোর উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী কম্পিত ও অবসন্ন হইয়া উঠে। এই অত্যাচারে বহুসংখ্যক লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। নিদ্রাদেবী কিছুকালের জন্য দিল্লী নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অন্তঃপুরের উচ্চ অবরোধের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পুরমহিলাগণের রোদনধ্বনির বিরাম ছিল না। এইরূপ উৎপীড়ন দ্বারা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের ধনাগার নিঃসম্বল করিয়া, নাদির শাহ প্রায় আটত্রিশ কোটী টাকা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ প্রায় দশ কোটী টাকা হস্তগত করিয়াছিল। অনন্তর তিনি এক সহস্র হস্তী, সাত সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র উষ্ট্র, এক শত খোজা, এক শত ত্রিশ জন হিসাবরক্ষক, দুই শত কর্ম্মকার, তিন শত রাজমিস্ত্রী, এক শত প্রস্তরখোদক, এবং দুই শত সূত্রধর দিল্লী হইতে সংগ্রহ করিয়া নগর ত্যাগ করিলেন। দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্র নাসরুল্লার সহিত সম্রাট আওরংজেবের পৌত্র কামবক্সের পৌত্রীর (আজিজুদ্দিনের কন্যার) বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। খাঁ-ই-দুরান খাঁর ভ্রাতা মজাফ্‌ফর খাঁর একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবার তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রধানা মহিষীর প্রতিকূলতাচরণে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। নাসরুল্লার বিবাহোপলক্ষে, বিদীর্ণ, বিশীর্ণ, অবসন্ন দিল্লী নগরী আবার নববেশে সুশোভিত হইল, হতাবশিষ্ট নরনারী হৃদয়ের অনন্ত যন্ত্রণা জীর্ণ বক্ষের গোপন অন্তরালে সংগুপ্ত রাখিয়া হাস্যবিকশিত মুখে বিবাহোৎসবে যোগ দান করিতে বাধ্য হইল; চতুর্দ্দিকে আনন্দস্রোত, গৃহে গৃহে পুষ্পমালা, রাজপথে শ্যামলপত্রপল্লবাচ্ছাদিত লোহিতপতাকাশোভিত তোরণশ্রেণী, চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি দ্রব্যের অজস্র বর্ষণ! কোথাও পশুযুদ্ধ প্রদর্শিত হইতে লাগিল; কোথাও নর্ত্তকীর মোহন নৃত্য; কোথাও গায়িকাগণের সুমধুর সঙ্গীতোচ্ছ্বাস! কিন্তু হায়, উৎসবানন্দ দিল্লীর কঙ্কালসার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমুত্থিত গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিবারিত

প্রকাশ্য দরবারে মহম্মদ শাহের মস্তকে রত্নমুকুট অর্পণপুরঃসর তাঁহাকে দিল্লীর শ্মশান-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নাদির দিল্লী ত্যাগ করিলেন। দিল্লী-ত্যাগের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রধান মোল্লা রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিলেন, "সৈন্যগণ, রাজরাজেশ্বর, আমাদের দয়াময় প্রভু, পৃথিবীপালক, ভারতবর্ষ জয় করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন; আমাদের বিজয়পতাকা আগামী কল্যই ইরাণের দিকে অগ্রসর হইবে; তোমরা প্রস্তুত হও।" নগর-ত্যাগের সময় নাদির শাহ হাজি সিদি ফৌলদ খাঁ কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন, যেন একজন পারসীকও দিল্লী নগরে না থাকে। শ্মশানের ন্যায় দিল্লীকে পরিত্যাগ করিয়া নাদির লাহোরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

লাহোরে উপস্থিত হইয়া নাদির শাহ তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিকট এক কোটী টাকার দাবি করিলেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা জাকারী খাঁ, লাহোরস্থ মান্য গণ্য অধিবাসিগণ, সওদাগর ও রাজকর্ম্মচারিবর্গকে আহ্বান করিলেন, এবং সকলের পরামর্শ-অনুসারে নাদিরের তরবারি হইতে নগররক্ষার জন্য এই টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কোটী টাকা মূল্যে লাহোরবাসিগণের জীবন ও সম্মান ক্রীত হইল।

নাদির শাহ লাহোর হইতে শিয়ালকোটের পথে স্বদেশে প্রতিগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তিনি রাউয়লপিণ্ডীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়াতে সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একটি অভিনব সেতু প্রস্তুত করিয়া, ১৪ই তারিখে তিনি সসৈন্যে চিনাব নদী পার হইলেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা খোদায়ার খাঁ আব্বাসী পারস্য রাজ-ভাণ্ডারে বার্ষিক বিশ লক্ষ মুদ্রা করদানে স্বীকার করিলেন। অনন্তর নাদির শাহ পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কিয়দংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, সমারোহসহকারে আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলেন।

গুপ্তঘাতুকের অস্ত্রাঘাতে নাদির শাহের মৃত্যু হয়; তাঁহার শেষ জীবনের কাহিনী বর্ণনা করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তাঁহার ভারত-ত্যাগের সঙ্গেই আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আত্ম-জীবনচরিত।

এক বৎসর পরে আমাদের বিভবের এককালে অবনতি হইল। আমাদের যে দুই দরপত্তনি তালুক ও এক নীলের কুঠী ছিল, তৎসমুদয় লইবার নিমিত্ত খাল বোয়ালীয়ার নীলকুঠীর অধিকারী ফ্রানসিস্ হারিক সাহেব আমাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে তাহার সহিত একটি হাঙ্গাম হইয়া এক ফৌজদারী মোকদ্দামা উপস্থিত হইল, এবং মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার স্বপক্ষ হওয়াতে পরিশেষে তালুক ও কুঠী ঐ নীলকরের নিকট বিক্রয় করিতে হইল।

দুঃসময় উপস্থিত হইলে যে বিবিধ বিপদ দেখা দেয়, আমাদের তৎকালীন অবস্থা তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সময় আমাদের বহুল নিষ্কর ভূমি যাহা পুরুষানুক্রমে সংসারের বহু সাহায্য করিতেছিল, তাহা গবর্মেণ্ট অসিদ্ধ বৃত্তি বলিয়া আত্মসাৎ করিলেন। দশ বারটি গোলাবাটীতে অনেক টাকার ধান্য আছে, কর্ত্তাদের এইরূপ বোধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, কতক ধান্য গমস্তাগণ হরণ করিয়াছে, কতক অনুপযুক্ত অধমর্ণকে ঋণ দেওয়াতে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার অনুপায় হইয়াছে। কর্ত্তারা তালুক, কুঠী, ধান্য, বৃত্তি সকলেতেই এককালে বঞ্চিত হইলেন। যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কষ্টকর হইল। কর্ত্তাদের তৎকালীন অবস্থা মনে পড়িলে অদ্যাপি হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাঁহারা দোল দুর্গোৎসব নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া, কত বাহুল্য অতিথিসেবা, অকাতরে দান, আত্মীয় স্বজনের উপকার, বাল্যকালাবধি করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের আজ নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয়সম্পাদন করাও দুষ্কর হইল।

প্রায় সকল হিন্দু পরিবারের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, যাবৎ অবস্থা উন্নত থাকে, তাবৎ পরিবারগণের মধ্যে বিলক্ষণ সুহৃদ্ভাবও থাকে; কিন্তু যেই অবস্থা অবনত হইতে আরম্ভ হয়, অমনই কলহ উপস্থিত হইয়া বিচ্ছেদের সূত্রপাত করে। বাটীর গৃহিণীরা এই বিচ্ছেদের প্রধান প্রবর্ত্তক হন। কর্ত্তাদের মধ্যে যতই স্নেহভাব থাকুক, কর্ত্রীরা ইচ্ছা করিলেই গৃহ ভাঙ্গিতে পারেন। বিশেষতঃ, যেখানে সকল সহোদরের উপার্জ্জনক্ষমতা সমান নয়, সেখানে অবিলম্বেই গৃহ-

পরিশ্রম করিয়া ধন আহরণ করিবেন, আর তাঁহার ভ্রাতারা বসিয়া খাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নয়। তিনি প্রথমে পতির ভ্রাতৃপত্নীদের সহিত অকারণ কলহ করিতে আরম্ভ করেন, ও মর্ম্মান্তিক কথা সকল কহিতে থাকেন। ক্রমশঃ ভ্রাতৃপত্নীরাও নিতান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া ভাবেন যে, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা ভিক্ষোপজীবী হওয়াও ভাল। সহোদরগণ পরিশেষে কর্ত্রীদের উত্তেজনায় পৃথক হইতে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্যেষ্ঠতাতমহাশয় রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতেন, এবং মধ্যমতাত মহাশয় তালুকের ও কুঠীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন ছিল। পিতাঠাকুর প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার হস্তে ধনাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার তাঁহারই পরিবার সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক পুত্র ও তিন কন্যার পর আমার জন্ম হয়। আমার পরে পিতার আর পাঁচ কন্যা জন্মে। ইহার মধ্যে তিনটির শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হয়। অগ্রজের ও জ্যেষ্ঠা তিন ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। ভগ্নীপতি তিন জনই প্রায় আমাদের বাটীতে থাকিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এবং আমাদের অন্যান্য কুটুম্ব মধ্যে মধ্যে আসিতেন। সুতরাং এক বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল। পিতা বহু কষ্টে এই সংসার চালাইতে লাগিলেন। যে দিন তিনি নিত্য ব্যয় নিষ্পাদনে অসমর্থ হইতেন, সে দিন মাতাঠাকুরাণী কোন দ্রব্য বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন।

এই কষ্টের উপর আর এক কষ্ট উপস্থিত হইল। আমার অবিবাহিতা দুই ভগ্নীর বিবাহকাল উপস্থিত হওয়াতে পিতাঠাকুর অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। বহুকালাবধি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কোন কন্যা শ্রোত্রিয়ে সম্প্রদান হয় নাই। তথাপি মাতাঠাকুরাণী তাঁহার কন্যাদ্বয়কে কোন দুই ধনবান কাপ বা শ্রোত্রিয় সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিবার গাঢ় ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীকে কোন মতেই সম্মত করিতে পারিলেন না।

বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন হইলে দেশের যে কত প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহার বর্ণনা হয় না। আমাদের প্রচলিত কুলীনের নিয়ম যদিও নিতান্ত ভ্রমমূলক, তথাপি তাহার উদ্ভাবন বোধ হয় মঙ্গলকামনায় হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন থাকিতে বর্ত্তমান কুলীনদের ব্যবহারদর্শনে স্বদেশীয় রাজা অবশ্যই ইহার

কাহারও কৌলীন্যমর্য্যাদা অটল থাকিবে, ইহা কথনই ঘটিত না। বঙ্গবাসিগণ বহুকাল হইতে আপনাদের হিতাহিতচিন্তাকরণে অক্ষম হইয়াছে, এবং রাজাজ্ঞা ও ব্যবহার ধর্ম্ম বোধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেন রাজাদের আদেশ ও তাহার পোষক ব্যবহার শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষাও মান্য হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালীন লোক কৌলীন্যমর্য্যাদাকে সাংসারিক সম্মানের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শ্রোত্রিয় শ্রীমান বিদ্বান সচ্চরিত্র রাজপুত্রকেও কন্যা দান না করিয়া কদাকার মূর্খ অসচ্চরিত্র দরিদ্র কুলীনপুত্রকেও দান করিতে ব্যস্ত হইতেন। পিতাঠাকুর অতি শান্তস্বভাব ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। তাঁহার বিবাহিতা তিন কন্যার সন্তান হইল, তবু গৃহিণীরা স্বাধীন হইতে পারিলেন না। বাপের বাটী পরাধীন থাকিয়া দিনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়াও এবং তাঁহাদের মনোদুঃখ জানিয়াও তিনি আপন ভ্রান্তিমূলক পূর্ব্বসংস্কারত্যাগে সমর্থ হইলেন না।

গুরুজনেরা সেকালের লোক ছিলেন। তাঁহাদের ত এরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে এরূপ কৌলীন্যাভিমানী হন, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? ইঁহারা পূর্ব্বকালীন কুলীনের ন্যায় কৌলীন্যের দোহাই দিয়া কি না করিতেছেন? ইঁহারাও কুলীন ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের পুত্রকে কন্যা দিতে পরাঙ্মুখ রহিয়াছিলেন। পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট যথাসাধ্য ধন লইতেছেন, এবং বৈবাহিক বা শ্বশুরের নিকট নানা বিষয়ের দাওয়া করিতেছেন। আর তৎসমুদায় লব্ধ না হইলে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেছেন। পূর্ব্বকালীন কুলীনদের ন্যায় ইঁহাদেরও সকল নীচ স্পৃহাই বলবতী রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখ উপস্থিত হয়।

একদা মাতুল মহাশয় পিতাঠাকুরকে কহিলেন যে, তোমাদের অবনতি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিঞ্চিৎ ধন হইলেই কুলীন পাত্র মিলিবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা সকলের গোচর হইলে কন্যা পাওয়া দুষ্কর হইবে। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে। মাতুলের কথা কত দূর ন্যায় বা অন্যায়, তাহার কিছুই বিবেচনা না করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। যদিও তখন আমি পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সাহায্য করি, এরূপ ক্ষমতা আমার হয় নাই। এ সময় বিবাহ হইলে ধনাভাববশতঃ পিতার আরও কষ্ট হইবে, ইহা একবারও মনে হইল না। কিরূপেই বা হইবে? তৎকালে আমা-

দের অপেক্ষাও দুরবস্থাপন্ন বালকবৃন্দের বিবাহ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছিলাম! বাল্য-বিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না; তদ্বিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না, এবং সকলকেই বালকবালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।

আমার বিবাহের জন্য পাত্রীর অন্বেষণ হইতে লাগিল। এক্ষণে যেমন অগ্রে কন্যাটির সৌন্দর্য্য দেখিতে হয় ও পরে তাহার কুল শীল জানিতে হয়, সেরূপ প্রথা সে কালে ছিল না। সে সময়ে প্রথমে কন্যার পিতৃ মাতৃ উভয় কুল নির্দ্দোষ কি না, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন। যদি সে বিষয়ে কোন দোষ দৃষ্ট না হইত, তবে কন্যা সুন্দরী কি না, দেখিতেন। উৎকৃষ্ট-কুলোদ্ভূতা কন্যা শ্রীমতী না হইলেও তিনি সাদরে গৃহীতা হইতেন। কিন্তু দোষসংযুক্ত বংশের কন্যা রূপে ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি কোন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের গৃহে আদৃতা হইতেন না। কন্যাপক্ষের গুরুজনেরাও ঐরূপ প্রণালীতে পাত্র স্থির করিতেন।

বিশেষ বিবেচনা করিলে এ রীতি উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। যে হেতু বালকবালিকার অপক্ক চরিত্র দেখিয়া, অথবা তাহাদের পিতা মাতার ব্যবহার দর্শন করিয়া, তাহাদের ভাবী চরিত্রের বিষয় স্থির করা যায় না। অধিকাংশ সন্তান জনক জননীর দোষ গুণের অধিকারী ও অধিকারিণী হয় বটে, কিন্তু কখন কখন দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন সন্তান পিতামহের বা মাতামহের দোষ গুণও পাইয়া থাকে। এই হেতু পূর্ব্বতন ভদ্রবংশোদ্ভব লোকেরা পাত্র ও পাত্রীর তিন চারি পুরুষের পরিচয় লইয়া সম্বন্ধ স্থির করিতেন। এই প্রথানুসারে বিবাহ স্থির করিলেই যে আশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, এরূপ নয়। তবে যত দূর দেখা যাইতে পারে, তত দূর চেষ্টা করা হইত। আমার ভাবীস্ত্রী সুন্দরী না হইলেও তাঁহার জনকজননীর বংশ দেখিয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

যদিও পাত্রপাত্রীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের কুলশীল দেখিবার পদ্ধতি ছিল, কিন্তু বর্ণিত কালের সকলেই এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির তাৎপর্য্য ভাল রূপে জানিতেন না, এবং সন্তানে পূর্ব্বপুরুষের দোষ গুণ বর্ত্তে,—ইহার কারণও বিশেষরূপ বুঝিতেন না। সুতরাং, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের স্বভাবের ও ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহাদের বংশে কুলকার্য্য হইয়াছে কি না ও যদি হইয়া থাকে, তবে কয় পুরুষে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের নিকট-সম্বন্ধীয়দিগের বংশে ঐরূপ আছে কি না, ইহাই জানিবার জন্য উৎসুক

হইতেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহার দিকে বড় দৃষ্টিপাত করিতেন না। আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যেও এমন কোন কোন কুলীন ও সিদ্ধশ্রোত্রীয় ছিলেন যে, তাঁহারা জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি করিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পদগৌরব বিনষ্ট হইত না। সকলে এ বিষয় যেন শুনিয়াও শুনিতেন না, জানিয়াও জানিতেন না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে কৌলীন্যসংস্রবের পরিমাণ দেখিয়াই বংশের গৌরব বা অগৌরব অবধারিত হইত।

হায়! প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা বঙ্গের কতই অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আলোককে অন্ধকার দেখাইতেছে, এবং অন্ধকারকে আলোক দর্শন করাইতেছে। অতি সচ্চরিত্র বিশিষ্ট সিদ্ধ বা কষ্ট শ্রোত্রীয়বংশ অনাদৃত হইতেছে, এবং যৎসামান্য জঘন্য দুশ্চরিত্রান্বিত কুলীন বংশও অতীব সমাদর পাইতেছে। এমন কি, ইহা ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের জ্যোতি তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং ধীমান সদ্বিদ্বানের জ্ঞানচক্ষুতেও ধূলি দিতেছে।

আমার তৎকালীন ভাবী শ্বশুর (১) আমাদের একজন জ্ঞাতির সহিত দুহিতার বিবাহ স্থির করিতে আসিয়া আমাকে দেখেন, এবং বাটী প্রত্যাগত হইয়া আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জ্ঞাতি পক্ষের ঘটক ইহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী পরিবারদিগকে কহে যে, তাঁহাদের (অর্থাৎ আমাদের) সম্পত্তি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ১৪।১৫ সহস্র টাকা ঋণ আছে। যাহাকে সাদা-সিদা লোক কহে, ভাবী শ্বশুর সেইরূপ ছিলেন। তিনি উত্তর করেন যে, যাঁহাকে লোকে এত টাকা কর্জ্জ দিয়াছে, তিনি কখনই নির্ধন নন। অতএব আমি তাঁহারই ঘরে কন্যা দিব।

তৎকালে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে, পাত্রীর পক্ষের লোক আসিয়া শ্রোত্রীয় পাত্রের বিদ্যার পরীক্ষা করিত। সে সময় এ অঞ্চলে ইংরেজী বিদ্যার শিক্ষা প্রায়ই হইত না, এবং পারস্য বিদ্যার চর্চ্চাও অধিক ছিল না। বঙ্গভাষায় একখানি পত্র লিখিতে ও দুই একটি অঙ্ক কসিতে পারিলেই পাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত। সুতরাং যখন পারস্য ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন আর আমার পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? বোধ করি এই বিবেচনায় আমায় পরীক্ষা দিতে হইল না। একবারেই কন্যাপক্ষীয় এক জন আসিয়া বিবাহের পত্র করিয়া যাইলেন।

(১) ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের সহযোগী অদ্বৈত প্রভুর বংশোদ্ভূত।

কিছু দিন পরে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমার অগ্রজের ও মধ্যম দাদার বিবাহে যে সমৃদ্ধি ও সমারোহ হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশের একাংশও হইল না, একারণ মনোমধ্যে যদিও দুঃখ হইতেছিল, তথাপি যখন বাহকেরা বিবাহের পাল্‌কি স্কন্ধে করিল, সম্মুখে ও পার্শ্বে আলোকরাজি নয়নগোচর হইল, এবং রোশনচৌকির সুমধুর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। শরীর রোমাঞ্চিত হইত লাগিল, এবং বোধ হইল, যেন এত সুখ আর কখন হয় নাই। আর এই পরিণয়-বৃক্ষে যে কত সুমধুর ফল ফুলই ফলিবে, এই চিন্তায় মন যেন বিহ্বল হইল। আহা! মানবজাতি কি অদূরদর্শী। কতই আশা করে ও কত নিরাশ হয়। কত দেখে ও শুনে, তথাপি আপনার সময়ে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। যে বিষয়ে কত শত লোককে অসুখী হইতে দেখিয়াছে, সেই বিষয়ে আপনি সুখী হইব, মনে করে। অন্যকে পরামর্শ দিবার সময় বিজ্ঞবর হন, কিন্তু নিজের সময় গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকেন। এই পরিণয়-কুণ্ড হইতে অমৃত না উঠিয়া গরলও উত্থিত হইতে পারে, এ সন্দেহ আমার মনে একবারও স্থান পাইল না। বরং বোধ হইল, যেন সংসারের সার পদার্থ পাইলাম, এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম।

বিবাহের এক বৎসর পরে জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে আমি একবার শ্বশুরালয়ে যাই, এবং অষ্টাহ যাপন করি। এই কয়েক দিন আমার এতই সুখে যায় যে, দিবারাত্রি কোথায় দিয়া গিয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। আমার স্ত্রীর বাল্যসখীরা অরুণোদয় হইতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কখন আমার নিকট থাকিতেন, কখন আমার নিমিত্ত নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার পত্নীর ভগ্নী-সম্পর্কীয় তিন জন ও ভ্রাতৃজায়াসম্পর্কীয় একজন ছিলেন। সে সময় তাঁহার ভগ্নীদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ এবং ভ্রাতৃবধূর বয়স চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ। প্রায় প্রতি বৈকালেই আরও অনেক প্রতিবাসিনী বালিকা ও যুবতী আসিয়া আমার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেন।

আমার শ্বশুরবাটীতে শয়নের ভাল স্থান না থাকাতে রাত্রিতে উপরি-উক্ত ভ্রাতৃজায়ার নিকেতনে আমার শয্যা প্রস্তুত হইত। তৎকালে তাঁহার স্বামী ও শাশুড়ী প্রভৃতি কেহই বাটীতে ছিলেন না। রাত্রিতে আমি শ্বশুরবাটীতে আহার সমাপন করিয়া তাঁহাদের বাটীতে যাইতাম। আমার স্ত্রী ও তাঁহার ভগ্নীরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইতেন। তখন আমার স্ত্রী তাঁহাদের

আমার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতেন, এবং কখন কখন সহচরীদিগকে দুই একটি কথা বলিতেন। তাঁহার ভাইজ ভগ্নীরা রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমার সহিত নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতেন। কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক বালিকা অতি মৃদু স্বরে গীতও গাইতেন। আমাদের সকলেরই চিত্ত আনন্দে এত অধিক অভিভূত হইত যে, যামিনীর নিয়মিত গতির দিকে কাহারও মনের নয়নপাত হইত না। নিদ্রা যে এক সংজ্ঞা আছে, তাহা আমাদের স্মৃতি-পথে আসিত না।

আমি যে দিবস প্রত্যূষে শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাগমন করি, সে দিবস অদ্যাপি স্মরণ করিলে হৃদয় হর্ষ বিষাদে অভিভূত হয়। যাত্রাকালে বর্ণিত বালিকারা সকলেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা কহা দূরে থাকুক, গুরুজন সম্মুখে থাকাতে আমার নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারিলেন না। চক্ষুর জল চক্ষুতেই রাখিতে হইল, এবং তৎকালীন মনের কথা মনেই থাকিল। তোমাদের নিকট এক্ষণে বিদায় হই, এ কথা আমিও বলিতে পারিলাম না, এবং বহু কষ্টে নয়নজলের পথ রোধ করিয়া রাখিলাম।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আলাপ করিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহা চরিতার্থ করিতে এ-দেশস্থ নরনারী উভয় জাতিই ইচ্ছা করিয়া থাকেন; কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ করিতে এ দেশের পুরুষেরা যেরূপ সক্ষম হইতেন, কুল-কামিনীরা সেরূপ সক্ষম হইতেন না। পুরুষেরা বেশ্যাদিগের সহিত আলাপ করিয়া এ অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কুলবালাগণ কেবল নিজ পরিবারের বা অতিসন্নিহিত স্বসম্পর্কীয় প্রতিবেশীর নূতন জামাতার সহিত আলাপ করিয়া আমোদিত হইতেন। সে আলাপও আপন ভগ্নীপতি বা স্বামীর ভগ্নীপতি ভিন্ন অন্যের সহিত ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। কোন সুশীল সরলস্বভাব ও মিষ্টভাষী জামাতা পাইলে তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। তাঁহারা হৃদয়ের দ্বার তাহার সমক্ষে খুলিয়া দিতেন, এবং সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাহার ভালবাসা পাইতে যত্ন করিতেন। আর যে নারীর যে গুণ থাকিত, তাহা ঐ জামাতাকে দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। চন্দ্র দেখিলে চকোর যেমন পুলকিত হয়, বা বহুকালের দরিদ্র অপর্য্যাপ্ত ধন-লাভ করিলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ কুলস্ত্রীরা সুশ্রী ও তরুণবয়স্ক জামাতৃদর্শনে আহ্লাদিত হইতেন। জামাতার বয়স অধিক না হইলে প্রেম-

অনভিজ্ঞ দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাগণও তাহাকে ভাল বাসিত। কি বালিকা, কি যুবতী, কাহারও হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইত না। তাঁহারা অতি নির্ম্মলচিত্তে ঐ জামাতার সহিত আলাপ করিতেন। যখন আমাদের কয়েক জন বন্ধুর মধ্যে পরস্পরের পত্নীর সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ আরম্ভ হইল, তখন আমাদেরও স্ত্রীদিগের অপার আনন্দ লাভ হইত।

আমার বিবাহের এক বৎসর কি দুই বৎসর পরে কাছারীর কার্য্য-শিক্ষার্থ আমি এখানকার জজ আদালতের "রিটরন্-নবিশের" সেরেস্তায় লেখা-পড়া করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের পরে যে একজন নূতন রিটরন্-নবিশ হইলেন, তিনি পারস্য ভাষা জানিতেন না। জজের নিজের লোক বলিয়া তিনি এই কর্ম্ম পান। সাহেবেরা মনে করিলে মনুষ্য কেন পশুকে দিয়াও কার্য্য চালাইতে পারেন। তাঁহার কার্য্য আমি করিতাম, তাঁহার বেতন আমাকে দিতেন, উপরি-লাভ আপনি লইতেন। ইহার কয়েক দিন পরেই গবর্মেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে, এ দেশের সমস্ত রাজকার্য্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমার মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল, তাহা নির্ম্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরেজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্য বিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরেজী-বিদ্যা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

শ্রীপ্রসাদ কলিকাতার মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটী আসিয়া অবস্থিত হন। শ্রীপ্রসাদ যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই দেশহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। তৎকালে গোয়াড়ীতে পাদরী সাহেবদের একমাত্র স্কুল ছিল। দূরতাবশতঃ তাহাতে তাঁহার প্রতিবাসী বালকদের পড়িবার সুবিধা ছিল না। এ কারণ তিনি আপন বাটীতে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সঙ্গে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি

বিদ্যায় বিতৃষ্ণা জন্মে, এ কারণ একখানি শিশুবোধক পুস্তক পাঠের পরেই শ্রীপ্রসাদ আমাকে "টেলিমেকস্" ও ক্যাম্বেলের "প্লেজর অব হোপ" পড়াইতে লাগিলেন। তিনি পুস্তকদ্বয়ের প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতেন, এবং অতি সুন্দররূপে তাহার মর্ম্ম বুঝাইতেন।

এ-প্রদেশস্থ তদানীন্তন প্রায় সকলেরই মনে এই ধারণা ছিল যে, ইংরেজীতে পশুর ও বালকের গল্প ব্যতীত উচ্চাঙ্গের কোন সুমধুর গল্প নাই। সে সময় এ অঞ্চলের যে দুই এক জন এ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সম্বৎসরই কলিকাতায় থাকিতেন, এবং তাঁহারা বাটী আসিলেও তাঁহাদের সহিত বহু লোকের আলাপ হইত না। সুতরাং যে দুই এক জন কেরাণীকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহারা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর বালকের পাঠ্য পুস্তক দুই একখানি পড়িয়া, যাহাতে হস্তাক্ষর সুন্দর হয়, তাহারই প্রতি মনোযোগ দিতেন। উচ্চাঙ্গের গ্রন্থপাঠের ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। যে হেতু তৎকালে কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও হুগলি ব্যতীত, এ প্রদেশে অন্য কোন স্থানে স্কুল ছিল না। নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, প্রতাপচন্দ্র পাল, এই কয়েক জন মাত্র আমাদের জানিত ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী আরব্যোপন্যাস ও অন্যান্য কয়েকখানি ভাল ভাল গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, এবং শুদ্ধরূপে ইংরেজী ভাষায় পত্র লিখিতে পারিতেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার এত দূর বিদ্যা হইয়াছিল। তিনি সুবিখ্যাত বাবু রামতনু লাহিড়ীর অগ্রজ ছিলেন। তিনিই রামতনু, রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ, ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ক্রমশঃ কলিকাতায় লইয়া যাইয়া স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। রামতনু বাবুর পূর্ব্বে বা তাঁহার সময়ে, এ জেলার আর কেহ হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন কি না, তাহা আমি জানি না।

যখন পারস্য ভাষা রাজকার্য্যে অব্যবহৃত হয়, তখন আমি টেলিমেকস ও ক্যাম্বলের প্লেজার অব হোপ পড়িতেছিলাম। রীতিমত না পড়িলে এ শকের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত দুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম, এবং নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম; এবং এক বৎসর মধ্যে তিন খানি "রিডর" ও একখানি "গ্রামার" পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া,

দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এবং কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। ৩।৪ মাস গত হইলে প্রথমশ্রেণী-ভুক্ত হইলাম। এই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক কয়েক খানি আমার সহপাঠীরা দ্বিতীয় বার পড়িতেছিলেন। শ্রীপ্রসাদ আমার সুগমের জন্য অল্প অল্প পাঠ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অপ্রতিভ করিবার মানসে অধিক পাঠ লইতে লাগিলেন। এত অধিক পাঠ অভ্যাস করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইল। শ্রীপ্রসাদ তাঁহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া এই শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী করিয়া আমার নিমিত্ত নূতন একটি প্রথম শ্রেণী করিলেন; আর কহিলেন, "যে শ্রেণীভুক্ত কার্ত্তিক (আমি) থাকিবেন, সেই শ্রেণীতে আমার বিশেষ মনোযোগ থাকিবে। যদি ইচ্ছা হয় ত এই শ্রেণীভুক্ত তোমরাও হইতে পার।" প্রথমে আমার আত্মীয় তারিণীচরণ রায় ও ভুবনমোহন মল্লিক এই শ্রেণীতে উঠিলেন। কিছু দিন পরে আমার বিদ্বেষী দুই জনও আমাদের সহাধ্যায়ী হইলেন। এই শ্রেণীতে আমাদের সকলেরই অপঠিত পুস্তক ব্যবস্থাপিত হইল। সুতরাং যদিও আমার সহপাঠীরা ছয় সাত বৎসর পড়িতেছিলেন, এবং আমি কেবল দুই বৎসর মাত্র পাঠারম্ভ করিয়াছি, তথাপি আমাদের সকলের পক্ষেই পাঠ্যপুস্তক নূতন হওয়াতে আমি তাঁহাদের সহিত সমান ভাবে পড়িতে লাগিলাম, এবং তাঁহাদেরও কোন অসন্তোষের কারণ রহিল না।

শ্রীপ্রসাদের কনিষ্ঠ কালীচরণও আমাকে যারপরনাই ভাল বাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়া দিতেন এবং বাটীতে অবস্থানকালে আমার পাঠের বিষয়ে বহু আনুকূল্য করিতেন। তিনি আমার অধীত পারস্য গল্প শুনিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। আমি যেমন তাঁহাকে এই সকল গল্প শুনাইতাম, তিনিও তেমনি আমার পড়া বলিয়া দিতেন। তিনি কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বাবু রামতনু লাহিড়ী সে সময় হিন্দু কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে যে কয়েক দিন বাটী থাকিতেন, সে কয়েকদিন মধ্যে মধ্যে আমাদের পরীক্ষা লইতেন, এবং বহু সদুপদেশ দ্বারা আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে যত্ন করিতেন।

ক্রমশঃ।

দার্জ্জিলিং।

বসনাবৃত পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগের মত আমরা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই; সেই জন্য সময় সময় প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাতৃপ্তির জন্য দুই দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক করিয়া আমি ও আমার সঙ্গী "দাদা" বঙ্গভূমির সমতল প্রান্তর হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম। ধূলিধূম-মগ্ন জনারণ্য মহানগরীর পাষাণনীড় ত্যাগ করিয়া ট্রেণ পল্লীগ্রামের শান্ত শোভার মধ্যে আসিয়া পড়িল;—আমাদিগের নগরদৃশ্যক্লান্ত দৃষ্টি তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

ক্রমে দিবাবসান হইল। অন্ধকার অম্বরতলে ট্রেণ আসিয়া জললীলাময়ী পদ্মার তীরে দাঁড়াইল। তাহার পর যাত্রিদল লইয়া পদ্মার বক্ষে ষ্টীমার ভাসিল; আর পদ্মা তাহার শ্বেতফেনচূড় তরঙ্গরাশি উপহার পাঠাইতে লাগিল। ক্রীড়াকৌতুকিনী মরালীর মত ষ্টীমার চলিতে লাগিল;—আমি আলোকোজ্জ্বল ডেকের এক পার্শ্বে বসিয়া জলরাশির খেলা দেখিতে লাগিলাম। নদীবক্ষে অন্ধকার মিশাইয়া গিয়াছে;—দূরে দুই একটা আলোক সেই নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারমধ্যে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে।

পর পারে গাড়ীতে আমাদের স্বতন্ত্র কামরার বন্দোবস্ত ছিল;—উঠিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রে ঘুম হইল না। প্রভাতে পথে চা প্রভৃতি দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিয়া শিলিগুড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার ট্রেণ বদলাইতে হয়। এবার ছোট ছোট গাড়ী, অনেকগুলারই দুই দিক খোলা। আবিষ্কারকের প্রতিভার মত দ্রুতগামী ট্রেণ ছুটিল;—রাস্তার এক পার্শ্বে মানুষ, গরুর গাড়ী প্রভৃতি, অপর পার্শ্বে ট্রেণ চলিয়াছে! এইবার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল কেবল বাঁশ-ঝাড়ে;—বাঁশগুলা সরল ও সরু, প্রান্তরমধ্যে সুন্দর দেখায়! এখন মানুষের নাক বিকৃত হইতে লাগিল!

দূরে পর্ব্বত দেখা যাইতেছে—যেন নীল মেঘের কোলে আরও নীল মেঘ, তাহার পর মেঘ, আবার মেঘ! যেন ধরণীর স্নেহময় অঙ্কে মেঘমালা শয়ান। দূরে পর্ব্বতে কি বিস্ময়কর বর্ণবৈচিত্র্য—কোথাও নীল, কোথাও স্বর্ণবর্ণ, ... বর্ণ। তেরাইয়ে উত্তাপ বড় অধিক। কিছু দূর যাইতেই

দুই ধারে চার ক্ষেত্র—ছোট ছোট গাছ পাতায় পরিপূর্ণ। পথে দুই একটা লোক অশ্বারোহণে চলিয়াছে—অশ্বগলে ঘুঙ্গুর ঝুন্ ঝুন্ বাজিতেছে। মানুষের চেহারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নাক থেবড়ান, চোক ছোট। প্রকৃতির দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ক্রমেই জঙ্গল ঘন হইয়া আসিতে লাগিল—আর বৃক্ষলতাও অচেনা, নূতন নূতন।

জঙ্গল নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। স্থানে স্থানে গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া দিলে পথপার্শ্বস্থ ঝোপ স্পর্শ করা যায়। গাড়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে,—যেন একটা উরগজাতীয় জীব এই গিরি-সম্রাটের অঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে বুকে হাঁটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি, ঘুরিয়া আসিয়া এক স্থান হইতে হয় ত দেখিতেছি,—খানিকটা নিম্নে লাইন পাতা,—পাঁচ সাত মিনিট পূর্ব্বে সেখান দিয়া আসিয়াছি। এক পার্শ্বে উচ্চ প্রস্তরের রাশি; কোথাও বা প্রস্তরের উপর প্রস্তর চাপাইয়া প্রাচীর প্রস্তত হইয়াছে; আর এক পার্শ্বে কত গভীর, সকল স্থানে দৃষ্টিও চলে না! দৃশ্য ভীষণ সুন্দর এবং সুন্দর ভীষণ। ঐ পথপার্শ্বে পাদপাঙ্গে লতা কেমন জড়াইয়া উঠিয়াছে! উচ্চে বৃক্ষলতাদিপূর্ণ হরিৎ পর্ব্বতগাত্রে পাহাড়ীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। কোথাও সেতুর উপর দিয়া ট্রেণ যাইতেছে, আর নিম্নে নির্ঝরের নির্ম্মল নীর ঝর ঝর করিয়া ঝরিতেছে। বহু নিম্নে প্রান্তরের দৃশ্য বড় মনোরম—বহুদূরে গৃহাদি যেন সাগরসলিলে জলবিম্বের মত প্রতীয়মান হইতেছে। ট্রেণ মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইতেছে—এঞ্জিন ঝর্‌ণা হইতে পাথেয় জল সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। পথপার্শ্বে কোথাও বা ক্ষুদ্র জলধারা পর্ব্বতের প্রস্তরদেহ বহিয়া নামিয়া আসিতেছে; কোথাও বা নির্ঝরনির্ম্মুক্ত বারিরাশি ঝর ঝর শব্দে ঝরিতেছে, আর তপনকিরণে শত-হীরক-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পর্ব্বতগাত্র যেন সবুজ মকমলে মণ্ডিত—তাহারও পশ্চাতে পর্ব্বতোপরি মেঘমালা ধূমবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও হয় ত পথপার্শ্বে দুইটা গাছ এমনই জড়াইয়া উঠিয়াছে যে,—দেখিয়া বোধ হয় না কাহারও চেষ্টা ভিন্ন এরূপ হইয়াছে। নিম্নে যে স্থানে বড় গভীর, সেখানে কেবল নীল মেঘের খেলা! মেঘান্তরালে দৃষ্টি চলে না; যেন অসীম জলধিতীরে দাঁড়াইয়া তাহার জললীলা দেখিতেছি।

ক্রমে একেবারে মেঘ-রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। চারি দিকে মেঘ—যেন মেঘের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতেছে। নিম্নে চাহিয়া আর এক সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হইল। গাঢ় নীল মেঘরাশি—তাহারই মধ্যে যে স্থানে মেঘ অপেক্ষাকৃত

অল্প গাঢ়, সেখান দিয়া নিম্নে তপনকরোজ্জল প্রান্তর দৃষ্ট হইতেছে। প্রান্তর সেই সূর্য্যালোকে বিচিত্র, সুখকল্পনাশালিনী নববধুর মত প্রফুল্লমুখ; কিন্তু লজ্জানম্র, তাই মুখোপরি এই মেঘাবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে—সেই সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন সে বিমল প্রফুল্ল হাস্য সম্পূর্ণরূপে দেখিতেও দিতেছে না, আবার সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিতেও পারিতেছে না! সে দৃশ্য বর্ণনাতীত সুন্দর। কোথাও উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতাঙ্গ কুসুমসুষমাসম্পন্ন বৃক্ষলতাদিতে বিমণ্ডিত,—লোহিত, শ্বেত, পীত, কত বর্ণের ফুল! তৃণের ফুল, লতার ফুল, পর্ব্বত আলো করিয়াছে। কোথাও বা বিরামবিহীন সবুজের মধ্যে এক একটা গাছ লোহিতবর্ণ পুষ্পভারে নতপ্রায় হইয়া কাননশোভা শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। সেই নির্ঝরকলনাদমুখরিত, পুষ্পিতদ্রুমলতাচ্ছাদিত প্রদেশে আসিয়া মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

ক্রমেই অধিক শীত অনুভূত হইতে লাগিল। চারি দিক মেঘে ঢাকা। পথের ধারেই বড় বড় ঝরণা;—ঝর্ ঝর্ শব্দ শুনিয়া চাহিলেই চক্ষের সম্মুখে একখানি চিত্রপট মুক্ত, প্রসারিত হইয়া পড়ে; যেন পর্ব্বতের বিশাল বক্ষের প্রেম মুক্ত হইয়া ধরণীর বক্ষে পড়িতেছে। এই পার্ব্বত্য দৃশ্যের মধ্যে কোন্ দিকে চাহিব, স্থির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; যে দিকে চাই, সেই দিকেই সুন্দর দৃশ্য। ঐ পথিপার্শ্বে এক ঝাড় গোলাপ গাছ, অযত্নে চারি দিকে লুটাইয়া পড়িয়াছে, রাশি রাশি কুসুম গাছ আলো করিয়াছে। তাহার নিম্নেই হয় ত একখানা বড় প্রস্তর কোমল 'মসে' মণ্ডিত;—সেই কোমল 'মস' তাহার প্রাণের পূর্ণ আবেগে সেই কঠিন প্রস্তর আলিঙ্গন করিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই হয় ত কত প্রকারের 'ফার্ণ', কত 'কোলিয়াস' ও বিচিত্রবর্ণ বৈচিত্র্যময়পত্র কচুগাছ।

কার্সিয়ঙ্গে এক জন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কার্সিয়ঙ্গ ছাড়াইয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়; সেই গম্ভীরাকৃতি গৃহমধ্যে বিলাসবিরাগী এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বাস করেন। এই য়ুরোপীয় দল অবিবাহিত, কঠোরভাবে জীবনযাপনকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। আমি ভাবিলাম, ইহারা সকলেই কি সংসারাসক্তিশূন্য, বিষয়বাসনাবিহীন, পরমার্থচিন্তামগ্ন? সকলেই কি

"ধবল শিলার সম স্বেদ-ক্লেদ-হীন,
ধবল শিলার সম মমতা-বিহীন?"

ধর্ম্মচিন্তা ভিন্ন অন্য সকল চিন্তাই কি ঐ দৃঢ়গঠিত আশ্রম-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে? ঘুম ষ্টেশনে বড় শীত বোধ হইল, সম্মুখে বা পার্শ্বে কিছুই দেখা যায় না, কেবল মেঘ। ঘুম যেন একটা মেঘস্তূপ। গাড়ী নিম্নগামী হইল। আমি সাগ্রহে বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। অন্ধকার যেন ক্রমে একটু দূর হইতে লাগিল।

* * * * *

যখন যাইতে যাইতে গাড়ী সহসা একটা মোড় ফিরিল, আর মানসপটে কোনও সুখ-স্মৃতির মত চক্ষের সম্মুখে সেই বহু দিনের অভিলষিতদর্শন দার্জ্জিলিং সহরের ছবি ফুটিয়া উঠিল, তখন হৃদয়ে যে আনন্দ-প্রবাহ বহিয়া গেল, তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তখন সূর্য্য পশ্চিম গগনে—অস্তগমনোন্মুখ; আর "পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন!" সেই স্বর্ণাভ আলোক সহরের উপর পড়িয়াছে; দার্জ্জিলিং হাস্য-প্রফুল্ল-বদন। ছোট ছোট বাড়ী, ঢালু ছাত, চারি দিকে গাছ পালার মধ্যে সুন্দর দেখাইতেছে।

বাসায় গিয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়াই আমরা দুই জন ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। এখানে আসিলে প্রথমেই মনে হয়, কলিকাতায় আর এখানে কি প্রভেদ! সেখানে সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত; কার্য্যের ব্যস্ততায় মন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে; এখানে সকলে আমোদের জন্য ব্যস্ত, কর্ম্মক্লান্ত মনকে বিশ্রামদান করিতে সমুৎসুক। এখানে সবাই যেন যুবা। এখানে স্বভাবকে কেহ বাধা দিতে চাহে না। রাস্তাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে; এক পার্শ্বে উচ্চ ভূমির গাত্রে বৃক্ষলতা জন্মিয়াছে—তবে কোথাও বা গোটাকতক ফুলগাছ বা ঝাউগাছ দেওয়া হইয়াছে। ঝরণা হইতে জল ঝরিতেছে। দূরে মেঘ ও মহীধর মিশিয়া গিয়াছে। স্বভাবের শোভা সুন্দর। এই হয় ত আলোক, আবার অল্পক্ষণমধ্যে চারি দিক কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া গেল! হয় ত দুই চারি বিন্দু বারিপাতও হইয়া গেল। আসিবার সময় পথে দেখিলাম, একটি ছয় কি সাত বৎসরের ভুটিয়া বালক পৃষ্ঠে মোট লইয়া যাইতেছে; দেখিয়া বড় কষ্ট হইল—এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কি ক্ষুদ্র বালককেও এত শ্রম সহিতে হয়? রাত্রি আসন্নপ্রায় বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহে ফিরিতে হইল। সকালে উঠিয়া কি কি দেখিব ভাবিতে ভাবিতে শয্যার আশ্রয় লইলাম।

পরদিন খুব সকালেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। "দাদা", দুই জন বন্ধু ও আমি,

হইলাম। রাস্তার এক পার্শ্বে গভীর 'খদ'! অপর পার্শ্বে উচ্চ ভূমিতে স্বেচ্ছা-বর্দ্ধনশীল লতাপাদপে কত কুসুম শোভা পাইতেছে! হাতের উপর 'ওয়াটার-প্রুফ' ফেলিয়া গল্প করিতে করিতে, যেন আনন্দালোক বিকীর্ণ করিতে করিতে, য়ুরোপীয় পুরুষ ও মহিলারা যাইতেছেন। বাঙ্গালীর সংখ্যাও অল্প নহে—আর মধ্যে মধ্যে দুই একটি বঙ্গরমণীও যাইতেছেন। পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে বৃক্ষ হইতে বিলম্বিত লতায় কত ফুল ফুটিয়াছে! ঐ পথপার্শ্বস্থ রেলিংএ এক রমণী আপাততঃ-অর্থহীন কি লিখিয়া গেলেন; আবার কিছুক্ষণ পরে এক জন পুরুষ সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহারই নিম্নে কি লিখিলেন! প্রেমিক প্রেমিকাদিগের দুর্ব্বোধ ভাষা?

অপরাহ্নে আমরা চৌরাস্তা দেখিতে গেলাম! এখানে সন্ধ্যার সময় জন-সমাগম হয়। একটা ব্যানার ঘর আছে, আর ফোয়ারা হইতে জলরাশি উদ্গীরিত হইতেছে। দুই ধারে বেঞ্চ পাতা—তাহাতে অনেক মহিলা ও পুরুষ ভ্রমণান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা সেখান হইতে অনুচ্চ 'অবসার্‌ভেটারি হিলে' উঠিলাম; উপরে একখানা বেঞ্চ পাতা—তাহাতে এত লোক নাম খুঁদিয়াছে যে, এখন তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়—তাহাতেই উপবেশন করিলাম। সেখান হইতে দৃশ্য কি সুন্দর! ঐ দূরে 'সিন্‌চল'; আর ঐ 'টাইসার হিল' মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছে;—উপরে, পার্শ্বে, চঞ্চল মেঘমালা সত্যই ক্রীড়ামত্ত মাতঙ্গের মত। যখন একবার আষাঢ়ের প্রথম দিনে, প্রথম বর্ষায় রামগিরিতে এমনই মেঘসমাগম হইয়াছিল, তখন বিরহী যক্ষ আর সকল ভুলিয়া, সেই দূরগীতঝঙ্কারিত গৃহের, আর সেই তন্বী, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা পত্নীর কথা ভাবিয়া, জড়ে চেতন জ্ঞান করিয়া, মেঘকে দূতপদে বরণ করিয়া প্রিয়ার নিকট সংবাদ পাঠাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল! নিম্নে ঐ দার্জ্জিলিং, যেন একখানি য়ুরোপীয় গ্রামের ছবি; ছোট ছোট বাড়ী, চিম্‌নি হইতে ধূম উঠিয়া পবনপথে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—কাষ্ঠ আর কাচই গৃহের প্রধান নির্ম্মাণোপাদান। সবুজ গাছ পালার মধ্যে কি সুন্দর দেখাইতেছে! আর ফুলের ত অভাব নাই—সকল প্রকার ঋতু-কুসুম গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে।

নামিবার সময় একটা ক্ষুদ্রায়তন গুহা দেখিলাম। পথে একজন নিম্নে একটা ভুটিয়া-বস্তি দেখাইলেন। এখানে সচরাচর তিন প্রকারের লোক দেখা যায়, ভুটিয়া, লেপচা ও পাহাড়ী। ভুটিয়াদিগের সংখ্যাই অধিক...

কেরা মুখে রং মাখে, শঙ্খ ভাঙ্গিয়া হাতে পরে; আর এক পরিচ্ছদে কতদিন কাটায়, জানি না। তবে ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী। অনেকে খুব চালাক। আমরা এক দিন পথে একটি ভুটিয়া বালককে কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তাহার বয়স সাত বৎসর হইবে। সে একজন বাঙ্গালীর চাকর ছিল—তাঁহার নিকট দুই মাসে কিছু ইংরাজীও শিখিয়াছিল। আমাদের একজন পরিচিত ব্যক্তির একটি ভুটিয়া চাকর ছিল—এক মাস অবস্থিতির পরে তিনি গৃহে গমন করিলে, তাহার ক্রন্দনে দর্শকমাত্রেই ব্যথিত হইয়াছিলেন। লেপ্চাদিগের বর্ণ গৌর, এবং বেশও একটু ভিন্ন প্রকারের; তবে ইহারা সহসা লেপ্চা বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না; কারণ, ইহারা নাকি মিশ্র জাতি। পাহাড়ীদিগের সংখ্যা অল্প; এই খাঁদা নাকের দেশে ইহাদের একটু নাক আছে। এই সকল জাতির সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস হইতেছে, তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করেন যে, কালে ইহারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এ কথা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যেখানে নূতন কোনও সভ্যজাতির অভ্যুদয়ে দেশ সভ্যতার পথে ধাবমান হয়, সেখানে অসভ্যগণ অনেক সময়ে বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমই টিকিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত বিরল নহে—কোথায় আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ?

পরদিন প্রভাতে "দাদার" সহিত হাট দেখিতে গমন করিলাম। মলিনবস্ত্রপরিধানা ভুটিয়া রমণী ও পুরুষগণ নানাবিধ ফলমূল বিক্রয় করিতেছে; আর তাহাদিগের মধ্য দিয়া যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুই একটি ইংরাজরমণী গমন করিতেছেন, তখন মেঘমধ্যে চন্দ্রোদয়শোভার মত শোভা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। যখন ফিরিলাম, তখন সহর কুহেলিকাচ্ছন্ন।

অপরাহ্ণে টিপ্‌টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল;—এরূপ বৃষ্টিতে বড় মন খারাপ হয়। "দাদা" বেড়াইতে যাইতে নিষেধ করিলেও 'ওয়াটার প্রুফে' শরীর আচ্ছাদিত করিয়া এক বন্ধু ও আমি বাহির হইলাম। এই প্রীতিহীন দিনে 'ম্যাল' প্রায় জনশূন্য; আমরা 'অবসারভেটারি হিল্' ঘুরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রভাতে দেখি, কুজ্ঝটিকা বড় নাই। আমরা চারি জন বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'বোটানিকাল গার্ডেন' আমাদের গন্তব্য স্থান। সেখানে রাশি রাশি গোলাপ, ঋতু-কুসুম ও শীতের ফুল ফুটিয়া কি শোভাময় দেখাইতেছে! কোথাও ঝাউ গাছের সারি, কোথাও সারি সারি উইলো নিম্নে শাখা প্রসা-

সরল বাঁশ। একস্থানে একটা ক্ষুদ্রায়তন পুষ্করিণীর মধ্যে একটা ঝোপ, তাহারই মধ্যে একটা ফোয়ারা পত্রান্তরাল হইতে কুসুম যেমন সুগন্ধ ছড়ায়, তেমনই অদৃশ্য থাকিয়া জল ছড়াইতেছে, জলধারা সূর্য্যালোকে শত ইন্দ্রধনু অঙ্কিত করিয়া পড়িতেছে। গৃহমধ্যে কত প্রকারের 'ফার্ণ', দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। একটা বড় কাচের ঘরে ঋতু-কুসুমের কি শোভা! ঘরের উপর লতা উঠিয়াছে—আর মধ্যে থাকে থাকে গাছ সাজান। কোনও ফুল এত লাল যে চক্ষু যেন ঝলসিয়া দেয়; কোনও ফুল নীল; কোনও ফুল শ্বেতবিন্দুপূর্ণ নীল; কোন ফুল পীত;—বৈষম্যে সৌন্দর্য্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে! এই পুষ্পগৃহের দ্বারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পত্রশালী তরু একত্র করিয়া জ্যামিতির চিত্রের মত বৃক্ষ-শয্যা। যেখানে সারি-দেওয়া উইলো গাছ, সেই স্থানটাই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল—এই নিবিড় কুন্তলের মত বিলম্বিত শাখা বড় একটা স্নিগ্ধ করুণ ভাবের উদ্রেক করে। আমরা যেখানে বসিলাম, সেখানে গাছে লতা তুলিয়া কুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে আমরা 'কাকঝোরা' দেখিতে গমন করিলাম। রাস্তা হইতে নামিয়া একখানা প্রস্তরোপরি উপবেশন করিলাম; হৃদয়ে অতীত স্মৃতির মত প্রস্তরগাত্রে 'মস' লাগিয়া আছে। উপর হইতে জলরাশি একখানা প্রস্তরের উপর পড়িতেছে, সেই বেগে বিন্দু বিন্দু হইয়া আর একখানি প্রস্তরের উপর পড়িয়া, প্রস্তরগাত্র বহিয়া, কয় খানি প্রস্তরের মধ্য দিয়া, নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে! শৃঙ্গচ্যুত প্রস্তরোপরি বসিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, সেই ঝর-ঝর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। আসিবার সময় পথিপার্শ্বে অযত্নবিক্ষিপ্ত বেরি গাছের ফল খাইলাম—কি সুস্বাদু!

অপরাহ্নে আমরা সমাধিক্ষেত্র দেখিতে যাই। এখানে মহান্ ক্ষমতাশালী মৃত্যু, ধনী দীন, পণ্ডিত মূর্খ, কবি দার্শনিক, সকলকে একত্র রাখিয়াছে। এখানে এক স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজিত। কত জন এতটুকু শান্তিলাভের আশায় চিরস্মৃতিবিজড়িত গৃহ ত্যাগ করিয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে—শান্তি পায় না; আর এখানে চিরশান্তি। সমাধিস্তম্ভগুলির উপর লেখা পড়িতে লাগিলাম। একটা এইরূপ:—

কেঁদ না আমার তরে জননী আমার,
মরি নাই আমি; শুধু হেথা নিদ্রা যাই।
না ছিনু তোমার; ছিনু জগৎ-পিতার,
ভালবেসে নিয়েছেন গেহে ডেকে তাই।

কোথাও শোকার্ত্ত পিতা মাতা সন্তানের জন্য রোদনরত। কোথাও অভাগিনী পত্নী, বিধবার শোকার্ত্ত হৃদয়ের যাতনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও বন্ধু বন্ধুর জন্য রোদন করিতেছেন। মন কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া গেল। কোথাও জীবন সংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত,—মৃত ব্যক্তি সংগ্রামান্তে শান্তি পাইতেছেন। কোথাও জীবনকে কুসুমের সহিত তুলিত করা হইয়াছে; তাহা আজ আছে, কাল্ শুকাইয়া যাইবে। কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া বড় কষ্ট হইল;—কোনটি ভগ্নপ্রায়, কোনটির উপর তৃণলতা জন্মিয়াছে। হয় ত যাঁহারা সমাধিস্থ, তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজন কেহ এখানে নাই; তাই এই শেষস্মৃতিস্তম্ভ অযত্নে নষ্ট হইতেছে। কিছু দিন পরে হয় ত কেবল ভগ্ন স্তম্ভস্তূপে তৃণ ও লতা জড়াইবে। শ্মশান অপেক্ষা এ স্থান সুন্দর; কারণ, এখানে এই সকল স্মৃতিচিহ্ন আছে।

পর দিবস প্রভাতে আমরা 'বার্চ্চহিলে' গমন করিলাম। ক্রমে কুজ্ঝটিকায় পাহাড় ছাইয়া ফেলিল। উপরে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর আছে। আমরা সেখানে বসিলাম। সেই ঘরের দারুময় দেহে এত লোক নাম খুদিয়া রাখিয়া আসিয়াছে! অনেকে আবার সেই কাষ্ঠোপরি পত্নী বা প্রণয়িনীর নামও রাখিয়া আসিয়াছে! ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা কয় জন ভিজিতে ভিজিতে বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্নে আমরা চৌরাস্তা হইতে নামিয়া ভুটিয়া বস্তি দেখিতে চলিলাম। এক জন সঙ্গী পাহারাওয়ালাকে হুকুম করিয়া খাবার-বিক্রেতাকে আনাইলেন, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া খাবার দিলেন। সেই সামান্য খাবার পাইয়া তাহাদের যে আনন্দ! দুই একটি ছেলে মেয়ে বড় সুন্দর।

ছোট ছোট নীচু ঘরে ভুটিয়ারা বাস করে। তাহাদের বস্ত্রাদি নিতান্ত মলিন। তাহাদের কুটীর গুলির কাছেই একটা স্তম্ভ—তাহার গাত্রে গোটা কতক চক্ষু অঙ্কিত; সেটা মন্দিরের মত একটা কিছু। শুনিলাম, ভুটিয়াদের মনে ধর্ম্ম বা দেবতা সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা নাই। পুরোহিতের বিধান ও কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়া ইহারা মনে করে যে, পরকালে মুক্তির পথ শরতের মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গেল।

দার্জ্জিলিং আসিয়া অবধি দুইটি জিনিস দেখিব দেখিব করিতেছি; কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না। সে দুইটি রঙ্গিৎ আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন আমাদিগের হাতে নহে, ...

অপসৃত হইবে, তবে গিরি-সম্রাটের সেই মহিমাময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইব! রঙ্গিৎ-দর্শন আমাদিগের হাতে বটে, কেবল দাদাকে লইয়াই কিছু গোলযোগ। তিনি ডাণ্ডিতে যাইতে ইচ্ছুক নহেন, আবার অশ্বারোহণে একেবারেই অসমর্থ। আমাদিগের সহিত একজন ডাক্তার ছিলেন; তাঁহার মত লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে জীবনের উদ্দেশ্য পনের আনা ভ্রমণের জন্য, আধআনা হাসির জন্য, আর অবশিষ্ট আধ আনা অন্যান্য কার্য্যের জন্য। তিনি অবসর পাইলেই বেড়াইতে বাহির হয়েন, ভুটিয়া ছেলেদের কোলে করেন, তাহাদের খাওয়ান, তাহাদের আহারীয় পরীক্ষা করেন, এবং বাঙ্গালী ও ভুটিয়াদিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিয়া একটা যোগ্যতর জাতির উৎপত্তির আশা করেন! তিনি এভারেষ্ট-দর্শনাশায় সকল উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আসিয়াই রঙ্গিৎ-যাত্রার কথা বলিলেন। আমরা ত তখনই প্রস্তুত। আমাদের পক্ষে অশ্বারোহণই প্রশস্ত। কুক্ষণে দাদা বলিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, আমিও ঘোড়ায় যা'ব।" কেন জানি না, সহসা তিনি অশ্বারোহণ নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে করিলেন।

সাত জনের জন্য ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে—ভুটিয়া পোনিই প্রশস্ত। ডাক্তার বাবু বলিলেন যে, আমাদের সে ভাবনায় কাজ নাই, তিনিই সব করিবেন। খানিকটা ঘুরিয়া আমরা ম্যালে আসিয়া বসিয়াছি, এমন সময় দুই জন সঙ্গী সহ ডাক্তার বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে। বাসায় ফিরিয়া যাত্রার আয়োজন শেষ করিয়া লইলাম। সকালে উঠিতে হইবে ভাবিয়া নিদ্রাগত হওয়া গেল। উদ্বেগবশতঃ প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিল।

আকাশ এমন পরিষ্কার! এতটুকু কুজ্ঝটিকা নাই। পূর্ব্ব গগনে কেবল আলোক দেখা দিতেছে। সকলেই আশা করিলেন যে, আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং সেই চিরতুষারসমাচ্ছন্ন গিরিমালা দৃষ্টিগোচর হইবে। এ দিকে অশ্ব হাজির। স্নানান্তে কিছু আহার করিয়া অশ্বারোহণে সকলে যাত্রা করিলাম। একজন সঙ্গীর বিলম্ব ছিল বলিয়া তাঁহার অশ্বটি রাখিয়া আমরা ছয় জন চলিলাম। ক্রমে আমরা সহর ছাড়াইলাম।

আমরা সকলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা-দর্শনাশায় ব্যগ্র। দাদা এখন হইতেই পশ্চাতে;

সহসা পশ্চাৎ হইতে এক জন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা!" সম্মুখে গিরি-সম্রাটের রবিকরোজ্জ্বল চিরতুষারাচ্ছন্ন মাধুরীময় মনোহর মূর্ত্তি—ছবিই বটে! অবাক হইয়া গেলাম—কি মহান সৌন্দর্য্য! একজন বলিয়া উঠিলেন, "Three Cheers for the Golden peaks!" সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি দূরে শ্রুত হইল! না জানি কতকাল হইতে ঐ গিরিশৃঙ্গ নীল নীরদমালা ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কালস্রোত উহার পদতলমাত্র স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতেছে;—তাহা সেখানেই প্রতিহত, তাহার উপরে আর স্পর্শ করিতে পারিয়াছে কি! উহার পদতল কাল-সমুদ্রের বেলাভূমি, তরঙ্গমালা সেখানে লুটাইয়া পড়ে।

উন্নত মস্তক কোথাও শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পার্শ্বে শ্বেত ও শ্বেতের পার্শ্বে কৃষ্ণ আরও সুন্দর দেখাইতেছে। কোথাও তুষাররাশি বিগলিত, আর কোথাও তুষারের স্তূপ। সেই আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে শৃঙ্গ-মালা কুজ্ঝটিকাবৃত হইয়া আসিল; সেই অর্দ্ধাবৃত অর্দ্ধোন্মুক্ত শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে শৃঙ্গমালা অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোড়া ছুটাইয়া বড় অধিক দূর যাওয়া যায় না, কারণ একটু যাইলেই দাদা অদৃশ্য। দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। পথে দৃশ্য বড় সুন্দর! বড় বড় প্রস্তরস্তূপ, প্রস্তরমধ্যে কত তৃণ লতা জড়াইয়া রহিয়াছে, কত ফুল ফুটি-য়াছে, আবার স্থানে স্থানে নির্ঝর হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতেছি, এক পার্শ্বে উচ্চ জমী ক্রমেই উচ্চতর হইয়া আসি-তেছে, আর এক পার্শ্বে কি গভীর! কেবলই নামিতেছি। ক্রমেই অধিক গরম বোধ হইতেছে, যত নিম্নে নামিতেছি, উত্তাপ ততই অধিক হইতেছে।

ক্রমে উষ্ণপ্রধান স্থানের তরুলতা এবং মলিনবর্ণ নরনারী দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ পথিপার্শ্বে এক প্রকার প্রস্তর পরিষ্কার রৌপ্যের মত রৌদ্রে চক্-চক্ করিতেছে—কিছু সংগ্রহ করা গেল। পথিপার্শ্বে শালতরু, তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের প্রাঙ্গনে ভুট্টা ও কলাগাছ; আর তাহারই পার্শ্বে বঙ্গদেশের চিরপরিচিত শ্যাম দূর্ব্বাদলে 'প্রভাতী' শিশির রৌদ্রে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেই তৃণমণ্ডিত ভূমি গড়াইয়া নামিয়া গিয়াছে—যত দূর দেখা যায়, নামিয়া গিয়াছে। সেই নিম্নগ ভূমির উপর চা-ক্ষেত্র—মধ্যে মধ্যে চা-করদিগের বাঙ্গলো। সারি বাঁধিয়া ঘোড়া চলিতেছে—মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিতেছি, আর

অশ্ব-পরিবর্ত্তনের স্থানে আসিয়া দেখিলাম, যে বন্ধুকে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি অন্য পথে আসিয়া অগ্রেই উপস্থিত। এবার সাত জনে একত্র যাইতে লাগিলাম।

ক্রমেই রৌদ্র প্রখর হইয়া আসিতে লাগিল, আর আমরা—যাহারা কুজ্ঝটিকা ও বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া গরম কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছিলাম, অনুতাপ করিতে লাগিলাম। দাদা এখন বড়ই আনন্দিত; কারণ তিনি গরম কাপড় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে দাদার অশ্বরাজ দর্শন দিলেন। দাদা একে ত অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত, তাহাতে আবার ভাগ্যক্রমে তাঁহার অশ্বরাজ নিতান্ত নির্জ্জীব!

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করি, আর দাদার ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব বর্দ্ধিত হয়। একজন কেবল দাদার সঙ্গ ছাড়েন নাই। অনেকটা নামিয়া যাইলাম। নবম মাইল অতিক্রম করিবার পর জলস্রোতের কলকল শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই কত দিনের অভিলষিত-দর্শন রঙ্গিৎ!

ক্রমে ঘোড়াগুলিকে শান্ত রাখা দায় হইয়া উঠিল। ছোট-খাট, মোটা-সোটা ভুটিয়া পোনি অত্যন্ত নিরীহ জীব; সহজে গোলমাল করিতে চাহে না, দুষ্টামী তাহাদের বড় নাই—তাহা ভিন্ন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির হাঙ্গামও নাই। এই সমতল-প্রায় জমীতে আসিয়া তাহারা আর শান্ত থাকিতে চাহে না,—একটু ছুটিতে চাহে।

আমাদেরও মনে তখন একটু স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছিল, সেই জন্য নিতান্ত স্বার্থপরের মত দাদা ও তাঁহার সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া ঘোড়া ছুটাইলাম। ডাক্তার বাবু সর্ব্বাগ্রে, তাঁহার হাসি দেখে কে! কিন্তু তাঁহার একটা ছোট খাট পতনও হইয়াছিল।

আমরা একটা সেতু-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; রঙ্গিতের মোহিনী মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাশি রাশি প্রস্তরের শয্যার উপর দিয়া জলরাশি সফেন প্রবাহে কল কল ছল ছল করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। উভয় তীরে অল্প দূর পর্য্যন্ত প্রস্তরস্তূপের মধ্যে রজতধবল বালুকারাশি; সেখানে পর্য্যন্ত সময় সময় জল উঠে। সেই সিকতাশয্যা সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিতেছে। তাহার পরেই তরুলতার নয়নমনোলোভা সবুজ স্নিগ্ধ সুন্দর শোভা, কি তৃপ্তিকর! তখনও আমাদিগের গন্তব্য স্থানে যাইতে পারি নাই; সেই

* * * * *

সম্মুখে রঙ্গিৎ। তাহার জলরাশি কি কল্লোল করিয়া প্রস্তরে প্রস্তরে প্রতিহত হইতেছে, আর বহিয়া যাইতেছে; নদীগর্ভে শিলারাশি কোথাও উচ্চ, কোথাও অনুচ্চ;—জল কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর; কোথাও কেবল দুই চারি খানি প্রস্তর মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। স্বচ্ছ জল কি বেগে প্রবাহিত হইতেছে! সে স্রোতে পড়িলে একেবারে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্রোতের ধারে কোথাও বা একটা গাছ জলের উপর হেলিয়া রহিয়াছে; আবার কোথাও বা একটা গাছ একেবারে জলের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, সময় সময় জল উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার উপর পড়িতেছে। চঞ্চল নদীর বক্ষের উপর ছোট দোলার মত একটি ক্ষুদ্র সেতু উভয় তীর হইতেই ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাতাস একটু বেগে বহিলে তাহাকে স্থির রাখা অসম্ভব। জন আষ্টেক মানুষ মাত্র একবারে তাহার উপর যাইবার আদেশ আছে। এই লোহিত সেতুটি নদীর বুকের উপর ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখাইতেছে। সে যেন পবনের গীতের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আমরা সেতু পার হইলাম। এই সিকীমের আরম্ভ।

সেতু পার হইয়া পরপারে বাজার, এবং সেখানে ক্ষুদ্র ডাক-ঘরে ইংরাজ গভর্মেণ্টের বিশুদ্ধ কুইনাইনের বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া একজন পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী পোষ্টমাষ্টার পোষ্ট-আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ ও এই নিম্নভূমির জল কতক দুর্ব্বল পিয়নের উপর রাজত্ব করেন। ডাকঘরেই আমরা আড্ডা লইলাম। সেখানে রঙ্গিতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিলাম। একবার নাকি দেবী ভগবতী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ মহাদেবের সংসারে লোকের বড় অভাব, হয় ত দেবাদিদেব দেবীকে ছাড়িয়া থাকাও কষ্টকর ভাবিয়াছিলেন—তিনি দেবীর প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। তখন দেবী রমণীর মহাস্ত্র বাহির করিলেন, অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল। ত্রিনেত্রে ত্রিধারা বহিল—তাহা হইতেই বুঝি ছোট রঙ্গিৎ, বড় রঙ্গিৎ ও আর একটি নদীর উৎপত্তি। এই ত্রিস্রোত হইতে উপত্যকার নাম ত্রিস্রোতা এবং ত্রিস্রোতার ইংরাজী বিকার তিস্তা। দেবীর পিত্রালয়ে গমন হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, রঙ্গিৎ-দর্শনের জন্যই আমরা এত দূর আসিয়াছি।

উপত্যকায় আসিয়া ত বসিয়া রহিলাম, এখন

পরেই তাঁহার সঙ্গী আসিয়া বলিলেন যে, প্রায় দেড় মাইল অগ্রে তিনি দাদাকে দুই জন চাকর ও তিন জন সহিসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছেন, তিনি এখনই আসিবেন। অল্প ক্ষণ পরেই একজন চাকর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল যে, দাদার অশ্বরাজ দাদাকে আর বহন করিতে পারে না; আর একটা ঘোড়া পাঠাইতে হইবে। শ্রান্ত অশ্ব কয়টার মধ্যে দুইটার পৃষ্ঠে আবার জিন চাপান হইল; এমন সময় এক জন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে সেতুর ও পারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে।" সত্যই দাদার মূর্ত্তি; পরিশ্রমে কাতর, ক্রোধে রক্ত-বর্ণ সেই মুখ! দাদা ঘোড়া ছাড়িয়া পদব্রজে আসিয়াছেন, চরণ-কমল-যুগল অনেক দুর পর্য্যন্ত ধূলিধূসরিত হইয়াছে। সেই স্তম্ভসম পদভরে সেতু যখন কাঁপিতে লাগিল, তখন আর সংশয় কোথায়! কারণ সে শব্দ ত সকলের পক্ষে সুলভ নহে। দাদা আসিয়া রাগিয়াই অস্থির! এই সব বন্ধুত্বের কার্য্য! তাঁহার জন্য ডাণ্ডি দেখিতে হইবে, তিনি তাহাতে ফিরিয়া যাইবেন, কিছুই খাইবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে দাদা লোকটি ভাল—সেই প্রবাসে তাঁহার স্নেহ ও সদ্ব্যবহার ভুলিবার নহে; শরতের লঘু মেঘের মত দাদার রাগ শীঘ্রই 'জল' হইল।

তখন আহারে মনোযোগ দান করা আবশ্যক হইয়াছিল; সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাক্ষসের মত আহার করা গেল। আমরা অনেকেই স্নান সারিয়া আসিয়া-ছিলাম; কিন্তু যখন রঙ্গিতের সেই জলে স্নানের প্রস্তাব হইল, তখন তাহাতে কাহারও অমত হইল না। তবে এক অসুবিধা,—আমরা সকলেই এক পোশাকে আসিয়াছি। একজন তখনই বাজারে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপড় আর তোয়ালে কিনিয়া আনিলেন।

আবার আমরা সকলে রঙ্গিতের তীরে প্রস্তরের উপর আসিয়া বসিলাম। উপরে পরিষ্কার আকাশ—সূর্য্যালোকে কি উজ্জ্বল! সেতুর মধ্য দিয়া হু হু করিয়া বায়ু বহিতেছে, আর রঙ্গিতের জলরাশি কল কল ছল ছল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই পার্ব্বতী নদীর কলগানে যেন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরিম্লান যৌবনচাঞ্চল্য ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিছু দুরে একটু উচ্চ স্থান হইতে জলরাশি নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে, এবং সেই বেগে ফেনময় হইয়া প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমি জলে একখানা কাগজ ফেলিয়া দিলাম, সেখানা এমন বেগে চলিয়া গেল! এক স্থানে স্রোতের পথে খান কয়েক প্রস্তর

করিতেছিল; সুতরাং সেখানে নিরাপদে দাঁড়াইবার সুবিধা ছিল। প্রথমে জন দুই জলে নামিয়া অভয় দান করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে আমরাও সেই মহাজনগণের পদচিহ্নের অনুসরণ করিলাম। সে জল কি শীতল! স্নানান্তে ডাকঘরে ফিরিয়া খাবারের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা গেল। চারিদিকে একটু বেড়াইয়া সাড়ে তিনটার সময় আমরা যাত্রা করিলাম।

এই বার উত্থান; সেই যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিয়াছি, এখন আবার তেমনই ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে হইবে। ঘোড়াগুলার এবার অত্যন্ত পরিশ্রম হইবার কথা; কিন্তু তাহারা আর ধীরে চলিতে চাহে না। আর এ কথাও বলিতে হয় যে, সেই ম্লান-সূর্য্যালোক-পরিস্নাত শীতলসমীরণসেবিত পর্ব্বতপথে বেগে অশ্ব ছুটাইয়া কিছু আনন্দ আছে। একটু একটু করিয়া আমরা দাদাকে ছাড়াইয়া চলিলাম; কেবল দুই জন এবার কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। তবে দাদার সেই রাগরক্ত মুখশ্রীর কথা তখনও আমরা ভুলি নাই! অশ্বপরিবর্ত্তনের স্থানে আসিয়া কেহ কেহ তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর বসিলেন, কেহ কেহ একেবারে শয়ন করিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দাদা ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় দর্শন দিলেন।

আবার যাত্রা করা গেল; একটু একটু অগ্রসর হই, আর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দাদার জন্য অপেক্ষা করি; তাঁহার অশ্বরাজ দর্শন দিলে আবার যাত্রা করি। বড়ই বিলম্ব হইতে লাগিল। কারণ ছোট পাহাড়ী ঘোড়া মন্থরগমনে বড় শীঘ্র পর্ব্বতারোহণ করিতে পারে না। প্রায় সন্ধ্যার সময় আবার সেই তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইল; তখন অস্তগামী রবির স্বর্ণাভ কিরণজাল সেই অমল ধবল গিরিমালার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে দার্জ্জিলিং নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইলে একটু কুজ্ঝটিকা দেখা দিল। এই অবিরাম পরিবর্ত্তনই এখানকার সৌন্দর্য্যের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত করে। বহুক্ষণ দৃশ্য একরূপ থাকে না; কেবলই নূতন নূতন। এই রৌদ্র, এই কুজ্ঝটিকা, এই বৃষ্টি, এই আলোকে আঁধারে মেশামিশি, আবার এই হয় ত তীব্র রৌদ্র।

ম্যাল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে প্রায় তিন কোয়ার্টার অপেক্ষা করিবার পর, সহসা উপরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ডাকিয়া জানিলাম, দাদারা অন্য পথে গিয়াছেন। তখন আমরা ঘোড়া ছুটাইলাম। যেখানে দুই

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর সব?" তিনি বলিলেন যে, "দাদা 'গুণ টানিয়া' আসিতেছেন", অর্থাৎ নামিয়া ঘোড়াটাকে টানিয়া আনিতেছেন। একটা ভুটিয়া বস্তীর নিকটে আসিয়া ঘোড়াটা আর নড়িবে না। এ দিকে আমরা পরিশ্রান্ত, ও দিকে ভুটিয়া রমণী ও বালকবালিকাগণের হাস্যধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই বিকট গম্ভীর পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠোর নির্ম্মমতার মধ্যে স্নেহ ও আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছে—কি ভয়ানক অবস্থা! ভুটিয়ারা যখন আপনাদিগের মধ্যে কথা কহে, তখন তাহা বুঝিতে পারা অসাধ্য; তবে আমাদিগের সহিত কথা কহিবার সময় একটু পরিষ্কার করিয়া বলে, তাই রক্ষা।

ম্যালে আসিয়া উঠিলাম। তখন দার্জ্জিলিং সহরের যত গৃহের কাচের বাতায়নপথে আলোক দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে,"যত হাসি, তত কান্না"; প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, গাত্রে বিষম বেদনা। রঙ্গিৎ হইতে আসিবার সময় পথে একবার এক স্থানে আসিয়া বোধ হইয়াছিল যে, উষ্ণ ও শীতপ্রধান স্থানের মধ্যে সেই স্থান; আর এখন বোধ হইল যে, সেই আনন্দ ও এই ব্যথা, ইহার মধ্যে নিদ্রা। দার্জ্জিলিংএর পথে যেমন এক একটা গাছের সর্ব্বাঙ্গে পরগাছা, তেমনই আমাদের সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। শুনিলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাইতেছে। তাড়াতাড়ি দূরবীক্ষণহস্তে ছুটিয়া গেলাম। আবার সেই আশ্চর্য্য শোভা চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল—সেই আলোকোজ্জ্বল গিরিমালা, সেই চিরতুষারাবৃত উন্নত পর্ব্বতশিখর!

*　　*　　*　　*　　*

এখানে আর অধিক দিন থাকিব না। গতকল্যও প্রভাতে ও অপরাহ্নে তুষারাবৃত গিরিমালা দেখা গিয়াছিল। আজ প্রভাতে 'জলাপাহাড়ে' বেড়াইতে গেলাম। জলাপাহাড় সেনাবাস;—এখানে ইংরাজ সেনাদল বাস করে। দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছু নাই—অন্যান্য গৃহের মত ঢালু ছাত ও লম্বা লম্বা চিমনি বিশিষ্ট ব্যারাক।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বৃষ্টি পড়িতেছে। আজ রবিবার,—সেই বৃষ্টিধারায় ভিজিতে ভিজিতে হাটে ঘুরিয়া গৃহে ফিরিলাম। বৈকালে কয় জন বেড়াইতে গেলাম। কাল দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া যাইব, আজ শেষ ভ্রমণ।

পরিচিতদিগের বিশেষ আপত্তিসত্ত্বেও যাত্রার আয়োজন করিলাম। এ দিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার

অল্পক্ষণ পরেই দেখি, তাঁহারা প্রায় সকলেই আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় লইলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

আবার সেই পথ; কিন্তু এই চিরনূতন পথ কখন পুরাতন হয় না। এবার বৃক্ষলতার উপর দৃষ্টি রাখিলাম। প্রথমে কেবল অপরিচিত বৃক্ষরাজি, ক্রমে একটি একটি করিয়া প্রান্তরের তরু দেখা দিতে লাগিল;—তাহার পর প্রায় সব বৃক্ষই পরিচিত। কোথাও এক একটা গাছ কেবল পরগাছায় আচ্ছন্ন, তাহার অস্তিত্বের মধ্যে উপরে গোটা দুই শাখা। আবার কোথাও বা এক একটা গাছ আপাদমস্তক লতিকায় মণ্ডিত। কিছু দূর নামিলে মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া কেবল লজ্জাবতীর বন—তাহার যেন আর অন্ত নাই। ক্রমে পর্ব্বতমালা মেঘের সহিত মিশাইয়া আসিতে লাগিল—আমরা সমতল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

উপন্যাস।

উপন্যাসের প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়—আনন্দদান ও শিক্ষাপ্রদান। শিল্পসৌন্দর্য্যময় সকল পুস্তক হইতেই আনন্দলাভ সম্ভব; কিন্তু সকল হইতে শিক্ষালাভ সম্ভব নহে;—বোধ করি, প্রয়োজনীয়ও নহে। এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসকে উদ্দেশ্যযুক্ত ও উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস বলা যাইতে পারে। উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস, অর্থাৎ Novels with a purpose, সাধারণতঃ একটা বিশেষ মত প্রমাণ করিবার জন্য রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে উদ্দেশ্যযুক্ত অপেক্ষা উদ্দেশ্যহীন উপন্যাসেরই প্রচলন অধিক ছিল;—এখন সে স্রোত মন্দ পড়িয়াছে, আর উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসে আবিল জলরাশি প্রবল বন্যার মত আসিয়াছে। এই জলরাশিকে আবিল বলিলাম, কেন না, এই ফেনিলোচ্ছ্বল জলরাশিবাহিত অনেক পুস্তকই ধর্ম্মমন্দিরে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। যে সকল ঔপন্যাসিক এখন উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের গোঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, গ্র্যান্ট অ্যালেন তাঁহাদিগের একজন। তিনি "নর্থ আমেরিকান রিভিউ" পত্রে উদ্দেশ্যশূন্য উপন্যাস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

তিনি বলিতেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দী শিল্পসৌন্দর্য্যবিহীন, অন্তঃসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন উপন্যাসের আবদার কতকটা সহিয়াছে বটে; বিংশ শতাব্দীতে শিল্পের যে প্রকৃত ও উচ্চতর আদর্শ আসিবে, তাহাতে উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস আর স্থান পাইবে না!

প্রথম কথা। অর্থাৎ, লেখকের মানসকল্পিত বারট্রাম ইংগিলডিউ জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস

বলেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত সকল জনপ্রিয় উপন্যাসই উদ্দেশ্যযুক্ত। "টম কাকার কুটীর" হইতে "জুড দি অবস্কিওর" পর্য্যন্ত সব উপন্যাসই উদ্দেশ্যযুক্ত। অষ্টবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে উপন্যাসে উদ্দেশ্যের বড় গন্ধ থাকিত না—তাই সে সকল আজ আর ইংলণ্ডের বাহিরে বড় পঠিতও হয় না;—আর সেই সময়ে রচিত উদ্দেশ্যযুক্ত ফরাসী উপন্যাস সকলের আদর আজও বিদ্যমান। ইংরাজ ঔপন্যাসিকগণ এখন উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের মূল্য বুঝিতেছেন;—উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস স্থায়ী হইতে পারে না।

শতাব্দীর শিক্ষা।

লোকে দেখিয়া শিখে ও ঠেকিয়া শিখে। লেখক বলেন, ভাল করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, উনবিংশ শতাব্দীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন সকল প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিই উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে উপন্যাস কেবল আনন্দপ্রদান ছাড়িয়া, চিন্তা ও শিক্ষার বিষয়ও যোগাইতেছে। বিগত বিশ বৎসরে উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস আদৃত ও উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস ক্রমে তাহার উপযুক্ত স্থানে, অর্থাৎ বিদ্যালয়গৃহে বা নার্সারিতে অপসারিত হইয়াছে। শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ডের নৈতিক-শিক্ষাপূর্ণ উপন্যাসের মত উপন্যাসের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার ভাল, মন্দ ও মধ্যম, সকল প্রকারের উপন্যাস কেবল উদ্দেশ্যযুক্ত বলিয়াই এত বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। সারা গ্র্যাণ্ডের "হেভন্‌লি টুইন্স", "আইয়োটা", "ইয়োলো অ্যাষ্টার", ইগার্টনের "কিনোটস্" এবং হার্ডির "টেসের" সাফল্যেরও এই কারণ। "ট্রিলবি"র অসাধারণ সাফল্যের কারণও বিশেষ উদ্দেশ্য—ইহা ইংলণ্ড ও আমেরিকার বর্ত্তমান অতিরিক্ত সুরুচিপ্রিয়তার উপর বিদ্রূপ। "জুড" ও "Story of an African Farm" আমাদের আশা, আশঙ্কা ও সমস্যায় পূর্ণ। ঐ সকল পুস্তক বর্ত্তমান শতাব্দী ভিন্ন অন্য সময়ে রচিত হইতে পারিত না। আমাদের এই বিশাল বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিষয় ব্যক্ত করাও লেখকের মতে একটা উদ্দেশ্য। লেখকের "উদ্দেশ্য" কথাটার "বহর" বড় অধিক বলিয়াই বোধ হয়। নহিলে তিনি "ট্রিলবি"র মধ্যেও উদ্দেশ্য বাহির করিতে পারিতেন না।

উদ্দেশ্যের উপযোগিতা।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উনবিংশ শতাব্দী ক্রমেই অধিক উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস চাহিয়াছে ও পাইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিংশ শতাব্দী আরও অধিক উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস চাহিবে—এবং তাহাই উচিত। ইহাও ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মানুসরণ করিবে। সাহিত্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল জাতির সকল সাহিত্যেই উদ্দেশ্য কার্য্য করিয়াছে। প্রধান প্রধান উপন্যাস ও কবিতা, সমস্তই উদ্দেশ্যযুক্ত। শিল্প-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রচনা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বা কোন চটি প্রবন্ধ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইতে হইলে তাহাতে কোনও নব সত্য নিহিত থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। নহিলে তাহা উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকিতে পারে না। সাহিত্য ভিন্ন অন্য সকল শিল্প সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযুজ্য। যে পুস্তক কেবল আনন্দদান ভিন্ন কোনও শিক্ষাই দান করে না, তাহা প্রথম শ্রেণীর পুস্তক নহে। যে সমালোচক পুস্তকে উদ্দেশ্যের অভাব আবশ্যক বলেন, তিনি দেখিয়া শিখিতে জানেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস বড় জোর দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে, তাহা মানবজাতির শৈশবেরই উপযোগী। অবশ্য অল্পবয়স্ক ও অল্পবুদ্ধিদিগের জন্য আরও কিছুকাল উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস রচিত হইবে। তবে এ কথা বোধ হয় ভরসা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে উন্নতিস্রোত যে কূলে উপস্থিত হইবে, সে কূলে পূর্ণবয়স্ক পূর্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস

শিক্ষা, এই সকলেরই পক্ষপাতী হইবে—তাই বিংশ শতাব্দীর পাঠক-সম্প্রদায় মরালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, উদ্দেশ্যহীন উপন্যাস-রূপ নীর পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস-রূপ ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত করিবেন।

শিক্ষা।

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ছাত্র।

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রতীচ্য মহাদেশের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। তাই আজ দেখিতে পাই যে, ললিতকলার চর্চ্চার জন্য বঙ্গবাসী ইটালি পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন। বিদেশে গিয়া জ্ঞানাহরণের উপযোগিতা যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তাহার প্রমাণ,—বঙ্গদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব আইন-সদস্য, অক্সফোর্ডের ল-রিডার, সার উইলিয়াম মার্কবি, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের অসুবিধা ও প্রলোভনের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

বক্তা অক্সফোর্ডে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়াছেন। বিগত পনর বৎসর যে সকল ভারতবর্ষীয় ছাত্র জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছেন, বক্তা তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই জানেন। ছাত্রদিগের কতকগুলি দোষ তিনি ব্যক্ত করিবেন বটে; কিন্তু তাহা সাধারণ অভিযোগ নহে। যখন বিবেচনা করা যায় যে, ভারতবর্ষীয় ছাত্র আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বহু দূরে আসিয়া, ভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত সমবয়স্কদিগের মধ্যে আসিয়া ও অভিনব শত প্রলোভনে পড়িয়াও সৎ ব্যবহার করে—তখন আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদের সৎব্যবহার ও পরিশ্রম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ইহাই অক্সফোর্ডে অনেকের মত। অবশ্য কোন কোন ছাত্র বিফলমনোরথ হইয়া যায়। পাঠক জানেন, কত যুবক বিদেশে নবসমাজে কনককেশা নীলাম্বুজনয়নার মোহে পড়িয়া, সুখশান্তিময় সংসারে অসুখ ও অশান্তি আনয়ন করে। অনেক ছাত্র একেবারে বিফলমনোরথ না হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পই উপকার লাভ করে; সুতরাং সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়; আবার আরও অনেকে অল্প কিছু উপকার প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সুবন্দোবস্তে তাহারা আরও অধিক উপকার পাইতে পারিত। কাজেই যাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা করা উচিত।

বিষয়।

অক্সফোর্ডের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসনপ্রণালী শিথিল হওয়াই প্রয়োজন। স্কুলের শাসনমুক্ত করিয়া যুবকদিগকে স্বাধীনভাবে কঠোর জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ করিবার উপযোগী করাই কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই ছাত্রকে আপনার উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। ইংলণ্ডে কলেজের শাসন ব্যতীত গৃহের শাসন আছে। কোন ছাত্র কলেজে যদি ভাল না থাকে, তবে তাহার অবিভাবককে তাহা জানাইলে, তিনি তাহা বিবেচনা করিয়া, ছাত্রকে সুবিধামত স্থানে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রের এ শাসন-সমন্বয় নাই। তাহার অভিভাবককে সব বিদিত করিবার সুবিধা নাই; আবার ইংলণ্ডে তাহার পিতৃপদবাচ্য কোন অবিভাবক নাই। কাজেই কলেজে সে সন্তোষজনক ব্যবহার না করিলে, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হয়,—তাহাতে তাহার অবনতি নিশ্চিত।

অক্সফোর্ডে।

ছয় মাস বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়, আর ছয় মাস ছুটী। এই অবকাশে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ কোথায় যায়, তাহার স্থির নাই। বোধ হয়, তাহারা অবকাশকালের সদ্ব্যবহার করে না। আর এক মহা অসুবিধা, সঙ্গিনির্ব্বাচন লইয়া।

ছুটী ও সঙ্গী।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গিয়া অক্টোবর মাসে অক্সফোর্ডে উপস্থিত হয়। সেখানে তাহার কেহই পরমার্শদাতা থাকে না, এবং ইংরাজের রীতিনীতি ও ইংরাজ-সমাজের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না লইয়া, সে কতকগুলি সমবয়স্কের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে। সে যেরূপ দলে মিশে—ফলও সেইরূপ হয়। আবার সে সাধারণতঃ যাহাদের অনুকরণ করে, তাহারা ঠিক ভাল নহে। সে বিচার করা ভারতবর্ষীয় ছাত্রের পক্ষে বড় সহজও নহে। কাহাদের সহিত মেশা উচিত, কি করা উচিত, এবং কি না করা কর্ত্তব্য, সে এ সকলের কিছুই জানে না; কাজেই সে যে দলে মিশে, সেই দলেরই অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। উপহসিত হওয়া এবং কাহাকেও দুঃখিত করা তাহার ইচ্ছা নহে,—তাহাকে পরামর্শ দিবার কেহ নাই,—তাহাকে ভবিষ্যৎ বিপদের কথাও কেহ বলিয়া দেয় না। অর্থব্যয় সম্বন্ধেও তাহার অভিজ্ঞতার অভাব। অনেক সময় সে অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করে, এবং আবশ্যক দ্রব্য বাদ দেয়। কি ভাবে থাকা তাহার উচিত, তাহাও সে জানে না; এবং স্বভাবতঃই আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য কত ব্যয় করিতে হয়, তাহাও বুঝে না। এখানেও তাহার দায়িত্ববোধী পরামর্শদাতার অভাব।

ভারতবর্ষীয় ছাত্রের আর একটা অসুবিধা আছে। অধিকাংশ ছাত্র ইংলণ্ডে আসিয়া যে অধ্যয়ন করিবে, তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত হইয়া আইসে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, অক্সফোর্ডে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইলে দুটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। এই দুইটির একটি ভাষা প্রাচ্য হইলেও চলে।

পাঠ।

ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃত ও ল্যাটিন শিক্ষা করাই সুবিধা। তাহারা ল্যাটিন ত জানেই না—কেহ কেহ ছিটা ফোঁটা সংস্কৃত জানিয়া আইসে মাত্র। কাজেই তাহারা দুইটা প্রাচীন ভাষা একটু একটু শিখিতে প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত করে। প্রায়ই প্রথম পরীক্ষার পরে প্রাচীন ভাষার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হয়, কাজেই প্রথম ছয় মাসের শ্রম নষ্ট হয়। ভারতবর্ষ হইতে আসিবার সময় তাহার যাহা শিক্ষা করিয়া আসা উচিত ছিল, ছয় মাসে সে তাহাই শিক্ষা করে। দেখিয়া বোধ হয় যে, আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ছাত্র যেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কথা ভাবেই নাই। যেন আসিবার দিন কতক পূর্ব্বে মাত্র তাহারা স্থির করিয়াছে যে, তাহারা আসিবে। কাজেই আসিয়া পরামর্শ লইতে, ভাবিতে চিন্তিতে, তাহাদের অনেক সময় যায়। তাহারা কেবল এই মনে করিয়া আইসে যে, সিভিল-সার্ভিসের পরীক্ষা দিবে, না পারিলে ব্যবহারজীবী হইবে; কিন্তু এ সকলের কিছুই স্থির জানিয়া আইসে না। ইংলণ্ডে আসিবার বহুদিন পূর্ব্বে ছাত্রের স্থির করা কর্ত্তব্য, সে কি বিষয় অধ্যয়ন করিবে; এবং সেই বিষয়ে বৎসর দুই তিন দেশে পাঠ করিয়া তবে তাহার ইংলণ্ডে আসা উচিত।

এই সকল কারণেই ভারতবর্ষীয় ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আশার উপযোগী হয় না। National Indian association এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন। উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদিগের জন্য অভিভাবক বড়ই প্রয়োজন—তাঁহারা ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা দেখিবেন। পরামর্শ ও শাসন নিতান্ত আবশ্যক।

... ইংলণ্ডে আসিবার সময় যথাসম্ভব শিক্ষা করিয়া আসিবে। অভিভাবক-

দিগের এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে

ভারতে শিক্ষা।

পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির বিষয় সংবাদ লইয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। সিবিলসার্ভিসের কথাই ধরা যাউক;—যাহারা সে পরীক্ষা দিতে আসিবে, তাহারা কোন কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া, দেশে তাহা যত দূর সম্ভব পাঠ করিয়া, তবে ইংলণ্ডে আসিবে।

এই সকল অসুবিধা হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়, একজন উপযুক্ত অভিভাবকের নিয়োগ। তিনি ছাত্রের পিতার মত কার্য্য করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে

অভিভাবক।

ছাত্র কিছু দিন তাঁহার কাছে থাকিয়া ইংরাজ-সমাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। কলেজের কর্ত্তারা তাঁহারই সহিত আবশ্যক বিষয়ে পরামর্শ করিবেন। ছুটীর সময় তিনি ছাত্রকে হয় নিজ-গৃহে রাখিবেন, নয় ত তাহার উপযুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আবশ্যক হইলে তিনি ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে অন্যত্র পাঠাইতে বা ভারতবর্ষে ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন টাকা কড়ি সব তাঁহার কাছে আসিবে। এইরূপ অবিভাবক প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে সত্য—তবে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে association সাহায্য করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। তবে যে সকল ভারতবর্ষীয় অভিভাবক এ সুযোগ সকল সময় গ্রহণ করেন না, তাহার কারণ বোধ করি ইহাতে অধিক ব্যয় পড়ে। একেই ত ইংলণ্ডে ছাত্রের জন্য প্রভূত ব্যয় হয়, ইহাতে আবার ব্যয় আরও বাড়িয়া যায়। বিনা ব্যয়ে লব্ধ উপদেশে বড় কোন উপকার হয় না। ইহাতে ঝনঝাট ও দায়িত্ব উভয়ই অধিক। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এই জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভিন্ন অন্যত্র প্রায় ইহা পাওয়া যায় না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাওয়া উচিত কি না? ইহার উত্তর প্রদান করা সহজ নহে—ভারতবর্ষে গিয়া তাহারা কিরূপ

শেষ কথা।

ব্যবহার করে, তাহা বুঝিয়া তবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে বিষয়ে বক্তার অভিজ্ঞতা অল্প। কেহ কেহ অবশ্য খ্যাতি লাভ করেন। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে লর্ড কেলভিন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হইয়াছেন। অধ্যাপকের কর্ম্মের এই আরম্ভ। কিন্তু কখনও ইংলণ্ডে আইসেন নাই, এমন অনেক ভারতবাসীও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে শিক্ষিত, তাঁহাদিগের সহিত ইংলণ্ডে শিক্ষিত ব্যক্তিদের তুলনা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বালককে অক্সফোর্ডে পাঠাইলে উপকারের সম্ভাবনা, এবং তাহাতে বিপদের আশঙ্কাও নাই। তাহা না হইলে, বিপদের আশঙ্কা প্রভূত, এবং সুবিধার সম্ভাবনাও সামান্য।

সমালোচনা।

মহারাণীর রাজত্ব।

সার ওয়াল্‌টার বেসাণ্ট, বিগত ষাট বৎসরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের যে সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম :—

কোন দেশের বা জগতের ইতিহাসে আমাদিগের সময়ের প্রকৃত আবশ্যকতা ও স্থাননির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের এই ষাট বৎসর, অন্ত কাহারও কথা দূরে থাকুক, খোদ এলিজাবেথের রাজত্বকাল অপেক্ষাও ইংলণ্ডের ইতিহাসে অধিক আবশ্যক ও অধিক সমুজ্জ্বল বোধ হইবে। এলিজাবেথের রাজত্বকালেরই মত এখন ইংরাজ জাতি আবার যৌবনের উৎসাহ ও আশায় পূর্ণ এবং অগ্রগামী হইয়াছে।

প্রথম কথা।

প্রাচীন ধর্ম্মের স্থানে এখন নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, বিজ্ঞানের নব নব শাখা আবিষ্কৃত হইয়াছে, নব নব আবিষ্কারে পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, নূতন তরী হইয়াছে, নূতন অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, যুদ্ধপ্রণালীও নূতন হইয়াছে। প্রকৃতির নব নব শক্তি মানবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে; এখন নূতন সামাজিক নিয়মে ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতিও সম্মানিত হইতেছে। দেশ, এমন কি, পার্লামেণ্টের হাউস অফ লর্ডসও নূতন সভ্যে পূর্ণ। মধ্যযুগের মত এখন অভিজাতগণ আবার সন্তানদিগকে ব্যবসায়ী করিতেছেন; বহুবিধ নূতন ব্যবসা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন সংবাদপত্র, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ব্যবহারজীবী ও সমালোচকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখন চিকিৎসাবিদ্যা বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছে; আর ষাট বৎসর পূর্ব্বে যেথানে ক্যাঙ্গারু নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিত, সেথানে আজ সৌধশিরঃসুশোভিত শত শত নগর সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। নূতন নূতন জাতি শক্তিশালী হইয়াছে—য়ুরোপে জার্ম্মেনি শ্রেষ্ঠ—প্রাচ্যে জাপানের অভ্যুদয়। পশ্চিম আমেরিকা আর ঘৃণিত নহে;—আফ্রিকায় এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে চিত্রিত মানচিত্র আজ অকর্ম্মণ্য। এলিজাবেথের সময় কবিতার যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এখন তেমনই উপন্যাসের উন্নতি। ইতিমধ্যে দুই তিন জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক দেখা দিয়াছেন, আর বহুসংখ্যক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীস্থ লেখকের মধ্যেও কেহ কেহ এক একখানি এমন পুস্তক রচনা করিয়াছেন যে, তাহাতেই তাঁহাদের অক্ষয় যশোলাভ হইয়াছে। এখন এমন অনেক কবি, ঐতিহাসিক, প্রবন্ধলেখক, সমালোচক ও জীবনচরিতকার আবির্ভূত হইয়াছেন যে, তাঁহারা শত বর্ষ পূর্ব্বে আসিলে অক্ষয় যশের অধিকারী হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এখন "নব" নারীর আবির্ভাব হইয়াছে—এখনও তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। এখন হয় ত তাঁহারা অত্যন্ত অধিক চাহিতেছেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা জননীরই মত রমণী, পবিত্র ও সহানুভূতিশালিনী হইবেন। এখন নূতন নূতন ফ্যাশনের মত তাঁহারা নূতন নূতন বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের রমণীত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে—তজ্জন্য ভয় নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের সহিত তুলনায় ... খৃষ্টাব্দের পরেই যে সকল গোলযোগ উঠিয়াছিল, তাহা

উন্নতি।

রাণীর সহজপ্রাপ্য ভক্তি নহে; আমরা বুঝিয়াছি যে, 'কনস্টিটিউশন' আমাদের এত উপকার করিয়াছে যে, বিশেষ কারণ ব্যতীত ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত নহে।

এখন আমরা এক এক বিষয় ধরিয়া বিচার করিব। প্রথম খাদ্যের কথা ধরা যাউক। এখন যুবকগণ স্থলভে আহারপ্রাচুর্য্যই দেখিয়া আসিতেছে। তাহারা অন্নকষ্টের উগ্রতা সহ্য করে নাই। দেশের সর্ব্বত্র খাদ্য-সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ভিক্ষুকেরা পূর্ব্বেরই মত বলে, 'একটা পয়সা দিন, একখানা রুটি কিনিব।' তাহাদের পদপ্রান্তে উৎকৃষ্ট গমের রুটি গড়াগড়ি যায়; শিশুরা খাইতে না পারিয়া উদ্বৃত্ত রুটি ফেলিয়া দেয়, ভিক্ষুকগণ তাহা কুড়াইয়া লয় না। ইতিপূর্ব্বে কখনও রুটি এত সস্তা ও এত প্রচুর ছিল না। ইতিপূর্ব্বে টাট্‌কা, আমদানী-করা, বা রক্ষিত মাংসও এত সস্তা ছিল না। বাজারে নানাবিধ ফল; এখন বারমাসই কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, আঙ্গুর ও কদলী বিক্রয় হয়। এখন অতিদরিদ্রও ফল খাইতে পায়, এখন চেরি ও ষ্ট্রবেরির অভাব নাই।

আহার।

এখন যুবকগণ দেখে, শ্রমজীবিগণ ভাল পোষাক পরে, তাহারা বেশ সন্তুষ্ট, ক্লবে যায়, সভা করে, ছুটী লয়, বেড়াইতে যায়, সংবাদপত্র পাঠ করে; তাহারা আর বিদ্রোহিমতের সেবক নহে;—তাহারা ইতর দলপতির কথা শুনে বটে, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করে না। ছেলেরা 'পলিটেক্‌নিকে' শিল্পশিক্ষা করে, বিশ্রাম ও ব্যায়ামের উদ্দেশে নানাবিধ সভা সমিতিতে যোগ দেয়। এখন ছেলেরা বিনা ব্যয়ে স্কুলে যাইতে বাধ্য, এখন রাজপথে ভ্রাম্যমাণ হতভাগ্য সন্তানগণও যত্ন পাই[illegible]। এখন শীতকালে সন্ধ্যার সময় শ্রমাবসানে লোকে কিছু পাঠ করে; বৎসরে বৎসরে পাঠকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে ও হইবে; লণ্ডনেই লক্ষ লক্ষ দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রীত হয়; কোন কোন সাপ্তাহিকও দেশের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ বিক্রীত হয়; এখন প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যে পরিপূর্ণ পাঠাগারসমূহে লোক ধরে না। এখন রবিবারে রাস্তা দ্বিচক্ররথে পূর্ণ হইলেও ভাল ভাল পাড়ার সকল ধর্ম্মমন্দিরই জনপূর্ণ। আবার এখানে ওখানে শ্রমজীবীরা অতি সুন্দর বক্তৃতা শুনিতেছে, অতি উৎকৃষ্ট কনসার্ট শুনিয়া শ্রবণ তৃপ্ত করিতেছে, বা অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিতেছে। এখন যুবকগণ এই সকল দেখে, আর ভাবে, বুঝি চিরদিনই এইরূপই ছিল। বর্ত্তমান লেখকের জীবন মহারাণীর রাজত্বের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, আর বোধ হয়, তাহারই সহিত শেষ হইবে। যখন জীবন অধিক সঙ্কটসঙ্কুল ও সাধারণ জনগণের জীবন আরও কষ্টকর ছিল, তিনি তখনকার কথা বলিতে পারেন। পূর্ব্বে শ্রমজীবীদিগের জীবন এরূপ কঠোর ছিল যে, এখনকার শ্রমজীবী তাহা সহ্য করিতেই পারিবে না।

অন্যান্য উন্নতি।

এই ত বর্ত্তমানের কথা। অতীতে বেতন, কার্য্য ও খাদ্য কিরূপ ছিল? প্রথমতঃ অনেক কার্য্যে শ্রমজীবিগণ বর্ত্তমান বেতনের অর্দ্ধেকের অধিক বেতন পাইত না। তখন অধিকক্ষণ খাটিতে হইত; তখন এত ছুটী ছিল না, এবং শনিবারে সকাল সকাল ছুটীও ছিল না। তখন অল্পবয়স্ক শ্রমজীবীদিগের রক্ষার উপায় ছিল না; তাহারাও খনিতে বা কলে সারাদিন, এমন কি, সারা রাত্রিও খাটিতে বাধ্য হইত। সেই সকল শিশুদিগকে কিরূপ শ্রম করিতে হইত, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। তাহারা এতক্ষণ ও এত অধিক শ্রম করিত যে, গৃহে আসিয়াই তাহারা শয্যার আশ্রয় লইত। তখন বাণিজ্যসমিতি ছিল না—লোকে তাহার উপযোগিতাও বুঝিত না। [illegible]

অতীতে।

একদিকে মনিবের আজ্ঞা, অপরদিকে ধ্বংস,—মধ্যে কিছু নাই। তখন খাদ্যের মূল্য অধিক ছিল, এবং দুর্ব্বৎসরে দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইত। রাস্তায় ভাল এক টুক্‌রা রুটি পড়িয়া থাকিবার যো ছিল না। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্রের শ্রমজীবী অর্থাৎ 'জন' সপ্তাহে ৭ শিলিং মাত্র পাইত, শস্যের সময় কিছু অধিকও পাইত। সকলে আবার থাকিবার স্থান পাইত না। সপ্তাহে ৭ শিলিং পাইলে একটা সংসার কেমন করিয়া চলে? (পাঠক মনে রাখিবেন, বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামে এখনও শ্রমজীবীরা দিন তিন আনা, অর্থাৎ সপ্তাহে এক টাকা পাঁচ আনা পাইয়া থাকে!) এখন যে 'চা'র মূল্য দু শিলিং, তখন সেই চা চার শিলিং না হইলে পাওয়া যাইত না। অতি অপকৃষ্ট চিনির সের ছিল আট পেন্স। সস্তা ফলের দোকান ছিল না। তখন দরিদ্রদিগের একমাত্র ক্ষীণ দীপালোকে আলোকিত বিপণিবাতায়নে সময় সময় দুই চারিটা কমলালেবু ও আপেল দেখা যাইত মাত্র। দরিদ্রশিশুরা একটা পয়সাও পাইত না, কাজেই ফলের আস্বাদনও জানিতে পারিত না। তাহাদের লেখাপড়াও ছিল না। শ্রমজীবীরা প্রায়ই লেখাপড়া জানিত না। বর্ত্তমান সকল জিনিসের উপর তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ছিল—তাহাদের সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে মহারাণী, ধর্ম্ম ও হাউস অফ লর্ডস্‌, এ তিনকেই গালি দেওয়া হইত; আবার তাহাতে বিদ্রূপাত্মক চিত্রও থাকিত। লোকে দেশের বা উপনিবেশের কিছু মাত্র জানিত না—তাহারা রাজনীতির কিছু বুঝিত না, দেশান্তরগমন কাহাকে বলে, তাহাও তাহাদের অবিদিত ছিল। রীতিমত ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যও হইত না।

তখন যাহারা সৈনিক বা নাবিক না হইত, তাহাদের ঘর হইতে উঠান বিদেশ ছিল। পল্লীবাসী পল্লীত্যাগ করিত না, সহরবাসী সহর হইতে নড়িত না। তখন ভ্রমণ বড় চলিত ছিল [illegible]নের ত্রিশ মাইল দূরের লোকে লণ্ডন চিনিত না। মধ্য-বিত্ত ও দরিদ্রদিগের ছু[illegible]ল না, ভ্রমণাদিও ছিল না। মফঃস্বল সহরে ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক ও ধর্ম্মযাজক বার মাসই সেখানে কার্য্য করিতেন—কাজ না পড়িলে কোথাও যাইতেন না। মধ্য-অবস্থাপন্ন [illegible]নের মেয়েরা ভাবিতেও পারিতেন না যে, বৎসরে একবার কোথাও গমন আবশ্যক হইতে পারে। যে সকল যুবক ভদ্রসমাজে চলিতে ফিরিতে চাহিত, তাহাদের বড় বিষম বিপদ ছিল। তাহারা কি করিবে? সেনাবিভাগে বা নৌসেনাবিভাগে যাইতে হইলে সুযোগ ও অর্থ চাহি; ব্যবহারজীবী হইতেও অর্থব্যয়; ব্যবসায় করিতে হইলে কেবল পাইকারী কারবার করিতে হয়; কোনও আফিসে কেবল মুহুরীগিরি বা বড় জোর ম্যানেজারী প্রাপ্তির সম্ভাবনা; চিকিৎসক হওয়াটা কতকটা সুবিধা বটে, এটর্ণীও তাহাই। রহিল এক ধর্ম্মযাজকের পদ। চালাক ছেলের পক্ষে য়ুনিভার্সিটির বৃত্তি ও স্কলার্শিপ থাকে—তাও বড় ছিল না। সুবিধা না থাকিলে পাদরীগিরিতেও তেমন উন্নতির আশা ছিল না। অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে ভদ্রনামে তাহার অধিকার থাকিত না। তখন স্থপতি ঘৃণিত হইত; অভিনেতা ত ভবঘুরে, সংবাদপত্রসেবায় যে দুই চার জন বিদ্বান ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতেন না। গ্রন্থকারের ত প্রায় অন্ন বস্ত্র ভিন্ন আর সব জুটিত! ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শরতে প্রায় কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। প্রতিকৃতি আঁকিতে না পারিলে চিত্রকরের অর্থাগম হইত না; শিক্ষক তখন নিতান্তই ঘৃণিত হইতেন। এখনকার শিক্ষকগণ তাহা বুঝিতেও পারেন না। বিজ্ঞান তখন ব্যবসায় ছিল না। হাক্সলিকেও চিকিৎসাবিদ্যাপথে বিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। * আর এখন এক বিজ্ঞানেই ব্যবসায়ের শত দ্বার মুক্ত।

লেখক এই অসাধারণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মোটামুটি কয়টা কথা বলিয়াছেন মাত্র।

* ১৩০২ সালের শ্রাবণের "সহযোগী সাহিত্য"—দ্রষ্টব্য।

এই পরিবর্ত্তনে কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে ; তন্মধ্যে ভদ্র ব্যবহারের ও পাণ্ডিত্যের ক্ষতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের ইতিহাস বিশদরূপে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, এবং তাহা হইবে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক, ঘটনাকালে বড় বলিয়া খ্যাত ঘটনা সকলের আলোচনা সংক্ষেপে সারিয়া, যে সকল ঘটনায় প্রকৃত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সকল ঘটনারই অধিক আলোচনা করিবেন। যেমন ভবিষ্যতের ইতিহাসে ক্রিমিয়ান যুদ্ধ অপেক্ষা শিক্ষাসংক্রান্ত আইন সকল অধিক আলোচিত হইবে। ঐতিহাসিক দেখিবেন যে, চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপও মুছিয়া গিয়াছিল ; তাহার পর পুরাতনের পতন ও নূতনের অভ্যুত্থান। এখন সেকালের সেই সামাজিক প্রাধান্যের আমল আর নাই ; এখন গুটিকতক পরিবারের প্রভূত ক্ষমতাপ্রাচুর্য্যের কাল আর নাই ; মুরুব্বিয়ানাও এখন আর চলে না। আমাদের চিন্তারাজ্যের প্রসার বাড়িয়াছে, এখন আমরা যেন স্বাধীনতার বাতাস পাইতেছি ; বহু অভূতপূর্ব্ব কার্য্য এখন সম্ভব হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এখন আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও যৌবনোৎসাহপূর্ণ। আর পঞ্চাশ বৎসর যদি আমরা এরূপ একত্র থাকি, তবে জগতের অর্দ্ধের ও অধিকাংশ মানবের মধ্যে শৃঙ্খলা, আইন, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে এরূপ ঐক্য শক্তির সৃষ্টি হইবে যে, জগৎ তাহা এখন স্বপ্নেও ভাবে না। লেখকের স্বপ্ন সফল হউক।

ইতিহাস।

কোনও নৃপতি প্রতিভার সৃষ্টি করিতে পারেন না, মুরুব্বির সাহায্যে বিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কার অসম্ভব। তবে প্রতিভার সাহায্য ও আবিষ্কারের উন্নতিকল্পে মহারাণী যথাসম্ভব করিয়াছেন ; তাই ভবিষ্যতে এ কাল ভিক্টোরিয়ার সময় বলিয়াই কথিত হইবে।

এই ষাট বৎসরে 'ভারতবর্ষের' যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

কে জানিত ?

কে জানিত উষার আলোক
ডুবে যাবে আঁধারের ছায়,
ক জানিত মধ্যাহ্নের রবি
...রে অস্ত যাবে হায়।
চির...ন্ত গোধূলি-আলোকে
কে জানি ...টিও তারা,
ফুটিবে না এ... -প্রভাতে
কে জানিত বসন্ত ধরা ;
শোভাহীন হবে এই দি,
কে জানিত চন্দ্রমার হাস,
ডুবে যাবে কাল-রাহু-গ্রা...
ধরণীর শ্যামল যৌবন
শুখাইবে মরুর বাতাসে ;

কে জানিত বাসনার তরী
চূর্ণ হবে ঘোর ঝটিকায়,
নিভে যাবে দীপ্ত দীপমালা,
আঁধারিয়া উৎসব-আলয় ?
মরণেরে দিয়া আলিঙ্গন
ভগ্ন বীণা লুটাবে ধূলায়,
অতীতের আনন্দসঙ্গীত,
শূন্য গৃহে করে হায় হায়।
সব তোর দিয়া বিসর্জ্জন,
চল, আজ হৃদয় আমার !
জেগে থাক অন্ধকার শুধু,
নীরবে ঘেরিয়া চারিধার।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

। প্রত্নতত্ত্বের ।

য় নাই ; ভাষার কৃত্রিম আড়

দেবেন্দ্রনাথ সেন দেখিতেছি তাঁ

ড়িবেন না ! এবার তিনি 'গো

রিয়াছেন । রচনার প্রবাহ প্রবল,—বর্ণনাও উজ্জ্বল।

একটি প্রত্নতত্ত্ব বন্ধ। লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে,—"সংহিতা ও ব্রা কাল অথর্ব্ব বেদের সামরিক হইতেছে ; * * * সে গুলি (সংহিতা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ২৩৮০ বৎসরের অগ্র পশ্চাৎ কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়।" "সিরাজ প্রস্তাবে লেখক এবারে সিরাজের সহিত ইংরাজদের "সন্ধির পরিণাম" বিবৃত করিয়াছেন। "স্বরলিপি"তে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি গান আছে। "রামমোহন রায়" সন্দর্ভটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ-সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল ;—ভারতী-সম্পাদিকারা তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন, বলা যায় না। প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত ভাষার লীলায় অলঙ্কৃত,—কিন্তু স্থানে স্থানে এত সংস্কৃতবহুল ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে যে, কৃত্রিমতাপূর্ণ মনে হয়। প্রবন্ধমধ্যে রবীন্দ্র বাবুর বক্তব্য অল্প ; কিন্তু কবিবর কবিজনসুলভ কৌশলে তাহাকেই অত্যন্ত ফেনাইয়া তুলিয়াছেন।—সুতরাং সমস্ত প্রবন্ধটি ক্ষণভঙ্গুর জলবুদ্বুদের মত আপাতসুন্দর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। "রামমোহন রায়" রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রতিভার যোগ্য হয় নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্র বাবুর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিকে শব্দ-রঞ্জিত চিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চিত্র বিচিত্র পাথর কাটিয়া বসাইয়া যেমন ইটালীয় শিল্পী 'মোজেক' শিল্প নির্ম্মাণ করে, রবীন্দ্র বাবু তেমনই বিচিত্র শব্দমালা বাছিয়া সাজাইয়া এই 'শব্দ-চিত্রের' রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সুগঠিত সুরঞ্জিত প্রতিমার প্রাণ নাই! "প্রতিশোধ" একটি আজগুবি গল্প ;—না আছে গল্পের গঠনকৌশল, না আছে বর্ণনার ভঙ্গী, না আছে আখ্যান-বস্তু ! এমন 'আষাঢ়ে' ও হাস্যাস্পদ গল্প সচরাচর দেখা যায় না,—"প্রতিশোধের" এই একমাত্র বিশেষত্ব।

নব্য-ভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। "সাহিত্য ও শম্ভুচন্দ্র" শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের রচনা। লেখক, মিষ্টার এফ্. এইচ্. স্ক্রাইন, সি. এস্. কর্ত্তৃক রচিত, "শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ;—জীবনী ও পত্রাবলী" গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "রাজা রামমোহন রায়" দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বর্গীয় রাজার বাঙ্গালা স্বাক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বহুমূল্য দুর্লভ স্বাক্ষর সকলের আদরণীয় হইবে। শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষের "শিশুর সান্ত্বনা" কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

নব্য-ভারত। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "গরিব-সেবা" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য ও অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। পরহিতৈষী দরিদ্রবন্ধু বার্ণাডো দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য যে

., তবে থাক সে.

এ কি? এত অল্প বয়সেই এমন

তে লাগিলেন। বালক সহজে স

।মার মত গৃহহীন আরও অনেক ব   । না।

. বর্ণদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, তি.   এমন অক্রূং

প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রত্যয় করিতে পারি না। .   .রে বালক শীতে

.এ, বালককে অগ্নিতাপ দ্বারা শীতার্ত্ত দেহকে উষ্ণ করি   বলিলেন, এবং উষ্ণ পান করিতে দিলেন। বালক কাফি সেবনে পরিতৃপ্ত হইল। পরে বর্ণদ নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকা দর্শনে নির্গত হইলেন। বালক অগ্রে, পশ্চাতে বর্ণদ নিঃশব্দে চলিতেছেন। রাজবর্ত্ম চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ—কেবল মাত্র প্রহরীর পদবিক্ষেপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বর্ণদ বলিলেন 'কৈ? কোথাও বালক বালিকা দেখি না।' বালক বলিল 'এখনই দেখিবেন। পাহারাওয়ালার ভয়ে সব বালক বালিকা লুকাইয়াছে।' বর্ণদ দেখিলেন, সম্মুখে এক দৃঢ় প্রাচীর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'কৈ! তোমার বালক বালিকারা কোথায়?' সেই প্রাচীরশিরোবর্ত্তী সেই ছাদ দেখাইয়া বালক উত্তরকরিল 'ঐ, উপরে মহাশয়!' বালক অনায়াসে তাহার উপরে উঠিল, উপর হইতে একটি যষ্টি ধরিল। তাহার সাহায্যে বর্ণদ কোন মতে উপরে উঠিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, ১১ এগারটি বালক সেই ছাদের উপর শীতে জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে;—তখনই সহসা চন্দ্র মেঘবিনির্ম্মুক্ত হইল। এবং সেই নিদ্রিত বালকগণের মুখোপরি চন্দ্রালোক পতিত হইল। সেই নিমীলিতনেত্র বালকগণের শীতক্লিষ্ট মুখবৃন্দ হিমানীপীড়িত কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইল। বর্ণদ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল * * * তাঁহার মনে হইল, অন্ততঃ আমার আশ্রিত এই বালকটিকে উদ্ধার করিতে হইবে।" এই ঘটনার পর বার্ণদো এক নিমন্ত্রণসভায় এই শোচনীয় কাহিনী কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবর্গ প্রথমে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে বার্ণদো যখন তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন, তখন—সেই মঙ্গলমুহূর্ত্তে—পঁচিশটি অনাথ বালক রাজপথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া বার্ণদো তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত অনাথাশ্রমের সূত্রপাত করেন। "অদ্য তিনি ৫০০০ পঞ্চ সহস্র বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়া লালন পালন করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু "Poverty Problem in India" নামক নবপ্রকাশিত সুগ্রথিত গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই।